আরব্য রজনী

তারাপদ রাহা

॥ আদিকথা ॥

প্রতারণা আর বেইমানি জগতে কেউই বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেটা আসে প্রিয়জনের কাছ থেকে। জীবনে সবচেয়ে যাকে বেশি ভালবাসা গিয়েছিল তার দ্বারা যদি মানুষ প্রতারিত হয়, তা হলে তা হয়ে ওঠে একেবারে অসহনীয়। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে মানুষের মন।

ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল একদিন ইরানের বাদশা-মহলে, অনেক—অনেক কাল আগে। বাদশা শাহরিয়ার তাঁর প্রিয়তমা বেগমের বেইমানিতে প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁকে হত্যা করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল সমস্ত নারীজাতির ওপর। হারেমের অন্যান্য বেগমের গর্দান নিয়েও তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না, উজিরকে ডেকে তিনি বললেন—শোনো উজির, রোজ সন্ধ্যায় আমীর ওমরাহদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কুমারী মেয়ে যোগাড় করে আনবে; জাঁকজমকে বিয়ে করব তাকে। একটি রাত্রি শুধু বেগমের মর্যাদা পাবে সে আমার কাছ থেকে, পরদিন ভোরেই জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে, এ ভারও রইল তোমার ওপর।

শুনে তো উজিরের বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল, একি বিষম ফরমান বাদশার!—কিন্তু উপায় কি, বাদশার হুকুম তো তাঁকে তামিল করতেই হবে; নইলে তাঁর নিজেরই গর্দান যাবে!

তারপর আমীর ওমরাহদের কোন না কোন এক বাড়ি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল ওঠে, বাদশার হুকুমে উজিরকে কোন না কোন বাড়ি থেকে বাপ-মায়ের কোল শূন্য করে তাদের নয়নের মণি সদ্যফোটা গোলাপের মত তরুণী মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে হয়, আর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে দিতে হয় জল্লাদের হাতে।

এমনি করে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; বছর ঘুরে এল। শেষে এমন দিন এসে গেল যখন উজির দেখলেন, নিজের দুই মেয়ে ছাড়া বাদশার যোগ্য আর কোন মেয়ে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিন বিষণ্ণমুখে উজির সেই কথাই ভাবছেন, এমন সময় তাঁর বড় মেয়ে শাহরাজাদী কাছে এগিয়ে এল, মেয়েটি যেন হীরের টুক্‌রো ; যেমনি রূপ তেমনি বিদ্যা, আর তেমনি বুদ্ধি। এই বয়সেই যত রকমের কেতাব আছে, সবই সে পড়ে ফেলেছে। তা ছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গী এতই মধুর যে, যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

মেয়ে বাপের পাশে বসে বললে—কি ভাবছ আব্বা, এমনি মুখ ভার করে ?

ভাবছি—আজ সন্ধ্যায় বাদশার বিয়ের কনে জোটাব কোত্থেকে ? দেশে তো আর বিয়ের বয়সী মেয়ে নেই রে, মা !

মেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে—কেন আব্বা, আমার কি বিয়ের বয়স হয়নি ?

শুনে চমকে উঠলেন উজির—কি বলছিস তুই ! বাপ হয়ে জেনে-শুনে তোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো ?

যাদের এতদিন দিয়েছ, আব্বা, তাদেরও তো বাপ-মা ছিল ?

সে বাদশার আদেশ পালন করেছি।

মেয়ে যখন আর দেশে নেই, তখন আমাকে পাঠানই তোমার কর্তব্য। তুমি যদি না নিয়ে যাও, তা হলে নিজেই গিয়ে আমি হাজির হব বাদশার কাছে।

শুনে তো উজিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে শাহরা-জাদীর মায়া হল। স্নিগ্ধ হাসি হেসে সে বলল—আব্বা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি এক ফন্দি এঁটেছি, যদি সেটা ঠিকমত খাটাতে পারি, তা হলে আমি তো বাঁচবই—তার সঙ্গে রক্ষা পাবে দেশের কুমারী মেয়েদের জান আর মান।

মেয়ের কথায় সান্ত্বনা পেলেন না উজির। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তিনি বাদশার দরবারে চলে গেলেন। এগিয়ে এল

শাহরাজাদীর ছোট বোন তুনিয়াজাদী তার দিদির কাছে। জিজ্ঞাসা করল—আব্বার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল রে দিদি, তোর?

দিদি হেসে বলল—আমি আজ বাদশার বেগম হতে যাচ্ছি রে, বোন।

তুই?—বলতে গিয়েই তুনিয়ার তু'চোখ জলে ভরে এল।

ছিঃ, কাঁদিসনে, বোকা মেয়ে! শোন্, আমি এক ফন্দি এঁটেছি। বেগম হয়ে শেষ রাত্রে বাদশার কাছে বায়না ধরব, আমি আমার ছোট বোনকে জন্মের শোধ একবার দেখবার জন্যে। জানি অনুমতি মিলবে। তুই গিয়ে জন্মের শোধ একবার আমার কাছে গল্প শুনতে চাস্, বাস্।

তুনিয়াজাদী হয়ত বুঝল, হয়ত বুঝল না; তখনকার মত চুপ করে রইল সে।

সন্ধ্যাকালে শাহরাজাদীকে বিয়ের কনে সাজিয়ে উজির বাদশার সামনে নিয়ে এলেন। বাদশা দেখে চমকে উঠে বললেন—একি করেছ উজির, তুমি—নিজের মেয়েকে···!

কি করব, জাহাঁপনা।—দেশে আর মেয়ে তো চোখে পড়ে না। তাছাড়া আমি না আনলেও নিজেই আসত, ওর জিদ।

শাহরিয়ার একবার তাকিয়ে দেখলেন শাহরাজাদীর দিকে। যেন একটা সদ্যফোটা বসরাই গোলাপ, চোখে মুখে হীরের ঝলমলানি।

বললেন—তুমি নিজে এসেছ—ইচ্ছে করে—কাল সকালে তোমার কি দশা হবে তা জেনেও?

জি, জাহাঁপনা—জেনেও। একরাত্রি আপনার বেগম হবার সৌভাগ্য লাভের জন্যে শতবার মৃত্যুবরণ করতেও রাজী আমি।

উজিরের মেয়ের কথা শুনে বাদশা একেবারে থ।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল!

শাহরাজাদীকে খুব ভাল লাগল বাদশার। অনেক আদর পেলো বাদশার কাছ থেকে সে, সুযোগ বুঝে শাহরিয়ারকে বললে—অনেক

পেয়ার পেলাম, জাহাঁপনা, আপনার কাছ থেকে, জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে।—একটা আরজি আছে আপনার কাছে আমার, রাখবেন কি ?

বল বল, আজ রাতে কিছুই অদেয় নেই তোমায় আমার।

শাহরাজাদী বলল—জাহাঁপনা, আমার একটি ছোট বোন রয়েছে, তাকে খুব ভালবাসি আমি। কাল সকালে তো দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে আমাকে, তার আগে—যতক্ষণ আছি, মানে আজকের রাতটুকু আমি তাকে কাছে রাখতে চাই।

বাদশা তখনই লোক পাঠিয়ে শাহরাজাদীর ছোট বোনকে নিয়ে এলেন নিজের শয়নকক্ষে। এনে পাশের পালঙ্কে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রি তিন প্রহর কেটে গেছে, আর একটি প্রহর মাত্র বাকী। দুই বোনের কারো চোখেই ঘুম ছিল না, থাকবার কথাও নয়। দুনিয়াজাদী বললে—দিদি ঘুমোসনি ?

কেন রে, দুনিয়া ?

ওদের কথা শুনে শাহরিয়ারেরও ঘুম ভেঙে গেল। চুপ করে রইলেন তিনি দু'বোনের কথাবার্তা শোনবার জন্যে।

দুনিয়া বললে—দিদি—একটা গল্প শোনাবি ? কি সুন্দর গল্প বলতিস তুই, আর তো শুনতে পাব না, জন্মের শোধ তাই—

শাহরাজাদী জবাব দিলে—জাহাঁপনা জাগুন আগে, তাঁর অনুমতি পেলে তবে শোনাতে পারি।

শাহরিয়ার জেগেই ছিলেন। বললেন—আমি জেগেছি। বেশ তো শোনাও না তোমার বোনকে গল্প—আমিও একটু শুনি।

বাদশার অনুমতি পেয়ে মনে মনে খোদাকে তসলিম করে ধীর মধুর কণ্ঠে শাহরাজাদী শুরু করলে তার গল্প : সে যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত। তাছাড়া জাদুকরীর মত কথার ইন্দ্রজাল বুনে চলল সে। শাহরিয়ার আর দুনিয়াজাদীর সামনে ভেসে উঠতে লাগল, কত মরু-প্রান্তর

খর্জুরবীথি, কত সরিৎসাগর পর্বত, কত দৈত্যদানাপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন হীরে জহুরত, কত রকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত বিপদ ঝঞ্ঝা, প্রমোদবিলাস, কত সুন্দরী বিলাসিনী নর্তকী, কত দুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটিল চক্রান্ত, হিংসাদ্বেষ আর প্রণয়ের কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, গল্প কিন্তু শেষ হল না। শাহরিয়ার বললেন—বেশ—বাকিটুকু কাল আবার শুনব—

গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্য বেগমের গর্দান নেওয়ার হুকুম দিতে পারলেন না বাদশা।

সূচী :

হীরের চেয়ে দামী

বোন দুনিয়াজাদীর তাগিদে সুলতান শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদী তার গল্প শুরু করলে—

অনেক—অনেক কাল আগে, বসোরায় এক সুলতান ছিলেন। মস্ত বড় সুলতান। যেমনি তাঁর শৌর্যবীর্য, তেমনি ধনসম্পদ, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি,—প্রজাপ্রীতি। হলে হবে কি—সুলতানের মনে সুখ নেই, কারণ তাঁর ছেলে মেয়ে নেই। সন্তান লাভের জন্যে দীন দুঃখী অনাথ দরবেশ ফকিরকে অনেক দান খয়রাত এবং খোদার কাছে অনেক দোয়া মাঙার পর খোদা সুলতানের মনস্কামনা পূর্ণ করলেন, চাঁদপানা একটি ছেলে হল সুলতানের। সুলতান তার নাম রাখলেন জইন অল আসনাম। ছেলে বড় হলে সুলতান মৌলভী রেখে তাকে কেতাব কোরান পড়ালেন, রাজনীতি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিলেন, শিক্ষা দিলেন অনেক কিছু; রাজ্যপালন ধনরক্ষা সম্বন্ধে নিজেই অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর বুড়ো হয়েছিলেন তিনি, খোদার ডাকে একদিন তাঁর কাছে চলে গেলেন। জইন সিংহাসনে বসল।

জইনের তখন তরুণ বয়স, বয়সের ধর্মে বিজ্ঞ বাপের উপদেশ সে আর পালন করতে পারল না। সমবয়সী অনেক বন্ধু আগেও ছিল, সিংহাসনে বসবার পর আরও অনেক নতুন জুটল, তাদের খুশী করবার জন্যে বৃদ্ধ অভিজ্ঞ উজির আমীর ওমরাহদের সরিয়ে তাদের জায়গায় তরুণের দল ভর্তি করল। তারা রাজকার্য বোঝে না, বোঝে কেবল ফুর্তি।

তাদের নিয়ে খানাপিনা, নাচগান ফুর্তি, চড়া দামে নিত্য নতুন বান্দাবাঁদী, দামী সৌখীন জিনিসপত্র কেনায় বছর খানেকের মধ্যেই রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। খাজাঞ্চি এসে কুর্নিশ করে জানাল—

জাহাঁপনার দৈনিক যা খরচ, সে হিসাবে আর তিন দিনের মতো অর্থ আছে রাজকোষে।

শুনে এই এতদিন পরে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল তরুণ সুলতান জইন। ঠিক এই সময় মা এসে তিরস্কার করে বললেন—কি হচ্ছে, বাবা, বাপের তকতে বসেছ, রাজ্যের খবর রাখো না কিছু। প্রজারা সব বিদ্রোহী হয়েছে, সমস্ত রাজাদের অনেকেই তালে আছে—তোমাকে সরিয়ে তোমার বাপের সিংহাসনে বসবার।

এই যেন প্রথম ঘুম ভাঙল—এমন চোখে জইন তাকালো মায়ের মুখের দিকে—রাজকোষও না কি শূন্য, মা!

তবে! এবার ভোল পালটাও, বুঝে চলো, নইলে আমার হাত ধরে পথে বেরুতে হবে তোমায়।

বাপজান বেঁচে নেই, কি করা যায় এখন, মা, তুমিই বলে দাও।

মা বললেন—তোমার ছেলে-ছোকরা বন্ধুবান্ধব সব তোমার দরবার থেকে সরাও, পুরনো বুড়ো উজির আমীর ওমরাহদের ডেকে আনো, গোল না মেটা পর্যন্ত না হয় আমিই রাজ্য শাসনের ভার নিচ্ছি।

সেই ভালো, মা।

তাই হল। জইন সিংহাসনে বসলেও পুরনো উজির আমীর ওমরাহদের ডেকে এনে তাঁদেরই পরামর্শমতো বেগমই রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমিত হল, সামন্ত রাজাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হল, রাজ্যে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। রাজ্যে শান্তি এল, কিন্তু, রাজকোষের শূন্যতা পূর্ণ হল না—অত শীগগির হয় না। অর্থের অভাবে অনেক ভোগবাসনাই মেটে না, রাজ্যের অনেক উন্নয়নের কাজেই হাত দেওয়া যায় না। জইন ভাবে, দিনরাত ভাবে, ভাবনায় অনেক রাতে ভাল ঘুম হয় না।

একদিন এমনি ভাবনায় ভাবনায় সারারাত ঘুম হয়নি, শেষে প্রভাতের দিকে একটু তন্দ্রা এলে তন্দ্রার মাঝে স্বপ্ন দেখলে, সৌম্য-দর্শন এক শেখ এসে তাকে বলছেন—জইন, তুমি ভেবো না, তোমার

সকল অভাব ঘুচে যাবে, তুমি একবার কায়রোয় যাও, অতুল সম্পদের অধিকারী হবে তুমি।

প্রভাতের স্বপ্ন, এ না কি ফলে! জইন খুশী হয়ে মা'র কাছে গিয়ে তার স্বপ্নের কথা বললে। মা শুনে হেসে উঠলেন: পাগলা ছেলে—স্বপ্নে অমন কত কি লোকে দেখে, বাবা, স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয়?

হোক না হোক—আমি একবার গিয়ে দেখতে চাই, মা, ক্ষতি ত কিছু নেই—না হয় শুধু হাতে ফিরে আসব, যেমন আছি তার চেয়ে খারাপ ত কিছু হবে না!

জইন সেই দিনই শেষ রাত্রে সামান্য কিছু পাথেয় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একাই রওনা হল। দেরি সইছিল না বলে কয়েকদিন অবিশ্রান্ত পথ চলে অবশেষে হাজির হল কায়রো নগরীতে। চমৎকার শহর, কিন্তু সেদিন আর শহর দেখা হয় কি করে! পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত সে। ঘোড়াটাকে জুম্মা মসজিদের কাছে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে এনে খেয়ে মসজিদের কঠিন মেঝেতেই শুয়ে পড়ল জইন। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। শেষ রাত্রে জইন স্বপ্ন দেখল, সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ শেখ আবার এসেছেন, এসেই বলছেন—জইন, তুমি আমার কথামতো যে এখানে এসেছ, এতে আমি খুব খুশী হয়েছি, বুঝলাম, তুমি আলসে কুঁড়ে নও, উৎসাহী। উৎসাহী লোকেরাই খোদার দোয়া পায়। তুমি আবার তোমার রাজধানীতে ফিরে যাও, গেলে তুমি বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে, সে এত যে দুনিয়ার কোন বাদশা কোনদিন তা চোখে দেখেননি। এখানে এনেছি তোমায় শুধু পরীক্ষা করতে। এই বলে শেখ কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

জেগে জইনের মনটা একটু দমে গেল; এখানে কিছু হবে না, আবার ফিরে যেতে হবে! তা হলে মায়ের কথাই কি ঠিক, স্বপ্ন টপ্ন ও সব বাজে, কিন্তু বাজে হলে স্বপ্নে শেখ আবার দেখা দেবেন কেন! আর তা ছাড়া যা ওঁর চেহারা তা দেখে মনে হয় উনি কোন পীর-

পয়গম্বরই হবেন। যাক—বেশি ভেবে লাভ নেই—বাড়ি ফিরে ত একদিন যেতেই হবে!

জইন এর পর কয়েকদিন ওখানে থেকে শহরটা ঘুরে ফিরে দেখে বাড়ি ফিরে এল। খালি হাত।

মা দেখে একটু হেসে বললেন—কই রে, তোর ধনরত্ন কই?

কিছ্ছু হল না, মা।

জইন তখন তার দ্বিতীয় স্বপ্নের কথা মায়ের কাছে খুলে বললে। শুনে মা কি ভাবলেন বুঝা গেল না, তিনি ছেলেকে শুধু বললেন—তুই ভাবিস্ নে, বাবা তুই আমার কথা শুনে চল, তোর এমনিতেই ভাল হবে, সম্পদ ফিরে আসবে, চ্যাংড়া অকর্মণ্য বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াসনে, বুড়ো পুরনো উজির ওমরাহদের পরামর্শমতো রাজ্য শাসন কর, প্রজাদের মুখের দিকে চা, শেখ কেন, সবার বড় যে খোদা তিনিই সব কিছু দেবেন তোকে। আমার কথা শুনে চলে দেখ তুই!

জইন বললে—খোদার কসম, তোমার কথার অবাধ্য আমি হব না। তুমি যা বলবে তার এক চুল এদিক ওদিক হবে না, দেখো।

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছিল জইন। রাত্রিও হয়ে গিয়েছিল, গোসল করে খেয়ে দেয়ে শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিলেন আবার সেই শেখ। শেখ বললেন—জইন, উৎসাহী উদ্যোগী সাহসী বীর, আমি আবার এসেছি, আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে এসেছি। তোমার ঘুমের জড়তা কাটলেই তুমি একটা গাঁইতি নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের যেখানে তোমার বাবার কবর—তার পশ্চিম দিকটা খুঁড়বে—তা হলেই যে ধনরত্ন তোমায় দিতে চেয়েছি তা তুমি পাবে।

ঘুম থেকে উঠেই জইন ছুটল তার মায়ের কাছে, গিয়ে বলল তাকে—এই নতুন-দেখা স্বপ্নের কথা।

শুনে মা এবারও হাসলেন: শেখ তোর সঙ্গে তামাশা করছেন।

না, মা, তামাশা বোধ হয় না, তাঁর চেহারা ত তুমি দেখনি, দেখলে ভক্তি হয়। আর মিথ্যে হলে তিনবার একই লোকের স্বপ্ন দেখব কেন?

তা ছাড়া দূর ত নয়, এবার ত বাড়ির ভেতর, এবার ত আর কায়রো যেতে হচ্ছে না আমায়, একবার খুঁড়েই দেখা যাক না কেন!

মা গম্ভীর হয়ে বললেন—বেশ দেখো, খুব বেশি পরিশ্রমের কাজ ত নয়, আমার ভয় হচ্ছে—এবারও ফিরে এসে না বলো—না, মা, এবারও কিছু হল না।

জইন তখন হাতমুখ ধুয়ে খোদার নাম স্মরণ করে একটা গাঁইতি নিয়ে চললো তার বাবার কবরের কাছে। গিয়ে খুঁড়তে শুরু করলো তার পশ্চিমের দিকটা। বেশিক্ষণ খুঁড়তে হল না, একটু খুঁড়বার পরই বেরুল একখানা শ্বেতপাথরের টালি, তাতে একটা আংটা লাগানো। আংটাটা ধরে টালিখানা তুলে ফেললে জইন—বেরুল একটা সিঁড়ি। বাতি নেই, দিব্যি আলো, দিনের আলোকে হার মানিয়ে দেয়! কি করে হল? জইন তাকিয়ে দেখে দু'পাশের দেয়ালে অসংখ্য রত্ন। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নামলেই জইন দেখে দরবার ঘরের মতো মস্ত বড় কামরা, কামরাটার থাম্বা আর দেয়ালগুলো তৈরি এলাবাস্টার আর শ্বেতপাথর দিয়ে। কামরাটার ভেতর সবুজ দামী পাথরের মুখ-ঢাকা বেশ বড় বড় জালা। দেখে জইনের মনে হল—বাবা বোধ হয় ভাল সিরাজি পুরনো করতে এমনি করে রেখে গেছেন, আবার তখনই মনে হল—অন্য কিছুও ত হতে পারে, একবার দেখাই যাক না! জইন তখন একটার ঢাকা খুলে দেখে চক্‌চক্ করছে সাবেকি মোহর। এত বড় জালা ভরতি মোহর দেখে খুশী উপচে পড়তে লাগল জইনের চোখে মুখে। কৌতূহলী হয়ে আর একটার ঢাকনা খুললো জইন: ইয়া আল্লা, এটাতেও যে! এর পর বাকী আটত্রিশটার ঢাকনা খুলে যখন সে দেখলে—ও সবগুলোতেই মোহর ঠাসা, তখন আনন্দে তার সারা গা থর থর করে কাঁপতে লাগল। সেই অবস্থায় ছুটে গেল সে তার মায়ের কাছে—

ও মা, মা—হাঁপাচ্ছে জইন।

কি রে, কি হল, অমন করছিস কেন?

তুমি যে বলেছিলে স্বপ্ন সত্যি হয় না, একবার দেখবে এসো।

জইন তখন মাকে সেই ভূগর্ভের কামরায় নিয়ে এসে একে একে চল্লিশটা জালার ঢাকনা খুলে দেখালে। দেখে মা-ও একেবারে থ।

বিস্ময়ের ভাব একটু কাটলে মা ছেলেকে বললেন—খোদা মেহেরবান—এবার তাঁর দোয়ায় যা পেলে, খবরদার—তার একটিও অপব্যয় করো না, অপদার্থ বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করে উড়িও না, নিজের ভোগ ছাড়া রাজ্যের কল্যাণে, প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় করবে এ সব।

তাই হবে, মা, এবার থেকে সব কিছুতেই তোমার কথা শুনে চলবো, তার একটুও অন্যথা হবে না।

হয়েছে, হয়েছে! শুধু আমার কথা নয় পুরনো বুড়ো উজির আমীর ওমরাহদেরও পরামর্শমতো চলবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ নজর পড়ল ঘরের এক কোণে আর একটা ছোট ঐ রকম সবুজ পাথরের পাত্র রয়েছে।

ওটাতে আবার কি!

মায়ে বেটায় এগিয়ে গিয়ে দেখেন একটা চাবি—সোনার চাবি। চাবি যখন তখন খুলবার মতো তালাবন্ধ কিছু আছেই। খুঁজতে খুঁজতে কামরার এক প্রান্তে একটা দরজায় তালা লাগানো দেখা গেল। চাবিটা তালায় লাগল—ঘুরাতেই খুলে গেল দরজা। মাকে সঙ্গে করে জইন এগিয়ে গিয়ে দেখে—ইয়া আল্লা, এ যে একটা প্রাসাদ বললেই হয়! শ্বেত পাথরের দেয়াল, মস্ত বড় মেঝে, মেঝের উপর ন'টা সোনার বেদী, আটটা বেদীর উপর আটটা সুন্দর তরুণীর প্রমাণ মূর্তি। কোন্ ভাস্কর গড়েছে, এ যে একেবারে জ্যান্তের মতো দেখাচ্ছে! আর কি জেল্লা—হীরে নয় ত!

মা বললেন—হাঁ রে, হীরেই যেন মনে হচ্ছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে জইন বলে উঠল—বাপজান কি কাণ্ড করে গেছেন! কোত্থেকে এনেছেন, এত বড় বড় হীরে কি দুনিয়ায় ছিল?

এবার নজর পড়ল—যে বেদীটাতে মূর্তি নেই, তার দিকে। ওটায় কোন মূর্তি নেই, ওর উপর পাতা—কাগজের মতো করকরে

একটা রেশমী কাপড়। তাতে তার বাপজান লিখে গেছেন—

বেটা জইন, গোটা হীরে থেকে তৈরি আটটা মূর্তি দেখে তাজ্জব বনে যাবে তুমি। হ্যাঁ, এগুলো তাজ্জব জিনিসই বটে, তুনিয়ায় এ রকমটি আর কোন সুলতানের ঘরে নেই, কিন্তু এদের চেয়েও হাজার গুণে সুন্দর আর দামী মূর্তির জন্যে—ন'য়ের বেদীটা খালি রেখে গেলাম আমি। সেটা যদি পেতে চাও, তা হলে আবার তুমি কায়রো যাও, গিয়ে আমার পুরনো বান্দা মোবারেকের সঙ্গে দেখা করো, সেই, তোমাকে ঐ মূর্তিলাভে সাহায্য করবে। তাকে খুঁজে পেতেও কষ্ট হবে না, ওখানে গিয়ে যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই তার বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

লেখা দেখেই জইন বলে উঠল—বাপজান লিখে রেখে গেছেন, এ মূর্তি আমায় আনতেই হবে। আমি আবার কায়রো যাব।

বেগম ছেলের উৎসাহ দেখে বললেন—বেশ যাও তুমি, খোদা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন! তোমার অবর্তমানে আমিই রাজ্য শাসন করব।

জইন সেইদিনই যাবার তোড়জোড় শুরু করলে। পরদিন ভোরেই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল। কয়েক দিন পর কায়রো এসে হাজির হয়ে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল, তাকেই জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ, ভাই, এখানে মোবারেক বলে কাউকে চেনো?

মোবারেক সাহেব? তাঁকে কে না চেনে বলুন, কায়রো শহরে এমন দান খয়রাত, বড় দিল আর কারো নেই, বিদেশী অতিথি অভ্যাগতের জন্যে তাঁর দরজা সব সময়ই খোলা! আসুন, জনাব—দেখিয়ে দিচ্ছি আমি তাঁর বাড়ি।

লোকটা জইনকে যে বাড়িতে নিয়ে এল সে যেন এক সুলতানের বাড়ি। বাড়ির সামনের বাগানে কত ফলফুলের গাছ, ফোয়ারা, কত মূর্তি! লোকটার সঙ্গে হুড়ি-ঢালা পথে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই একটা বান্দা দরজা খুলে বললে—কোত্থেকে এসেছেন, কি চাই?

আমি বিদেশী, বহু দূর দেশ থেকে এসেছি, মোবারেক সাহেবের

দান খয়রাত অতিথি সেবার কথা শুনে তাঁর বাড়িতেই আজ রাত্রের মতো আশ্রয় নিতে চাই।

বান্দা তখনই ছুটে গিয়ে তার মনিবের অনুমতি নিয়ে এসে জইনকে কামরার পর কামরা পার করিয়ে নিয়ে চললো মোবারেক সাহেবের কাছে। জইন কামরাগুলো দেখছে আর অবাক হচ্ছে—সে ভুল জায়গায় এল না ত, তার বাপের বান্দার এত ঐশ্বর্য! অবশেষে মোবারেক যে কামরায় বসে ছিলেন সেই কামরায় এসে গেল তারা। একটা দামী রেশমী কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া বিছানায় তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন মোবারেক, জইনকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম করে বললেন—আসুন জনাব, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, আমার বাড়ি আপনার নিজের বাড়ি বলেই মনে করবেন।

জইনকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে মোবারেক বললেন—আপনি কি, কোত্থেকে কি উদ্দেশ্যে এখানে আসা—জানলে দিলটা আমার খুশী হয়।

উত্তরে জইন বললে—সুদূর বসোরা থেকে আসছি আমি, ওখানকার সুলতানের পুত্র আমি, তিনি অবশ্য বছর খানেক আগে মারা গেছেন, তাঁর মোবারেক নামে এক পুরনো বান্দার খোঁজে এসেছি আমি এখানে।

বলেন কি, জনাব, বসোরার সুলতানের ছেলে আপনি? কিন্তু আমি যতদূর জানি, আমার মনিব বসোরার সুলতানের ত কোন পুত্র ছিল না! কত বয়স হয়েছে আপনার।

তা—বিশ বছরের মতো হবে। আপনি কতোদিন বসোরা ছেড়ে এসেছেন?

তা—বছর বাইশেক হবে।···আপনি যে সুলতানের ছেলে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারি এমন কিছু বলতে পারেন আপনি?

তা পারি বই কি: বাপজান যে মাটির নিচে কামরা করে সবুজ জেড পাথরের চল্লিশটি পাত্রে পুরনো মোহর রেখেছিলেন এ কেবল আপনারই জানা। তা ছাড়া মাটির নিচেই আর একটা প্রাসাদ করে

তাতে ন'টা স্বর্ণবেদীর আটটায় হীরের মূর্তি বসিয়ে ন'য়েরটায় একটা রেশমী কাপড়ে লিখে রেখে গেছেন, এখানে বসানোর মতো মূর্তিটি হবে ওগুলির চেয়ে হাজার গুণে সুন্দর এবং দামী, সেটা আনতে হবে আমাকে এবং আপনার সাহায্য ছাড়া সেটা আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই কথা শুনে মোবারেক আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে উঠে জইন অল আসনামের সামনের মেঝে চুম্বন করে বললেন—আমার আর কোন সন্দেহ রইল না যে আপনি আমার মমিব বসোরার সুলতানের ছেলে—আমার বাড়ি আজ ধন্য হল, পবিত্র হল। এত আনন্দের কারণ আমার বহুদিন ঘটেনি। আজ বহুকাল পরে মনিব ভৃত্যের মিলন হল। পিতা পুত্রের ভেতরে বেঁচে থাকেন, আমার মনিবের মৃত্যু হয়নি, তিনি আপনার মধ্যেই আছেন, সুতরাং আপনিই এখন আমার মনিব, আমি আপনার কেনা গোলাম। এ ঘর বাড়ি বাগান ধনরত্ন সম্পদ—যা কিছু দেখছেন সবই আপনার, গোলামের নিজের বলে কিছু থাকে না, সবই মনিবের। আর আমাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলবেন না, এতক্ষণ যে বলেছেন এতেই আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

মোবারেকের মহানুভবতা এবং বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে জইন তার হাত ধরে উঠিয়ে বললে—তুমি বসোরার সুলতানের বান্দা হলেও খোদা তোমার মতো বান্দা-দুইটি পয়দা করেননি—আজ থেকে তুমি আর গোলাম নও, আমি তোমায় গোলামি থেকে মুক্তি দিলাম, আর এই ঘর বাড়ি সম্পদ যা কিছু দেখছি এ যদি বসোরার সুলতানের হয়, তাও আমি তোমাকে দান করছি, এর পর আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে তা-ও আমি পূরণ করতে রাজী আছি—বলো।

মোবারেক তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে জইনের করচুম্বন করে বললেন—হুজুর, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই, খোদা আপনাকে সুখে রাখুন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন আপনার—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

জইন বললে—তা হলে বাপজানের লেখা পড়ে যে অভিলাষ নিয়ে আমি এসেছি তা পূর্ণ করতে আর দেরি করো না।

উত্তরে মোবারেক বললেন—হুজুর, দুটি কথা আছে : তার একটি হচ্ছে আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম খানাপিনা করে সুস্থ হোন। আমার পুরনো মনিবের ছেলে নতুন মনিবের প্রথম দেখা পেলাম, গোলামি থেকে মুক্তি পেলাম, সম্মান পেলাম এ সবের জন্যে আমি আগামী কাল এখানে একটি ভোজ দিতে চাই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যে রত্ন-প্রতিমার খোঁজে আপনি বেরিয়েছেন তা পেতে হলে আজ এখনই হতে পারে না, যেতে হবে আমাদের দূরের এমন এমন দুর্গম দেশে যেখানকার বিপদের কথা মনে করলে ভয়ে বুক কাঁপে, জায়গাটা হচ্ছে জিনের এলাকা। সাধারণ মানুষ কেউ যেতে পারে না সেখানে, আপনার বাপজান যেতে পারতেন, আর পারে আমারই মতো দুই একজন যারা ওখানে যাবার তন্ত্র-মন্ত্র তুকতাক অন্ধিসন্ধি জানে। একটু ভুলচুক হলে রক্ষা নেই। ভেবে দেখুন, হুজুর—যা যা বলব তা সব ঠিক ঠিক করতে পারবেন ত, তা ছাড়া পথের কষ্ট সহ্য করতে পারবেন ত?

জইন একটু বিরক্ত হয়ে বললে—মোবারেক, তোমার পুরনো মনিব বসোরার সুলতানকে ভালো করে জানতে ত তুমি? আমি তাঁরই বেটা—ভুলে যেও না তুমি।

মোবারেক শুনে খুশী হয়ে বললেন—না আমার আর ভয় নেই, আপনি পারবেন। তা হলে আপনি অনুমতি করলে, কাল ভোজ দিয়ে পরশু রওনা হতে পারি আমরা।

বেশ, তাই হোক।

পরের দিন মোবারেকের বাড়িতে ভোজ হয়ে গেল। তার পরের দিন সকালে অনেক খোজা বান্দা উট ঘোড়া তাঁবুর সঙ্গে জইন অল আসনামকে নিয়ে জিনের এলাকা ত্রিদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন মোবারেক। পথে পড়ল কত জনপদ, কত অরণ্য, কত ধূ ধূ প্রান্তর, কত শস্যশ্যামল ক্ষেত্র—কত ফলফুলে ভরা উদ্যান, এ সব কিছু পার হয়ে মোরারেক জইন অল আসনাম আর তাঁর লোকজনকে নিয়ে যেখানে এসে হাজির হলেন তার সামনে পড়ল আকাশছোঁয়া দিগন্ত

বিস্তৃত এক খাড়া পাহাড়। মোবারেক তাঁর লোকজনকে বললেন—তোরা আমাদের না ফেরা পর্যন্ত তাঁবু খাটিয়ে উট গাধা ঘোড়া নিয়ে এখানে থাকবি। জইনকে বললেন—আমাদের গন্তব্য স্থান জিন-রাজের এলাকা ত্রিদ্বীপ ওই পাহাড়ের ওপারে।

—শুনে জইন ত হতভম্ব : ও মোবারেক, এ পাহাড় আমরা পার হব কি করে, আমাদের ত পাখা নেই!

মোবারেক মৃহু হেসে বললেন—সে জন্যেই সাধারণ মানুষের ওখানে যাবার উপায়ও নেই। দেখুন না আমরা কি করে যাই!

এই বলে মোবারেক তাঁর থলির ভেতর থেকে একখানা কেতাব বের করে তার পাতা খুললেন। জইন দেখলে তার পাতায় তার অজানা ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো অক্ষরে কি সব উল্টো করে লেখা। মোবারেক একটা জায়গা থেকে জইনের অবোধ্য ভাষায় কি সব পড়তে লাগলেন আর বারবার পাহাড়ের দিকে তাকাতে লাগলেন! একটু পরেই বজ্রনাদের মতো একটা ভীষণ আওয়াজ হল, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টা দু'ভাগ হয়ে গেল, মাঝে সংকীর্ণ একটা পথ।

এবার আসুন, হুজুর, আমার পিছু পিছু—বলে মোবারেক একটা থলি হাতে সেই পথে চলতে শুরু করলেন। জইন তাঁর পিছু পিছু। জইনের মন তখন মোবারেকের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গেছে : মোবারেক দেখছি বাপজানের সাধারণ বান্দা ছিল না, তাঁর মন্ত্রশিষ্য, ভাবশিষ্য!

কিছুক্ষণ চলবার পর তাঁরা পাহাড়টার অপর পারে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের দু'ভাগ আবার বজ্রনাদ করে এক সঙ্গে বেমালুম জুড়ে গেল। জইন ত দেখে অবাক!

কিন্তু এদিকে পাহাড় পার হবার পরেই সামনে পড়ল একটা হ্রদ। ঠিক যেন একটা সমুদ্র। ওর মাঝে অনেক দূরে তিনটে সবুজ দ্বীপের মতো কি দেখা যাচ্ছে। মোবারেক বললেন, ঐ—ঐখানে যেতে হবে আমাদের, ঐ সে ত্রিদ্বীপ, জিন রাজার মুল্লুক।

যেতে ত হবে—কিন্তু ওখানে যাব আমরা কি করে, নৌকো, ভেলা, জাহাজ, কিছুই ত দেখছি না এখানে।

মোবারেক মৃদু হাসলেন : দেখছেন না, হুজুর, এখনই দেখবেন—নৌকো এল বলে এখানে। তখনই একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি আপনাকে—নৌকো আসবে, কিন্তু তার মাঝি যে কি মূর্তি ধরে আসবে কিছুই বলতে পারি না আমি। যে মূর্তিতেই আসুক আপনি তা দেখে হাসবেন না, ভয় পাবেন না, নইলে সমূহ বিপদ। তা ছাড়া যতক্ষণ সে আমাদের নৌকোয় করে নিয়ে যায় ততক্ষণ একটিও কথা বলবেন না আপনি, বললে নৌকো তখনই ডুবে যাবে, মারা পড়ব আমরা দুজনেই।

জইন বললে—মনে থাকবে সব, ভুলবো না।

বলতে না বলতে দেখে নৌকো এসে গেছে তাদের একেবারে সামনে—মাত্র হাত কয়েক দূরে! এ যে কোত্থেকে এল—বুঝে উঠল না জইন! নৌকোটা বেশি বড় নয়, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর তার গঠন, চন্দন কাঠে তৈরি—লাল চন্দন। মাঝিটা কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত, দেখে ভয় বিস্ময় দুই-ই জাগছিল মনে, মাঝির ধড়টা ঠিক জোয়ান মানুষের মতো বটে, কিন্তু মাথাটা একটা হাতীর, মস্ত বড় শুঁড়, আর কান দুটো কি পেল্লায়, একেবারে মাটিতে ছেঁচড়ে যায়! মাঝি তার লম্বা শুঁড় দিয়ে একে একে ওদের কোমর জড়িয়ে তুলে নিল তার নৌকোয়। দেখে মনে হল যেন দুই টুকরো হালকা সোলা তুলছে সে। শুঁড় দিয়েই নৌকো চালাতে লাগল সে, শুঁড়ই বৈঠা, শুঁড়ই হাল! অতি বিশাল কান দুটো হয়ে উঠল দুটো পাল। ও দুটো খুব জোরে নাড়তে থাকায় বাতাস কেটে নৌকো জোরে চলতে লাগল। মাঝি শুঁড় দিয়ে ওদের দুজনকে ধরেই আবার ওখানে নামিয়ে দিল। তখন কোথায় বা নৌকো, কোথায় বা মাঝি, কোন কিছুই নেই!

মোবারেক এবার মণিমুক্তো দিয়ে বাঁধানো পথে জইনের হাত ধরে নিয়ে চললেন। পথের দু'ধারে রঙবেরঙের রকমারি সুগন্ধি ফুলের গাছ : চন্দন এলাচি দারচিনির গাছ—গন্ধে নেশা ধরে যায়। আঙুর বেদানা আপেল জলপাই ইত্যাদির ডাল পুষ্ট-পক্ক-ফল ভারে নুয়ে

পড়েছে মাটিতে, নানা রঙের পাখি সে সব ফল খেতে এসে যে রব করছে—তা শুনে কানের সঙ্গে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এ ছাড়া কোথাও ঝরনা, কোথাও সবুজ গালিচার মতো তৃণশয্যা।

যেতে যেতে মোবারেক জইনকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখছেন হুজুর!

জইন বললে—আমাদের পয়গম্বর যে বেহেস্তের কথা বলেছেন এ যেন তাই!

শুনে মোবারেক একটু হাসলেন, জইনের হাত ধরে আর একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—এবার সামনে তাকিয়ে দেখুন, হুজুর।

জইন তাকিয়ে দেখলে—একটু দূরে চুণী পান্না পোকরাজ দিয়ে গড়া অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ ঝলমল করছে। বড় বড় দরজাগুলো তার সোনা দিয়ে তৈরি, প্রাসাদের চারিদিকে পরিখা, প্রাসাদে ঢুকবার জন্য পরিখায় পাতা রয়েছে পঞ্চাশ হাত চওড়া দেড়শ হাত লম্বা, কাছিমের খোলের এক সেতু। পরিখার ধারে ধারে অতি সুন্দর কি সব গাছ ছায়া ফেলেছে প্রাসাদ আর পরিখার গায়ে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হাতে ভীমদর্শন জিন প্রহরীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাসাদের চারিধারে।

জইন দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে বললে—ওখানে কি যেতে হবে আমাদের মোবারেক? ভয় করে যে!

মোবারেক মৃদু হেসে বললে—না, ওখানে যেতে হবে না আমাদের, যাবার অধিকার নেই, কোন মানুষের। এপারে থেকেই ত্রিদ্বীপের অধীশ্বরের দেখা পাবার জন্যে আরাধনা করতে হবে।

মোবারেক তখন একটা ফুল বাগিচার মাঝে গালিচার মতো তৃণশয্যা বেছে নিয়ে জইনকে সেখানে ডেকে নিলেন। তারপর আচকানের নিচের থলির ভেতর থেকে হলুদ রঙের চারখানা বড় রেশমী রুমাল বের করে একখানা কোমরে আর একখানা গলায় জড়ালেন। আর দুখানা জইনকে দিয়ে তাকেও ঐ রকম করতে বললেন। তারপর ঐ থলির ভেতর থেকে—বসে নমাজ করবার

মতো দু'খানা বড় বড় রেশমী আসন বের করে দূর্বার উপর বিছিয়ে তার একখানায় নিজে বসলেন আর একখানায় জইনকে বসতে বললেন। এরপর মোবারেক একটা কৌটা থেকে কিছু কস্তুরী আর অন্যান্য গন্ধদ্রব্য বের করে ঐ দুই আসনের উপর ছড়ালেন, আর একটা সোনার ধুনুচি বের করে তার উপর আগুন জেলে ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুল পোড়াতে পোড়াতে জইনকে বললেন—এবার আমি ত্রিদ্বীপের জিন রাজাকে আনবার জন্যে মন্ত্রপাঠ, তুকতাক আরম্ভ করতে যাচ্ছি। এ আরম্ভ করলে আর কথা বলব না আমি, তাই আগে থেকেই কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখি আপনাকে। আমার এ জাদুমন্ত্রে ত্রিদ্বীপের জিনরাজ না এসে থাকতে পারবেন না। তিনি আসবেন, কিন্তু কি মূর্তিতে আসবেন, তা হুজুর, আমি বলতে পারছি না! আমাদের আহ্বানে তিনি যদি খুশী হন, তা হলে দিব্যসুন্দর এক মানুষের মূর্তি ধরে আসবেন। সে সুন্দর এত সুন্দর যে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের মূলাধার যিনি কেবল তাঁর সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। যাই হোক যে মূর্তিতেই আসুন, তিনি এলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সেলাম জানাবেন, কিন্তু খবরদার ঐ আসন থেকে নেমে দাঁড়াবেন না। ওর উপর দাঁড়িয়েই বিনীত কণ্ঠে বলবেন—মহামহিম বিপুল-শক্তি জিনরাজ, উচ্চাভিলাষী হয়ে আমি আপনার এলাকায় এসে আপনার কৃপাভিক্ষা করছি। আমি আপনার দাস। আপনার পরম ভক্ত বসোরার সুলতানকে আপনি যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখে অশেষ কৃপা করেছিলেন। তিনি খোদার ডাকে তাঁর কাছে চলে গেছেন, আমি তাঁরই পুত্র। তাঁকে যে অনুগ্রহ আপনি করেছিলেন, তার এক বিন্দু পেলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।

উনি খুশী হয়ে আপনি কি চান জিজ্ঞাসা করলে আপনি ভূগর্ভের সেই শূন্য সিংহাসনে বসানোর জন্যে সেই দুর্লভ নবম রত্নপ্রতিমার কথা বলবেন।

জইন বললে—ঠিক মনে থাকবে আমার, ভুলবো না।

এরপর মোবারেক তাঁর গালিচার আসনে পা মুড়ে বসে ধূপ-ধুনা

জ্বেলে কেতাব খুলে জইনের অবোধ্য ভাষায় কি সব আবৃত্তি, মন্ত্রপাঠ ও তার সঙ্গে নানা তুকতাক আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরই সারা আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে গেল, তা থেকে বিদ্যুতের লেলিহান শিখা যেন সাপ খেলিয়ে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বজ্রনাদ। এর সঙ্গে শুরু হল ভয়ঙ্কর ঝড় আর দারুণ ভূমিকম্প। জইনের মনে হতে লাগল এখনই বুঝি মহাপ্রলয় হবে। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল সে।

মুখে প্রকাশ না করলেও মোবারেক জইনের মনোভাব বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললেন—কিচ্ছু ভয় পাবেন না, হুজুর। লক্ষণ ভালই দেখছি। আমাদের খারাপ কিছু হবার আশঙ্কা নেই, যা কিছু হবার ভালই হবে।

তারপর দেখতে না দেখতে ঝড় বজ্র বিদ্যুৎ থেমে গেল, ঘন মেঘ কেটে গেলে, জইন দেখলে তার সম্মুখে অনিন্দ্য সুন্দর এক পুরুষ মূর্তি। মুখে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসি। সে হাসি শারদ পূর্ণিমার জোছনাকেও যেন হার মানিয়ে দেয়। মোবারেকের ইঙ্গিতে জইন গালিচার উপর উঠে দাঁড়িয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে সেই অনুপম মূর্তিকে সেলাম করে মোবারেকের শেখানো কথাগুলি বলে জিনরাজাকে আরাধনা করলে। ত্রিদ্বীপরাজ খুশী হয়ে বললেন—কি চাও তুমি আমার কাছে বলো।

জইন জোড়হাত করে বললে—শাহানশা, আমার বাপজানকে আপনি অনুগ্রহ করে আটটি মণিপুত্তলী দিয়েছিলেন, আটটি স্বর্ণ-বেদীতে তিনি তাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। একটি বেদী খালি পড়ে আছে, তাতে এমন রত্নপ্রতিমা বসাবার কথা যার জৌলুসে অপর আটটার জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়। আমি সেই দুর্লভ নবম পুত্তলী লাভের দুরাশা নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

পরম স্নেহশীল পিতা যে দৃষ্টিতে চেয়ে যেমন স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গে কথা বলেন, ঠিক তেমনি করে সৌম্যকান্তি জিনরাজ জইনকে বললেন—তোমার বাপজান বসোরার সুলতানকে আমি খুবই স্নেহ করতাম! তিনি যে ক'বার আমার সঙ্গে দেখা

করতে এসেছেন প্রতিবারেই তাঁকে আমি একটি করে হীরকপ্রতিমা উপহার দিয়েছি, শুধু দিয়েছি নয়, উটে করে নিয়ে যেতে পাছে ওগুলির কোনটা খুঁতো হয়ে যায় তাই প্রতিবারই ও মূর্তি আমি নিজে তোমার বাবার ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। শূন্য বেদীতে রেশমী কাপড়ে যে লেখা পড়ে তুমি এখানে এসেছ, তাও তোমার জন্যে তোমার বাবাকে দিয়ে আমি লিখিয়েছি! স্বপ্নে তিনবার যে শেখের তুমি দেখা পেয়েছ সে আমিই। তোমাকে এখানে আনবার জন্যই ঐ রকম করতে হয়েছে আমায়। তোমার বাবার চেয়ে তোমাকে আমি কম ভালবাসিনে। সুতরাং নবম বেদীতে বসাবার মতো সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নপ্রতিমা তোমাকে আমি দেবই। এ প্রতিমা অন্য আটটি থেকে হাজার গুণে ভালো। কিন্তু এর বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে আমিও যে একটা জিনিস চাই, রে বেটা।

জইন ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে—মালেক, আমার যা কিছু আছে সবই আপনার, এমন কি আমি নিজেও আপনার। সুতরাং বিনিময়ে কি দিতে হবে আমায় হুকুম করুন।

উত্তরে জিনরাজ মৃদু হেসে বললেন—যা যা সব তোমার আছে তার কিছুই চাই না আমি। আমি যা চাই তা তোমায় সংগ্রহ করে আনতে হবে আমার জন্যে।

হুকুম করুন।

আনতে হবে তোমায় পনের বছরের একটি অনুপম পরম সুন্দরী কন্যা, কুমারী।

এ আর কি এমন কঠিন কাজ, একটা কেন, দশটা এনে দিচ্ছি আপনাকে।

শুনে ত্রিদ্বীপরাজ হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন: তুই একে-বারে বাচ্চা রয়ে গেছিস, রে বেটা!

এতে হাসির কি হল বুঝতে না পেরে জইন, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল জিনরাজের দিকে। জিনরাজ একটু শান্ত হয়ে বললেন—আমার অভিলাষ পূরণ করা তুমি যত সহজ মনে করছ, তত নয়।

তত ত নয়ই, বরং এত কঠিন যে আমার এ চাহিদা মেটানো তোমার পক্ষে হয়ত সম্ভব না হতেও পারে।

কেন?

কেন—বলছি। মেয়েরা হাজারো রকমের কৌশলে পুরুষের মনে বিশ্বাস জাগায় যে তারা কুমারী।

শুনে জইন একটু ভড়কে গিয়ে বললে—তা হলে আমি কি করে বুঝব, তাদের চোখ দেখে?

জিনরাজ আবার একটু হাসলেন: না রে বেটা, চোখ দেখেও মেয়েদের দেহ ও মনের শুচিতা বুঝবার উপায় মানুষের নেই।

তা হলে কি উপায়ে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি মেহেরবানি করে তা আমায় বলে দিন।

দিচ্ছি—একটু সবুর—

—বলে জিনরাজ তখনই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন এবং প্রায় পরক্ষণেই সেখানে এসে হাজির হলেন। হাতে তাঁর একখানা ঝকঝকে রূপোর আয়না। আয়নাখানা জইনের হাতে দিয়ে তিনি বললেন—এরই সাহায্যে তুমি মেয়ের কৌমার্যের সঠিক খবর পাবে। আয়নাখানা কোন মেয়ের সামনে ধরলে যদি ঝাপসা হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে তার আত্মীয়স্বজন যা কিছুই বলুক না কেন, মেয়েটি তাদের সর্বপ্রকারে কুমারী নেই। আর যে মেয়ের সামনে ধরলে আয়নার গায়ে কোন রকম কলঙ্কের ছাপ পড়বে না, বুঝবে তার দেহমনেও কোন কলঙ্কের দাগ পড়েনি, সে শুচি-শুভ্রা আজন্মশুদ্ধা কুমারী, তা শুধু নয়, তার নিজ গুণে আয়না পরিষ্কার থাকায় তার পূর্ণ সৌন্দর্য তোমার চোখে পড়বে।

বহুৎ বহুৎ দোয়া আপনার—কৃতার্থ হয়ে বলে উঠল জইন।

জিনরাজ বললেন—শোন, আরও কথা আছে: এই আয়না যেন কোনরকমে না হারায় তোমার কাছ থেকে, হারালে বহুৎ ক্ষতি হবে তোমার, জীবন নাশ পর্যন্ত হতে পারে।

না, হুজুর—হারাবে না, অনেক যত্নে অতি সাবধানে রাখব এটা আমার কাছে।

জিনরাজ বললেন—আরও আছে : আমি যেমনটি বললাম তেমন অপরূপ সুন্দরী পঞ্চদশী কুমারী যদি সংগ্রহ করতে পার তবে তাকে তেমনি শুচিশুভ্র অবস্থায়ই আমার কাছে এনে পৌঁছে দেবে, মোহে পড়ে স্পর্শ দ্বারা যেন তাকে কলুষিত করো না।

জইন দৃঢ় কণ্ঠে বললে—আপনার সকল হুকুম আমি ঠিক ঠিক তামিল করব, এক চুল এদিক ওদিক হবে না, আল্লার কসম।

জিনরাজ বললেন—তা হলে এখন তোমরা এস, আল্লা তোমার চেষ্টা সফল করুন। কন্যারত্ন নিয়ে নির্বিঘ্নে নিরাপদে তুমি আমার কাছে ফিরে এস, তারপর আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখব। বলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। মোবারেক তখন তাঁর জিনিসপত্র গুটিয়ে জইনকে নিয়ে আবার সেই হ্রদের কাছে এলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই করিশির নরদেহ তার সেই রক্ত-চন্দনের নৌকো এনে তাদের পার করে দিল। পাহাড়ের কাছে এলে পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে আবার আগেকার মতো তাদের যাবার পথ করে দিল। মোবারেক জইনকে নিয়ে হাজির হলেন—তাঁর লোকজন উট গাধা তাঁবু যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেইখানে। তারপর তিনি সদলবলে রওনা হলেন নিজের বাড়ি কায়রো।

পথশ্রমে ক্লান্ত জইন কয়েকদিন মোবারেকের বাড়িতে থেকে বিশ্রাম করে নিলে। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর সে মোবারেককে বললে—মোবারেক, আর দেরি করা ঠিক নয়, এবার চলো বেরিয়ে পড়া যাক ত্রিদ্বীপরাজের ফরমাসি সেই পঞ্চদশী কুমারীর খোঁজে। বাগদাদ বা বসোরায় গেলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ওখানে ত সুন্দরী কুমারী মিলবে এমন হাজার হাজার, তার মাঝ থেকে সেরাটা আমাদের বেছে নিলেই চলবে। সত্যি—কি সরল লোক তোমার এই জিনরাজ, একটা সুন্দরী কুমারীর বদলে দেবেন এক হীরক-প্রতিমা।

মোবারেক বললেন—সে কথা ঠিক, কিন্তু, হুজুর, রূপসী কুমারীর

খোঁজে অত দূরে যাওয়ার আমাদের দরকার কি। সুন্দরী মেয়ের জন্য কায়রো জগদ্‌বিখ্যাত। এখানে থেকেই আমরা জিনরাজের ফরমাস মতো মেয়ে সংগ্রহ করতে পারব।

কি করে সংগ্রহ করবে ?

সে ব্যবস্থা আমার আছে : এখানে আমার জানা এক বুড়ী পাকা ঘটকী আছে। তার হাতে সব সময়ই অনেক বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকে। তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি। আমাদের পছন্দমতো মেয়ে পেলেই তাকে অনেক বকশিশ দিয়ে—গরীবের ঘরের হলে কিনে নেব, আর বনেদী বড় ঘরের হলে আপনার সঙ্গে সাদি দিয়ে নিয়ে নেব।

শুনে জইন খুশী হয়ে বললে—এ অতি উত্তম ব্যবস্থা।

মোবারেক তখনই একটা বান্দা পাঠিয়ে বুড়ী ঘটকীকে ডেকে এনে অনেক বকশিশ কবুল করে সুন্দরী কুমারী দেখাবার হুকুম দিয়ে বললেন—কি, পারবে ত, শুধু পনের বছরের সুন্দরী মেয়ে হলে চলবে না, অনাঘ্রাত কুসুম চাই, পুরোপুরি কুমারী। আনতে পারলে প্রচুর বকশিশ দেব তোমায়।

ঘটকী বুড়ী শুনে খুশী হয়ে বলে—পারবো না কেন, হুজুর, আমার হাতে অগুনতি সুন্দরী কুমারী মেয়ে আছে, তাদের অনেকের বয়সই পনেরো। একে একে এনে দেখাচ্ছি আপনাদের।

বুড়ী মনে মনে ভাবে—মেয়ে এঁদের পছন্দ হলেই হল। পুরোপুরি কুমারী কিনা—জানবেন কি করে এবং খোদা ছাড়া কেউ কি এ কথা জানতে পারে—যত সব বাজে বায়নাক্কা। আমি এ পর্যন্ত কত মেয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিলাম তার কি লেখাজোখা আছে, কেউ কি ধরতে পারলে !

এর পর বুড়ী একে একে পনের বছরের সুন্দরী মেয়ে আনতে লাগল মোবারেকের বাড়িতে। জইন জিনরাজের দেওয়া আয়নাটা কৌশলে তাদের সামনে ধরে আর দেখে ; কোনবার দেখে আয়নাটা শুধু ঝাপসা হচ্ছে, কোনবার এমন কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে যে

কিছুই চোখে পড়ে না। দেখে—আর অবাক হয়ে যায় জইন—ব্যাপার কি—বাইরে দেখে ত এদের প্রত্যেককে কুমারী বলে মনে হয় তার।

বুড়ীর হাতে যত মেয়ে ছিল একে একে সব দেখানো হয়ে গেল। জইন বললে—না, হল না। বুড়ী পারিশ্রমিক পেলেও মনে মনে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল।

জইন মোবারেকের দিকে চেয়ে বললে—এবার। এবার তা হলে কি করা যায়, মোবারেক?

চিন্তা কি, হুজুর, এখানে না হলেও, দামাস্কস আছে, বাগদাদ আছে, আপনার বসোরা আছে, এসব জায়গার মেয়েরাই সুন্দরী। কোন না কোন জায়গায় আমাদের পছন্দমতো কুমারী মেয়ে পেয়ে যাবই।

বেশ, যা ভাল বোঝ তাই করো। মোট কথা জিনরাজের কাছ থেকে সবার সেরা হীরক-প্রতিমা না নিয়ে আমি ঘরে ফিরছি না।

মোবারেক তখন তাঁর দলবল আর জিনিসপত্রের সঙ্গে জইনকে নিয়ে সিরিয়া রওনা হলেন। কয়েকদিন পরই তার প্রধান শহর দামাস্কস এসে একটা বড় বাড়ি ভাড়া করে ওখানকার বুড়ী ঘটকীদের ডেকে ভাল বকশিশের লোভ দেখিয়ে নিজেদের চাহিদা জানালেন।

ওদের সবার মুখেই এক কথা: এমন খুবসুরত সব কুমারী এনে দেব যে দেখে আমাদের তাক্ লেগে যাবে। কোনটা রেখে কোনটা নেবেন—ভেবে কূল পাবেন না!

মেয়ে আনলেও তারা একে একে, অনেক পরীর মতো মেয়ে। কোনটা মুসলমান, কোনটা খৃস্টান, কোনটা ইহুদী। ঘটকীদের দাবি—এদের প্রত্যেকটি কুমারী, কিন্তু জিনরাজের দেওয়া আয়না এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিল।

মোবারেক তখন দামাস্কসের পাট উঠিয়ে দিয়ে জইনকে নিয়ে বাগদাদে এলেন। এসে তাইগ্রিসের তীরে বেশ বড় আর চমৎকার

একটা বাড়ি ভাড়া করে বেশ জাঁকজমক করে বসলেন। এখানে আর সুন্দরী কুমারীর খোঁজে প্রথমেই ঘটকী ডাকা নয়, এখানে অন্য পন্থা। বাগদাদে নিজেদের আগে পরিচিত করে তোলবার জন্যে, আমীর-ওমরাহ গণ্যমান্যদের আমন্ত্রণ করে নিত্য ভোজ চলতে লাগল বাড়িতে, ভোজের পরে ফালতু খাবার যা পড়ে থাকে তা বিলিয়ে দেওয়া হতে লাগল গরীব দুঃখীদের মধ্যে। তা ছাড়া নানা দান খয়রাত ত আছেই। সে এক এলাহি কাণ্ড।

এই কাণ্ড দেখে পাশেরই এক মসজিদের ইমামের চোখ জ্বলে যায়। ইমামের নাম আবুবকর। আবুবকর নিজে গরীব তাই বড় লোকদের ওপর তার নিদারুণ ঘৃণা। দুঃখ-দৈন্য মহতের মনকে আরও দিব্য মহান্ করে তোলে, ইতরকে করে তিক্ত কঠোর। আবুবকর জইনের বাড়ির নবাবী চাল সহ্য করতে না পেরে একদিন মসজিদে বিকেলের নমাজের শেষে সমবেত লোকজনদের সম্বোধন করে বললে—শোন ভাই সব, তোমাদের একটা কথা বলতে চাই, মানে—একটা ব্যাপার তোমাদের সমঝে না দিলে খোদার কাছে, আমাদের পয়গম্বরের কাছে আমায় অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। তাই বলা। কথাটা হচ্ছে—তোমরা সবাই লক্ষ্য করেছ, আমাদের পাড়ায় কোথেকে দুটি লোক এসে মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করে বাদসাহী চালে আমীর-ওমরাহদের নিয়ে খানাপিনা নাচ গান চালাচ্ছে। এদের বান্দারা গরীব-দুঃখীদের সামনে খাবারের টুকরো কুকুরকে দেওয়ার মতো করে ছুড়ে দেয়। লোকের কাছে নাম কিনবার জন্যে দান খয়রাত করে খলিফার মতো। কিন্তু এত সব আসে কোথেকে! এরা নিশ্চয়ই নিজের দেশে ডাকাতি করে অনাথ-বিধবাদের সর্বস্ব অপহরণ করে নিজের দেশে ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। আমি তোমাদের আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, এদের সঙ্গে মিশবে না, এদের বাড়িতে যাবে না, এদের দান খয়রাত আতিথেয়তা গ্রহণ করিবে না। করলে ফ্যাসাদে পড়বে! খলিফার কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। খলিফাকে যে এখনও জানানো হয়নি, এও আমাদের ত্রুটি, আমার মনে হয়, আর

দেরি না করে এখমই আমাদের খলিফাকে বিদেশী এই দুই চোরের কথা জানানো উচিত।

শ্রোতারা সব একবাক্যে বলে উঠল—হাঁ ভাই আবুসাহেব, এ আমাদের জানানো উচিত, নইলে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আবুবকর বললে—নইলে কিছু যদি ঘটে তার জন্যে আমি কিন্তু দায়ী রইলাম না।

তা বটেই ত, তা বটেই ত, আমরা শীগগিরই খলিফাকে জানবার ব্যবস্থা করছি।

আবুবকর মসজিদে যা সব বলে লোক ক্ষেপিয়েছে সে সব কথা মোবারেকের কানে এলে তিনি বেশ একটু ভয়ই পেয়ে গেলেন। এসব মিথ্যে হলেও মেয়ের খোঁজ করা যাবে না ত এখানে, ঘটকীরা কেউ ভয়ে কাছেই ঘেঁষবে না। মোবারেক তখন পাঁচশো দিনারের একটা থলি হাতে আবুবকরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। দরজার কড়া নাড়লে দরজা খুললো বটে আবুবকর, কিন্তু মোবারেককে দেখেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল।

কি চাই আপনার ?—চোখ মুখ কুঁচকে বললে আবুবকর।

মোবারেক অতি বিনীত ভাবে বললেন—জনাব, আমি আপনার গোলাম মোবারেক। আমীর জইন সাহেব আপনার পাণ্ডিত্য দয়া-দাক্ষিণ্য দান-ধ্যান ধর্মনিষ্ঠার খ্যাতি শুনে আপনাকে সম্মান জানানোর জন্যে এই পাঁচশো দিনার নজরানা পাঠিয়েছেন আমার হাতে, গ্রহণ করলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। এ সামান্য উপহার আপনার মতো মহামহিমের যোগ্য নয়, তা তিনি জানেন। ভবিষ্যতে তিনি আপনার যোগ্য মর্যাদা দিতে পারবেন—এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর আছে। এ ছাড়া কি ভাবে আপনার সেবা করলে তিনি আপনার আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন, তা-ও তিনি জানতে চেয়েছেন।

মোবারেকের মুখে এই সব কথা শুনে আর মোহরের থলি হাতে পেয়ে আবুবকর একেবারে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। একই সঙ্গে আনন্দে গলে গিয়ে এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে কণ্ঠের স্বর রীতিমতো মোলায়েম

করে সে বললে—জনাব, আমি বড্ড ভুল করেছি, না বুঝে মসজিদে আপনার নামে কুকথা বলেছি। আমি আজই আবার গিয়ে আমার ভুল স্বীকার করে আপনাদের মহানুভবতার কথা প্রচার করছি, তা হলে আল্লা যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনার মনিব আমীরের কিছুটা শ্রদ্ধা যদি অর্জন করতে পারি। আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনার মনিব এবং আপনি আমার ক্রটির কথা ভুলে যান। আমার ভুলের জন্য আমি নাক কান মলছি।

মোবারেক অমনি তার হাত ধরে বললেন—ও কি, জনাব, ও কি! আমরা কিছু মনে করব না, আপনার যে প্রীতি ও সহানুভূতি আমরা লাভ করলাম এতেই আমরা কৃতার্থ। আল্লার নিতান্ত দোয়া না থাকলে এমন সৌভাগ্য আমাদের হত না। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ভুলে যাবার আগেই বলে রাখি: আমার মনিব আমার মারফত একটা আরজি পাঠিয়েছেন—আপনার কাছে: বিকেলের নমাজের পরে যদি একটু সময় করে আমাদের দীন কুটীরে আপনার পায়ের ধূলি দেন, তা হলে আমাদের কুটীরও পবিত্র হয়, দু'দণ্ড আপনার সঙ্গে কথা বলে দিলটাও আমাদের ঠাণ্ডা হয়।

মোবারেকের মুখে এই সব কথা শুনে আবুবকরের চোখ দুটো যেন ছল ছল করে এল। মোবারেক আর কিছু না বলে তার হস্ত চুম্বন করে তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

সেদিন বৈকালিক নমাজের পর আবুবকর মসজিদে সমবেত লোকজনদের ডেকে বললেন—মুসলিম ভাইসব,যাবার আগে তোমরা আমার একটা কথা শুনে যাও: খোদার দুনিয়ায় যিনি যত জ্ঞানীই হন না কেন, সবারই ভুল হয়। আমারও মস্ত বড় ভুল হয়েছে, নবাগত দুই বিদেশীর সম্বন্ধে কাল আমি তোমাদের যে কথা বলেছি সে সবই ভুল। আমি বিশেষ অনুসন্ধানে জানলাম, এঁরা দুইজনেই অতি ভদ্রবংশজাত সজ্জন, মহানুভব, উদার, মানব-দরদী এবং আরও নানা গুণের অধিকারী। দোষক্রটীর লেশমাত্র নেই এঁদের চরিত্রে। এঁদের একজন ত অতি উঁচু দরের বনেদী ঘরের ছেলে, আমীর। পথে বা

কোথায়ও এঁদের সঙ্গে দেখা হলেই তোমরা এঁদের বিশেষ সম্মান দেখাবে—এই আমার অনুরোধ।

আবুবকর লোকজনদের এই সব কথা বলে বাড়ি এসে তার সব চাইতে ভাল এবং দামী জামাটা বের করলে। এটা এত লম্বা যে গায়ে দিয়ে চলবার সময় প্রান্তদেশ মাটিতে লুটাতে থাকে, আর আস্তিন ঝুলে পড়ে হাঁটুর কাছে। অন্য সাজ-গোজের সঙ্গে এই জামাটা পরে চললো সে জইন অল আসনামের বাড়ির দিকে। সেখানে গিয়ে দেখে জইন এক উঁচু পালঙ্কে রেশমী কাপড়ে ঢাকা গদির উপর বসে আছে, পাশেই মোবারেক। ইমাম ঘরে ঢুকতেই জইন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে তাকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলে, ইমামও তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সেলাম করলে। জইন এরপর ইমামকে বিশেষ আপ্যায়ন করে নিজের পাশে বসিয়ে তখনই এক বান্দাকে সুগন্ধি সরবৎ আনবার হুকুম দিলে। সরবৎ এলো, তারপর খাবারের হুকুম দিলে খাবার এলো। খানাপিনার সঙ্গে পুরনো বন্ধুদের মতো কথাবার্তা গল্পস্বল্প চলতে লাগল।

এর মাঝে আবুবকর একবার জইনকে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, জনাব, আপনি আমাদের এ বাগদাদে আর কতদিন আছেন?

ঠিক বলতে পারি না। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি তা সিদ্ধ হলেই চলে যাব।

কি উদ্দেশ্য জনাব, আমি একটু শুনতে পাই না? পেলে আমি হয়ত সে ব্যাপারে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

উত্তরে জইন বললে—উদ্দেশ্য, জনাব, আমার অতি সাধারণ, কিন্তু তার জন্যে যা আমি চাই, তা একেবারে অসাধারণ।

ইমাম মৃদু হেসে বলল—একটু খোলসা করে না বললে ত, জনাব, আমি বুঝতে পারছি না!

জইন বললে—সাদি করতে এসেছি আমি এখানে, কিন্তু এর জন্যে যে রকর কনে চাই আমি, তা নিতান্তই অসাধারণ, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য।

আবুবকর শুনে খুশী হয়ে বললে—সে জন্যে ভাবতে হবে না, অন্য

জায়গায় যা দুর্লভ এখানে তা সুলভ, ডানাকাটা পরীর মতো খুব সুন্দর মেয়ে এখানে অনেক আছে।

আমার চাওয়ার একটু বিশেষত্ব আছে।

বলুন!

আমি যে মেয়ে চাই, সে এত সুন্দরী হবে যে জগতে তার আর জুড়ি নেই, বয়স হবে পনরো, তা ছাড়া সে হবে কুমারী, কায়মনবাক্যে নিষ্কলুষ কুমারী।

শুনে আবুবকর উল্লসিত হয়ে বললে—বুঝেছি, বুঝেছি। দেখুন, খোদা এই জন্যেই আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করে দিয়েছেন, নইলে ঘটকীদের হাতে পড়ে আপনাকে নাস্তানাবুদ হতে হত। আপনি যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনি একটি মেয়ে আছে আমার জানা, বেহেস্তের হুরীকেও হার মানিয়ে দেয় তার রূপ, তা ছাড়া আপনি যা চাইছেন—নিঃসন্দেহে কুমারী সে, আর বয়সও তার পনরো ছাড়ায়নি!

অত্যধিক উৎসাহে এক নিঃশ্বাসে এতটা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিল ইমাম, একটু থেমে নিয়ে বললে—এখানকারই এক উজিরের মেয়ে সে, নাম লতিফা। মেয়েকে কোরানের ফরমান মতো মানুষ করবেন বলে বেশ কয়েক বছর আগে কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন উজির। মেয়েকে শিক্ষাদীক্ষা দেন, লেখাপড়া শেখান, চোখে চোখে রাখেন, বাড়ির বা'র কোনদিন হতে দেননি তাকে।

জইন বললে—জনাব, এ মেয়ের চেহারা সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, তাতে বুঝছি—আমি যেমনটি খুঁজছি এ তেমনটিই হবে, এর জন্যে তাকে আর দেখবার দরকারও হত না, কিন্তু তার দেহমনের শুচিতা বুঝবার জন্যে তাকে যে আমার একবার দেখা দরকার!

আবুবকর হাসি আর চাপতে পারলে না: হুজুর, আপনি যা জানতে চাইছেন, একমাত্র খোদা ছাড়া ওর খবর আর কেউ জানতে পারে না। মেয়ে অবশ্য আপনাকে দেখাচ্ছি আমি, দেখানো দরকারও, কিন্তু মেয়ে দেখে তার দেহমনের শুচিতা আপনি জানবেন কি করে?

সে আমি পারব, একবার দেখলেই পারব।

আবার হাসলে আবুবকর: হুজুর, দেখছি তা হলে অন্তর্যামী, না হয় বড় গনৎকার।

জইন আর তার এ কথার উত্তর দিলে না। আবুবকর এরপর তাকে মেয়ে দেখাতে উজির সাহেবের বাড়ি নিয়ে গেল। ওরা গিয়ে গৃহস্বামীকে সসম্মানে সেলাম করে দাঁড়ালে তিনিও সেলাম করে ওদের সংবর্ধনা করে বসালেন। জইনের চেহারা আর সাজসজ্জা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন উজির, তারপর ইমামের কথায় যখন তার ধনৈশ্বর্য, পদমর্যাদা, দান খয়রাত, মহানুভবর্তা এবং তাঁর বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য শুনলেন তখনই তিনি সানন্দে কন্যা লতিফাকে ডেকে পাঠালেন। একটু পরেই লতিফা লাজনম্রমুখে ধীর পদক্ষেপে সেখানে এসে হাজির হল। বাপের হুকুমে অন্য পুরুষের সামনে আবির্ভাব তার এই প্রথম। সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার দেহের গঠন এবং বর্ণের যে আভাস পাচ্ছিল জইন তাতেই তার মনে রোমাঞ্চ জাগছিল, তারপর যখন মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করা হল, তখন তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল: মানুষের মুখ যে এত সুন্দর, স্নিগ্ধ, কমনীয় হয় তা সে স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি! কেন সে ত্রিদ্বীপের জিনরাজের কাছে কথা দিয়ে এল, এমন একটা মেয়ে পেলে, তাকে আর কোন রকম পরীক্ষা না করেই বসোরার বেগম করে নিয়ে যেতে পারলে সুখী হত সে।

যাক—এখন আর ওসব ভেবে লাভ কি। যা করতে এসেছে তাই করতে হবে তাকে। যন্ত্রচালিতের মতো জইন বের করলে জিনরাজের দেওয়া মুকুরখানা, তাতে ফুটে উঠল শুচিশুভ্রা এক কুমারীর রূপ যা খুঁজতে বেরিয়েছে সে—তা মিলে গেল এবার।

সেইদিনই কাজী ডেকে চুক্তিপত্রের পর সাড়ম্বরে লতিফাকে বিয়ে করলে জইন। শ্বশুর উজিরকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে প্রচুর উপঢৌকন দিলে, লতিফাকে দিলে নানা মণিরত্নের অলঙ্কার। ও এলাকার সবাইকে নিমন্ত্রণ করে চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় খাওয়ালে।

সবারই মুখে ঐ এক কথা—এমন ভোজ এখানে কেউ কোনদিন দেয়নি!

ভোজের শেষে আর সবাই চলে যাবার পর জইন ইমাম আবুবকরকে দশহাজার মোহরের একটা তোড়া দিয়ে বললে—জনাব, আপনি যা করলেন তার প্রতিদানে যা আমি দিচ্ছি আপনাকে তা অতি নগণ্য, আমি বসোরায় গেলে আপনি একবার পায়ের ধুলো দেবেন ওখানে, আমি আপনাকে আমার ওমরাহ করে নেব, আমি ওখানকার সুলতান।

মোবারেক জইনের হাবভাব দেখেই তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, সুতরাং বর-কনের আর সাক্ষাৎকারের সুযোগ না দিতে তখনই জইনকে বললেন—হুজুর, যে জিনিসের খোঁজে আমাদের এতদিন ধরে এত দেশ ঢুঁড়ে বেড়ানো তা ত আমাদের মিলে গেল, সুতরাং আর এক মুহূর্ত দেরি না করে যাঁর জিনিস তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে এখনই আমাদের রওনা হওয়া উচিত।

জইন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—বেশ, তোড়জোড় করো।

জরুরী কাজে এখনই দূর দেশে রওনা হতে হবে—বলে শ্বশুর উজিরের কাছ থেকে বিদায় নিলে জইন। উট গাধার পিঠে তাঁবু জিনিস-পত্র সব সাজানো হল। মণিরত্নের ঝালর দেওয়া রেশমী কাপড়ে ঘেরা একটা বড় দোলায় লতিফাকে বসিয়ে দোলাটাকে একটা উটের পিঠে বসানো হল। দলের আগে চললেন ঘোড়ায় চড়ে মোবারকে। পিছনে জইন, আর ঠিক মাঝে উটের দোলায় লতিফা।

দীর্ঘদিনের যাত্রা। শুধু দিনের পর দিন নয়, মাসের পরে মাস। রাত্রে তিনটি তাঁবু পড়ে! এক তাঁবুতে লতিফা, আর একটায় মোবা-রেক আর জইন, আর একটায় তাদের লোকজন। বর-কনের দেখা আর হয় না। মোবারেক লক্ষ্য করেন জইনের চোখে ঘুম নেই, ছটফট করছে জইন। দেখে দেখে একদিন মুখ খুলতেই হল মোবারেকের—হুজুর, সহ্য করুন, মনকে বশে রাখুন—উপায় নেই,

ত্রিদ্বীপের জিনরাজকে কথা দিয়ে এসেছেন আপনি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলে মহা বিপদ, আপনার প্রাণ, লতিফার প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে। এ চুক্তি কিছুতেই ভাঙা যায় না।

শুনে কোন উত্তর দেয় না জইন, তার ভাঙা বুক থেকে শুধু একটা করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

এদিকে লতিফার চোখেও ঘুম নেই। প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে থাকে—আজ তার স্বামীর দেখা পাবে সে, স্বামী ভুলেও একবার তার তাঁবুর দিকে পা বাড়ান না। এ যে কি কষ্ট তা সদ্য বিবাহিতা তরুণী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। মাঝে মাঝে অবশ্য মোবারেক যান দেখা করতে লতিফার সঙ্গে, তুটো কথা বলতে। মোবারেক গেলে জইনও গিয়ে তাঁবুর বাইরে লুকিয়ে থাকে—লতিফার মিষ্টি-গলার তুটো কথা শুনতে পাবে সে! একদিন মোবারেক অমনি দেখা করতে গেলে লতিফা আর থাকতে না পেরে বললে—জনাব, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আশা করি ঠিক উত্তর পাব।

বলো, বেটি।

আমি কি আমার স্বামীর কাছে কোন অপরাধ করেছি? কোন কারণে বিরক্ত হয়েছেন তিনি আমার উপর?

তা হলে এতদিন আমাদের বিয়ে হয়েছে, পথচলার ত শেষ দেখতে পাচ্ছি না, এর মাঝে একদিনও আমার তাঁবুতে পায়ের ধুলো দিলেন না, এর কারণ কি?

শুনে মোবারেক একটু চুপ করে রইলেন, তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—এর কারণ শুনলে তুমি বড় তুঃখ পাবে, বেটি, বড় কষ্ট পাবে, তার চেয়ে নাই শুনলে!

না, তুঃখ কষ্ট পাই পাবো, আপনি বলুন, না শুনলে আমার চলবে না।

ব্যাপারটা যখন শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পাবেই তখন মোবারেক কথাটা আর চেপে না রেখে বললেন—বেটি তোমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তুমি-ও তাকে পাবে না, সে-ও তোমায় পাবে না।

কেন ?

মোবারেক তখন আছোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললেন। কাহিনীটা শোনাবার সময়ই লতিফা অঝোরে চোখের জল ফেলতে লাগল, তারপর মোবারেক যখন সেটা শেষ করে বললেন—ত্রিদ্বীপের সেই জিনরাজের কাছেই তোমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, এর অন্যথা হলেই আমীর ও তোমার দুইজনেরই মৃত্যু, তখন সে একেবারে মূর্ছিত হয়েই পড়ল। এদিকে তাঁবুর বাইরে থেকে সব কথা শুনে জইনও মূর্ছিত।

মোবারকের অনেক চেষ্টায় দুজনের শেষে জ্ঞান ফিরে এল।

রাত্রি ভোর হলে আবার যাত্রা শুরু। আরও কিছুদিন চলার পর তারা সাধারণ মানুষের অগম্য জিনরাজের এলাকায় এসে হাজির হল। মোবারেকের তুকতাকে আবার পাহাড় গেল ফেড়ে, গজমুণ্ড মাঝি এসে হ্রদ পার করে দিল। জিনরাজ এলেন। জইন তাঁর আয়নাখানি ফেরত দিতে লতিফাকে তাঁর সামনে আনালে। জিনরাজ আয়নার ব্যবহার করলেন না, তাঁর দুই চোখই দিব্য মুকুর। বেশ কিছুক্ষণ অবগুণ্ঠিতা লতিফার দিকে চেয়ে থাকবার পর তিনি জইনকে বুকে জড়িয়ে ধরে পুত্র স্নেহে তার কপালে মাথায় অজস্র চুমু দিয়ে বললেন—সাবাস বেটা, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি আনতে পেরেছ তুমি। সৌন্দর্য ও দেহমনের শুচিতায় এ অদ্বিতীয়া সম্পূর্ণ কলঙ্কহীনা কুমারী। এবার তুমি বাড়ি যাও, গিয়েই দেখবে তোমাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে শূন্য সিংহাসনে আমার প্রতিশ্রুত সেই নবম রত্নপ্রতিমা, যার জ্যোতিতে হাজার হীরকমূর্তি ম্লান হয়ে যায়। হ্যাঁ—এবার একে বলে যাও—তোমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হল।

কথটা শোনামাত্র লতিফার চোখে অশ্রুর বন্যা নামল : তরুণ প্রিয়দর্শন জইনকে সে বড়ই ভালোবেসেছিল। জইনও কাঁদতে কাঁদতে তাদের পূর্বচুক্তির কথা লতিফার কাছে বর্ণনা করে তাকে তালাক দিলে। তালাকের কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে লতিফার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এরপর মোবারেকের সঙ্গে জইন বসোরায় ফিরে চললো। সারা-পথ সে অনুশোচনা করতে করতে গেল : কেন সে লতিফাকে এমন প্রবঞ্চনা করতে গেল, রত্নপ্রতিমার লোভে এমন নারীরত্নকে হারাতে হল তার!

বসোরায় পৌঁছেও তার মনের অশান্তি দূর হল না! সে ফিরে আসাতে রাজ্যের লোক যে বিরাট উৎসবের আয়োজন করলে তাতেও সে যোগদান করলে না। মোবারেক তখন প্রধান উজির হয়েছেন, তিনি জইনকে ভুগর্ভের প্রাসাদে গিয়ে নবম রত্ন প্রতিমা দেখতে কত সাধাসাধি করতে লাগলেন। তাতেও রাজী হয় না জইন। মোবারকের অনেক সাধ্যসাধনার ফলে অবশেষে একদিন মন নরম হল তার, চললো সে নবম প্রতিমা দেখতে।

ঢুকতে হল তাকে প্রথমে স্ফটিক প্রাসাদে। চল্লিশ ঘড়া মোহরের জেল্লায় কক্ষপ্রাচীর স্বর্ণাভ হয়ে উঠেছে। সেটা পেরিয়ে এসে গেল জইন মর্মরে গড়া শিল্প মন্দিরে যেখানে আটটি বেদীতে আটটি হীরক মূর্তি ঝলমল করত, আর একটি বেদী ছিল শূন্য—যার কাছে প্রথম আটটি ম্লান হয়ে যায়, তুচ্ছ হয়ে যায় এমন একটি রত্ন প্রতিমা জিনরাজের সেখানে বসিয়ে দেবার কথা।

একে একে আটটি বেদী পার হয়ে গেল জইন, তাদের সাবেক জেল্লা একটুও ম্লান হয়নি, কিন্তু নবম বেদীর সামনে এসে সে একে-বারে থ! লতিফা তার অবস্থা বুঝে মিষ্টি হেসে বললে—হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ—আমি তোমারই লতিফা। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে, তুমি বোধ হয় অনেক সুন্দর দামী কিছু প্রত্যাশা করে এসেছিলে!

তোমার চেয়েও সুন্দর আর দামী কিছু জগতে আছে নাকি! তোমায় দেখে আমার চোখে এই সব রত্ন প্রতিমা ম্লান হয়ে গেছে, তুচ্ছ হয়ে গেছে—বলেই হাত বাড়াতে যাচ্ছিল জইন—লতিফাও। ঠিক এই সময় ঘন ঘন বজ্রনাদ আর ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আবির্ভূত হলেন ত্রিদ্বীপের অধীশ্বর জিনরাজ। মুখে

তাঁর স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসি। এসেই তিনি জইনের ডান হাত লতিফার হাতে দিয়ে বললেন—বেটা, এই নে তুই সেই আমার প্রতিশ্রুত রত্ন প্রতিমা যার জেল্লায় হাজার হীরক-প্রতিমা ম্লান হয়ে যায়। তোর জন্ম থেকে তুই আমার রক্ষণাধীনে, তোকে সুখে রাখবার, শান্তি দেবার উপায়ের কথা ভেবে ভেবে আমি শেষে এই পন্থা অবলম্বন করব ঠিক করে-ছিলাম। অনিন্দিতা সুন্দরী কুমারী রত্ন জগতের সকল রত্নের চেয়ে দামী, জীবনের শ্রেষ্ঠ রসায়ন ; নে, একে নিয়ে তুই সুখে রাজত্ব কর, বলে পরম স্নেহে জইনের কপালে একটা চুমু দিয়ে জিনরাজ হাওয়ার মিলিয়ে গেলেন।

জিনরাজের আশার্বাদ মিথ্যা হয়নি, খোদার ডাকে তাঁর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত জইন আর লতিফা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসে সুখেই দিন কাটিয়েছিল।

গল্পটি শুনে শাহরিয়ার বললেন—সত্যি---চমৎকার তোমার এ গল্পটি, তা ছাড়া খুবই শিক্ষাপ্রদ। আচ্ছা শাহরাজাদী, সৌন্দর্যের পূজায় কোন শাহজাদী রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করেছে এমন কোন গল্প তোমার জানা নেই ?

আছে, বই কি জাহাঁপনা—আল্লার দোয়ায় আর আপনার আশীর্বাদে এ বাঁদীর সব রকম গল্পই জানা আছে। আপনি হুকুম করলে কাল শোনাতে পারি : শাহাজাদী জুলেখার কাহিনী—আপনি যেমনটি চাইছেন—ঠিক তেমনটি।

জুলেখার কাহিনী

পরদিন শেষ রাত্রে সুলতানের পূর্বদিনের ফরমাস মতো গল্প আরম্ভ করলে শাহরাজাদী—

উমায়্যাদ বংশের এক খলিফা তখন দামস্কসের সিংহাসনে। তাঁর এক উজির ছিলেন, বহুৎ তাঁর এলেম। কাব্য ইতিহাস পুরাণ বিজ্ঞানের কোন কেতাব পড়তে তাঁর বাকী ছিল না। আর শুধু পড়াই নয়, এ সবের অধিকাংশ তাঁর কণ্ঠস্থ। খলিফার মন খারাপ দেখলেই এ সবের কিছু না কিছু শুনিয়ে খালিফাকে উৎফুল্ল করে তুলতেন। একবার খলিফা অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক বেশি মন খারাপ করে বসে আছেন দেখে তিনি তাঁকে বললেন—জাহাঁপনা, ধর্মাবতার, কিছু গল্প শোনালে একটু ভাল লাগরে আপনার?

না, গল্পে আজ আর আমার রুচি নেই।

কোন কাব্য সাহিত্য ইতিহাসের কথা।

উঁহু।

উজির তখন একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন—খোদাবন্দ্, একটা কথা বলব?

কি বলো।

এতদিন গল্প শোনাবার সময় আমি অপরের জীবনের কাহিনী শুনিয়েছি আপনাকে, আপনি আমার জীবনের কাহিনী, অর্থাৎ বান্দা আপনার দোয়ায় আপনার সেবা করবার সুযোগ পাবার আগে তার জীবনে যে তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে আপনি তা শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেও লজ্জা সঙ্কোচে এবং পাছে অহংকার প্রকাশ পায় এই ভয়ে তা আর বলতে পারিনি। আজ আপনি যদি হুকুম করেন ত—

খলিফা জানতেন উজিরের গত জীবন রোমাঞ্চকর অনেক তাজ্জব

ঘটনায় পূর্ণ। কিন্তু যে কারণেই হোক তিনি তা বলতে চাইতেন না, নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতেন, আজ যখন তিনি স্বেচ্ছায় তা বলতে চাইছেন তখন তাঁর মনে যেন একটু ঔৎসুক্যই জেগে উঠল, তিনি উজিরের কথার উত্তরে বললেন—বেশ, আজ যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে বলো শুনি, তোমার নিজের জীবনের সেই তাজ্জব কাহিনী, দেখি—শুনে যদি একটু ভাল লাগে। উজির তখন বলতে শুরু করলেন—

মালেক, ত্বনিয়ার এই সেরা নগরী দামস্কসেই আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন একজন সদাগর, বেশ ধনী সদাগর, বেশ নাম ডাক ছিল তাঁর। এ তল্লাটের সবাই তাঁকে চিনত, নাম ছিল তাঁর আবত্নল্লা। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, তাই আমায় লেখাপড়া শেখাবার জন্য তিনি যথেষ্ট ব্যয় করেছিলেন। নানা মৌলভী রেখে তিনি আমার কাব্য সাহিত্য, গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, কোরান ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়া ভাষাও শিখেছিলাম আমি অনেকগুলো। আমাদের দেশে প্রচলিত সকল ভাষা ত বটেই, তা ছাড়া ফারসী, গ্রীক, তাতার, সংস্কৃত, চীনে ইত্যাদি করে অনেক কিছু। সুতরাং ভাগ্যচক্রে ত্বনিয়ার যে কোনো দেশেই আমি গিয়ে পড়ি না কেন, সেখানকার লোকের ভাষা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বাবার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। ত্বনিয়া থেকে বিদায় নেবার দিন তাঁর ঘনিয়ে আসছিল, কিন্তু আমি এমন শিক্ষিত হয়ে উঠেছি দেখে এ জগৎ ছেড়ে যেতে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল না। যেদিন তিনি বুঝলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে সেদিন তিনি আমায় ডেকে তাঁর বিছানার পাশে বসিয়ে আমার হাত ধরে বললেন—বেটা, খোদার ডাক এসেছে, আমি তাঁর কাছে চল্লাম, এখানে তোমার আর কোন মুরুব্বি রইল না, কিন্তু আমার তাতে ক্ষোভ নেই, তুমি যা শিক্ষা পেয়েছ আর যা তোমার জন্যে আমি রেখে গেলাম এতে তোমার সুখেই দিন কাটবার কথা, তবে এও সত্যি যে নসিবের কথা কেউ বলতে পারে না,

যা করেন সাঁই তা কারো মনে নাই, সুতরাং কোন কারণে জীবনে দুর্দিন যদি আসে, চারিদিকে আঁধার ছাড়া আর কিছু যদি দেখতে না পাও তা হলে একটি কাজ করবে তুমি—এই আমার শেষ উপদেশ। বাপজান আবার একটু থামলেন, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। একটু জিরিয়ে নিয়ে পূর্ব কথার খেই ধরে বললেন—আমার উপদেশ হচ্ছে —উপদেশ নয়, নির্দেশ যে তুমি একা একটা দড়ি হাতে আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে বেরিয়ে যাবে। ওখানে যে শুকনো বড় গাছটা আছে তার সব চাইতে যে বড় ডাল তাতে দড়ি বেঁধে ঝুলবে তুমি—এই রইল আমার শেষ উপদেশ আর নির্দেশ, এই বলেই বাপজান আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শোকে ত বটেই, তা ছাড়া তাঁর এই সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত উপদেশ বা নির্দেশে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না বাপজান আল্লায় বিশ্বাসী ধার্মিক মুসলমান হয়েও কোরানে নিষিদ্ধ আত্মহত্যার উপদেশ কি করে দিতে পারলেন। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত!

অন্ত্যেষ্টির পর ধীরে ধীরে আমার শোকাবেগ মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঐ অদ্ভুত নির্দেশের কথাও আমি এক রকম ভুলে গেলাম। অল্প বয়সে অর্থসম্পদ হাতে এসে পড়লে প্রায় সকলেরই যে দশা হয়, আমারও তাই হল। বন্ধুদের নিয়ে খানাপিনা আর ফুর্তিতে আমার সর্বস্ব নিঃশেষ হল। হঠাৎ একদিন দেখলাম সদ্যোজাত নগ্ন শিশুর মতো আমি রিক্ত। আমার অবস্থাটার পূর্ণ উপলব্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে-ক্ষোভে উদ্‌ভ্রান্ত আমার মুখ দিয়ে অমনি বেরুলো—আবদুল্লার বেটা হাসান, এখন কি করবি তুই, বাগান সমেত এই বসত বাড়ি বিক্রি করা ছাড়া তোর যে আর গত্যন্তর রইল না! এখন দুনিয়ার পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে যে তোর, সুখের দিনের বন্ধুরা এই দুঃখের দিনে কেউ আর তোর মুখের দিকে চাইবে না, বুদ্ধির দোষে যে নিজের ঘর বাড়ি বিক্রি করে তাকে কেউ অনুকম্পাও করে না। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ

বাপজানের উপদেশের কথা মনে পড়ে গেল। বুঝলাম তিনি হক কথাই বলে গেছেন, ভিক্ষা করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা ভাল।

মনের দুঃখে শেষে বাপের উপদেশ পালন করাই সাব্যস্ত করলাম। বাড়িতে খুঁজে-পেতে একটা শক্ত দড়ির যোগাড় করে ঢুকলাম আমি আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে। তারপর বাবার নির্দেশমতো সেই বুড়ো শুকনো গাছের বড় ডালটার নিচে গিয়ে, দুটো বেশ বড় বড় পাথর যোগাড় করে সেখানে একটির উপর একটি রেখে, তার উপর দাঁড়িয়ে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে সেই ডালটায় বেঁধে আল্লার কাছে ক্ষমা চেয়ে ঝুলে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে একি হল! গাছের ডালটা গোড়া থেকে মড় মড় করে ভেঙে আমি মাটিতে এসে পড়লাম যে! অচৈতন্য আর হইনি। ধিক্কার আসছিল মনে: আরে আবদুল্লার বেটা হাসান, তুই এমন অপদার্থ যে আত্মহত্যার ব্যবস্থাটাও ঠিক মতো করতে পারিস না! আর একবার ঠিকমতো চেষ্টা করবার জন্যে উঠতে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার চোখের সামনেই আমার মাথার কাছে, উপর থেকে একটা পাথরের নুড়ির মতো কি পড়ল! কিন্তু একি? জ্বলন্ত কয়লার মতো জেল্লা বেরুচ্ছে যে এ থেকে, তবে কি এ হীরে! আর একটা পড়ল, আর একটা। ভিন্ন ভিন্ন রঙ, নীলা আর পান্না। শুকনো গাছের বড় ডালে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে বাপজান কেন বলে গিয়েছিলেন এখন তার তাৎপর্য উপলব্ধি হল। আমি তখনই উঠে বাড়ির ভিতর গিয়ে একখানা কুড়ুল এনে ভাঙা-ডালের ওখানকার খোড়লটা আর একটু ফাঁক করে দেখি: ইয়া আল্লা, গাছের কাণ্ডটা যে একেবারে ফাঁপা, আর তার ভিতর হীরে, চুনী, পান্না, পোকরাজ, নীলা আর মোহর একেবারে ঠাসা। দেখে খোদার দোয়া আর বাপজানের স্নেহের কথা মনে করে আমার চোখে জল এসে গেল, আমি তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর নয়, উচ্ছৃঙ্খল বিলাসীর জীবন যাপন করব না আমি। এখন থেকে সংযত সাধু নাগরিকের জীবন। এ শহরে থাকাও আর নয়, এখানকার সর্বত্র আমার পূর্ব জীবনের স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে।

বাপজান বলতেন পারস্যের সিরাজ অপূর্ব জায়গা, শিক্ষা সংস্কৃতি সৌজন্য সুরুচির সঙ্গে সম্পদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে সেখানে, সুতরাং বেশি ভেবে সময় নষ্ট না করে সেখানে যাওয়াই আমি সাব্যস্ত করলাম।

দুই একদিনের মধ্যেই প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে গেল। রওনা হলাম সিরাজে। নির্বিঘ্নে সেখানে গিয়ে হাজিরও হলাম। সাবুরশাহ তখন পারস্যের তকৃতে।

সিরাজের লোকজন, ঘড়বাড়ি, দৃশ্য সব কিছুই আমার চোখে বড় ভাল লাগল। খোঁজ করে ওখানকার সেরা সরাইখানায় গিয়ে আমি আস্তানা নিলাম। একটা ভাল ঘর ভাড়া নিয়ে, সাজিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে পর্যটকের পোশাক ছেড়ে সভ্য ভদ্র নাগরিকের দামী পোশাক পরে শহরটা ভাল করে দেখব বলে আমি রাস্তায় বেরুলাম। এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে সামনেই একটা সুন্দর পর্সিলেনের মসজিদ দেখে আমি সেখানে ঢুকে পড়লাম। সেখানে নমাজ সেরে বাইরে বেরিয়েছি এমন সময় সামনে পড়লেন সুলতানের এক উজির। উজির সাহেব আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন : কে তুমি, বাবা, বড় প্রিয়দর্শন চেহারা ত!

নিজের প্রশংসা শুনে খুশী হয়ে আমি তাঁকে সেলাম করলাম। তিনি আমায় আশীর্বাদ করে বললেন—কোত্থেকে এসেছ বাবা, তুমি ?

জনাব, দেশ আমার দামস্কস। নিজেকে মার্জিত করব বলে আমি আপনাদের সিরাজে এলাম।

বাঃ বাঃ—তা কত বয়স হয়েছে তোমার ?

পনরো উতরে ষোল চলেছে এখন।

শুনে খুবই যেন খুশী হলেন উজির সাহেব, কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—তুমি সুলতানের ওখানে কোন কাজ করবে, বাবা ? মহল্লকের (অন্তঃপুর রক্ষী) কাজ, কর ত আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, আমি তাঁর একজন উজির। তোমার মতো ছেলে পেলে সুলতান লুফে নেবেন।

শুনে আমিও খুশী হয়ে বললাম—আমি রাজী।

উজির বললেন—হাঁ কাজ নাও, আমার মনে হয় সুলতানের বিশেষ স্নেহভাজন হতে পারবে তুমি, কারণ তোমার চেহারাই শুধু প্রিয়দর্শন নয়, তুমি নিখুঁত উচ্চারণে যেমন চোস্ত ফারসী বলছ, এমনটি ত কোনদিন কোন বিদেশীকে বলতে শুনিনি। তোমার মতো ফারসী যদি তোমাদের দামস্কসের সবাই বলতে পারে, সেটা ত তবে বেহেস্তের কাছাকাছি, ওখানকার আসমানটাকে তা হলে বেহেস্তই বলতে হয়।

উজির পরদিনই আমায় সুলতানের কাছে নিয়ে হাজির করলেন। যা বলবার তা আগেই তিনি বলে রেখেছিলেন। ভূমি চুম্বন করে সুলতানকে কুর্নিশ করে যখন আমি উঠে দাঁড়ালাম তখন সুলতান বললেন—উজির যেমনটি বলেছে, দেখছি তার চেয়েও তোমার চেহারা সুন্দর! আসলে দামস্কসের লোকেদেরই চেহারা ভাল। তা তোমার নাম কি?

বললাম, হাসান।

সুলতান খুশী হয়ে বললেন—হাঁ, যেমন চেহারা, তেমনি নাম। বেশ, আজ থেকেই তুমি আমার মহল্লক নিযুক্ত হলে।

উজির সেখান থেকে আমার নিজের আস্তানায় নিয়ে এসে আমায় মহল্লকের পোশাকে সাজিয়ে দিলেন, আমার কাজ—কেমন করে কি কি আমায় করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে কি কি করা আমার নিষেধ—তাও। নিষেধের মধ্যে একটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন—দেখ, সুলতানের বাগানে যদি কখনও হাওয়া খেতে যাও, যেতে পার, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে কখনও থাকবে না। সন্ধ্যার পরে সুলতানের হারেমের মেয়েরা আসেন সেখানে হাওয়া খেতে। ঐ সময় যদি কোন পুরুষকে ওখানে দেখতে পাওয়া যায়—তিনি যেই হন না কেন—সুলতানের বিচারে হবে প্রাণদণ্ড।

আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী উজির এই রকম অনেক উপদেশ দিয়ে আমাকে কাজে পাঠিয়ে দিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই

অন্যান্য তরুণ মহল্লকদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দিন আমার বেশ সুখেই কাটতে লাগল। এ পর্যন্ত, জাহাঁপনা, আমি কোন নারীর সাহচর্যে আসনি। ভাগ্যচক্রে এরপর আসতে হল, কি করে —তাই এবার বলছি।

বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে আমি সুলতানের বাগানে হাওয়া খেতে যেতাম। যেতাম, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতাম। একদিন, বড় গরম সেদিন—ওখানে ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে একটা বেঞ্চের উপর শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার কানে এল বীণানিন্দিত মধুর নারী কণ্ঠে কে যেন অতি অনুচ্চস্বরে বলছে—হ্যাঁরে, দেখছিস কি সুন্দর চেহারা, ঠিক যেন দেবদূত, চোখ ফিরাতে ইচ্ছা করে না—কি সুন্দর, কি সুন্দর! শুনে প্রথমে মনে হল যেন ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু প্রায় পরক্ষণেই সত্যিকার অবস্থাটা আমার উপলব্ধি হল: সর্বনাশ! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ওরা এসে গেছে! একে গাছের ছায়া—তাতে চাঁদটা ছিল তখন মেঘে ঢাকা কোন মেয়েকে আর দেখতে পেলাম না আমি। দুই সারি গাছের ভেতর দিয়ে সামনে যে পথ পেলাম তাই ধরে দৌড়াতে শুরু করলাম। বাঁক ঘুরতে গেছি এমন সময় চাঁদের সামনে থেকে মেঘ সরে গেল —ফুটফুটে জোছনা—আর মাত্র করেক হাত দূরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। আমার মনে হতে লাগল আমি কি আসমানের চাঁদের দিকে চেয়ে ফেলেছি—না কি? না, খোদার-পয়দা আসমানের চাঁদও এর মুখের কাছে ম্লান হয়ে যায়, আর কি ঠাট, যেন শাহাজাদী!

পথের সামনে এই অপূর্ব মূর্তি দেখে আমি থমকে মাথা নীচু করে দাঁড়ালাম। মূর্তি ধীরকণ্ঠে বললে—এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ তুমি, ছুটছ কেন? আমি বললাম—বিবিসাব, আপনি যদি সুলতানের প্রাসাদের লোক হন তা হলে ত আপনি জানেনই সন্ধ্যার পরে যদি কোন পুরুষকে প্রহরীরা এখানে দেখতে পায় তা হলে পরের দিন

সকালে তার গর্দান যাবে, সুতরাং মেহেরবানি করে আপনি সরে দাঁড়ান, আমি আমার জানটা বাঁচাতে চেষ্টা করি। মেয়েটি বললে—যাবার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে এখন প্রাসাদে ফিরবার চেষ্টা করলে ভুল করবে, ক্ষতি হবে তোমার, তার চেয়ে এই সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রিটা আজ তুমি এখানেই কাটিয়ে যাও। এই বলে সে খপ্ করে বাঁ হাত দিয়ে আমার হাত ধরে ডান হাতে তার মুখের আবরণ খুলে ফেললে: দেখ, তাকিয়ে দেখ, রোজ সন্ধ্যায় এমন কারো দেখা নিশ্চয়ই তোমার ভাগ্যে জোটে না, আমার বয়স আঠার বটে, নিতান্ত কুরূপা নিশ্চয়ই আমি নই, কিন্তু এ মুখ আর কোন পুরুষ কোনদিন দেখে নি, তুমিই প্রথম দেখলে। আমাকে দেখার পরও তুমি যদি পালাতে চেষ্টা কর, তা হলে কিন্তু আমার সত্যিই রাগের কারণ ঘটবে।

আমি বললাম—হুজুরাইন, রাগ করবেন না, আপনি—আপনি পূর্ণচন্দ্রের চেয়ে সুন্দর, রাত্রি হিংসা করে আপনার রূপের সবটুকু যদিও প্রকাশ হতে দেয়নি, তবু যতটুকু আমি দেখেছি তাতেই আমি মুগ্ধ, কিন্তু আমার অবস্থাটা আপনি একবার ভেবে দেখুন—আমার বিপদের কথা!

মেয়েটি উত্তর দিলে—তোমার অবস্থাটা আমি খুব বুঝেছি কিন্তু বিপদের কথা ভেবো না, আমি যখন অভয় দিচ্ছি তখন তোমার কোন বিপদের ভয় নেই, আমি কে তা যদি তুমি জানতে তা হলে বুঝতে তোমার এখন একমাত্র বিপদ হচ্ছে আমার অসন্তোষভাজন হওয়া। সে যাক, এখন তোমার পরিচয় বল ত—কে তুমি আর এখানে কি কাজ তুমি করো?

হুজুরাইন, আমি দামস্কস থেকে এসেছি, নাম হাসান, এখানে সুলতানের নতুন মহল্লক আমি। শুনে মেয়েটি উল্লাসে একেবারে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল—আরে, আরে, তুমি? তুমি দামস্কসের হাসান! ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, সিরাজের সবার মাথা খারাপ করে দিয়েছ তুমি, হাঁ—মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো চেহারাই

বটে! আমার নসিব, আর খোদার অশেষ দোয়া যে এমন সুন্দর জোছনা রাতে একা আমিই তোমাকে কাছে পেলাম। ছাইপাঁশ ভেবে এমন সুন্দর রাতটা নষ্ট করে না। বলে নাছোড়বান্দা হয়ে সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে গিয়ে শ্বেত পাথরের একটা বেদীর উপর বসিয়ে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেবল বলেছে— তুমি কি সুন্দর! অমনি মস্ত বড় একটা গোলাপের ঝোপ থেকে দশটি মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে এক সঙ্গে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল: সত্যি খইরা, কি নসিব রে তোর, আসমানের চাঁদকে তুই একেবারে হাতে পেয়ে গেলি! আর একজন বললে—আমাকে একটু বসতে দে না, ভাই, পাশে। আর একজন ঝরনার মতো বেলোয়ারী আওয়াজ তুলে বললে—আমি অত চাই না, আমি শুধু একটু দেখব। এর পর আর আর মেয়েরা তাদের মুখের আগল ভেঙে যে সব কথা উচ্চারণ করতে লাগল জাহাঁপনা, তা শুনে আমার মনে হচ্ছিল আমার পায়ের নিচের জমিন ফেড়ে যাক, আমি তার মাঝে আত্মগোপন করি। আমি ত আগেই বলেছি, জাহাঁপনা, মেয়েদের সঙ্গে আমি আগে কোনদিন মিশিনি, কোন মেয়ের মুখের দিকে চাই নি পর্যন্ত। সেদিন সেই প্রথম সাক্ষাতে তাদের যে নির্লজ্জ বেহায়াপনার পরিচয় পেলাম তা কোন গল্পে শুনিনি, কেতাবে পড়িনি। এত কেতাব-পড়া এলেমওয়ালা ছেলে আমি, কতকগুলো মেয়ে কিনা আমাকে বেকুব বানিয়ে ছাড়লে। রাগে অপমানে ক্ষোভে আমার তখন জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা। ঠিক এই সময় আবার আর এক কাণ্ড: পাশের এক জুঁইয়ের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আর একটি মেয়ে, যেন মেঘের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ বেরিয়ে এল! সঙ্গে সঙ্গে শুধু মেয়েগুলো নয়, ফুলে-ভরা গাছের ডালগুলোও যেন মাথা নুইয়ে চুপ করলে এমনি সম্রাজ্ঞীর মতো তার ঠাট। মেয়েটি এনেই স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—দামস্কসের হাসান, তুমি আজ যে বেয়াদপি করলে এমনটির কথা এখানে কেউ কোনদিন শোনেনি। তোমার দিকে চেয়ে

তোমার সৌন্দর্য আর বয়স দেখে আমার সত্যিই বড় দুঃখ হচ্ছে যে এমন একটি তরুণ কাল জল্লাদের খড়্গাঘাতে প্রাণ হারাবে! মেয়েটির কথা শুনেই আমার বুকের কাঁপন শুরু হয়ে গেল কিন্তু তখনই খইরা এগিয়ে এসে এই মেয়েটির হস্ত চুম্বন করে বললে—শাহাজাদী জুলেখা, দোহাই আপনার, এইবারের মতো হাসানকে মার্জনা করুন। খোদার বাগিচা থেকে এমন একটা ফুল ফুটতেই ছিঁড়ে ফেলা হবে, এমন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা আপনি করবেন না। শাহাজাদী শুনে একটু কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—অপরাধ ও করেছে যখন তোমার কাছে, আর তুমিই যখন ওর হয়ে বলছ তখন এবারের মতো ওকে মার্জনা করা গেল, কিন্তু এ রাত্রে প্রাসাদে ফিরলে ও বিপদে পড়বে, সুতরাং ওকে আজ রাত্রে হারেমে আমাদের আস্তানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যাক, সেখানে রক্ষণাবেক্ষণে ও নিরাপদে থাকবে।

সবাই বিনীত ভাবে মাথা দুলিয়ে তাদের সম্মতি জানালে। জুলেখা তখন তাদের একজনকে ইঙ্গিত করতেই সে সেখান থেকে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল, তখন দেখি তার বগলের নিচে এক প্রস্থ মেয়েদের রেশমী পোশাক! পোশাক এনেই সে আমার পায়ের সামনে রাখলে। তখন কয়েকজন মেয়ে মিলে আমাকে সেই পোশাক পরিয়ে—মেয়ে সাজালে। দেখে শাহাজাদী যখন অনুমোদন করলেন তখন তারা তাদের সঙ্গে আমায় একটা ঘরে নিয়ে এল। শ্বেত পাথরের ঘর, আড়ে দীর্ঘে বিশ ফুটেরও কিছু বেশি, দেয়ালগুলোতে নানা মণিরত্নের কারুকাজ। মাঝে খোরাসানি গালিচা পাতা, চারিদিকে বৃত্তাকারে অন্তত বিশটা দামী রেশমী কাপড়ে ঢাকা পালকের তাকিয়া। মেয়েরা আমাকে বসালে গালিচার একেবারে মধ্যিখানে শাহাজাদী জুলেখার পাশে। আর সবাই আমাদের চারি পাশে ঘিরে বসল। ওরা আমার কানে ফিস ফিস করে বললে—সুলতানের একমাত্র কন্যা জুলেখা। এটা তারই ঘর বুঝলে, সাহেব। বুঝলাম ত, কিন্তু ওরা যে আমায় একেবারে জ্বালা-

তন করে মারলে, কেউ আমার মাথায় হাত দেয়, কেউ পিঠে, কেউ মুখে হাত দিয়ে আদর করে। জুলেখাকে দেখে বাগানে যেমন সন্ত্রস্ত হতে দেখা গিয়েছিল ওদের, বেশ সমীহ করতে দেখা গিয়েছিল এখন সে ভাবটি আর নেই। জুলেখাও এদিকে আমার দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে কি করব দিশে পাচ্ছি না।

এরপর জুলেখা এখানে এসে প্রথম মুখ খুললে : হাসান আজ আমাদের অতিথি, ওকে কিছু আপ্যায়ন করা দরকার। এরপর একটি মেয়েকে ইঙ্গিত করতেই সে পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই ছ'টি মেয়ে ছ'টি সোনার থালার উপর ছ'টি রেশমী তোয়ালে হাতে এল, তারাও আগেকার মেয়েদের মতো সুন্দরী তরুণী, সুসজ্জিতা। এর পর এল দশটি মেয়ে—এক হাতে তাদের ঝকঝকে পোর্সিলেনের পাত্রের উপর দই, লেবুর আচার, নানা রকম মেঠাই আর এক হাতে গেলাসে বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা সরবৎ। প্রথমে খেল জুলেখা। যে সোনার চামচ দিয়ে নিজে খেল সেই চামচ দিয়েই সে একটু একটু করে সব কিছু আমার মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ালে। এর পর আর সবাই খেতে পাত্র সব শূন্য হয়ে গেল। এবার আরও কয়েকটি মেয়ে স্ফটিকাধারে মুখ ধোওয়ার জল নিয়ে এল।

শাহাজাদীর ঘরে এই রকম পরিবেশে এই রকম ব্যবস্থায় খাওয়ার সময় যেন আমার নেশা লেগে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমি সিরাজি পান করছি। আর ঐ সময় মেয়েরা নিতান্ত বেহায়ার মতো আমাকে নিয়ে যেসব ঠাট্টা বিদ্রূপ রসিকতা করছিল, তা শুনে লজ্জায় আমি একেবারে মরে যাচ্ছিলাম মুখ তুলতে পারছিলাম না আমি। ওরই মাঝে মাঝে আমার প্রথম দেখা খইরার দিকে আমি না তাকিয়ে পারছিলাম না। আর যখনই তাকাচ্ছিলাম তখনই দেখছিলাম ও আমার দিকে চেয়ে আছে ওতে আমার বে-আইনি বেয়াদপি কাজের তিরস্কারের চিহ্ন মাত্র ছিল না, সুতরাং বুঝেছিলাম ও আমার অবিনয় ক্ষমা করেছে।

আমি লজ্জায় জড় পদার্থের মতো বসে আছি দেখে হঠাৎ জুলেখা বলে উঠল—হাসান, হল কি তোমার, কোন কথা বলছ না কেন? মেয়েদের এত কথার কোনটিরই জবাব দিচ্ছ না কেন তুমি? ভয় করছে? কতবার বলব তোমায়, শাহাজাদীর ঘরে এসেছ এখানে কোন ভয় নেই তোমার—তুমি প্রাণ খুলে কথা বল, কোন খোজা আগে থেকে খবর না দিয়ে এ ঘরে ঢুকতে পারে না। ভুলে যাচ্ছ কেন—আমি কে, সামান্য দোকানদারের মেয়ে নই আমি। লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দাও মন থেকে, কথা কও। আচ্ছা আমি প্রশ্ন করছি —তুমি উত্তর দাও; এই যে এতগুলি মেয়ে দেখছ, এদের মধ্যে কাকে তোমার বেশি পছন্দ—বলো।

আমি তবুও চুপ করে রইলাম দেখে জুলেখা জোর করতে লাগল—বলো, বলো—

আমি কি একটু বলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কথা বেরুল না আমরা মুখ দিয়ে—বেরুল কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ। শুনে সবাই হেসে উঠল। জুলেখা মৃদু হেসে বললে—বলো, বলো—নিঃসঙ্কোচে বলো, তুমি হয়ত ভাবছ একজনকে ভাল বললে আর সবাই বুঝি রাগ করবে, সে ভয় করো না। আমরা সকলে এমন বন্ধু যে, কোন পুরুষের কাছে আমাদের কেউ যদি বেশি মর্যাদা পায় তাহলে, আর সকলের মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ থাকে না। সুতরাং নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার তুমি।

এই কথা শোনার পর আমার যেন একটু সাহস হল, আমি সবার দিকেই একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম, দেখলাম সবাই সুন্দরী। শাহাজাদী নিজেও কারো চেয়ে কম নয়, তবু মনে মনে বুঝলাম—আমার প্রথম-দেখা সঙ্গ-পাওয়া খইরাকেই আমার বেশি পছন্দ। কিন্তু মুখে আর সে কথা না বলে জুলেখার উদ্দেশ্যে বল-লাম—চাঁদ চিরকালই সর্বাঙ্গ সুন্দর চাঁদ, আর তার আশেপাশের তারা সব সময়েই সর্বঙ্গ সুন্দর তারা। এই কথা বলার সময় মুখে কিছু না বললেও খইরার দিকে আমি এমন সতৃষ্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে

চাইলাম যাতে সে বোঝে যে, তাকেই আমার বেশি পছন্দ।

আমার কথা শুনে জুলেখা হেসে বললে—সাবাস, হাসান, সাবাস, মস্ত বড় এক কঠিন পরীক্ষায় তুমি পাস করলে। এখন আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার এই যে সহচারীরা তোমার সামনে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোমার বেশি পছন্দ ঠিক করে বল। এ শুনবার পর সব মেয়েরাই আমাকে বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, বিশেষ করে খইরা। ওদের সহজ ব্যবহারে আমার লজ্জা জড়তা তখন কেটে গেছে, আমি আর কালবিলম্ব না করে খইরার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে উঠলাম—সব চেয়ে বেশি পছন্দ আমার—ঐ খইরা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশ কণ্ঠে যেন হাসির জলতরঙ্গ বেজে উঠল—সে বাজনা আর থামতে চায় না, এ ওর গায়ে ধাক্কা মারে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে। আমার তখন মনে হচ্ছে—এরা মেয়ের জাত না কি—এ ব্যাপারে হিংসাদ্বেষ বলে কি কিছু ওদের থাকতে নেই, ওরা সবাই কি বিলকুল পীর হয়ে গেছে না কি! এ ব্যাপার সহোদরা বোনের মধ্যে ঘটলেও যে এতক্ষণ চুলোচুলি বেধে যেত!

আমি যখন এই রকম হতভম্ব হয়ে ভাবছি তখন হঠাৎ জুলেখা বলে উঠল—দামস্কসের হাসান, তোমার পছন্দের তারিফ না করে পারছি না। এ-কথা বলতেই হবে যে, দামস্কসের ছেলেদের চোখ আছে, রুচি আছে, জ্ঞানবুদ্ধি আছে। এখন আর বলতে বাধা নেই—তোমার পছন্দ আর আমার পছন্দ এক। খইরা আমারও প্রেম-পাত্রী, আমার নয়নের মণি, আমার জান। পুরুষ হলে আমি ওকেই সাদি করতাম। সে কথা যাক, কিন্তু খইরার সমস্ত গুণের পরিচয় এখনও তুমি পাওনি, পেলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যেত। সত্যি বলতে কি, শিল্পজ্ঞান, রুচিবোধ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি—সব দিক দিয়ে বিচার করলে ওর জুড়ি আমার বাঁদীদের মধ্যে আর কেউ নেই, সুতরাং তোমার নির্বাচনের জন্যে কোনদিন যে তোমার আফসোস করতে হবে না—একথা আমি জোর করে বলতে পারি।

জুলেখার পর আর আর মেয়েরাও খইরার প্রশংসা করতে লাগল, সে প্রশংসায় অকপটতা থাকলেও কৌতুক দ্বন্দ্বের স্পর্ধিত আহ্বান ছিল। খইরা দেখলাম তীক্ষ্ণ শাণিত বাক্য-বাণে তাদের ক্ষত বিক্ষত করে দিল।

এরপর জুলেখা—একটা স্বর্ণবীণা খইরার হাতে দিয়ে বললে—তুই কেমন গান গাইতে জানিস, আমাদের অতিথিকে একবার শুনিয়ে দে ত! খইরা সেটা হাতে নিয়ে এক লহমায় টুংটাং করে বেঁধে নিল, তারপর প্রথমে অস্পষ্ট অনুচ্চ, পরে স্পষ্ট মধুর কণ্ঠে তারই সুরে সুর মিলিয়ে গাইল—

হৃদয় আমার সোনা আর সরাবে ভরে গেছে।
কালো চুলের বৃশ্চিক চারণ কল্লছে যে আমার বুকে
তার জন্যে ও দুইই রেখে দিয়েছি আমি।
সে যে আমার খাপ-খোলা বাঁকা তলোয়ার,
কালো তীর লাগানো ধনু—
গোলাপের অশ্রুতে লেখা সে আমার দিব্য সঙ্গীত।
হে প্রিয়, তুমি আমার সঙ্গে হামামে এস,
সুরভিধূপ তার নীলচুম্বন ছড়াবে আমাদের চারিদিকে,
আমি তখন তোমার বুকে মাথা রেখে গান গাইব।

গান শেষ করে খইরা যখন আমার দিকে স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টিতে চাইল, তখন আমি একেবারে পাগল হয়ে তার পায়ের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লাম। তার পোশাক আর গায়ের গন্ধে মাতাল হয়ে আমি মাতালের মতোই করতে লাগলাম। অন্য মেয়েদের কৌতুকোচ্ছল কলহাস্যে যেন আমি আমার স্থৈর্য ফিরে পেলাম।

ঠিক এই সময় এক বুড়ী এসে হাজির হল আমাদের কামরায়। জুলেখা আমায় বললে—হাসান, রাত্রি শেষ হয়ে গেল, এখন আমাদের বিশ্রামের সময়। খইরার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে সব রকমের সাহায্য পাবে, বাধা বিঘ্ন আপদ-বিপদে আমি তোমায় বুক দিয়ে আগলাবো, কোন দুশ্চিন্তা রেখ না মনে। আর

কথা পরে হবে—এখন আপাতত তোমার এখান থেকে বাইরে যাবার ব্যবস্থা করছি—এই বলেই জুলেখা বুড়ীর কানে কানে কি যেন বললে। শুনে বুড়ী আমার দিকে একটু কেমন করে তাকিয়ে আমার হাত ধরলে আমি শাহাজাদী জুলেখাকে ধন্যবাদের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে বিহঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খইরার দিকে বিদায়কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। বুড়ী কত আঁকাবাঁকা বারান্দা গলিঘুঁজি পার হয়ে পাঁচিলের পিছনের একটা দরজা খুলে আমাকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিল।

তখন রোদ উঠে গিয়েছিল, আমি নিজের জামা কাপড় পরে সিংহদ্বার দিয়ে প্রহরীদের সামনে দিয়েই নিজের কামরায় ঢুকে দেখি উজির সাহেব আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে বললেন—কোথায় ছিলি রে বেটা? কাল সারা রাত তোকে না দেখে আমি দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

সত্যি কথা আর কি করে বলি, বললাম—চাচা, কাল সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরুলে আমাদের দামস্কসের এক বণিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি কালই আবার বসোরায় চলে যাচ্ছেন, অনেকদিন দেখা হবে না বলে কাল রাত্রে কিছুতেই আর ছাড়লেন না। উজির আমার কথায় বিশ্বাস করে ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—বড় ভাবনায় পড়তে হয় আমায় রে বেটা, মনে হয় কোন ডাকাত গুণ্ডার হাতে পড়লি বুঝি! না বলে কয়ে এমনটি আর করিসনি।

সারা দিনরাত্রি আমি যেন অদৃষ্টপূর্ব এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করলাম। পরদিন ভোরে বিছানায় শুয়েই আমি খইরার মুখখানার কথা ভাবছি, এমন সময় এক খোজা এসে আমার হাতে ভাঁজ-করা এক চিরকুট দিয়ে গেল। আমি তখনই কম্পিতবক্ষে চিরকুটের ভাঁজ খুলে পড়ে দেখি তাতে লেখা—

সামদেশের তরুণ মৃগের যদি বনবিহারের ইচ্ছা থাকে তবে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বনে যেন তার শুভাগমন হয়, এলেই সে দেখতে

পাবে তার দর্শনের আনন্দে অর্ধচেতনাহারা অপেক্ষামানা প্রেমকাতরা এক মৃগীকে। সামের মৃগ অন্য মৃগীদের চেয়ে তাকে সুন্দর দেখেছে বলে—সে নিজেকে ধন্য মনে করছে।

চিরকুট ত নয় যেন রঙিন পেয়ালায় রক্তরাঙা সিরাজি। পান করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার নেশা ধরে গেল। দুনিয়ার তামাম দিকেই যেন রংবাহার।

সুযোগ মতো উজিরের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে অনেক চুমু দিয়ে অনেক মিষ্টি কথা বলে খুশী করে বললাম—চাচা, আজ খোদার দোয়ায় দেশের এক দরবেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। তিনি হালে মক্কা থেকে এসেছেন, সেখানকার গল্প শোনবার নিমন্ত্রণ করেছেন আমায় আজ রাত্রে, আপনি যদি অনুমতি দেন।

উজির সাহেব কিছুমাত্র সন্দেহ না করে বলামাত্রই অনুমতি দিলেন। সন্ধ্যাকালে আমি হামামে গোসল করে কস্তুরী বাসে দেহ সুরভিত করে ভাল জামাকাপড় যা ছিল বের করে পরে—তা-ও ঐ একই আতরে সুবাসিত করলাম। এর পর আমার বাড়ি থেকে যেসব রত্ন আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—তা থেকে বেছে বেছে—পছন্দসই চুনী, পান্না, পোকরাজ, হীরে, নীলা, ইত্যাদি বার করে স্বর্ণসূত্রে একটি মালা গাঁথলাম। তারপর আকাশে চাঁদ উঠলে আমি আমার কামরা থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে বাগানের পিছনের দরজার কাছে গিয়ে দেখি দরজা আমার জন্যে অনেক আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। আমি নিঃশব্দে বাগানে ঢুকে যে সাইপ্রাস গাছের নিচে এর আগের দিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—ধীরে ধীরে সেখানে এগিয়ে গেলাম। কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি অধীর প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে লাগলাম। একটু পরেই পাশের গাছপালা নড়ে উঠল, আর তারই মাঝ থেকে বেরিয়ে এল একটি সাদা ছায়া, আমার খইরা। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর পায়ের সামনের মাটি চুম্বন করে আমি মাটিতেই পড়ে রইলাম। আনন্দের আবেগে কোন বাক্‌নিঃসরণ হচ্ছিল না আমার মুখ দিয়ে। আমাকে এই রকম দেখে একটু পরেই

আমায় হাত ধরে তুলে সে বললে—ছিঃ, হাসান—অমনি মাটিতে পড়ে থাকে না, ওঠো, আমার নয়নের আলো, ওঠো—উঠে আমার সঙ্গে দুটো কথা কও। কি বলব, জাহাঁপনা, সেদিন সে যে বীণা বাজিয়েছিল তার সঙ্গীতের চেয়েও মধুর তার কণ্ঠস্বর। আবেগে মুহ্যমান হয়ে গভীর প্রেমে গভীর শ্রদ্ধায় তার হাতে মাথা রাখলাম। তাতেই কেঁপে উঠল তার দেহ। সে সস্নেহে আমার হাত ধরে শ্বেত পাথরের বেদীটার উপর বসিয়ে বললে—এবার কথা বলো, সেদিন অতগুলি মেয়ের মাঝে আমাকে সবার সেরা সুন্দরী বলায় আমি সম্মানিত হয়েছি—বলো আবার শুনতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখ থেকে সে কথা, নইলে যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে না আমার যে এত সুন্দর তরুণের প্রেমপাত্রী হতে যাচ্ছি আমি! শুনে রোমাঞ্চিত দেহে আমি আমার আচকানের জেব থেকে সেই মালাটা বের করে খইরার হাতের সামনে ধরে বললাম—রাণী আমার, জীবনের মহারাণী, আমার দেশের এই সামান্য জিনিসের সঙ্গে অসামান্য তোমাকে আমার সারাজীবনের প্রেম নিবেদন করছি, গ্রহণ করে আমায় ধন্য করো।

খইরা সানন্দে সেটা গ্রহণ করে প্রথমে তাতে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে তারপর সেটা গলায় পরে বললে—তোমার সত্যিকার প্রেমের পরিচয় পেয়ে এত বিপদ ঝক্কি মাথায় করে গোপনে তোমায় দেখতে আসা আমার সার্থক হল মনে হচ্ছে। কিন্তু মনে আমার স্বস্তি নেই।

কেন, খইরা, কিসের অশান্তি তোমার, কিসের অস্বস্তি?

তোমার রূপমুগ্ধ হয়ে তোমার চিত্ত জয় করে তোমাকে ভালবেসে আমি ভাল করেছি না মন্দ করেছি ঠিক বুঝে উঠছি না। মনে হচ্ছে কি জানি নিজের জীবনের চরম দুঃখ, নিজের সর্বনাশই আমি ডেকে আনছি! বলবার সময়ে নিজের মাথাটা সে আমার কাঁধের উপর রাখল, আবেগে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, নিঃশ্বাস লাগতে লাগল আমার গায়ে। আমি সান্ত্বনা দিতে তার মাথার চুলে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, ছিঃ খইরা, অযথা ছাইপাঁশ ভেবে এমন সুন্দর রাত্রিটা নষ্ট করতে নেই।

অযথা নয়, সোনা, তুমি জানো না, আমি জানি শাহাজাদী জুলেখা তোমায় ভালবেসেছেন, অতগুলি মেয়ের মাঝে নিজের ঠাট বজায় রাখবার জন্যে শুধু উদারতার অভিনয় করেছেন। সুতরাং খোদা আমার নসিবে কি লিখেছেন খোদাই জানেন!

আমি বললাম—তুমি মনে কিছু ডর রেখ না, খইরা, কিছ্ছু ভয় নেই। হাজার শাহাজাদীও তোমার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না—দেখো।

কিন্তু এত সম্মান, মর্যাদা, এত ঐশ্বর্য, তা ছাড়া শাহাজাদী জুলেখাও ত সুন্দরী, এত লোভ কি পুরুষে—

আমি তখনই তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম—কি বলছ তুমি খইরা, আল্লার কসম নিয়ে আমি বলছি—সুলতান সাবুর যদি তাঁর কন্যাদানের সঙ্গে তাঁর তামাম রাজ্য আমাকে দান করে যাবার প্রস্তাব দেন তা হলেও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমি তোমারই বান্দা হয়ে থাকব।

খইরা তাতেও স্বস্তি না পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলে উঠল—তুমি অন্ধ, হাসান, তুমি পাগল! শাহাজাদীর প্রেমকে প্রত্যাখান করার পরের দিনই জল্লাদের খড়্গে তোমায় আমায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে, ভুলে যাচ্ছ কেন, জুলেখা শাহাজাদী আর আমি তাঁর সামান্য বাঁদী।

আমি বললাম—যদি সেই ভয়ই আমাদের থাকে তবে তোমাকে নিয়ে আমি আমার দেশ দামাস্কসে চলে যাব, সেখানে কোন মরু-প্রান্তে জনবিরল স্থানে গিয়ে আমরা বাস করব, পারশ্যের কোন শক্তি আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না।

এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে খইরা একটা স্বস্তির, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার বুকে মাথা রেখে বললে—হাসান, রাগ করো না, লক্ষ্মীটি, আমি ছলনা করেছি তোমায়: তোমার সত্যিকার প্রেমের পরিচয় পাবার জন্যেই আমায় এ ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে; আমি খইরা নই, আমিই শাহাজাদী জুলেখা। আমিই যে জুলেখা

তা তোমায় এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি—বলেই ছোট্ট একটা সিটি দিলে সে, সঙ্গে সঙ্গে সাইপ্রেসের কুঞ্জ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটি মেয়ে, তাকিয়ে দেখি—সাবেক জুলেখা, সে এসে সত্যিকার জুলেখার কর-চুম্বন করে শির নত করে আমাদের সামনে দাঁড়াল। জুলেখা এবার আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে—আমি বাঁদী নই জেনেও তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে ত?

উত্তর আমার মুখের কাছেই ছিল, বললাম—আমার প্রেমের জন্যে তোমায় এত নীচু হতে হয়েছে এতে আমি হাজার রাজার চেয়ে উঁচু হয়ে গেছি।

জুলেখা বললে—জোছনা রাত্রে সাইপ্রেস গাছের নীচে তোমায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু প্রেমনিষ্ঠার পরীক্ষা না নিয়ে আমি আত্মপরিচয় দিতে পারছিলাম না, তাই এই ছলনার অবতারণা, এখন আল্লা আমায় নিশ্চিন্ত করলেন।

এর পর, জাহাঁপনা, সে রাত্রি যে আমাদের কি সুখেই কাটল তা একমাত্র সর্বজান্তা খোদাই জানেন, জাহাঁপনাও মনে মনে কল্পনা করে দেখতে পারেন। মধুর জোছনারাত্রি যে কি করে নিঃশেষ হয়ে গেল তা আমরা টেরও পাইনি, টের পেলাম তখন যখন একটা বাঁদী এসে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, বিদায়ের সময় এসে গেছে। এরপর চোখের জলে ভিজে দু'জন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

নিজের আস্তানায় এসে সারাদিন প্রত্যাশা করে রইলাম কখন তার আমন্ত্রণ লিপি আসে কিন্তু এল না কোন চিঠি। সে যে কি কষ্ট! রাত্রে কোন খানা রুচল না মুখে, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে সারারাত ছটফট করে কাটালাম। ভোর হল, দিনের আলো অসহ্য বোধ হতে লাগল। সেদিনও সারাদিন কোন চিরকুট না আসায় আমি অধীর হয়ে সন্ধ্যার দিকে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই একবার সুলতানের বাগানে গেলাম, গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে গেল, বাগানের ঝোপে ঝোপে দেখি সশস্ত্র প্রহরী। আজ আর কোন আশা নেই, ভবিষ্যতেও বুঝি নেই!

ভারাক্রান্ত মনে অশ্রু সজল চোখে ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। এসেই দেখি—জুলেখার খোদ খোজা: আমি ঘরে এলেই খোজা জুলেখার লেখা চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে পালিয়ে গেল।

কম্পিত বক্ষে চিরকুটটা খুলে পড়ে দেখি তাতে লেখা—

মৃগী মৃগকে বিদায় দেবার পরেই দেখে সে শিকারী পরিবৃত। এখন শিকারীরা ওত পেতে বসে আছে বনে, মৃগী আর নড়তে পারছে না তার জায়গা ছেড়ে। মৃগ সাবধান, সে যেন শিকারীদের ফাঁদে ধরা না পড়ে। হালে কোন খবর কানে গেলেই নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ো না তুমি, এমন কি আমার মৃত্যুর খবরেও না।

জুলেখা এ সব কথা লেখা সত্ত্বেও দুঃখ নৈরাশ্যের গুরুভার আর আমি বহন করতে পারছিলাম না। পরদিন ভোরে পেঁচার ডানা ঝাপটানোর মতো যখন শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, গত রাত্রে শাহজাদী হঠাৎ মারা গেছেন—তখন নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে উজিরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

সাতদিন সাত রাত্রি যে আমার কি করে কেটেছিল, জাহাঁপনা, তা আমার কিছুই জানা নেই, সিরাজের সেই মহাপ্রাণ উজিরের সেবাযত্ন না পেলে আমি হয়ত বাঁচতামই না, পাগল হয়ে যেতাম, খোদা তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। সাতদিন পরে যখন আমি আবার সংবিৎ ফিরে পেলাম তখন দেখি দুনিয়া আমার কাছে একে-বারে বিস্বাদ হয়ে গেছে সুলতানের প্রাসাদের ছায়া অসহ্য। সেই দিন রাত্রেই আমার যে সব ধনরত্ন ছিল তার একটা পোঁটলা বেঁধে সুযোগ মতো সিরাজ থেকে বেরিয়ে মরুভূমির দিকে হাঁটা দিলাম। সারা রাত্রি এবং পরদিন বিকেল পর্যন্ত পথ চলে সন্ধ্যার কাছাকাছি আমি একটা ঝরনার কাছে এসে হাজির হলাম, আশেপাশে তার দু'একটা গাছ। ঐখানে বিশ্রাম করে পরদিন ভোরে আবার রওনা হওয়া যাবে ভেবে ঐখানেই বসে পড়লাম আমি, আশেপাশে কোন জনমুনিষ্যি নেই। একটু পরেই দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এল, তাকিয়ে দেখি—হ্যাঁ, তাই, একজন অশ্বারোহী আসছে আমার

এই পথে। দেখতে না দেখতে অশ্বারোহী আমার কাছে এসে গেল, তাকিয়ে দেখি এক অপরূপ সুন্দর তরুণ, পোশাক দেখেই বুঝলাম —এ কোন দেশের রাজপুত্র। তরুণ আমার দিকে চেয়ে শুধু হাত উঁচিয়ে সেলাম করলে, কোন কথা বলে নয়; দেখে বড় দুঃখ হল মনে —এমন সুন্দর যুবক মুসলমান নয়, বিধর্মী কাফের! যাই হোক— মনের গোপন দুঃখ চেপে আমিও তাকে সেলাম করে বললাম— জনাব, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত, আপনার ঘোড়া-টাও হাঁপাচ্ছে। এই ঝরনার ধারে ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটু বিশ্রাম করে নিন আপনি, শান্তি পাবেন, ঘোড়াটাকেও ঝরনা থেকে জল খাইয়ে নিন।

শুনে তরুণ মৃদু হেসে তার ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে ওটাকে এক গাছের ডালে বেঁধে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বিস্ময়ানন্দে আমার মুখ থেকে কি এক রকম আওয়াজ বেরুল শুধু, বলতে চাইলাম—জুলেখা, তুমি এলে, বেঁচে আছ তুমি!

মিলনানন্দের বিহ্বলতা কাটলে জুলেখা খুলে বললে—মৃত্যুর ভান করে—সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে তার সহচরীদের সাহায্যে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছে সে, কি করে আত্মগোপন করে সে আমার অবস্থা লক্ষ্য করেছে, তারপর আমার পলায়নের খবর জেনে পুরুষের ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে মিলিত হতে ছুটেছে। রাজৈশ্বর্য সুখ তার কাছে এখন অতীব তুচ্ছ, আমার সুখশান্তি বিধানেই সে তার জীবন উৎসর্গ করতে চায়

জাহাঁপনা, জুলেখাকে ফিরে পেয়ে তার মুখে এই সব কথা শুনে যে আমার কি অসহ্য আনন্দ হচ্ছিল, তা বলতে গেলেও আমার রসনা অসাড় হয়ে যায়। এর পরের ঘটনা শুধু এইটুকু বলতে পারব যে, শাহাজাদীর আনা খানা খেয়ে ঝরনার জল পান করে ঐ মরুদ্যানেই আমরা সেদিন রাত কাটালাম। পরের দিন জুলেখার ঘোড়ায় চড়েই আমরা দু'জনে দামস্কসের দিকে রওনা হলাম।

আমার জীবনের গোপন কথা এইখানেই শেষ, এরপর আমার জীবনের যা সুখ সৌভাগ্য ঘটেছে—সে ত জাহাঁপনারই মেহের-বানিতে, সে ত আপনার জানাই।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী ও শাহরিয়ার দুইজনই খুশী দেখে শাহরা-জাদী উৎসাহিত হয়ে সুলতানের দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এর পর আপনাদের যে গল্পটা শোনাতে যাচ্ছি তার কাছে এটা লাগে না।

শাহরিয়ার বললেন—আজ আর বোধ হয় সেটা শেষ হবে না, ভোর হয়ে এল, কাল শুনব—

জুডার ও তার দুই ভাই

পরদিন শেষ রাত্রে সুলতানকে তসলিম করে শাহরাজাদী তার সেই তাজ্জব গল্পটি শুরু করলে—

এক বণিক, নাম ওমর। তাঁর তিন ছেলে : সালিম, সলিম আর জুডার। ছোট ছেলে জুডারকেই বণিক বেশি ভালবাসেন, কারণ তার স্বভাবটি বড় ভাল। বড় দু'ভাই এ দেখে হিংসেয় জ্বলে যায়। বণিক বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন, তাই ভাবলেন—আমি মরে গেলে ত এরা আমার সম্পত্তি নিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি করে মরবে, তার চেয়ে আগে থেকেই একটা বিলি ব্যবস্থা করে যাওয়া ভাল। বণিক তখন কাজীকে ডেকে আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শীদের সাক্ষী মেনে নিজের ধনসম্পত্তি চার ভাগ করে তিন ভাগ দিলেন তিন ছেলেকে, এক ভাগ রাখলেন নিজে, বললেন—আমি মারা গেলে এ থেকে আমার স্ত্রীর ভরণপোষণ হতে পারবে।

কিছুদিন পরেই বুড়ো মারা গেলেন। সালিম আর সলিম জুডারকে ধরলে : বাবা সব কিছু তোকেই দিয়ে গেছেন, আমাদের ভাগ দে।

জুডার তা দেবে কেন, বাধলো মামলা। কাজী আর বিচারক-দের ঘুষ দিতে দিতে তিন ভাই-ই সর্বস্বান্ত হল। সালিম আর সলিম তখন মায়ের ভাগটা নিয়ে পড়ল : তোমার ভাগটা আমাদের দিয়ে দাও।

ও দিলে আমি খাবো কি ?

তা আমরা জানি না, ওটা তোমায় দিতেই হবে—বলে জোর করে মাকে মেরে ধরে মা'র যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিল। মা কেঁদে কেটে পড়ল ছোট ছেলের কাছে : তুই এর একটা বিহিত কর, কাজীর কাছে যাব আমি নালিশ করতে, তুই আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

জুডার বললে—ওটি করতে যেও না মা, ওরা শুষে নেবে, ঘরের ধন পরকে দিয়ে কোন লাভ নেই। তোমার ভাবনা কি, তুমি আমার কাছে থাকো, যা জুটাতে পারি তাই খাবো দু'জনে ভাগ করে।

সেই থেকে মা জুডারের কাছেই থেকে গেল।

মামলা করে সব খোয়ালেও জুডার বসে থাকবার পাত্র নয়, একটা জাল কাঁধে করে সে রোজ বালুক আর পুরনো কায়রোর কাছে যে নদী আছে তাতে মাছ ধরতে যায়, যা পায় তাই বিক্রি করে সেই পয়সায় মা'র আর নিজের জন্যে আটা ময়দা সবজি কিনে আনে, দিন এক রকম স্বচ্ছন্দেই কেটে যায়।

এদিকে সালিম আর সলিমের কোন কিছু করবার মন নেই, করে তারা ভিক্ষে, কোনদিন পেট ভরে, অনেক দিনই ভরে না। একদিন ভিক্ষে করে কোন কিছুই জোটেনি, তাই এল তারা তাদের মায়ের কাছে, এসে বললে—ছুটি খেতে দেবে মা, বড্ড খিদে পেয়েছে।

যত দুর্ব্যবহারই ওরা করুক, হাজার হোক মায়ের মন ত! বললে—বস তোরা, দেখি ঘরে যা আছে—তাই খাবি।

কিছু অবশ্য ফালতু ছিল, তা ছাড়া জুডারের খাবার রেখে দিয়ে নিজের খাবারটা ওদের এনে দিল।

এরপর ওরা একেবারে পেয়ে বসল, ভিক্ষে করা ছেড়ে দিয়ে রোজ ওরা মা'র কাছে খেতে আসতে লাগল। মা আর কি করে বাড়িতে যা থাকে তা-ই ওদের দেয়, অনেক সময় নিজের ভাগ থেকেই দেয়, শুধু বলে—একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিস, বাবা, জুডার যদি এসে পড়ে, দেখলে চটে যাবে।

কিন্তু একদিন—মা যা ভয় করত, তাই ঘটে গল! ওরা খেতে বসেছে এমন সময় জুডার এসে হাজির। দেখে ওরা হকচকিয়ে গেল।

জুডার কিন্তু একটকুও রাগ করলে না, বরং বললে—ভাইজান,

এতদিন পরে মনে পড়ল ? আমি ভেবেছিলাম, ছোট ভাই আর মাকে তোমরা ভুলেই গেলে !

না, না, ভুলবো কেন, ভুলবো কেন, মানে—একটা লজ্জাকর ব্যাপার ঘটে গেল কি না, তাই—মানে বুঝছ না !

ও কিছু না, মাঝে মাঝে মানুষের মাথায় শয়তান এসে ভর করে কিনা, মানুষের দোষ নেই ।...তা তিন ভাই আর আলাদা থেকে লাভ কি, এইখানেই থাকো, যা জোটে তা-ই সবাই ভাগ করে খাওয়া যাবে।

এরপর সালিম আর সলিম ঐ বাড়িতেই রয়ে গেল। জুডার রোজ মাছ ধরতে যায়, যা পায় বিক্রি করে সবজি রুটি কিনে আনে আর ওরা দু'জন সকালেই আড্ডা দিতে বেরিয়ে ফেরে সে ঐ দুপুরে খাবার সময়।

এমনি করে এক মাস কেটে গেল। এর পর জুডার মাছ ধরতে গিয়ে একদিন কিছুই পেল না। ধুত্তোর—বলে জাল ফেললে সে আর এক জায়গায়, সেখানেও কিছু মিললো না। জায়গা পালটে পালটে বহু জায়গায় জাল ফেললে সে—না একটা চুনো পুঁটিও না !

মন খারাপ করে বাড়ি ফিরছিল সে, ভাবতে ভাবতে আসছিল মা আর ভাই দুটিকে আজ কি খেতে দেবে সে, নিজে কি খাবে ! পথে একটা রুটির দোকান পড়ল। রুটিওয়ালা তার চেনা, তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছে, সে বললে—কি জুডার, কিছুই পড়েনি বুঝি আজ ? তা এত ভাবনা কিসের, রুটি বাকী দিচ্ছি তোমায়, দাম দিয়ে যেও, এ ছাড়া দশ নুস্ফা (তাম্রমুদ্রা) ধার দিচ্ছি।

জুডার জালটা বাঁধা রাখতে চাইল, দোকানী বললে—উঁহু, দরকার নেই, জাল রাখলে মাছ ধরবে তুমি কি দিয়ে গো ?

জুডার দশ নুস্ফা দিয়ে আর সব কিনে নিয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই আবার সে জাল কাঁধে বেরুল, ফেললো গিয়ে বালুকের কাছে নদীতে। কিছুই উঠল না, আর এক ক্ষেপ, তাতেও না। জায়গা পালটে পালটে ক্ষেপ ফেলতে লাগল সেই

একেবারে বিকেল পর্যন্ত, বরাতে একটি মাছও ধরা পড়ল না।

বাড়ি ফিরবার সময় রুটির দোকানের পাশ দিয়ে যেতেই রুটি ওয়ালা তারমুখ দেখেই ধরে ফেললে : বুঝেছি আজও ঢন্ ঢন্। লজ্জা কি তোমার রুটি বাকী দিচ্ছি,আর দশ নুস্ফা ধার, কাল দিয়ে যেও—তোমায় ত চিনি।

বাধ্য হয়ে নিতে হল জুডারের, নইলে চারটে প্রাণী খাবে কি।

এমনি করে শুধু দু'দিন নয়, সাত সাত দিন কোন মাছ পড়ল না তার জালে। আট দিনের দিন জায়গা পালটে সে গেল কারুন হ্রদের ধারে। সেখানে জাল ফেলতে যাচ্ছে এমন সময় তার সামনে একটা সুন্দর মাদী ঘোড়ায় চড়ে হাজির হল এক ম্যাগরিবি (মরক্কোর অধিবাসী) গায়ে তার জমকালো পোশাক, ঘোড়ার জিনে ঝুলানো জরির কাজ-করা দুটি থলি। ম্যাগরিবি জুডারকে দেখেই সেলাম করে বললে—তুমি ওমর সাহেবের ছেলে—না?

জুডার সেলাম করে বললে— জি।

তা—তুমি আমার একটা কাজ করে দাও, তাহলে তোমায় অনেক কিছু পাইয়ে দেব।

কি কাজ বলুন।

ম্যাগরিবি তখন একটা রেশমের দড়ি বের করে তার হাতে দিয়ে বললে—এটা দিয়ে আমার দুটো হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে পিঠমোড়া দিয়ে বেশ আচ্ছা করে কষে বাঁধবে, তারপর আমায় এই হ্রদের জলে দেবে ঠেলে, দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যদি দেখ আমার মাথার দিকটা উপরে উঠছে, তাহলে জাল ফেলে আমায় ডাঙায় তুলবে, আমি উপরে উঠে তোমায় অনেক বকশিশ দেব। আর যদি দেখ পা দুটো উপরের দিকে উঠেছে, তাহলে জানবে আমি মরে গেছি। তখন তুমি এই ঘোড়াটা নিয়ে বাজারে গিয়ে খোঁজ করে যাবে স্যাময় নামে এক ইহুদী বণিকের কাছে, এই ঘোড়া দিলেই সে তোমায় একশো দিনার (মোহর) দেবে।

ম্যাগরিবির কথামতো জুডার তখন তাকে তেমনি করে বেঁধে

জলে ঠেলে দিলে। একটু পরেই দেখে ম্যাগরিবির পা দুটো উপরে দেখা যাচ্ছে। জুডার বুঝলে লোকটা মারা গেছে। তখন সে ঘোড়া নিয়ে গেল বাজারে, খুঁজে বের করল স্যাময়ের দোকান। স্যাময় ঘোড়া সমেত জুডারকে দেখেই বলে উঠল—কি, হয়ে গেছে ত? হবে না? লোভের ত এই-ই পরিণাম!

এর পর স্যাময় ঘোড়া নিয়ে জুডারকে একশো মোহর গুনে দিলে, সে তা নিয়ে বাড়ি চললো। পথে রুটির দোকানের দেনা শোধ দিয়ে অনেক কিছু খাবার কিনে বাড়ি ফিরল, তারপর নিরানব্বইটা মোহর সে মায়ের হাতে তুলে দিল।

পরের দিন আবার গেল সে কারুন হ্রদে জাল নিয়ে। জাল এই ফেলে ফেলে—এমন সময় আরও জমকালো পোশাক পরে আরও সাজানো ভালো ঘোড়ায় চড়ে হাজির হল এক ম্যাগরিবি। আগের দিনের ম্যাগরিবি তাকে যে সব অনুরোধ করেছিল, এ-ও ঠিক তাই করল। জুডার তার পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ঠেলে দিল কারুনের জলে। আগের দিনের ম্যাগরিবির মতো পা দুটোই জলের উপর দেখা গেল। এ-ও মরে গেছে জেনে ঘোড়া নিয়ে গেল জুডার ইহুদী স্যাময়ের কাছে। ঘোড়া দেখেই ইহুদী বলে উঠল—এটাও মরেছে ত! জানতাম এত লোভ করতে গেলে এ হবেই!

ব্যাপার কিছু বুঝছে না জুডার, তবু স্যাময় তাকে একশো দিনার দিল, তাই নিয়ে সে বাড়ি রওনা হল। পথে বাজার থেকে সে রুটি মাংস কিনলে ও বাকী নিরানব্বই এনে মা'র হাতে দিল।

মা পরপর দু'দিন এত মোহর হাতে পেয়ে বললে—বাবা, রোজ রোজ তুই এত মোহর কোথায় পাচ্ছিস—বলত?

জুডার তখন সব ঘটনা তাকে খুলে বললে। শুনে মা বললে—ও সব ম্যাগরিবি ফ্যাগরিবির ব্যাপারে তুই যাসনি—বাবা!

কেন? আমি ত তাদের আর ইচ্ছে করে মারছি না, তারা যদি অমন ইচ্ছে করে মরে ত তাদের আমি কি করে ঠেকাব?

পরের দিন ভোরে মায়ের মানা না শুনেই জুডার গেল আবার

কারুন হ্রদের ধারে, গিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইল। একটু পরেই দেখে—আসছে আর একটা ম্যাগরিবি—আরও জমকালো পোশাক পরে, আরও ভালো করে সাজানো ঘোড়ায় চড়ে, এ আবার ঘোড়ার জিনের দু'পাশে দুটি থলের সঙ্গে দুটো কাচের বয়াম ঝুলিয়ে এনেছে। ম্যাগরিবি জুডারের কাছাকাছি এসে বললে—ওমর সাহেবের ছেলে জুডার না তুমি ?

জি।

কাল পরশু আমার মতো কোন ম্যাগরিবি আসতে দেখেছো তুমি এ পথে ?

তা দেখেছি বই কি ?

কি হল—তাদের ?

বিশেষ কিছু না—তাঁরা দুইজনেই এই হ্রদের জলে ডুবে মরেছেন —ইচ্ছা করেই, আমাকেই তাঁরা দুই হাত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে জলে ঠেলে দিতে বলেছেন। আপনিও তাই করতে বলবেন নিশ্চয়, এ কাজে—মানে জলে ডুবিয়ে মারতে আমি পাকা হয়ে গেছি।

শুনে এ ম্যাগরিবি একটু হাসলে : কার কিসে কখন মরণ হবে —বিধাতা জন্মের সময়ই তা তার কপালে লিখে দিয়ে থাকেন। তোমার আমার এতে কোন হাত নেই। যাই হোক—তুমি তাদের যা যা করেছ—আমারও তাই তাই করো। একই শর্ত।

—এই বলে ম্যাগরিবি তার থলির ভিতর থেকে রেশমী দড়ি বের করে জুডারের হাতে দিয়ে নিজের দুই হাত পিছনে রেখে বললে—এবার তোমার কাজ শুরু করো।

জুডার আগের দু'জনার মতোই তার হাত বেঁধে ঠেলে ফেলে দিলে কারুন হ্রদের জলে—দিয়ে চেয়ে রইল কখন পা-দুটো তার জলের উপরে দেখা যায়। একটু পরেই সে আশ্চর্য হয়ে দেখল—এবার আর পা নয়, দেখা দিয়েছে এবার সেই বাঁধা দুটো হাত, তাতে ধরে রেখেছে সে পলার মতো রাঙা দুটো মাছ। দেখতে না দেখতে মাথাটাও দেখা দিল জলের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগরিবি বলে

উঠল—জুডার, শীগগির তোমার জাল ফেলে আমায় ডাঙায় তোল, আমি সাঁতার দিতে পারছি নে।

জুডার তখনই জাল ফেলে ম্যাগরিবিকে ডাঙায় তুলতে সে বললে—আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও, আর জিনের তু'পাশে যে তুটো কাচের বয়াম ঝুলানো আছে, ও তুটো নিয়ে এস—জলদি।

জুডার বাঁধন খুলে কাচের পাত্র তুটি নিয়ে এলে—ম্যাগরিবি মাছ তুটি তুই পাত্রে রেখে আচ্ছা করে দিলে তার মুখ বন্ধ করে। তারপর উঠেই সে জুডারকে বুকে জড়িয়ে ধরলে, শুধু তাই নয়, তার এখানে চুমো ওখানে চুমো: তুমি আমার কি উপকার যে করলে জুডার, তা আর বলবার কথা নয়, তুমি জাল ফেলে আমায় না তুললে মারা যেতাম। আমি যে কি করে তোমায় খুশী করব, কি করে তোমার ঋণ শোধ দেব ভেবে পাচ্ছি না!

জুডার বললে—জনাব, আপনি যদি আমার উপর খুশী হয়ে থাকেন, তাহলে আগে আমায় বলুন—এ সকল ব্যাপার কি?

কি ব্যাপার?

কাল পরশু যাঁরা হ্রদের জলে ডুবে মারা গেলেন তাঁদের ব্যাপার, ইহুদী বণিকের ব্যাপার, আপনার এই তুই মাছ ধরার ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি নে আমি—বড় জানতে ইচ্ছে করছে!

ম্যাগরিবি তখন বললে—শোন জুডার, তুমি যা জানতে চাইছ তা খুলেই বলছি তোমাকে: কাল পরশু যাঁরা জলে ডুবে মারা গেছেন তাঁরা আমার তুই ভাই, তাঁদের নাম আবদল সালাম আর আবদল আহদ্, আমার নিজের নাম আবদল সামাদ। আর যে ইহুদীর কথা জানতে চাইছ তুমি তিনিও আমার ভাই, তাঁর নাম আবদল রহিম। আসলে তিনি ইহুদী নন—মালিকি সম্প্রদায়ের মুসলমান—ইহুদীর ছদ্ম নামে এখানে আছেন।

আমাদের বাবা আবদল ওয়াতুদ একজন ওস্তাদ জাতুকর ছিলেন। তাঁরই কাছে আমরা জাতুবিদ্যা শিখি। সেই শিক্ষার বলে জগতের কোথায় কি ধনরত্ন আছে সব আমরা চোখের সামনে দেখতে

পাই, অপরের কাছে যা গভীর রহস্য আমাদের কাছে তা জলের মতো সহজ। তা ছাড়া তাঁর শেখানো বিদ্যাবলেই দুনিয়ার ইফরিদ্ প্রভৃতি জিনেরা আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে।

বাবা মারা গেলে আমরা তাঁর সব কিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম, সে সব কিছুর মধ্যে তাঁর ধনরত্ন ভূসম্পত্তি ছাড়াও ছিল অনেক কবচ মাদুলি, জাদুবিদ্যার সাজসরঞ্জাম! ভাগ ত হল, কিন্তু একখানা কেতাব নিয়ে বাধালো বিবাদ। কেতাব খানার নাম পুরা-তন্ত্র। বাবার নিজের হাতে লেখা। দুনিয়ার কোন কিছুর সঙ্গে এর তুলনা হয় না, এর ওজনের হীরে দিলেও এর শতাংশের একের দাম দেওয়া হয় না। দুনিয়ার কোথায় কি গুপ্তধন কত আছে আর কি করলে সে সব পাওয়া যায়, বাবা সব লিখে রেখেছেন এতে। বাবার মুখে শুনে এর কিছু কিছু আমাদের জানা, সব ত নয়ই— অনেক কিছুই নয়। সুতরাং এটা নিজস্ব হিসাবে পাবার জন্যে ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদ ত বাধবেই।

আমাদের বিরোধ যখন চরমে উঠল তখন তা মেটাবার জন্যে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ—মহাজ্ঞানী গুণী লোক, এঁর কাছেই বাবা জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ, তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক সব কিছু শিখেছিলেন— কোহেন্ অল আবতান এসে বললেন—শোনো ভাই সব, তোমাদের বাবা আমার শিষ্য ছিলেন, সুতরাং পুত্র তুল্য, তোমরা তাঁরই ছেলে, তাই সম্পর্কে আমার ছেলের ছেলে—নাতি। তাই এ বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া আমারই কর্তব্য। নিয়ে এসো ত কেতাবখানা।

কেতাবখানা আমরা এনে তাঁর হাতে দিলে তিনি বললেন— শোনো দাদুভাইয়েরা, এ কেতাবখানা যে পেতে চাও, তার কি করতে হবে শোনো: আনতে হবে তাকে আলশামরদলের সম্পদ। সে সম্পদ কি কি তাও বলে দিচ্ছি। সে সম্পদ হচ্ছে মাত্র চারটে জিনিস: এক—দিব্য গোলক, দুই—একটা কাজলের বোতল, তিন—একটা নাম লেখা আংটি, চার—একখানা তলোয়ার।

ঐ যে আংটির কথা বললাম—ওর তাঁবেদার এক মারিদজিন,

নাম হচ্ছে তার আলরাদ অল কাসিফ। ওটা যার হাতে থাকবে—দুনিয়ার কোন নবাব বাদশা তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না, শুধু তাই নয়, ওর সাহায্যে সে সারা দুনিয়ার মালিক হতে পারে।

আর ঐ যে তলোয়ার—ওটা খাপ থেকে বের করে ঘুরিয়ে যেই বলা—ঐ সৈন্যদল নাশ করো, অমনি তা থেকে বজ্র-অগ্নি বেরিয়ে গোটা শত্রুদল পুড়িয়ে মারবে।

দিব্য গোলকের গুণ হচ্ছে—এর মালিক যে দেশটা দেখতে চায়, ওর মুখটা সেই দিকে রাখলেই সেখানকার লোকজন সব কিছু সমেত সেই সারা দেশটা তার চোখের সামনে এসে যাবে। কোন দেশকে শত্রু ভেবে সে যদি বিনষ্ট করতে চায় তবে গোলকের মুখটা সূর্যের দিকে ফিরিয়ে একবার বললেই হল—অমুক দেশটা ছাই হয়ে যাক, অমনি সে দেশটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আর ঐ কাজলের বোতলে যে কাজল আছে, ওর একটু চোখে পরলেই দুনিয়ার যেখানে যত গুপ্ত ধনভাণ্ডার আছে, সে সব দেখতে পাওয়া যাবে।

কোহেন্ অল আবতান ঐ চারটে জিনিসের গুণ বর্ণনা করে বললেন—এখন তোমাদের মধ্যে যে আলশামরদলের সম্পদ—এই সব জিনিস আনতে পারবে—এ কেতাবের মালিক হবে সেই, আমার এই শর্তে রাজী আছ তোমরা ?

আমরা সবাই এতে রাজী এ কথা জানালে তিনি আরও বলে চললেন—আলশামরদলের এ সম্পদ তোমাদের বাপও পেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি তিনি, কারণ এ সম্পদ যাদের কাছ থেকে নিতে হবে লোহিতরাজার সেই ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে মিশরের কারুন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল। তোমাদের বাবা সেখান পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করেও কিছু করে উঠতে পারেননি, কারণ ওখানকার জল এক বিশেষ রকমে জাদুকরা। তোমাদের বাবা এসে তাঁর ব্যর্থতার কথা জানালে আমি খড়ি পেতে গনতে বসলাম, গণনা করে দেখি কায়রোর—ওমর সাহেবের ছেলে জুডারের সাহায্য

ছাড়া এ সম্পদ পাবার আর কোন উপায় নেই, কারণ লোহিত রাজার ছেলেদের ধরতে সেই কেবল সাহায্য করতে পারে। তার দেখা পাওয়া যাবে কারুন হ্রদের ধারেই। যারা ঐ সম্পদ লাভ করতে চায়—তাদের যেতে হবে জুডারের কাছে। জুডার তাদের দুই হাত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে দেবে জলে ফেলে, ঐ অবস্থায় লড়াই করবে তারা লোহিত রাজার ছেলেদের সঙ্গে, না পারলে মারা যাবে তারা—তাদের পা দেখা যাবে জলের উপরে। যে জিততে পারবে, তার মাথা দেখা যাবে জলের উপরে—ঐ অবস্থায় দেখলে জুডার জাল ফেলে তাকে ডাঙায় তুলে আনবে।

কোহেন্ অল আবতানের এই কথা শুনে আমার ভাই আবদল সালাম আর আবদল আহদ্ বললে—মরি সে-ও ভাল, আমরা গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখব। আমি বললাম—আমিও যাব। ভাই আবদল রহিম, যাকে তুমি ইহুদীদের ছদ্মবেশে দেখেছ, সেই কেবল বললে—আমি যাচ্ছি না।

আমরা তখন ঠিক করলাম, সে ইহুদী বণিকের ছদ্মবেশে কায়-রোয় গিয়ে থাকবে, আমাদের কেউ মারা গেলে তার ঘোড়া আর জিনের থলে নিয়ে যে তার কাছে যাবে তাকে সে একশো দিনার দিয়ে সেগুলো নেবে। আমার ভাইদের মধ্যে প্রথম যে তোমার কাছে এসেছে সে ঐ লোহিতরাজার ছেলেদের হাতে মারা পড়েছে পরশুদিন, আর একজন কাল, আজ আমি তাদের বন্দী করেছি।

বন্দী করলেন, কই দেখলাম না ত আমি!

দেখলে না কি গো, তোমার চোখের সামনেই ত আমি কাচের বয়ামের ভেতর পুরলাম! ওরা মাছ নয় গো, ওরা ইফরিদ জিন, মাছের ছদ্মবেশে কারুনের জলে লুকিয়ে ছিল। সে যাক, একটা জরুরী কথা বলছি জুডার, শোন। কথাটা হচ্ছে—যে মহাসম্প-দের জন্য এত কাণ্ড, তোমার সাহায্য ছাড়া তা পাবার নয়। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে ফেজ আর মিকুইনেজ শহরে, তুমি যা চাও তাই তোমায় দেব, খুশী করে দেব তোমায়, আর আল্লায় কসম—

চিরকাল তুমি আমার ভাইয়ের মতো থাকবে। তোমায় এত কিছু পাইয়ে দেব যে সারা জীবন তোমার কিছু করতে হবে না। আমার কাজ হয়ে গেলেই তুমি খুশী মনে বাড়ি ফিরতে পারবে।

জুডার বললে—বাড়িতে আমার যে মা আর দুই ভাই আছে জনাব, তাদের খাওয়াতে পরাতে হয় আমার। আমি আপনার সঙ্গে গেলে তাদের কি দশা হবে?

যত সব বাজে কথা, তাদের খরচ পত্রের মতো কিছু অর্থ রেখে গেলেই ত লেঠা চুকে গেল। চার মাসের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে তুমি বাড়িতে, এই ক'মাসের খরচ বাবদ এক হাজার দিনার দিচ্ছি আমি তোমায়, এটা তোমার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এস তুমি।

এক হাজার দিনারের কথা শুনেই জুডারের মন গলে গেল, বললে—তবে দিন, দেখি মাকে বলে আসি।

ম্যাগরিবি আবদল সামাদ তাকে এক হাজার দিনার দিলে, তা নিয়ে ছুটল জুডার তার মায়ের কাছে। গিয়ে বললে—মা এগুলো ধরো, আমি চার মাসের জন্য মরোক্কো যাচ্ছি এক মুরের সঙ্গে। মুর লোকটি বড় ভালো, খুব বড়লোক, আমাকে খুশী করে দেবেন বলছেন।

এক হাজার দিনার হাতে পেয়ে মায়ের মন খুশী হয়েই উঠেছিল, তবু বললে—অত দূর যাবি, আমার ভয় করে যে বাবা! আর অত দিন তোকে না দেখে কি আমি থাকতে পারব?

অমন করো না মা, চার মাস সময় দেখতে না দেখতে কেটে যাবে, আর ভয়ই বা করবে কেন, তুমি আল্লার উপর একটু ভরসা রাখো, তাঁকে ডাকো, তিনিই আমায় রক্ষা করবেন।

মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এল জুডার সামাদের কাছে।

কি, মায়ের সঙ্গে কথা হল?

হ্যাঁ, তাঁর অনুমতি পেয়েছি। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি তাঁর।

তবে এস, ওঠো ঘোড়ার পিঠে—আমার পিছনে।

সামাদের কথামতো উঠলো জুডার তার পিছনে। ঘোড়া তাদের নিয়ে ছুটতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের নমাজের সময় এসে গেল। এদিকে ছেলেমানুষ জুডারের খিদে পেয়েছে খুব। আর চুপ করে থাকতে না পেরে সে সামাদকে বললে—জনাব, পথে আমাদের কোন কিছু খাবার আনতে ভুলে গেছেন বুঝি?

কেন, খিদে পেয়েছে তোমার? আচ্ছা, দাঁড়াও —বলে আবদল সামাদ ঘোড়া থেকে নামলেন, জুডারকে নামতে বলে জিনে-বাঁধা থলি দুটো মাটিতে নামালেন, তারপর জুডারকে প্রশ্ন করলেন—কি খেতে চাও তুমি বলো?

যা হয় কিছু একটু পেলেই হয়।

না, কি খেতে তোমার এখন ইচ্ছে করছে তাই বলো।

রুটি আর পনির।

আরে, রুটি পনির আবার একটা খাবার নাকি, ভাল কিছুর নাম বলো।

আমার যা খিদে পেয়েছে, সব কিছুই এখন আমার কাছে ভাল।

একটা ভাজা মুরগী যদি এখন পাও ত কেমন হয়?

ভালই।

তার সঙ্গে মধু মাখানো ভাত?

আরও ভাল।

এরপর আবদল সামাদ জুডারকে—এটা খেতে চাও নাকি, ওটা খেতে চাও নাকি করে অন্তত চব্বিশটি খাবারের নাম করলেন। শুনে বিরক্ত হয়ে জুডারের, বলতে ইচ্ছে হল—থাক যথেষ্ট হয়েছে, মুখে বললে—খিদেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে এখন আর লোভ বাড়াবেন না আপনি।

আবদল সামাদ মৃদু হেসে বললেন—রাগ হচ্ছে তোমার? আচ্ছা দাঁড়াও, এখনি রাগ থামিয়ে দিচ্ছি—বলেই জিন থেকে খোলা দুটো থলির একটার ভেতরে হাত দিয়ে একটা সোনার থালাবের করলেন তার উপর দুটো ভাজা মুরগী, তখনও গরম, তারপর আর একবার

হাত ঢুকিয়ে আর একটা সোনার থালা তাতে রয়েছে কাবাব, এমনি করে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে তিনি মুখে যা যা বলেছিলেন, সেই চব্বিশ রকমের খাবার বের করলেন। জুডার ত ব্যাপার দেখে একেবারে থ। আবদল সামাদ হেসে বললেন—কি গো, কথা বলছ না যে!

জুডার বললে—ব্যাপার বুঝছি না কিছু, থলের মধ্যে আপনার রান্নাঘর আর বাবুর্চি রয়েছে নাকি?

আবার হাসলেন আবদল সামাদ : এ জাহুথলি গো, এর ভেতর আমার এমন চাকর আছে যে হুকুম করলে এক ঘণ্টার মধ্যে হাজার রকমের খাবার বের করে দেবে আমায়।

জুডার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সামাদের মুখের দিকে।

তারপর মনের আনন্দে ছু'জনে পেট ভরে খেলেন, খাওয়া হয়ে গেলে যা বাঁচল তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামাদ থালাগুলো থলির ভেতর পুরে আবার থলিতে হাত ঢুকিয়ে একটা সিরাজির বোতল বের করলেন। ছু'জনে তা পান করবার পর উজু করে বিকেলের নমাজ সেরে নিলেন। এরপর আবদল সামাদ সিরাজির বোতল আর বয়াম ছুটো থলেয় পুরে জুডারকে নিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়লেন।

জুডার, জানো কায়রো ছেড়ে আমরা কত পথ এসেছি?

না, জনাব, কত পথ?

প্রায় এক মাসের।

জুডার চমকে উঠে বললে, কি করে?

যে মাদী ঘোড়ায় আমরা যাচ্ছি, এটা আসলে ঘোড়া নয়, এ একটা মারিদ জিন, একদিনে এ এক বছরের পথ যেতে পারে, তোমার কষ্ট হবে বলে একটু আস্তে আস্তে চালাচ্ছি।

এর পর চললো তাদের ঘোড়া। রাত্রে এক জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে সামাদ আবার থলি থেকে খাবার বের করলেন। ছু'জনে খেলেন। পরের দিন ভোরে আবার কিছু খেয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু। এমনি করে চলবার পর পাঁচ দিনের দিন তাঁরা ফেজ আর মিকুইনেজ শহরে এসে হাজির হলেন। জুডার দেখলে শহরের পথে সামাদকে

যে দেখে সেই সেলাম করে। সামাদ শহরের পথে কিছুটা চলবার পর একটা বড় বাড়ির দরজায় এসে টোকা দিতেই যে মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল জুডার তার চেহারা দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল, ভাবলে এ কোন রাজকন্যা না হয়ে যায় না। সামাদ মেয়েটিকে বললেন—রহমা, উপরের বড় ঘরটা খুলে দে ত, মা।

দিচ্ছি বাবা—বলে পিছন ফিরে যে ভঙ্গীতে রূপের ঝিলিক ছড়িয়ে উপরে উঠে গেল তা দেখে জুডারের মনে হল—এ কোন শাহাজাদী না হয়ে যায় না! মেয়েটি উপরের দিকে রওনা হলেই আবদল সামাদ ঘোড়ার জিনে বাঁধা থলি দুটো খুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে বললে—যাও, এখন তোমার নিজের জায়গায় চলে যাও, আল্লা তোমার ভাল করুন।

—বলার সঙ্গে সঙ্গে বাজের মতো কড় কড় শব্দে সেখানকার মাটি গেল ফেটে আর ঘোড়াটা সেই ফাটলের মাঝে ঢুকতেই ফাটল বন্ধ হয়ে আবার যেমন মাটি তেমন হয়ে গেল। জুডার কিছুটা ভয় পেয়ে কিছুটা অবাক্ হয়ে বললে—বাপরে বাপ, কি ব্যাপার, এরই পিঠে চড়ে এসেছি আমরা জনাব, আল্লা রক্ষা করেছেন—তাই!

সামাদ বললেন—আমি ত তোমায় আগেই বলেছি, জুডার এ ঘোড়া আসলে জিন। যাক এখন আমার সঙ্গে উপরে এস ত!

জুডার সামাদের সঙ্গে উপরে এসে একেবারে তাজ্জব বনে গেল, কি ঘর রে আল্লা, আর মণিমুক্তো সোনা রুপো দিয়ে কি অপরূপ সাজেই না সাজানো!

জুডার সেই ঘরে বসলেই আবদল সামাদ রহমাকে ডেকে একটা পুঁটলি আনতে বললেন। সেটা আনা হলে সামাদ সেটা খুলে অন্তত হাজার দিনার দাম হবে—এমন একটা পোশাক বের করে জুডারের হাতে দিয়ে বললেন—এটা পরো ত ভাই, আমার বাড়িতে এসেছ এই তোমার প্রথম উপহার।

জুডার সে পোশাক পেয়ে জবর খুশী, আর তা পরতে—দেখাতে লাগল তাকে যেন পশ্চিম আরবের কোন রাজপুত্তুর!

এর পর সামাদ তার সেই থলি থেকে চব্বিশ রকমের বাদশাহী খাবার বের করে সোনার থালা জুডারের সামনে ধরে বললেন—নাও ভাই, এবার খেতে বসো। কিছু মনে করো না, তুমি কি কি খেতে ভালবাস—জানা নেই, তাই নিজের খুশিমতো দিলাম, এর পর তুমি যা যা খেতে ভালবাস বলবে আমায়, তাই খাওয়াব তোমায়।

জুডার হেসে বললে—জনাব, ও নিয়ে ভাববেন না আমি সবই ভালবাসি, খাবার কিছু পেলেই আমার আনন্দ, বাচ-বিচার নেই।

এর পর কুড়িদিন সামাদের বাড়িতে জুডার পরম সমাদরে রইল। প্রতিদিনই সামাদ তাকে নতুন নতুন পোশাক পরতে দেন, আর বাদশাহী সব খানা বের করে খাওয়ান। কুড়িদিন কেটে যাবার পর একুশ দিনের দিন সামাদ বললেন—জুডার, আজ আমাদের উঠতে হবে যে : আলশামরদলের সম্পদ আনবার দিন যে আজ!

বেশ, কি করতে হবে, হুকুম করুন।

চলো আমার সঙ্গে।

এর পর আবদল সামাদ জুডারকে নিয়ে হেঁটেই শহরের বাইরে এসে হাজির হলেন। সেখানে দুটো মাদী ঘোড়া নিয়ে দুটি বান্দা দাঁড়িয়ে ছিল, তার একটায় জুডারকে চড়তে বলে সামাদ নিজে একটায় চড়লেন, তারপর একটা বিশেষ দিকে তাঁরা চলতে শুরু করলেন। বান্দা দুটি সঙ্গে সঙ্গেই চললো। দুপুরের কাছাকাছি তাঁরা একটা নদীর ধারে এসে হাজির হলেন। সামাদ এবার জুডারকে ঘোড়া থেকে নামতে বলে নিজেও নামলেন। তার পর ঘোড়া দুটোকে বান্দা দুটির হাতে দিয়ে বললেন—এবার ব্যবস্থা কর।

বান্দা দুটি ঘোড়া দুটোকে নিয়ে চলে গেল, একটু পরেই তারা ফিরে এল : একজন একটা তাঁবু নিয়ে এসেছিল, সেটা সে বেশ করে খাটালো, আর একজন এনেছিল গালচে, তোশক, বালিশ, সেগুলো তাঁবুর ভেতর পেতে দিল। এরপর এক বান্দা গিয়ে নিয়ে এল মাছ পোরা রয়েছে যে বয়ামে সেই দুটো বয়াম, আর একজন

নিয়ে এল সেই খাবারের জাদু থলিটি। আবদল সামাদ এবার সেহ থলি থেকে আচ্ছা আচ্ছা খাবার বের করে জুডারকে দিলেন, নিজে খেলেন। তারপর সেই বয়াম দুটো সামনে রেখে তার উপর মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে কাদের কাতর কণ্ঠের আওয়াজ বেরুতে লাগল—মেহেরবান, আর না, আর না, দয়া করুন আমাদের, রক্ষা করুন। সামাদ সে কথায় কর্ণপাত না করে একেবারে ঝড়ের মতো মন্ত্র পড়ে যেতে লাগলেন। বয়ামের ভেতর থেকে উঠতে লাগল আরও করুণ আর্তনাদ। একটু পরেই বয়াম দুটো গেল ফেটে, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মানুষের মতো দুটি মূর্তি, দু'জনার হাতই পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা। এ দু'জন তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আমাদের এখন কি করবেন আপনি ?

আলশামরদলের সম্পদ যদি না দাও আমায় তোমরা, তাহলে তোমাদের দুটোকেই আমি পুড়িয়ে মারব।

আমরা খোদার কসম নিয়ে বলছি, সে সব আমরা আপনাকে দেব কিন্তু তার জন্যে ওমরের ছেলে—জেলে জুডারকে চাই যে, কারণ তার সাহায্য ছাড়া এ কাজ হবার নয়, সে ছাড়া সেখানে কেউ ঢুক-তেই পারবে না।

আবদল সামাদ বললেন—তাকে এনেছি আমি, এই যে সে রয়েছে এখানে, তোমাদের দেখছে, তোমাদের কথা শুনেছ।

তবে ত হয়েই গেল, খোদার কসম নিয়ে বলছি—যা আপনি চান তা পাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমরা।

লোহিতরাজের ছেলে দুটো খোদার নামে শপথ করলো দেখে আবদল সামাদ তাদের ছেড়ে দিলেন। এরপর তিনি একটা ফাঁপা নল বের করে তার উপর কয়েকটা লাল টক্‌টকে বড়ি রাখলেন, তার উপরে ঝুলিয়ে দিলেন কয়লা ভরতি একটা সোনার ধুনুচি। কয়লাতে একটিমাত্র ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা জ্বলে উঠল, এবার ছাড়লেন তাতে তিনি ধূপধুনো গুগ্‌গুলের গুঁড়ো। ধুনুচি থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। সামাদ তখন জুডারকে ডেকে বললেন—শোন

জুডার, এবার আমি আমার তুকতাক আর জাতুমন্ত্র পড়া শুরু করব, এ শুরু করলে আর কথা বলতে পারব না আমি, বললে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তাই আগে থাকতেই বলে রাখি—তোমার কি কি করতে হবে। মন দিয়ে শোন।—

আমি ধুনুচিতে ধুনো ছড়িয়ে মন্ত্র পড়তে থাকলেই ধীরে ধীরে এই নদীর জল শুকিয়ে একেবারে এর তলাটা বেরিয়ে পড়বে। সেই জলশূন্য তলাটার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে তুমি মস্ত বড় একটা সোনার দরজা, তাতে তুটো আংটা লাগানো। দরজাটা দেখতে পেলেই তুমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে দেবে আস্তে করে একটা টোকা, টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কববে, এর পর দেবে জোরে এক ধাক্কা, দিয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, এর পর—পর পর তিনটে ধাক্কা দেবে—দ্রুত। আমনি ভেতর থেকে একজন বলে উঠবে—ধনকোষের দরজায় কে ধাক্কা দেয়? তুমি অমনি বলবে—আমি ওমরের ছেলে—জেলে জুডার। তখন দরজা খুলে তলোয়ার হাতে একটা লোক বেরিয়ে তোমায় বলবে—বেশ, তুমি যদি জুডার হও, তবে গলাটা বাড়িয়ে দাও, এক কোপে তোমায় সাবাড় করি। ওর কথায় কিছুমাত্র ভয় না করে অমনি গলাটা বাড়িয়ে দেবে তুমি, কোপ দিতে গিয়ে হাত উঠিয়েই তোমার সামনেই ও মরে পড়ে যাবে, কিন্তু তুমি যদি ভয় পেয়ে গলা না বাড়াও, তাহলে তোমায় মেরে ফেলবে।

এখানকার জাতু থেকে মুক্ত হয়ে আর একটু এগিয়ে গেলেই সামনে পড়বে আর একটা দরজা, সে দরজায়ও অমনি করে ধাক্কা দিলে দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে এক ঘোড়সোয়ার, কাঁধে তার ছুঁচলো বড় বর্শা, বর্শার ফলা তোমার বুকের দিকে এগিয়ে বলবে—কে রে তুই, বেতমিজ, একমাত্র ওমরের ছেলে জুডার ছাড়া কোন মানুষ বা জিনের যেখানে আসবার অধিকার নেই, সেখানে নাক গলাতে এসেছিস যে বড়! ওর ঐ কথা শুনে কিছুই ভয় না করে বুকটা এগিয়ে দেবে তুমি ওর বর্শার সামনে। তোমাকে আঘাত

করতে গিয়েই ও মাটিতে লুটিয়ে পড়বে—দেখবে ও মারা গেছে। আর তুমি যদি ভয় পেয়ে গিয়ে বুকটা এগিয়ে না দাও, তাহলে ওর হাতেই তোমার মরণ।

এরপরে এগিয়ে গেলে পাবে তৃতীয় দরজা, ধাক্কা দিলেই বেরিয়ে আসবে তীর ধনুক হাতে একটি লোক তাক করবে সে তোমার বুকের দিকে, ভয় না করে বুকটা খুলে এগিয়ে দিও, তোমাকে মারতে গেলেই ও নিজে মরে যাবে।

এর পর চতুর্থ দরজায় গিয়ে ঘা দিলেই, দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে মস্ত বড় আর ভয়ঙ্কর এক সিংহ, ও যেন তোমায় কামড়ে ছিঁড়ে খেতে ছুটে আসছে, এমনি ভঙ্গী নিয়ে আসবে। কিছ্ছু ভয় না পেয়ে—ও কাছে এলেই তুমি তোমার একটা হাত এগিয়ে দিও, ও তাতে দাঁত বসাতে গিয়েই মরে মাটিতে ঢলে পড়বে।

এর পর এগিয়ে গিয়ে পাঁচের দরজায় ধাক্কা দিলে দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে এক কাফ্রী বান্দা, এসেই তোমায় জিজ্ঞাসা করবে—কে তুমি? তুমি বলবে—আমি জুডার। ও বলবে—তুমি যদি সে-ই হও, তবে যাও, ছয়ের দরজা খোলো গিয়ে।

এগিয়ে যাবে ছয়ের দরজার কাছে, গিয়ে বলবে—ঈশা, মুসাকে বলো দোর খুলতে। ঐ বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে দুটি ড্রাগন, একটা ডান দিক আর একটা বাঁ দিক থেকে হাঁ করে তোমায় খেতে আসবে। কিছুমাত্র ভয় না করে তোমার দুটো হাত তুমি দু'দিক দিয়ে ও দুটোর মুখের দিকে এগিয়ে দিও। ওরা তোমার হাতে কামড় বসাতে গিয়েই মরে ঢলে পড়বে মাটিতে। ওদের আক্রমণে বাধা দিতে গেলেই অথবা ভয় পেলেই তুমি মারা পড়বে।

এর পর সাতের দরজায় ধাক্কা দিলেই বেরিয়ে আসবেন তোমার মা, এসেই তোমায় দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলবেন—আয় বাবা আয়, কাছে আয়, কতদিন তোকে দেখি না! তুমি সে সব কথায় গলে না গিয়ে ভীষণভাবে তাকে নির্যাতন করবে। কি করে তাকে নির্যাতন করতে হবে আবদাল সামাদ জুডারকে তা বললে জুডার শিউরে

উঠল। সামাদ বললেন—এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ সব কিছুই মায়া, জাদু ; মা তোমার বাড়িতে নিরাপদে থাকবেন। মায়ের জাদু কাটিয়ে এগিয়ে গেলেই সামনে পাবে তুমি একটা বড় ঘর, এই ঘর-টাই হচ্ছে আলশামরদলের ধনকোষ। তার ভেতর ঢুকলেই দেখবে —এখানে ওখানে রাশি রাশি সোনা মণি মুকতো পড়ে রয়েছে, সবের দিকে নজর দেবে না তুমি, আর একটু এগিয়ে যাবে। এগিয়ে গিয়ে দেখবে ঘরের শেষপ্রান্তে একটা উঁচু বেদীর সামনে একটা পরদা ঝুলানো। পরদাটা সরালেই দেখবে এক সোনার পালঙ্কে দুনিয়ার সেরা জাদুকর আলশামরদল ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাঁর মাথার উপর ঝুলছে একটা গোলক, জোছনার মতো রোশনাই বেরুচ্ছে তা থেকে, চাঁদির সঙ্গে লেগে রয়েছে একখানা তলোয়ার, আঙুলে রয়েছে একটা আংটি, আর গলায় হারে ঝুলানো রয়েছে একটা কাজলের শিশি। এই যে চারটে জিনিসের কথা বললাম—গোলক, তলোয়ার, আংটি আর মায়া কাজলের শিশি—এ চারটেই আনবে তুমি। এখানে পৌঁছবার আগে সাত দরজায় তোমার যা যা করতে হবে, সব বলে দিয়েছি তোমায়, ভুলো না যেন, ভুললে হবে তোমার মহাবিপদ, শেষে আফসোস করতে হবে।

জুডার পাছে ভুলে যায় তাই আবদল সামাদ বার বার—চারবার তাকে তার করণীয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন। শুনে জুডার বললে —ভুলিনি জনাব, ভুলব না, কিন্তু সাত দরজায় যেসব ব্যাপারের কথা আপনি বললেন, তা শুনেই ত গা কাঁটা দিয়ে ওঠে, এ সব কি আমি বরদাস্ত করতে পারব ?

পারতে তোমাকে হবেই। ভুলে যাচ্ছ কেন—ওর কোন কিছুই সত্য নয়, সবই মায়া। যেমন যেমন বলেছি তোমায়, তেমন তেমন করলে কোন কিছুই হবে না তোমার, কিছুই ভয় নেই।

বেশ, তাই করব আমি, আল্লাই ভরসা আমার।

আবদল সামাদ তখন ধুনুচিতে ধূপধুনো দিয়ে তাঁর জাদুর মন্ত্রপাঠ তুকতাক শুরু করলেন। কিছুক্ষণ অমনি করতে থাকলেই নদীর জল

শুকিয়ে তার তলাটা বেরিয়ে পড়ল, দেখা দিল আলশামরদলের রত্নকোষের দরজা। জুডার গিয়ে সে দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে শব্দ হল: কে?

আমি জুডার, ওমর সাহেবের ছেলে।

জুডার হও ত, গলাটা বাড়িয়ে দাও, কাটব তোমায়—বলে তলোয়ার হাতে একটা মূর্তি এগিয়ে এল। জুডার গলা বাড়িয়ে দিতেই কোপ দিতে গিয়ে মূর্তিটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এর পর জুডার গেল পরপর আরও পাঁচটা দরজায়, ছয়ের দরজা পর্যন্ত। কিছুমাত্র ভয় না পাওয়ায় এ সব ক'টা জাতুই সে ভেঙে উৎরে গেল। মুশকিল বাধল যত সাতের দরজায় এসে। সাতের দরজায় এসে ধাক্কা দিতে বেরিয়ে এল তার মা, এসেই জুডাকে আদর করে ডাকলে—আয় বাবা, আয়।

কে তুমি?

মাকে চিনলি না তুই—ন' মাস দশ দিন পেটে ধরলাম তোকে, বুকের ত্বধ দিয়ে মানুষ করলাম, এখন চিনছিস না তুই আমাকে!

ও সব বাজে কথা রাখো—বলেই আবদল সামাদের নির্দেশমতো তাকে নির্যাতন করতে গেল, কিন্তু মা এত কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, চোখের জলে ভেসে এমন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল যে তার নিজের চোখেও জল এসে গেল, সে তাকে আর নির্যাতন করতে পারল না।

অমনি মায়ার মূর্তি বলে উঠল—ভুল করছে ও, ভুল করছে—কোথায় তোরা, ওকে পিটিয়ে দূর করে দে এখান থেকে।

অমনি শিলাবৃষ্টির মতো কিল চড় ঘুষি পড়তে লাগল জুডারের সর্ব অঙ্গে, রত্নকোষের রক্ষী বান্দারা তাকে মারের চোটে আধমরা করে রত্নকোষের এলাকার বাইরে ফেলে গেল। কোষের সাত দরজাই পটাপট বন্ধ হয়ে গেল। দেখতে না দেখতে নদী আবার জলে ভরে গেল।

ম্যাগরিবি আবদল সামাদ জুডারকে নদীতীরে আধমরা অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে তখনই ছুটে গিয়ে মন্ত্র পড়ে তুকতাক করে তার

জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন বটে, কিন্তু জুডারের দেহে তখন এক ফোঁটা বল নেই। সামাদ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করেছিলে তুমি, মুর্খ? জুডার তখন সাতের দরজায় এসে যে ভুল করেছিল তা সব খুলে বললে :

তাকে যেমন নির্যাতন আপনি করতে বলেছিলেন তা করতে গেলে সে এমন কান্নাকাটি করতে লাগল যে তা দেখে আমার চোখেও জল এসে গেল। আমি তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম।

তারপর যা যা ঘটেছিল—বলে গেল জুডার।

শুনে আবদল সামাদ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—আমার কথামতো কাজ না করে তোমার আমার দু'জনেরই কি ক্ষতি যে তুমি করলে তা বলার কথা নয়। এখন থাক আমার এখানে এক বছর বসে। আসছে বছর ঠিক এই দিনে আবার আমাদের চেষ্টা করতে হবে। একটু ভুলে মানুষের কত ক্ষতি হতে পারে তাই একবার বুঝে দেখ।

এর পর সামাদ তাঁর দুটো বান্দাকে ডেকে পাঠালে তারা এসে তাঁবু খুলে জিনিসপত্তর সব গাধার পিঠে চাপাল, তারপর আবার কোথায় গিয়ে আগেকার সেই দুটো মাদী ঘোড়া নিয়ে এল। সামাদ জুডারকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এলেন ফেজ শহরে নিজের বাড়িতে। জুডার সেখানে থেকে ভাল ভাল খানা খেয়ে আর নিত্য নতুন দামী পোশাক পরে পুরো এক বছর কাটিয়ে দেবার পর আবার সেই আকাঙ্ক্ষিত দিন এসে গেল। সামাদ বললেন—জুডার, আমাদের সেই নির্দিষ্ট দিন আজ, এবার আবার যেতে হয় যে!

বেশ, চলুন।

সামাদ তখন জুডারকে নিয়ে শহরের বাইরে এসে গেলেন। সেখানে দু'জন বান্দা দুটি মাদী ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সেই ঘোড়ার চড়ে এসে গেলেন তাঁরা সেই নদীতীরে। বান্দারা সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বেশ করে সাজিয়ে দিল। সামাদ তাঁর থলি থেকে খাবার বের করে নিজে খেলেন, জুডারকে দিলেন। এর পর ধুনুচিতে

আগুন জ্বেলে ধূপধুনো ছড়িয়ে জুডারকে বললেন—জুডার তোমায় কি কি করতে হবে এবার সেগুলো আবার মনে করিয়ে দিতে চাই।

কোন দরকার নেই জনাব, আমি যেদিন সে মারের কথা ভুলব, সেদিন আপনার সে সব উপদেশ ভুলব।

ভাল করে বুঝে দেখ, ঠিক মনে আছে ত?

জি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এবার কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখো—মনে রেখো যে মূর্তি তোমার মা সেজে আসবে, আসলে সে তোমার মা নয়, ও বিলকুল মায়া, জাত্নর ভাঁওতা, তোমার ভুল করিয়ে সব কিছু বানচাল করে দিতে আসবে ও। প্রথম বার ভুল করে কোন রকমে রক্ষে পেয়ে গেছে, এবার ভুল করলে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবে না।

এবার যদি ভুল করি তা হলে আমার মরণ হওয়াই উচিত।

জুডারের কথা শুনে আবদল সামাদ তখন ধুনচির আগুনে ধুনো ছড়িয়ে জাত্নমন্ত্র পড়ে তুকতাক শুরু করলেন। দেখতে না দেখতে নদীর জল গেল শুকিয়ে, জুডার সেখানে নেমে সোনার দরজায় দিলে ধাক্কা, দরজা খুলে গেল, জুডার শুধু সেখানকার নয়, পরপর ছ'টা দরজার মায়াজাল ছিন্ন করে হাজির হল সাতের দরজায়। সে দরজায় ধাক্কা দিতেই বেরিয়ে এল তার মা, কণ্ঠে মধু ঢেলে বললে—জুডার এলি—আয়, বাবা, আয়।

জুডার এবার আর তার মায়ায় ভুললে না, আবদল সামাদ তাকে যে কথা বলে যেমন নির্যাতন করতে বলেছিলেন জুডার ঠিক ঠিক তাই করলে স্ত্রীলোকটির প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুলিয়ে পড়ল।

জুডার নির্বাধ নিষ্কণ্টক হয়ে প্রবেশ করলো ধনকোষের বড় কামরাটায়। গিয়ে দেখে এদিকে ওদিকে ছড়ানো রয়েছে কত সোনা মণিরত্ন। জুডার সে সব উপেক্ষা করে ঘরের শেষ প্রান্তে পর্দা-ঝুলানো বেদীর দিকে এগিয়ে গেল, তারপর পর্দা সরিয়ে দেখে সেখানে সোনার পালঙ্কে শুয়ে রয়েছেন যাত্নসম্রাট আলশামর-দল, মাথার কাছে তাঁর তলোয়ার, হাতের আঙলে আংটি, গলার

হারে বাঁধা কাজলের শিশি, আর মাথার উপর ঝুলে রয়েছে সেই দিব্য গোলক।

. এদিকে ওসব দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মধুর যন্ত্রসঙ্গীত তার কানে সুধাবর্ষণ করতে লাগল, ধনকোষের বান্দারা এসে বলতে লাগল—জুডার, যে রত্ন তুমি আজ পেলে এতে জীবন তোমার ধন্য হয়ে গেল। শুনে জুডারের গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। সে তখন আলশামর-দলের সেই চারটি দুর্লভ রত্ন নিয়ে নদী তীরে ম্যাগরিবি আবদল সামাদের কাছে চলে এল। সামাদ তার চিরকাম্য সেই চারটি জিনিস নিয়ে জুডারকে আসতে দেখেই তুকতাক থামিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জুডার চারটি জিনিস তাঁর হাতে তুলে দিল। সামাদ তখন তাঁর বান্দাদের ডাকলেই তারা ছুটে এসে তাঁবু তুলে নিল—এনে দিল সেই দুটো মাদী ঘোড়া। তাতে চড়ে জুডারকে নিয়ে ফিরে এলেন সামাদ তাঁর ফেজ শহরের বাড়িতে। এসেই সেই জাদুথলি থেকে ভাল ভাল সব খাবার বের করে জুডারকে খাওয়ালেন, নিজে খেলেন, খেয়ে সোনার থালাগুলো থলির মধ্যে পুরে জুডারকে বললেন—জুডার, তুমি এতদিন নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে আমার কাছে থেকে আমার যে উপকার করলে এর তুলনা হয় না। এ উপকারের কথা আমি জীবনে ভুলব না : এর জন্য কিছু পুরস্কার নিতে হবে তোমায় আমার কাছ থেকে। কি চাই তোমার বলো, তুমি যা চাও তাই দেব আমি তোমায়। কোন সঙ্কোচ রেখো না, লজ্জা করো না, মন যা চায়—তাই বলো।

জুডার বললে—যদি তা-ই হয়, জনাব, তা হলে প্রথমে চাওয়া আমার খোদার কাছে তারপর আপনার কাছে—ঐ যে ঘোড়ার জিনে বাঁধেন আপনি দুটি থলি, ঐ থলি দুটি আমায় দিন।

ম্যাগরিবি তখনই থলি আনিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন—নাও—তোমার প্রাণ যা চায় নিজে খাও, বাড়ির আর সব লোককে খাওয়াও। তুমি অন্য কিছু চাইলেও—তোমাকে তা আমি দিতাম। কিন্তু শোন, জুডার, শুধু ঐ থলিই ত তোমার সকল অভাব মেটাবে

না, তোমার আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন, তার জন্যে বহুমূল্য ধনরত্ন ভরতি আরও থলি তোমায় দিচ্ছি, তা খরচ করে তুমি বেশ ভদ্রভাবে ধনী সদাগরের মতো জীবন যাপন করবে, তোমার মা ভাইকেও ভালভাবে রাখবে, এ ছাড়া তোমার সারাজীবনের হাত খরচও চলে যাবে এ থেকে—এই বলে তিনি জুডারকে বহু মণিরত্ন সোনাদানা ভরতি তুটো থলি দিলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ, জাতু থলি থেকে কি করে খাবার বের করতে হয় তা-ও তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি : থলির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বলবে—ও জিনের থলির বান্দা, তোমার গুরুর দোহাই আমার জন্যে অমুক খাবার দাও। এমনি করে তুমি যদি হাজারো রকমের খাবারও চাও এক দিনে, তা-ও যোগাবে তোমায় বান্দা। এরপর একটা বান্দাকে ডেকে একটা মাদী ঘোড়া আনিয়ে জুডারকে বললেন—এই চারটি থলি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তুমি বাড়ি রওনা হও! এই বান্দা তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বাড়িতে পৌঁছেই এ ঘোড়াটা ওকে ফেরত দেবে। আর আমার সব শেষ কথা হচ্ছে—আমাদের এ সব গোপন কথা কারো কাছে ফাঁস করবে না, এখন এসো—আল্লা তোমার ভাল করুন।

আল্লা আপনারও সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করুন, কুশলে রাখুন বলে চারটি থলি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে জুডার নিজের দেশে রওনা হল। বান্দা তার আগে আগে থেকে ঘোড়াটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সারা দিনরাত্রি চলে পরের দিন ভোরে তারা কায়রো শহরের ফতাহ্ দরজার সামনে এসে হাজির হল। এখানে আসতেই দেখে—তার মা ফটকের সামনে বসে, আল্লার নামে তুটি ভিক্ষে দিয়ে যাও—বলে ভিক্ষে করছে। দেখেই আর থাকতে পারল না জুডার, অমনি ঘোড়া থেকে নেমে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে—মা, মা, ওমা বলে তাকে জড়িয়ে ধরলে। জুডার মাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিজে তার পাশে পাশে হেঁটে বাড়ি এল, এসে মাকে আর চারটে থলি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ঘোড়াটা ম্যাগরিবির কথামতো বান্দাকে দিয়ে দিল। বান্দা ঘোড়া নিয়ে তখনই সেখান থেকে উধাও

হয়ে গেল। আসলে এ ঘোড়াও ঘোড়া নয়, বান্দাও বান্দা নয়, দুটিই জিন গোষ্ঠীর।

যাক, এবার জুডার মাকে একা ঘরে পেয়ে ভাইদের কুশল জিজ্ঞাসা করলে। মা বললে, হ্যাঁ—বাবা, তারা ভালই আছে।

তা তুমি অমন রাস্তার ধারে ভিক্ষে করছিলে কেন ?

কি করব বাবা, পেটের জ্বালা।

আমি বিদেশে যাবার আগে একদিন তোমার হাতে নিরানব্বইটা দিনার দিলাম, তার পরের দিন আর নিরানব্বই, তা ছাড়া যাবার ঠিক আগে তোমায় এক হাজার দিনার দিয়ে গেছি, এতে চললো না তোমার ?

সে আর বলিস নে, বাবা, সে সব কি আর রাখতে দিল আমায় : তোমার গুণমন্ত দুই ভাই সে সব কিছু আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমায় পথে বের করে দিলে। সম্বল কিছুই রইল না হাতে, তাই পেটের জ্বালায় ভিক্ষা করি।

শুনে চোখে জল এসে গেল জুডারের, একটু পরে সে সামলে নিয়ে মাকে বললে—তুমি ভেবো না, আমি এসেছি—আর তোমার ভাবনা নেই। এই যে চারটে থলি দেখছ—এর দুটো ভরতি মোহর আর মণিরত্ন।

শুনে মায়েরও চোখে জল এসে গেল, সে বললে—আল্লা তোমার ভাল করুন বাবা,—তোমায় সুখে রাখুন !

একটু পরে মা বললে—দেখ রে, বড় খিদে পেয়েছে আমার, কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি, খিদের জ্বালায় পোড়া চোখে ঘুম এল না এক ফোঁটা। জলদি কিছু খাবার নিয়ে আয় আমার জন্যে।

জুডার বললে—কি খেতে চাও তুমি বলো। খাবার আনতে বাজারে যাবারও দরকার নেই আমার, রাঁধবারও দরকার নেই। কি খাবে তুমি বলো, এক্ষুণি দিচ্ছি আমি তোমায়।

কই, কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না তোর কাছে, তামাশা করছিস ?

না, মা, তামাশা নয়, এই যে ঘোড়ার জিনে বাঁধবার থলে দেখছ, এর ভেতরেই আমার সব রকমের খাবার আছে।

তবে দে, যা হয় কিছু একটু দে।

জুডার বললে—যা হয় কিছু কেন মা, যখন ভাল কোন কিছু জোটে না, তখন পেটের জ্বালায় লোকে যা তা কিছু খেতে চায়। সব রকমের ভাল খাবার যখন আমার আছে, তখন—যা হয় কিছু খাবে কেন তুমি ? বল কি খাবে ?

তবে দে আমায় কিছু গরম রুটি আব একটু পনির।

ইয়া আল্লা, ও কি খাবার গো! ভাজা মুরগীর মাংস খাবে তুমি ? —কোর্মা, কাবাব, পোলাও, বিরিয়ানি, মধুমাখা ভাত, বাদামের পিঠে।

শুনে মা ভাবলে ছেলে তার খিদে নিয়ে তামাশা করছে, বললে—আমি কি তোর তামাশার বস্তু রে বেটা—না মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর, না খোয়াব দেখাচ্ছিস ?

খোয়াবও নয়, তামাশাও নয়, পাগলও হইনি আমি। যে সব খাবারের কথা তোমায় বললাম সে সব তোমায় খাওয়ালেই ত হল ? দেখ না, এখনই খাওয়াচ্ছি তোমায়।

কই, বাবা—আমি ত কিছুই দেখছি না।

দেখছ না ? আচ্ছা দেখাচ্ছি দাঁড়াও, ঐ থলি দুটো দাও ত আমার হাতে।

মা থলি দুটো হাতে নিয়ে টিপেটুপে দেখে ছেলের সামনে রাখলে জুডার তার সেই থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খাবারের পর খাবার বের করতে লাগল—মাকে যা যা খাওয়াতে চেয়েছিল সব।

ব্যাপার দেখে ত মায়ের দুই চোখ কপালে!

ও জুডার, এ সব কোথায় ছিল রে, থলি ত দেখলাম তোর একটুখানি, তা ছাড়া খালি ?

জুডার মৃদু হেসে বললে—মা, এ বড় মজার থলি, জাদুথলি এটা, —ম্যাগরিবি দিয়েছেন আমায়। কোন কিছু খেতে ইচ্ছে করলে এ থলির ভেতর হাত দিয়ে থলির যে বান্দা আছে মনে মনে তাকে—গুরুর দোহাই দিয়ে—অমুক খাবার দাও হুকুম করলেই সে সে-ই খাবার হাতে এগিয়ে দেবে।

আমি অমনি করে বললেও—দেবে ?

নিশ্চয়। তুমি একবার চেষ্টা করেই দেখ।

মা তখনই গুরুর দোহাই দিয়ে থলির বান্দাকে মনে মনে বললে—আমায় একখানা মসলা দিয়ে রান্না করা ভেড়ার পা এনে দাও। তারপর থলিতে হাত ঢুকাইতেই পেল সোনার থালায় মসলার গন্ধে ভুর ভুর সম্বরঁাধা গরম গরম ভেড়ার টেংরি! এরপর তার যা মনে আসতে লাগল তাই চাইতে লাগল থলির বান্দার কাছে। বান্দা সবই যোগাতে লাগল মাকে। দেখে মা মনের আনন্দ যেন আর ধরে রাখতে পারে না।

জুডার বললে—শোনো মা, তোমায় সব কিছুই শিখিয়ে দি। এই যে সোনার থালায় সব খাবার দেখছ, এর যতটা পারো খাওয়া হয়ে গেলে, যা বাঁচবে গরিব দুঃখীদের বিলিয়ে খালি থালা আবার থলিতে পুরে রাখবে, বুঝেছ ?

হ্যাঁ, বাবা, বুঝেছি—বলেই মা মূল্যবান থলি দুটি একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে এসে মায়ে-পোয়ে খেতে বসল। খেতে বসে জুডার বলল—দেখ মা, এই থলির কথা যেন কাউকে বলো না। তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করলে এর ভেতর থেকে এমনি করে বের করে খাবে, গরিব দুঃখী ভিখারীদের দেবে, ভাইদের খাওয়াবে, কিন্তু কোত্থেকে এ সব আসছে সেই গোপন কথাটি কাউকে বলবে না। জুডার খেতে বসে তার মায়ের সঙ্গে এমনি কথা বলছে এমন সময় তার দুই ভাই সালিম আর সলিম এসে হাজির হল। ওরা যেখানে আড্ডা দিচ্ছিল, ওদের একজন ইয়ার দূর থেকে জুডারকে দেখতে পেয়েই সেখানে গিয়ে ওদের বলেছে—ওহে তোমাদের ছোট ভাই জুডার ফিরে এল যে দেখে এলাম। একটা সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে সে এল সামনে তার এক বান্দা, আর কি জমকালো পোশাক তোমার ভাইয়ের, দেখে চোখ ঝলসে যায়। শুনে প্রথমে একটু ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিল দু'ভাই; এক ভাই বলেছিল—মায়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটা ঠিক হয়নি। মা কি আর জুডারকে সব না বলে ছাড়বে?

আর একজন তার উত্তরে বলেছিল—ভয় নেই রে, মায়ের যা নরম মন, একটু কিছু বললেই ঠিক হয়ে যাবে, আর জুডার ত মায়েরও বাড়া, কোন কিছু বলবারই দরকার হবে না হয়ত—দেখিস।

নিজেদের মধ্যে এইসব বলাবলি করে তারা দু'জনেই এসে হাজির হল—বাড়িতে মা আর জুডার বসে খাচ্ছিল যেখানে—সেখানে। জুডারভাইদের দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম আপ্যায়ন করে ডাকলে—এস ভাইয়েরা অনেক দিন পরে এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাক।

সালিম সলিম তখনই বসে গেল খেতে। অনেক দিন ভাল খাবার কিছু জোটেনি, খিদে লেগেই ছিল, বেশ পেট ভরে মহা তৃপ্তির সঙ্গেই তারা খেল। খাওয়া হয়ে গেলে জুডার বললে—ভাই, যা বাঁচল সব গরীবছুঃখীদের বিলিয়ে দাও।

না, না—থাক, আমরা রাত্রে খাব ও সব।

রাত্রে আরও ভাল খাবার খাওয়াব ভাই, ও সব বিলিয়ে দাও।

বাকী খাবারগুলো তখন তারা গরিব দুঃখীদের বিলিয়েই দিলে। জুডার তখন মাকে বললে—মা, থালাগুলো থলিতে পুরে রাখ।

রাত্রে জুডার নিজে হাতে চল্লিশ রকম ভাল ভাল খানা বের করে মা আর ভায়েদের খাওয়ালে, নিজে খেলে, তারপর বের করলে নানা রকমের মেঠাই। পরের দিন সকালেও ঐ রকম। এমনি মহা ফুর্তিতে জুডারের দুই ভাইয়ের দশ দিন কেটে গেল। তারপর সালিম সলিমকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—জুডারের বাড়িতে এ কি ব্যাপার বল ত, সকালে মহাভোজ, দুপুরে মহাভোজ, রাত্রে মহাভোজ, তারপর আবার মিঠাই! ফালতু জিনিস আবার গরিব দুঃখীদের দান! এ ত সুলতানী কারবার হে, কিন্তু একদিনও কিনে আনতে দেখলাম না কিছু, রাঁধুনীও দেখি না, রান্নাঘরে আগুন পর্যন্ত জ্বলে না, কোত্থেকে আসে এ সব ?

কি জানি, ভাই, আমিও ত ভাবি তাই, বুঝি না কিছু!

কি ব্যাপার, কার কাছে জানা যায় বল ত ?

মা হয়ত জানে, এমনি হয়ত বলতে চাইবে না, কোন কৌশল করে জানতে হবে।

এর পর দুই ভাই অনেকক্ষণ ধরে শলাপরামর্শ করে জুডারের অনুপস্থিতিতে মায়ের কাছে গিয়ে বলল—মা, হঠাৎ বড় খিদে পেয়ে গেল যে, জুডার ত বাড়ি নেই, কি করা যায় ?

মা বললে—দাঁড়া, দেখছি আমি—বলেই যে ঘরে সেই জাদুথলি ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রায় তখনই গরম গরম রুটি আর মাংস বের করে এনে তাদের খেতে দিল।

ওরা বললে—মা, গোস্ত রুটি ত দেখছি বেশ গরম, এ কি করে হল! তোমাকে ত রাঁধতেও দেখলাম না, আগুন জ্বালতেও দেখলাম না, কোথায় পেলে তুমি এ সব ?

মা বললে—এ সবের জন্যে রাঁধতে হয় না রে আমার, আগুন জ্বালাতেও হয় না, পাই এ সব জিনের থলি থেকে।

জিনের থলি, সে আবার কি ?

জাদুকরা দুটো থলি আছে, তাদের আবার বান্দা আছে, মন্ত্রের মতো দুটো কথা বলে, তাকে হুকুম করলেই সঙ্গে সঙ্গে সে এই সব খাবার বের করে দেয়। তোরা জিজ্ঞাসা করলি তাই বললাম, কিন্তু খবরদার, আর কাউকে বলিস নে যেন এ কথা।

না, মা, কাউকে বলব না আমরা। কিন্তু তুমি শিখিয়ে দাও না আমাদের—কি করে—কি মন্ত্র পড়ে খাবার বের করতে হয়।

মায়ের প্রাণ, সে তখনই থলি এনে দুই ছেলেকেই খাবার কি করে বের করতে হয় হাতে কলমে শিখিয়ে দিল। সালিম সলিমও তখনই থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বান্দাকে যা বলবার বলে নিজেদের খুশিমতো খাবার বের করে খেল। জুডার কিছুই জানতে পেল না।

দু'একদিন পর সালিম সলিমকে বললে—আমরা জুডারের এখানে থেকে ওর দেওয়া ভিক্ষার অন্ন খাব তার চেয়ে ওকে কোথাও সরিয়ে এ থলি দুটো নেওয়া যায় এমন কোন ফন্দি করা যায় না ?

আমার ত এমন কোন ফন্দিটন্দি মাথায় আসে না।

তোর আসে না, আমার আসে। তুই যদি ঠিক আমার কথা শুনে চলিস, তা হলে দেখ না ওকে কেমন আমি জাহাজে বিক্রি করে দি।

কি করে?

কি করে? সুয়েজের জাহাজের কাপ্তেনের কাছে গিয়ে তার দু'জন লোক সমেত তাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব জুডারের বাড়িতে। আমি জুডারকে যা বলব তুই কেবল তাতে সায় দিবি, ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না তোকে, রাত্রি শেষ হতে না হতে দেখবি কি করে ফেলেছি আমি জুডারের!

এর পর সালিম তার ভাই সলিমকে নিয়ে জাহাজের কাপ্তেনের কাছে গিয়ে বললে—আমরা একটা বিশেষ কাজে এসেছি আপনার কাছে, এটা ঠিক মতো পারলে আপনারও লাভ, আমাদেরও লাভ।

কি কাজ বলো?

বলছি, খুলেই বলছি আপনার কাছে: আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন আমার ভাই, আমাদের ছোট আর একটা ভাই আছে, সে অতি বদ। আমাদের বাবা মারা গেলে আমরা যে ধনসম্পত্তি পাই তা আমরা তিন ভাগে ভাগ করে নি, তার ভাগ সে দু'দিনেই খানা-পিনা ফুর্তি করে উড়িয়ে দিয়ে কাজীর কাছে নালিশ করল—আমরা তার অংশ ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি। মকদ্দমা চালাতে অনেক অর্থ ব্যয় হল আমাদের, সম্পত্তিও কিছু তার হাতে গেল। আর একবার আর এক কাণ্ড করে সে আমাদের পথে বসিয়ে ছেড়েছে, এতেও তার শান্তি নেই, সে আমাদের আরও নির্যাতন করবার তালে আছে। মোট কথা, সে এখানে থাকলে আমাদের আর নিস্তার নেই, তাই আমরা তাকে আপনার কাছে বিক্রি করে দিতে চাই।

বেশ, এনে দাও তোমরা তাকে আমার কাছে, আমি কোন জাহাজে দূর পাল্লার পাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে।

তাকে ত আনা যাবে না জনাব, আপনাকেই যেতে হবে দুইজন মজবুত লোক সঙ্গে নিয়ে; বাড়িতে বলব—আমাদের তিনজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। আপনারা তিনজন এলে তার সঙ্গে আমরা

দু'জন মিলে পাঁচজন হব আমরা। তারপর ও ঘুমুলে আমরা পাঁচজনে মিলে ওকে ধরে মুখ বন্ধ করে নিয়ে আসব আপনার ডেরায়, তারপর ওকে নিয়ে—আপনার যা খুশি তাই করবেন।

আমি কিন্তু ওর দাম চল্লিশ দিনারের বেশি দিতে পারব না—তাতে রাজী আছ ত তোমরা?

হ্যাঁ, রাজী।

কোথায় যেতে হবে আমাদের?

সালিম একটা মসজিদের নাম করে বললে—ওর সামনে যে রাস্তাটা সেখানেই আমাদের দু'জনের একজন থাকবে। যে থাকবে সেই আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

বেশ, ঠিক আছে—যাচ্ছি আমরা। এখন পালাও।

এর পর তারা জুডারের কাছে এল। একটু পরেই অমনি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে জুডারের হাতটা ধরে তার মুখের দিকে তাকাল।

কি ভাই, কি হল,—কিছু বলবে?

হ্যাঁ, একটু মুশকিলে পড়লাম যে আজ, তাই—

কি মুশকিল?

মুশকিল—মানে—আমার এক বন্ধু আছে, তুমি যখন বিদেশে ছিলে সে আমায় তার বাড়িতে অনেক দিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে, আর কত রকমে যে উপকার করেছে তার লেখাজোখা নেই, সলিম ভাই জানে সব। আজ হঠাৎ আবার পথে তার সঙ্গে দেখা, দেখা মাত্রই আবার সে নিমন্ত্রণ করে বসলে আমায়। আমি বললাম—সে কি করে হয়, আমি আমার ছোট ভাই জুডারের ওখানে আছি, তাকে ফেলে আমি কি করে আসি! সে বললে বেশ, তাকেও নিয়ে এস, তারও নিমন্ত্রণ। আমি বললাম—সে বোধ হয় রাজী হবে না, তার চেয়ে বরং তুমিই—বলতেই সে চোখ ইশারায় তার পাশের দু'জন লোককে দেখিয়ে বললে—এরা আমার ভাই সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম—তুমিই বরং তোমার দুই ভাইকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে এস। আমি ভেবেছিলাম ও আসতে রাজী হবে

না, কিন্তু আমার এমন ভাগ্য যে ও শুনেই রাজী হয়ে গেল, ও বললে ছোট মসজিদের ফটকের সামনে ও ওর ভাই দুটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখান থেকে নিয়ে আসতে হবে ওদের। তোমার কাছে বড় লজ্জায়ই পড়ে গেলাম ভাই, আমি। ওরা ত এসেই যাবে, এখন বলো তোমার এখানেই আনব ওদের, না—প্রতিবেশীদের কারো বাড়িতে ব্যবস্থা করব ?

শুনে জুডার জিভে কামড় খেয়ে বললে—ছি, ছি—কি যে বলো তুমি, তোমার ভাইয়ের বাড়ি থাকতে অপরের বাড়ি ? সোজা নিয়ে আসবে তাদের এখানে, দরকার হলে আরও দু'চারজন বন্ধুকে বলতে পার। তুমি তোমার বন্ধুদের কি কি খাবার খাওয়াতে চাও শুধু হুকুম করবে আমায়, ব্যাস্। তোমায় বলে রাখছি—আমি বাড়ি নেই—এমন সময় কোনদিন যদি তোমার কোন বন্ধুকে আন, তাহলে মাকে বলবে, বললেই মা তোমায় ভাল ভাল খাবার বের করে দেবে।

জুডারের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে সালিম গিয়ে সেই ছোট মসজিদের ফটকের সামনে বসে রইল। সন্ধ্যাকালে কাপ্তেন তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে এলে সালিম তাদের জুডারের বাড়িতে নিয়ে এল। ভাইয়ের বন্ধু বলে জেনে জুডার তাদের মহা-আপ্যায়ন করে বসালে, তারপর নিজে মাকে বলে চব্বিশ রকম ভাল ভাল খানা এনে তাদের খাওয়ালে। তারা ভাবলে এ সব বাদশাহী খানার ব্যবস্থা সালিমই তাদের জন্যে করেছে। রাত্রি তিন ভাগের এক ভাগ কেটে গেলে জুডার অতিথিদের জন্যে নানা রকমের মিঠাই নিয়ে এল। সালিম নিজে মিঠাই পরিবেশন করলে। এরপর ঘুমের পালা। জুডার অতিথিদের শোবার ব্যবস্থা করে নিজেও একটা বিছানায় শুয়ে পড়ল। সরল নিষ্পাপ মন তার, ওদের ষড়যন্ত্রের কথা জানত না, তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। ওরা যেই বুঝল সে ঘুমিয়ে পড়েছে—অমনি পাঁচজন একসঙ্গে তাকে ধরে মুখে কাপড় গুঁজে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে রাত্রের অন্ধকারে সুয়েজে নিয়ে এল। সেখানে আনা হলে কাপ্তেন সালিমকে চল্লিশ দিনার দিয়ে তাকে কিনে

নিয়ে পায়ে বেড়ি দিয়ে যে জাহাজটা তার বাইরে যাচ্ছিল তার দাঁড় টানার কাজে লাগিয়ে দিল।

সালিন আর সলিম ভোরে বাড়ি এসে তাদের মাকে বললে—মা, জুডারকে দেখছি না, ঘুম থেকে সে ওঠেনি এখনও ?

না রে, তোরা তাকে ওঠা গিয়ে—যা তো ?

কোথায় শুয়েছে সে, মা ?

ঐ যে অতিথিরা যে ঘরে শুয়ে আছে, সেই ঘরে।

ওরা মাকে দেখানোর জন্য একবার সে ঘরের দিকে গিয়ে ফিরে এসে বললে—জুডার সে ঘরে নেই ত মা, অতিথিরাও নেই। সে বোধ হয় তা হলে ঐ নাবিকদের সঙ্গে চলে গেছে, আমরা জানি ঘরে তার কোন দিনই মন টেঁকে না। নাবিকরা বোধ হয় তাকে কোন গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছে, কাল রাত্রে শুনছিলাম বটে ওরা নিজেদের মধ্যে ঐ রকম কি যেন সব বলাবলি করছিল।

মা বললে—তা হলে তোরা যা বলছিস বোধ হয় তাই হবে, আবার বিদেশে গেল সে! যাক, তার উপর আল্লার দোয়া আছে, আল্লা তার ভালই করবেন।

মা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তখনই বলে উঠল—কিন্তু আমি এতদিন তাকে না দেখে থাকব কি করে ? ও জুডার, জুডার রে, তুই একবার আমায় বলেও গেলি না, তোর দুঃখিনী মাকে এখন কে দেখবে রে!—এই বলে মা তখন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসল।

সালিমের তা আর সহ্য হল না, সে তখনই বুড়ীর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল—এই বুড়ী, যত মায়া তোর এই ছোট ছেলের জন্যে; কই আমরা দূরে গেলে তুই ত কাঁদিস না, ফিরে এলেও ত খুশী হতে দেখি না ? জুডার ছেলে, আর আমরা বুঝি তোর ছেলে না—না ?

মা কান্না থামিয়ে বললে—ছেলে হবে না কেন, দুশমন, বেইমান ছেলে, তোমাদের বাপের মৃত্যুর পর একটু ভাল কিছু করতে দেখলাম না তোমাদের, একটু ভাল ব্যবহার পেলাম না, অনাথা মায়ের সম্বলটুকু কেড়ে নিয়ে তাকে ঘরের বার করে দাও তোমরা,

তাকে শেষে ভিক্ষে করে খেতে হয়, আর জুডার আমার মুখের দিকে চায়, সেবা যত্ন করে, মান মর্যাদা বোঝে—সে কাছে না থাকলে কাঁদি কি সাধে !

তবে রে বুড়ী—সালিম ও সলিম দুই ভাই-ই তখন মায়ের উপর গিয়ে পড়ল, তারপর, তাকে নানা গালাগালি দিয়ে মারধোর করে ঘর তচনচ করে—জাদুকরা খাবারের থলি, মণি রত্ন সোনা ভরতি থলি—সব বের করে বললে—এসব আমাদের, পৈতৃক ধন এ !

মা ক্ষিপ্ত হয়ে বললে—না, কিছুতেই না, এসব জুডারের, এনেছে সে এসব ম্যাগরিবির দেশ থেকে।

মিছে কথা বলবার জায়গা পাওয়া না ? এসব আমাদের পৈতৃক, এ নিয়ে আমরা যা খুশি তাই করব—বলে সেগুলো তারা আত্মসাৎ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে বসল। মা বেচারা কোন কিছু না করতে পেরে, ও জুডার, জুডার রে, তোর জিনিস আমি রক্ষা করতে পারলাম না—রে !—বলে কাঁদতে লাগল।

মা কাঁদতে লাগল আর সালিম সলিম এদিকে দুই থলি থেকে মণিরত্ন আর মোহর বের করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল—গোল বাধল এসে জাদুকরা খাবারের থলি নিয়ে। এ বলে আমি নেব, ও বলে আমি।

মা তখন কান্না থামিয়ে বললে—বাবা, ও থলি নিয়ে আর তোরা ঝগড়াঝাটি করিস নে, ও কেটে ভাগ করতে গেলে ওর জাদু নষ্ট হয়ে যাবে, তার চেয়ে বরং ওটা আস্তই রাখ, আমার হেপাজতে রাখ, ও থেকে তোরা যেমন খাবার খেতে চাস বের করে দেব, যা ফেলাছড়া পড়ে থাকে তাই আমি খাব, তোরা পরবার কিছু দিস ত বুঝব সে আমার বহু ভাগ্‌গি। আমি তোদের মা, আমি যা বলছি তা করলে তোদের ভাই যখন ফিরে আসবে তার কাছে তোদের লজ্জার কিছু থাকবে না, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবি তোরা তার সামনে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা, ঐ জাদু থলি কে নেবে তাই নিয়ে সারারাত দু'ভাই গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করেই কাটিয়ে দিল।

ঘটনাচক্রে পাশের বাড়িতে সে রাত্রে সুলতানের একজন বড় কর্মচারী এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। ঐ বাড়িতেই রাত কাটাচ্ছিলেন তিনি। সালিম সলিমের ঝগড়া, মায়ের কান্নাকাটি আপোসের কথা সব কিছুই কানে গেল তাঁর। ভোরে উঠেই তিনি মিশরের সুলতান সামসুলদ্দৌলার কাছে গিয়ে সব ব্যাপার খুলে বললেন। সুলতান তখনই লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেলেন—সালিম আর সলিমকে তারপর বাদশাহী চালে তাদের দু'চারটা ধমক দিতেই, তারা সব কথা খুলে বলতে বাধ্য হল। বাদশা তখন চারটি থলিই বাজেয়াপ্ত করে ওদের দুই ভাইকে মারধোর করে কারাগারে বন্দী আর তাদের মাকে খাওয়া পরার জন্য নিয়মিত খরচ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদিকে জুডার জাহাজের বান্দা হয়ে দাঁড় টেনে আর ফাই ফরমাস খেটে দিন কাটাচ্ছে। এই কষ্টের জীবন এক বছর কাটানোর পর যে জাহাজে সে কাজ করছিল যে জাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে হঠাৎ কি করে এক ডুবোপাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেল, একমাত্র জুডার ছাড়া জাহাজের আরোহী কেউ আর বেঁচে রইল না। জাহাজের ভাঙা একখানা কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে জুডার কোন রকমে তীরে গিয়ে পৌঁছাল। ডাঙা পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখে সামনে বেদুইন বণিকদের এক তাঁবু। সেখানে আশ্রয়ের জন্যে গেলে তারা তার সাজগোজ দেখে বললে, তুমি কি নাবিক? এখানে কি করে এলে? জুডার তখন তার জাহাজডুবির দুর্দশার কথা তাদের খুলে বলল।

ঐ তাঁবুতে সেদিন জিড্ডার এক সদাগর ছিলেন, তাঁর বড় দয়ার শরীর। জুডারের অবস্থা দেখে তাঁর বড় মায়া হল, তিনি তাকে বললেন—তুমি আমার বাড়িতে কাজ করবে?

করব।

বণিক তখন জুডারকে নিজের দেশ জিড্ডায় নিয়ে এলেন। এরপর জুডারের কাজকর্ম আর মধুর বিনীত ব্যবহার দেখে খুশী হয়ে

বণিক যেখানে যেতেন সেখানে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এক বার মক্কায় তীর্থযাত্রা করলেন তিনি, সঙ্গে জুডার। সেখানে যাবার পর জুডার একদিন কাবা প্রদক্ষিণ করছে, সেই সময় হঠাৎ সামনে দেখে তার পুরনো বন্ধু আবদল সামাদ।

প্রদক্ষিণ শেষ হলে আবদল সামাদ জুডারের কাছে এসে সেলাম করে বললেন—কেমন আছ জুডার?

জুডার তাঁকে সেলাম করে নিজের দুর্দশার কথা বলে কাঁদতে লাগল। আবদল সামাদ তখন তাকে নিজের আস্তানায় এনে ভাল জামা কাপড় পরিয়ে ভাল খাবার খাইয়ে বললেন—তোমার দুর্ভোগ শেষ হতে যাচ্ছে এবার।

এরপর তিনি জুডারের জন্যে মাটিতে খড়ি পেতে গণনা করে দেখে বললেন—তোমার দুই ভাই, সালিম সলিম—তাদের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করছে, তারা এখন মিশর সুলতানের কারাগারে। তুমি আমার এখানেই থাক থেকে তীর্থকৃত্য করো।

জুডার বললে—জনাব, আমি যে বণিকের কাছে কাজ করছি, থাকতে হলে তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আসা দরকার।

তোমার কিছু ধার আছে তাঁর কাছে?

জি, না।

তবে যাও, জলাদি বিদায় নিয়ে এসো তাঁর কাছ থেকে।

জুডার তখন বণিকের কাছে গিয়ে বললে—এখানে আমার ভাইয়ের দেখা পেয়েছি, তাঁর কাছে যেতে চাই, তাই আপনার কাছে বিদায় চাইতে এসেছি।

বণিক বললেন—বেশ, নিয়ে এস তাকে আমার এখানে, এখানেই খাওয়া দাওয়া করবে।

তাতে বোধ হয় তিনি রাজী হবেন না, ধনী লোক তিনি—অনেক বান্দাবাঁদী তাঁর।

বণিক তাই শুনে তাকে বিশটা দিনার দিয়ে বললেন—আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতো তোমার যা পাওনা তাই দিলাম—এতে খুশী ত তুমি?

জি।

জুডার তখন বণিককে সেলাম করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরুতেই সামনে একটা গরিব লোক দেখে বিশটা দিনারই তাকে দিয়ে দিল, তারপর এল সে আবদল সামাদের কাছে। সেখানে থেকে তাঁরই সঙ্গে তীর্থের কাজ কর্ম সে শেষ করলে। সব কৃত্য শেষ হলে বাড়ি ফিরবার সময় আবদল সামাদ আলশামরদলের কাছ থেকে আনা সেই জাদু আংটিটা জুডারের হাতে দিয়ে বললেন—তোমারই আনা সেই আংটিটা তোমায় দিচ্ছি—এ জাদু আংটি, এর সেবক এক বান্দা আছে, নাম হচ্ছে তার আল রাদ অল কাসিফ—জিন সে। এ জগতে যা কিছু তুমি করতে চাও, যা কিছু পেতে চাও—এই আংটিতে ঘষা দিলেই অল কাসিফ এসে তা তোমার সব করে দেবে, তোমায় পাইয়ে দেবে।

আংটিটার গুণ জুডারকে ভাল করে হাতে নাতে দেখাবার জন্যে আবদল সামাদ সেটা আবার হাতে করে তাতে দিলেন এক ঘষা। অমনি বান্দা জিন এসে তাকে সেলাম করে বললে—হুকুম—হুজুর কি করতে হবে, কোন নগরকে ধ্বংস করতে চান আপনি, না জনশূন্য নগর আবার জনগণে ভরিয়ে দিতে চান, কোন বাদশাকে মারতে চান, কোন শত্রু-সৈন্য বিনাশ করতে চান, যা হুকুম করবেন তাই করে দেব আমি।

আবদল সামাদ বললেন—শোন বান্দা, এ সব কাজের জন্যে ডাকিনি। তোমায় আজ ডেকেছি তোমার নতুন মনিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। সামাদ তখন জুডারকে দেখিয়ে বললেন—এখন থেকে এই হচ্ছে তোমার নতুন মনিব, এর হুকুম তুমি ঠিকমতো তামিল করবে—বলেই তিনি জিনকে ছুটি করে দিলেন। এরপর আংটিটা জুডারের হাতে দিয়ে বললেন—এবার নিজে ঘষো তুমি আংটি, তাহলেই এর বান্দা জিন এসে হাজির হবে, তুমি তাকে করতে বলবে তাই সে তোমায় করে দেবে। খুব যত্ন করে রাখবে আংটিটা, এরই সাহায্যে তোমার শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করে

দিয়ে আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখবে তুমি ! আপাতত আংটি ঘষে জিনকে এনে তার পিঠে চড়ে বাড়ি যাও, অনেকদিন বাড়ি ছাড়া তুমি।

জুডার তখন ম্যাগরিবি আবদল সামাদের কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নিয়ে আংটিতে দিলে ঘষা, অমনি আংটির বান্দা আল রাদ এসে হাজির বললে—হুকুম, হুজুর।

জুডার বললে—আমাকে আজই কায়রো শহরে আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে চলো।

বহুৎ আচ্ছা—বলে জিন তখনই জুডারকে পিঠে করে ছুটল। রাত্রি দুই প্রহরের কাছাকাছি তার বাড়ির সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। জুডার মা, মা, করে ঘরে ঢুকতেই মা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল—তুই এলি বাবা, আমার অন্ধের নড়ি এলি ! এদিকে কি দুঃখে যে আমার কাল কেটেছে তা আল্লাই জানেন। তুই বাড়ি নেই, সুলতান তোর দুই ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে আঁধার ঘরে পুরেছে, থলি চারটে নিয়ে নিয়েছে। মা এই সব বলে আর কাঁদে।

জুডার তার মাকে বললে—তুমি কেঁদো না মা, আমি এখনই এনে দিচ্ছি আমার দুই ভাইকে। বলেই আংটিতে দিলে ঘষা, সঙ্গে আল রাদ এসে হাজির : কি করতে হবে—বলুন।

আমার দুই ভাই সুলতানের কারাগারে বন্দী হয়ে আছে তাদের এখনই এখানে এনে দাও।

জিন তখনই মাটিতে ঢুকে গেল—বেরুল এসে সুলতানের কারাগারে—যেখানে সালিম আর সলিম কারাযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রতি মূহূর্তে মৃত্যু কামনা করছিল। হঠাৎ কারাগারের মেঝে ফেড়ে জিনকে বেরুতে দেখেই তারা ভয়ে অচেতন হয়ে গেল, যখন জ্ঞান হল দেখে তারা মায়ের বাড়িতে, মায়ের পাশেই বসে রয়েছে জুডার।

তাদের জ্ঞান হতে দেখেই জুডার তাদের সাদর সম্ভাষণ জানালো—ওরা লজ্জায় মাথা নীচু করে কাঁদতে লাগল !

কেঁদ না ভাই, কেঁদ না—তোমাদের দোষ নেই, মাঝে মাঝে

মানুষের মাথায় শয়তান আর ধনলোভ ঢুকে এমন সব কাণ্ড করে! তোমরা আর কি করেছ—যোসেফের ভাইয়েরা যে তাকে মেরে ফেলবার জন্যে গর্তের মধ্যেই ফেলে দিয়েছিল। যাই হোক আল্লার কাছে ক্ষমা চাও, তিনি মেহেরবান, তিনি ক্ষমা করবেন। আমি ক্ষমা করেছি তোমাদের, আমার দ্বারা কোন অনিষ্ট তোমাদের হবে না, নিশ্চিন্তে থাক তোমরা এখানে মায়ের কাছে, আমার কাছে।

জুডার তখন—ভাইয়েরা তাকে বিক্রি করে দেবার পরে কি কষ্টে তার দিন কেটেছে, এবং তারপর মক্কায় পুরনো বন্ধু ম্যাগরিবি আব-দল সামাদের সঙ্গে দেখা হলে তিনি কেমন পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করছেন আর জাদু আংটি দিয়েছেন—সে সব কথা মা আর ভাইদের খুলে বললে। সালিম আর সলিম তখন বিশেষ অনুতপ্ত হয়ে বললে—ভাই, এবারকার মতো তুমি আমাদের ক্ষমা করো, এমনটি আর কোনদিন করলে—যা খুশি আমাদের শাস্তি দিও।

জুডার বললে—ছি, ছি, কি যে তোমরা বলো, তোমরা আমার আপন মায়ের পেটের ভাই, তোমাদের শাস্তি দিতে যাব আমি কিসের জন্যে, ও সব বাজে কথা নিয়ে আলেচনা এখন রাখো, এবার বলো ত সুলতান তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন?

সে আর বলবার কথা নয়। সুলতান আমাদের কি মারটাই মেরেছে, গর্দানের ভয় দেখিয়েছে, আর কি কদর্য ঘুপসি ঘরে আমাদের আটকে রেখেছিল, কি কষ্ট যে আমরা পেয়েছি তা কি বলব! তা ছাড়া আমাদের সেই চারটে থলিও কেড়ে নিয়েছে সুলতান।

আচ্ছা মজাটা দেখাচ্ছি সুলতানকে। বলেই জুডার তার যাদু আংটিতে দিলে ঘষা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আল রাদ এসে হাজির। তাকে দেখবামাত্র সালিম আর সলিম ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের মাকে জড়িয়ে ধরলে: মা, রক্ষা করো, বাঁচাও আমাদের, জুডার এখনই ওকে লেলিয়ে দেবে আমাদের মারতে।

মা, তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে—না, না, ভয় নেই তোদের, জুডার আমার তেমন ছেলে নয়।

এদিকে জুডার তখন জিনকে বলছে—শোন আল রাদ, সুলতানের কোষাগারে ধনরত্ন যা কিছু আছে—সব নিয়ে এস এখানে, এ ছাড়া জিনে বাঁধবার যে দু'জোড়া থলি কেড়ে নিয়েছেন তিনি আমার ভাইদের কাছ থেকে তা-ও নিয়ে আসবে।

যো হুকুম, খোদাবন্দ—বলে আল রাদ তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল এবং একটু পরেই জুডার যা যা আনতে বলেছিল সব কিছু এনে তার সামনে রেখে বললে—এই নিন, হুজুর, সুলতানের কোষাগারে আর কিছুই রেখে আসিনি।—আর কোন হুকুম, হুজুর ?

হ্যাঁ, আরও আছে : তুমি আজ রাত্রের মধ্যেই বাদশাহী মহলের মতো এমন একটা বাড়ি তৈরি করে দাও যে দুনিয়ায় তার জুড়ি মেলে না, ঐ বাড়িটা যেন সোনার পাতে মোড়া থাকে, ঘরগুলো যেন তার তোমার রুচিমতো চমৎকার আসবাবে সাজানো থাকে। ভোর হবার আগেই এ সব শেষ করা চাই।

যো হুকুম, বলে জিন মাটিতে মিলিয়ে গেল।

জুডার তখন তার জাদু থলি থেকে খাবার বের করে বহুদিন পরে তার মা আর ভাইদের নিয়ে খেতে বসল। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে জুডার ঘুমানোর জন্যে আরাম করে শুয়ে পড়ল, আর আল রাদ তখন তার জিন অনুচরদের নিয়ে নতুন মনিব জুডারের ফরমাসমতো তার বাড়ি তৈরি করার কাজে লেগে গেল।

রাত্রি ভোর হবার আগেই বাড়ি তৈরি এবং তা সাজ-সরঞ্জাম আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো হয়ে গেল। আল রাদ তখন জুডারকে গিয়ে বললে—হুজুর, আপনার বাড়ি তৈরি, সাজানো হয়ে গেছে, এসে একবার দেখুন।

জুডার এসে বাড়ি দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেল : এমন সুন্দর বাড়ি দুনিয়ার কোন বাদশারও নেই। জুডার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বার বার ঘোরাফেরা করে দেখে আর মনটা তার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সে তখন তার মাকে ডেকে এনে তার বাড়ি দেখিয়ে

বলে—কি মা, পছন্দ হয় এ বাড়ি ?—এ বাড়ি আমার, আসতে চাও এ বাড়িতে ?

তা আর চাই না ? তোর বাড়ি, আসব না আমি ? খোদা তোর ভাল করুন বাবা—সুখে রাখুন।

শুধু বাদশাহী বাড়িতে গেলেই ত চলে না, সেখানে তেমনি বাদশাহী ঠাটে থাকা চাই। জুডার তখন আংটি ঘষে আল রাদকে এনে বললে—আমার এ বাড়ির জন্যে চাই চল্লিশটি খুবসুরত গোরা বাঁদী, চল্লিশটি কালো বাঁদী, চল্লিশটি করে গোরা আর নিগ্রো বান্দা।

বহুৎ খুব—এখনই এনে দিচ্ছি আমি।

আল রাদ তখন তার অন্যান্য জিন অনুচর নিয়ে হিন্দ, সিন্ধ, ইরান, তুরান আফ্রিকা থেকে গোরা কালো বান্দা বাঁদী এনে জুডারের বাড়িতে হাজির করল।

আর চাই কিছু ?

হ্যাঁ, এদের জন্যে জমকালো সব পোশাক চাই।

তা-ও তখনই এনে দিল আল রাদ।

আর কিছু ?

হ্যাঁ, এবার আমার মায়ের জন্যে, আমার নিজের এবং ভাইদের জন্যে তোমার পছন্দমতো ভাল পোশাক চাই।

সে সবও এসে গেল তখনই। জুডার আর তার মা ভাইয়ের। যখন সেই পোশাক পরলে তখন তাদের দেখাতে লাগলো যেন সুলতান, সুলতানের মা এবং দুই উজিরের মতো।

আল রাদ বান্দা বাঁদীদের পোশাক পরিয়ে জুডারের মাকে দেখিয়ে বললে—ইনি তোমাদের মনিব, এঁকে সব সময় খুশী রাখতে চেষ্টা করবে, সেলাম কর।

মস্ত বাড়ি জুডারের, অনেক মহল। জুডারের দুই ভাই তাদের বান্দা বাঁদীদের নিয়ে এক এক মহলে রইল, আর জুডার রইল তার মা আর বান্দা বাঁদীদের নিয়ে মাঝের বড় মহলে। নিজের নিজের মহলে—সবাই যেন এক একজন সুলতান।

এই ত গেল জুডারের দিকের কথা। ওদিকে সুলতানের খাজাঞ্চী ভোরে কি একটা আনতে কোষাগারে গিয়ে দেখে কোষাগার একেবারে ফাঁকা—বিলকুল ফাঁকা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চীর মাথাটা কেমন করে উঠল, আর অমনি সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে তোশাখানার দরজা খোলা রেখেই সুলতান সামসুলদ্দৌলার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—জাহাঁপনা, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি ব্যাপার ?

গত রাত্রের মধ্যে কোষাগার একেবারে শূন্য হয়ে গেছে, গিয়ে দেখি একেবারে ফাঁকা—বিলকুল ফাঁকা।

শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন সুলতান : মানে, কি বলছ কি তুমি, কোথায় গেল আমার ধনরত্ন, কি করলে তুমি ?

মালেক, আল্লার কসম, আমি কিছুই জানি না—কিছুই বুঝতে পারছি না। কাল দেখে গেছি তোশাখানা ভরতি—সব ঠিক আছে, আজ সকালে গিয়েই দেখি একেবারে বিলকুল ফাঁকা। দরজা যেমন বন্ধ করে রেখে এসেছিলাম, ঠিক তেমনি বন্ধই আছে, দেয়ালে কোন ছেঁদা নেই, আগল ভাঙেনি, সুতরাং কোন চোর ঢোকেনি নিশ্চয়, কিন্তু বিলকুল ফাঁকা, তাজ্জব ব্যাপার !

সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—সেই দু'জোড়া থলি আছে ত ?

জি, না—তা-ও নেই।

শুনে সুলতান রাখে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সিংহাসন থেকে উঠে খাজাঞ্চীকে বললেন—চলো, দেখি গিয়ে তোমার তোশাখানা। কিন্তু কি আর দেখবেন ! সুলতান এসে দেখেন খাজাঞ্চী যা বলেছে তাই : কোষাগার একেবারে খাঁ খাঁ করছে। সুলতান ডাকলেন তাঁর সৈন্যদের : দেখ ত তোমরা কার এমন বুকের পাটা, আমার তোশাখানা লুঠ করে, মনে একটু ভয় ডর নেই !

সৈন্যেরা খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞাসা করলে সে সুলতানের কাছে যা যা বলেছিল তাদেরও সেই কথা বললে—শুনে তাদের শুধু বিস্ময়ের

মাত্রা বাড়ল ; সুলতানের কাছে নতুন খবর কিছু দিতে পারল না।

এমনি করে নানা তত্ত্বতল্লাস করেও যখন ব্যাপারটার কোন কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না—তখন সেখানে সুলতানের যে কর্ম-চারীটি সালিম আর সলিমকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এসে হাজির হলেন। তিনি এসে সকল কথা শুনে বললেন—জাঁহাপনা, কি বলব, এখন যেন তাজ্জবেরই খেল শুরু হয়েছে, কাল রাত্রে মিস্ত্রীদের ঠনা-ঠন আর ঝনাঝন শব্দে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারিনি, আজ ভোরে উঠে দিনের আলোতে দেখি যেখানে খালি মাঠ ছিল সেখানে পেল্লায় এক বাড়ি, আর কি চমৎকার সে বাড়ি, কি বলব ? দুনিয়ার কোন বাদশাহের বাড়ি তার কাছে লাগে না, বাড়ির গা একেবারে সবটুকু সোনার পাতে মোড়া, আর কি তার চেকনাই, একেবারে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। পথের লোকজন দেখি সব হাঁ করে দেখছে। আমি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার বাড়ি এ ?

ওরা বললে—এ জুডার সাহেবের বাড়ি। জুডার সাহেব বিদেশ থেকে অনেক ধনরত্ন, গোরা কালো বান্দা বাঁদী নিয়ে দেশে ফিরেছেন ভাই দুটীকে সুলতানের কয়েদখানা থেকে খালাস করে নিয়ে এসে-ছেন—তিনিই সুলতানী ঠাটে রয়েছেন এখন এ বাড়িতে।

শুনে সুলতান তখনই হুকুম দিলেন—দেখ ত তোমরা কয়েদখানায় সালিম আর সলিম আছে কি না!

তখনই লোক ছুটল কয়েদখানায়, একটু পরেই তারা ফিরে এসে বললে—না, হুজুর, তারা কেউ সেখানে নেই।

সুলতান তখন রেগে চোখ রাঙা করে বললেন—তা হলে কে চোর—তা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে !

উজির বললেন—কে, জাহাঁপনা ?

সুলতান বিরক্ত হয়ে বললেন—কারাগার থেকে সালিম সলিমকে যে সরিয়েছে—সেই। জুডার। জুডারই আমার তোশাখানা লুণ্ঠন করেছে ! শোন উজির, এখনই তুমি পঞ্চাশ জন জোয়ান লোক সঙ্গে দিয়ে একজন আমীরকে পাঠাও জুডারের বাড়িতে, গিয়ে ওরা তার

ধনরত্ন সব কেড়ে নিয়ে আসুক, আর ধরে নিয়ে আসুক ওদের তিন ভাইকে, আমি তাদের ফাঁসি কাঠে ঝুলাব।

উজির হাত জোড় করে ভয়ে আমতা আমতা করে বললেন—হুজুর একটু রয়ে সয়ে ভেবে চিন্তে কাজ করলে হত না?

কি বলতে চাও তুমি?

আমি বলছি—যা শুনলাম আমরা তার সম্বন্ধে তাতে আপনি যা বলছেন সে কাজটা তেমন সহজ হবে না। এক রাত্রের মধ্যে যে এমন বাড়ি তৈরি করাতে পারে—আমীর তাকে ধরে আনতে গেলে মুশকিলে পড়তে পারে।

আমি বলি কি—একজন আমীরকে আপনি পাঠান, কিন্তু তাকে ধরে আনতে নয়, তাকে নিমন্ত্রণ করতে। সে যদি আসে তবে আমি পেয়ার দেখিয়ে মিষ্টি কথায় তার কাছ থেকে তার ধন সম্পদ শক্তি সামর্থ্যের কথা জেনে নেব, তারপর যা করতে হয় আপনাকে পরামর্শ দেব। তাকে যদি তেমন শক্ত দেখি তাহলে আমরা কৌশলে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করব, আর যদি নরম দেখি ত আপনাকে বলব, আপনি তাকে ধরে নিয়ে এসে যা খুশী তাই করুন।

উজিরের যুক্তি শুনে সুলতান তখন ওসমান নামে তাঁর এক আমীরকে ডেকে বললেন—ওহে, তুমি পঞ্চাশজন লোক নিয়ে যাও একবার জুডারের বাড়িতে, তাকে আমার এখানে খানা খেতে ডেকে নিয়ে এস। তাকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরবে না কিন্তু।

আমীর ওসমান চললেন বটে সুলতানের আদেশে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে, কিন্তু তাঁর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই, তা ছাড়া নিজেকে ভাবেন তিনি মস্তবড় একটা কিছু। এসেই তিনি দেখলেন জুডারের বাড়ির সামনের ফটকে একটা সোনার কুর্সিতে রীতিমতো মজবুত একটা খোজা বসে রয়েছে। আমীর পঞ্চাশটা অনুচর নিয়ে তার সামনে এলেও তাঁকে দেখে খোজা একবার ওঠা ত ভাল, তাঁর দিকে একটু চেয়েও দেখলে না। এর কারণও আছে, এ খোজা আসলে হচ্ছে আংটির বান্দা, জিন আল রাদ কাসিফ। জুডার তাকে

খোজার ছদ্মবেশে প্রাসাদের ফটকে বসে থাকতে বলেছে। যাই হোক, আমীর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওহে, তোমার মনিব কোথায় ?

বাড়িতেই আছেন।

উত্তর দেবার সময় আল রাদ নড়ল না চড়ল না, মুখ পর্যন্ত ফেরালো না, আরামে কুর্সি হেলান দিয়ে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। দেখে ওসমান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—বেয়াদপ, বেতমিজ, বান্দা হয়ে নবাবী চাল দেখাচ্ছ তুমি, লজ্জা করে না ?

আল রাদ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে—বেশি বক্ বক্ না করে সরে পড়ো ত এখান থেকে।

এই শুনে রাগে আর নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আমীর ওসমান হাতের লোহার মুগুরটা দিয়ে আল রাদের মাথায় যেই ঘা দিতে গেলেন অমনি আল রাদ হঠাৎ ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো তড়াক্ করে এক লাফে উঠে আমীরের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে তাকেই আচ্ছা করে লাগালো চার ঘা। আমীরের সঙ্গের পঞ্চাশ জন লোক এ দৃশ্য দেখে আর থাকতে না পেরে খোলা তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করতে এল আল রাদকে।

তবে রে কুত্তার দল, তলোয়ার দিয়ে কাটতে এসেছিস আমাকে, দাঁড়া, দেখাচ্ছি—বলে আল রাদ মুগুর হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের মাঝে, এবং কোন কিছু করবার সুযোগ না দিয়েই তাদের এমন পেটান পেটালো যে তাদের হাড়গোড় ভেঙে গা দিয়ে রক্ত বের করে ছাড়ল। তারা কোন রকমে নিজেদের প্রাণটা নিয়ে ফিরে যেতে পারল আল রাদের কাছ থেকে। ওরা পালিয়ে গেলে আল রাদ যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গীতে নিজের কুর্সিতে এসে বসে রইল।

এদিকে আমীর তাঁর লোকজন নিয়ে ফিরে এলে সুলতান বললেন—কই হে, যাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের, সে জুডার কই ?

শুনে আমীরের চোখে জল এসে গেল, তিনি বললেন—হুজুর, আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের কি হাল হয়েছে !

আমীরের হাল দেখে এবং সব শুনে সুলতান রেগে গিয়ে বললেন—এবার একশো লোক গিয়ে তাকে টিট করে দিয়ে আসুক।

সুলতানের হুকুমে একশো লোকই অবশ্য গেল—কিন্তু আল রাদকে আক্রমণ করতে গেলেই আল রাদ মুগুর দিয়ে তাদের এমন পেটান পেটালো যে তারা পালাতে দিশে পায় না। তারা ফিরে এসে সুলতানের কাছে তাদের দুর্দশার কথা বললে, সুলতান পাঠালেন এবার দুশো লোক, কিন্তু তারাও বেদম মার খেয়ে ফিরে এল।

এবার আরও রোখ চেপে গেল সুলতানের, তিনি উজিরকে ডেকে বললেন—শোন উজির, এবার তোমাকে পাঠাচ্ছি আমি, পাঁচশো লোক নিয়ে তুমি যাও, গিয়ে ঐ খোজাটার সঙ্গে জুডার এবং তার ভাই দুটোকেও বেঁধে নিয়ে এস।

উজির বললেন—জাহাঁপনা, আপনি যখন হুকুম করেছেন তখন আমি যাচ্ছি, কিন্তু পাঁচশো কেন, একটি লোকও সঙ্গে নেব না, একাই যাব, আর তা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও আমি কিছু সঙ্গে নেব না।

বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ—তাই করো

উজির তখন তার উজিরের পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে সাদা পোশাক পরে তসমীর মালা গলায় দিয়ে একা একাই পায়ে হেঁটে জুডারের বাড়ির ফটকের সামনে এসে অতি ভদ্রভাবে বিশেষ সমীহ করে আল রাদের পাশে বসে বললেন—সেলাম আলেকুয়াম। আল রাদও তার প্রত্যুত্তরে তাকে আলেকুয়াম সেলাম জানালো বটে, কিন্তু জানাল সে তাঁকে—মানুষ বলে সম্বোধন করে।

উজিরকে মানুষ বলে সম্বোধন করাতেই বুদ্ধিমান উজির বুঝলেন, ও তা হলে মানুষ নয়, মানুষের ছদ্মবেশে কোন জিন। ভাবতেই বুকটা কেমন ছাঁৎ করে উঠল, ভয়ে ভয়ে তিনি বললেন—জনাব, আপনার মনিব বাড়িতে আছেন ?

হ্যাঁ, তিনি বাড়িতেই

আপনি তাহলে তাঁর কাছে গিয়ে একবার বলুন যে সুলতান সামসুলদ্দৌলা তাঁকে সেলাম জানিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে তিনি যদি

সুলতানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আজ খানাপিনা করেন তাহলে তিনি নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করবেন।

আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা করো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

উপরওয়ালা হুকুম করলে নিম্নতম কর্মচারী যেমন সম্ভ্রমের সঙ্গে অপেক্ষা করে উজির তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে জিন আল রাদ জুডারের কাছে গিয়ে বললে—হুজুর, সুলতান তার এক আমীরের সঙ্গে পঞ্চাশজন লোক পাঠিয়েছিল, এখানে, আমি তাদের মেরে তাড়িয়ে দি, তারপর পাঠায় একশো লোক, তাদেরও মেরে তাড়াই আমি, তারপর পাঠালো ছুশো, তাদেরও ঐ দশা করলাম। এবার পাঠিয়েছে তার উজিরকে, অস্ত্রশস্ত্র নেই তার হাতে, সে এসে বলছে, সুলতান আপনাকে তার সঙ্গে খানা খেতে ডেকে পাঠিয়েছে।

শুনে জুডার হুঙ্কার দিয়ে উঠলে—কি, বলছ কি তুমি, যাও উজিরকে ডেকে নিয়ে এস এখানে।

জিন এসে উজিরকে বললে—এস, মনিব তোমায় ডাকছেন।

উজির নিতান্ত বশংবদের মতো জিনের পিছু পিছু উপরে উঠে এসে দেখেন—ছুনিয়ার সুলতানরা দেখে শিখতে পারেন এমন ঠাটে জুডার বসে আছে এক গালিচার উপর আর সে গালিচাই বা কি চমৎকার, সুলতান সামসুলদ্দৌলা বা তিনি এমনটি কোনদিন চোখেও দেখেননি! আর শুধু কি তাই—এমন প্রাসাদও কোনদিন চোখে পড়েনি তাঁর, যে কোন কিছুর দিকে চাইলেই চোখ ঝলসে যায়। উজির তখন সম্ভ্রমে জুডারের সামনের মেঝেতে নত হয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে সম্মান জানিয়ে অনেক আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

জুডার তাঁকে বললে—জনাব, কি কাজে আসা হয়েছে আপনার এখানে?

উজির বললেন—হুজুর, আপনার বন্ধু সুলতান সামসুলদ্দৌলা আপনার একবার দর্শন লাভ করতে চান, তাই সেলাম জানিয়ে আমায়

দিয়ে আপনাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে আজ খানা খেতে, আপনি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে দিলটা তাঁর বড় খুশী হয়।

জুডার বললে—তিনি যদি আমার দোস্তই হন, তাহলে তাঁকে আমার সেলাম জানিয়ে তাঁকেই আমার এখানে আসতে বলুন।

যো হুকুম, বলে উজির চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু জুডার তখনই তাঁকে যেতে দিল না, আল রাদকে বলে অতি চমৎকার একটি পোশাক আনিয়ে উজিরকে দিয়ে বললে—ও পোশাক ছেড়ে এই পোশাক পরে আপনি যান।

এমন পোশাক উজির কোনদিন দেখেননি, যাইহোক মনে মনে পোশাকের তারিফ করতে করতে খুশী হয়ে সেই পোশাক পরে তিনি সুলতানের কাছে গিয়ে—জুডারের সঙ্গে যে সকল কথা-বার্তা হয়েছে তা খুলে বললেন। সুলতান তখনই তাঁর লোকজনদের ঘোড়ায় চড়ে প্রস্তুত হতে বললেন, নিজের জন্য একটা তাজী ঘোড়া আনিয়ে তাতে চড়লেন, তারপর সদলবলে চললেন জুডারের বাড়িতে।

এদিকে উজির চলে গেলেই জুডার আল রাদকে বললে—রাদ, তুমি এক কাজ করো : তোমার যে সব ইফরিদ অনুচর আছে তাদের কিছু এনে আমার বাড়ীর সামনের ময়দানে প্রহরীর বেশে সাজিয়ে দাও, সুলতান আসছেন, ওদের দেখেই তিনি ভয় পেয়ে যাবেন, তা ছাড়া দেখলেই বুঝবেন, তাঁর ক্ষমতার চেয়ে আমার ক্ষমতা কত বেশি! আল রাদ জুডারের কথা শুনে তখনই দীর্ঘকায় জোয়ান জোয়ান দুশো ইফরিদ এনে নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আর বর্মে সাজিয়ে প্রহরী করে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল জুডারের বাড়ির সামনের ময়দানে। সুল-তান এসে তা দেখবামাত্র তাঁর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। সুলতান ভয়ে ভয়েই জুডারের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, গিয়ে দেখেন জুডার মণিমুক্তার কাজ করা শ্বেত পাথরের মস্তবড় এক ঘরে অপরূপ সুন্দর এক গালিচার উপর এমন ভঙ্গীতে বসে আছে—যা দেখলে বাদশা-দেরও পিলে চমকে যায়। সুলতান জুডারের সামনে গিয়ে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে তাকে সেলাম জানালেন, কিন্তু জুডার কোন কিছুই

করলে না, উঠে দাঁড়াল না, কোন সম্মান দেখাল না, এমন কি মুখেও বললো না, পর্যন্ত,—বসুন। সুতরাং সুলতান জুডারের সামনে দাঁড়িয়েই রইলেন। জুডার না বললে তিনি বসতেও পারছেন না, আবার যেতেও পারছেন না। এদিকে ভয়ও পেয়ে গেছেন খুব, ভাবছেন ও যদি আমাকে কিছুমাত্র ভয় করত তা হলে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারত না, ও নিশ্চয়ই আমাকে শত্রুভাবে দেখেছে, কিছু অনিষ্ট করতে চায়। সুলতান কেবল জিজ্ঞাসা করতে যাবেন—জুডারের কি অসন্তোষের কারণ ঘটিয়েছেন তিনি, এমন সময় জুডারই কথা বললে, সুলতানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে—অতি গর্হিত কাজ করেছেন আপনি, রাজা হয়ে প্রজার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া, তাদের নির্যাতন করা আপনার মতো লোকের শোভা পায় না।

সুলতান হাত জোড় করে বললেন—জনাব, মাফ চাইছি আমি, ধনলোভেই আমি এ কাজ করে বসেছিলাম, এবারের মতো মার্জনা করুন আমায়। ক্ষমার বড় ধর্ম নেই।

সুলতান এমনি করে অনেক অনুনয় বিনয় করতে থাকায় শেষে জুডারের বুঝি মন গললো, বললে—আমি ক্ষমা করবার কে, আল্লা আপনায় ক্ষমা করুন, আর করবেন না এমন, বসুন।

সুলতান স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বসে পড়লেন। জুডার তখন তার ভাইদের ডেকে খানার আয়োজন করতে বললে। ভালো দামী কাপড় বিছিয়ে তার উপর সোনার থালায় চল্লিশ রকমের ভালো ভালো সব খাবার পরিবেশন করা হল। এমন খানা বাদশাহের কোনদিন ভাগ্যে জোটেনি। খানাপিনা হয়ে গেলে জুডারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সুলতান সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন। যাবার সময় জুডার সুলতানের লোকজনদের দামী দামী পোশাক ও অনেক ধনরত্ন বকশিশ দিলেন।

এরপর সুলতান রোজই আসতে লাগলেন জুডারের বাড়িতে, এমন কি শেষে দরবারও বসাতে লাগলেন এ বাড়িতে। বন্ধুত্ব বেশই জমে উঠল।

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল কিন্তু সুলতানের মনের ভয়-ভয় ভাব আর যায় না। মনের এই ভাব চেপে রাখতে না পেরে একদিন তিনি বলেই বসলেন উজিরকে—উজির আমায় একটা যুক্তি দাও ত—কি করি?

কিসের যুক্তি, জাহাঁপনা?

আমার কেবলি ভয় হয়—জুডার বুঝি কোনদিন আমাকে মেরে আমার রাজ্য কেড়ে নেয়!

উজির বললেন—রাজ্য নেওয়ার তার কোনই প্রয়োজন নেই কারণ আপনার রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি ধনসম্পদ তার আছে, আপনার রাজ্যের লোভ করলে তাকে খেলো হতে হয়, সুতরাং সে ভয় করবেন না আপনি, তবে যদি এ ভয় থাকে যে সে আপনাকে হত্যা করবে তবে তা-ও দূর করবার এক ভাল উপায় আছে।

কি, বলো এখনি?

আপনার যে মেয়ে আছে—তার বিয়ের বয়স হয়েছে—এবং সে পরমা সুন্দরী। জুডারের সঙ্গে তার বিয়ে দিন, তা হলে এ ভয় আর কোনদিন থাকবে না।

সুলতান খুশী হয়ে বললেন—ঠিক, ঠিক বলেছে উজির, তুমিই যোগাযোগ করে এ বিয়েটা ঘটিয়ে দাও।

এটা ঘটাতে হলে একটা কৌশল করতে হবে।—আপনি তাকে একদিন আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করুন। সে এলে তাকে সব চেয়ে ভাল ঘরে বসিয়ে খানা খাইয়ে তার সঙ্গে বসে গল্প গুজব করতে থাকবেন আপনি—আর আপনার মেয়েকে বলা থাকবে সে যেন ভাল জামাকাপড় গহনা পরে ঐ ঘরের দরজার সামনে দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করে। নজর একবার পড়বেই জুডারের, দেখবেই সে, আর অমনি বেহেস্তের হুরীর মতো খুবসুরত মেয়েকে দেখামাত্র সে না ভালবেসে পারবে না। শুধু ভালবাসা নয়, সে ওকে পাবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে যাবে। তার মনের এই অবস্থা বুঝতে পারলেই আমি তাকে আপনার মেয়ের পরিচয় দিয়ে দেব। তখন আমাকেই

ধরে বসবে সে। তখন আমিই তাকে নিয়ে আসব আপনার কাছে, সে নিজে আসবে আপনার মেয়ের পাণি প্রার্থনার জন্যে। আপনি কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গ জানেন না এমন ভাব দেখাবেন।

সুলতান শুনে বললেন—তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না, উজির। সাধে কি তোমায় উজির করেছি!

উজির তখন বলে চলেছেন—এই বিয়েটা দিতে পারলেই—বুঝে দেখুন—আর কোন ভয় রইল না। আর জুডার যদি মারা যায় তা হলে তার ধনসম্পদ বাড়িঘর বান্দাবাঁদী—সব আপনার হাতে এসে যাবে।

উজিরের সব কথাই সুলতানের বড় মনে ধরল, তিনি তার পরের দিনই জুডারকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। সে এলে ভাল ঘরে বসিয়ে খানাপিনার পর তার সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এদিকে বেগমের কাছে বলা ছিল জুডার এলে মেয়েকে ভাল করে সাজিয়ে দরজার সামনে যেন আনাগোনা করান।

বেগম সুলতানের কথামতো কাজ করলে—উজির যা বলেছিলেন ঘটে গেল। জুডার ঐ পরীর মতো সুন্দরী শাহাজাদীকে দেখবামাত্র কেমনই যেন হয়ে গেল, দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদের মতো কেমন একটা আওয়াজ বেরুল তার মুখ থেকে, চোখে কেমন বিহ্বল দৃষ্টি, মুখ বিবর্ণ। উজির লক্ষ্য করলেন আগের মতো আর সুলতানের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না সে। এই সময় উজিরের ইঙ্গিতে সুলতান বাইরে গেলে জুডার বললে—উজিরের সাহেব, দরজার সামনে দিয়ে যে মেয়েটি গেল—ওটি—

জনাব, ওটি—এই সুলতানেরই মেয়ে—

তা—তা—কথা আর শেষ করতে পারল না জুডার

সুযোগ পেয়ে উজির বললেন—আপনার যদি পছন্দ হয় ত অনু-মতি করলে আমি সুলতানের কাছে আপনার সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাব করতে পারি।

জুডার তখন উজিরের হাত ধরে মিনতি করে বললে—উজির

সাহেব, তাই আপনি করুন, যদি সক্ষম হন ত চিরদিন আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব, আর ধনরত্ন যা কিছু চান আপনি তাই আপনাকে দেব। সুলতান এর জন্য যে পণ চান—তা-ও আমি দেব। চিরদিনের আত্মীয় হয়ে থাকব আমরা।

এরপর সুলতান সেখানে এসে গেলেই উজির কথাটা পাড়লেন : জাহাঁপনা, এতদিন জুডার সাহেব আপনার বন্ধু ছিলেন, এখন তিনি আপনার আত্মীয় হতে চান—

কেমন—?

তিনি আমার মারফত আপনার কন্যা—শাহাজাদী আসিয়ার পাণি প্রার্থনা করছেন, যে পণ চান আপনি, তা উনি দিতে রাজী।

শুনে সুলতান রীতিমতো খুশী হয়ে বললেন—আরে পণের কথা কি বলছ উজির, উনি যখন একথা বলছেন তখন পণ ত আমার পাওয়াই হয়ে গেছে, আর আমার মেয়ে আসিয়াকে ওঁর বাঁদী করে দিচ্ছি, ওঁকে জামাই করে পাওয়া ত আমার পরম আনন্দের কথা, সম্মানের কথা।

জুডারকে সে রাত্রে আর বাড়ি যেতে দিলেন না সুলতান, আদর করে নিজের বাড়িতেই রেখে দিলেন। পরের দিন দরবার বসল—বাদশামহলে, সে দরবারে সুলতান আমীর ওমরাহ ছোটবড় সবাইকে ডাকলেন—ডাকলেন সেরা আইনজ্ঞ শেখ-অল-ইসলামকে। সবার সামনে জুডার সুলতানের মেয়ের পাণি প্রার্থনা করলে, সুলতান বললেন—পণ পাওয়া আমার হয়ে গেছে। বিয়ের চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে যাবার পর জুডার আবদল সামাদের থলি আনিয়ে মণি-রত্ন দিলেম কনেকে। ঢাক ঢোল শানাই বেজে উঠল, মহা আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল, উৎসব চলল কয়েকদিন ধরে।

বর কনে খুশী, সুলতান খুশী, আমীর ওমরাহ, সৈন্যসামন্ত রাজ্যের প্রজাগণ খুশী। সবারই বেশ কিছুদিন সুখেই দিন কাটল। তারপর একদিন খোদার কাছ থেকে সুলতান সামসুলদ্দৌলার ডাক এলে তিনি তাঁর কাছে চলে গেলেন। সৈন্য সামন্তরা জুডারকে

সিংহাসনে বসাতে চাইল জুডার রাজী হল না, অবশেষে তাদের অনেক ধরাধরি পীড়াপীড়িতে তাকে রাজী হতে হল।

জুডার সুলতান হয়েই শ্বশুরের কবরের উপর মস্তবড় এক মসজিদ তৈরি করিয়ে দিলে, আর শহরের যে অঞ্চলে জুডারের বাড়ি ছিল সে অঞ্চলে সে এক জুম্মা মসজিদ এবং অতিথিশালার জন্যে অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরি করালে, এর পর থেকে অঞ্চলটার নাম হল জুডারিয়াহ্। এ ছাড়া সালিম সলিম দুই ভাইকে সে তার দুই উজির, বড় ভাই সালিম বসত তার ডাইনে, আর মেজো বাঁয়ে।

এমনি করে এক বৎসর সে বেশ সুখেই রাজত্ব করল। তারপর?

তারপর বড় ভাই সালিম একদিন মেজো ভাই সলিমকে একান্তে ডেকে বললে—ও ভাই এমনিধারা আর কতদিন চলবে? ছোট ভাইয়ের তাঁবেদারি আর দাসত্ব করে সারাজীন কাটাব নাকি আমরা?—ও বেঁচে থাকতে ত আর আমাদের আশা নেই, কি করে ওকে খতম করা যায় তাই একবার ভেবে দেখ।

সালিম বললে—আমি আর ভাবব কি, এসব ব্যাপারে তোমার মাথাটাই খোলে ভালো, তুমিই উপায় ঠিক করো।

তা করছি, কিন্তু তোমাকে ভাই আগে থাকতেই বলে রাখছি, কাজটা ঠিক মতো হাসিল করতে পারলে আমি কিন্তু ভাই সুলতান হব, আর আংটিটা রাখব, আর তোমাকে দেব ঐ জিনে বাঁধবার থলি দুটো, আর এ ছাড়া তুমি হবে আমার প্রধান উজির। কেমন—রাজী আছ ত?

হ্যাঁ, রাজী।

এর পর সালিম সলিমের সঙ্গে যুক্তি করে তাকে সঙ্গে নিয়ে জুডারের কাছে গিয়ে বললে—ও ভাই, একটা কথা বলতে এলাম তোমায়।

কি, বলো।

বুঝতেই পারছ তোমার উন্নতিতে আমরা কত খুশী হয়েছি, তোমার গৌরবেই আমাদের গৌরব। তোমার সংবর্ধনার জন্যে

আমাদের নিজের মহলে তোমাকে আমরা এক একটি ভোজ দিতে চাই।

শুনে জুডার খুশী হয়ে বললে—বেশ, এ তো খুব ভাল কথা, খুশীর কথা। তা ভোজটা কবে কার বাড়িতে হবে?

সালিম বললে—আজই, আগে আমার বাড়িতে তার পর সলিমের ওখানে খাবে তুমি।

বেশ, চলো, যাচ্ছি, বলে জুডার ভাইদের পিছু পিছু এল।

সালিম আগে থেকে জুডারের খাবারে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে রেখেছিল, জুডার তা মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঢলে পড়ল। সালিম তখনই জুডারের আঙুল থেকে আংটিটা খুলতে গেল, পারলে না তাই ছুরি দিয়ে আঙুলটা কেটে আংটি বের করে তাতে দিল ঘষা। অমনি আল রাদ সামনে এসে বললে—হুকুম, কি করতে হবে—বলো।

সালিম বললে—এই যে আমার ভাই সলিম রয়েছে, একে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো, তারপর এর লাস, আর ঐ যে বিষ খাইয়ে মারা জুডারের লাস রয়েছে, এই দুটো লাস সৈন্যদের নাকের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে—ফেলে দাও।

আল রাদ সলিমকে হত্যা করে তার আর জুডারের লাস সেনা বিভাগের কর্মচারীদের সামনে দিয়ে যখন নিয়ে যায়, তখন তারা খানা খাচ্ছিল, এ দৃশ্য দেখেই তাদের হাত থেকে খাবার পড়ে গেল, তারা হাহাকার করে উঠল : আমাদের সুলতান আর উজির সাহেবের এ দশা কে করলে?

আল রাদ উত্তর দিলে—করলে তাদের ভাই সালিম।

ঠিক সেই সময় সালিম তাদের সামনে এসে বললে—তোমরা খাও, আর আনন্দ করো, কারণ জুডার মারা গেছে, তার আংটি এখন আমার হাতে, আর এই আংটির আজ্ঞাবহ যে জিন আল রাদ তাকে তোমরা এখন তোমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছ, তাকেই হুকুম দিয়ে আমি সলিমকে মারিয়েছি, কারণ এখানকার সুলতানি নিয়ে সে

আমার সঙ্গে বিবাদ করতে পারত। তোমরা ভেবে দেখে বলো তোমার এখন আমাকে সুলতান হিসাবে মানতে রাজী কিনা, যদি রাজী না হও, তাহলে এই আংটি ঘষে জিন ডেকে আমি তোমাদের ছোট বড় সবাইকে শেষ করব।

ওরা সবাই ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে সুলতান হিসাবে মানতে রাজী হয়ে গেল। তখন সালিম কয়েকজন লোককে হুকুম দিল তার ভাই দুটিকে কবর দিতে, বাকী লোকেরা শোভাযাত্রা করে সালিমকে নিয়ে দরবার ঘরে এল। সেখানে এসে সিংহাসনে বসেই সে বলে উঠল—আমি আজই আমার ভাই জুডারের বেগম আসিয়াকে বিয়ে করতে চাই।

তা ত হতে পারে না, হুজুর বৈধব্যের শোকের দিনগুলি কেটে যাক, তারপর—

বৈধব্যের দিনটিন আমি মানি না, আজ রাত্রি থেকেই সে আমার বেগম।

যেই কথা সেই কাজ। সেদিন সেখানে সেই দরবারে বসেই সে বিয়ের চুক্তি পাকা করে নিলে, তারপর খবর পাঠালো বেগমকে যে সে তার মালিক হিসাবে আসছে তার কাছে।

বেগমের অনুমতি পেতে বেগ পেতে হল না, তার। বেগমের ঘরে গেলে বেগম আসিয়া তাকে সংবর্ধনা করেই বসালো, খুশীর ভাব দেখিয়ে আদর করে তাকে এক পেয়ালা সিরাজি পান করতে দিলে, সিরাজিতে তীব্র বিষ মেশানো ছিল, পান করবার সঙ্গে সঙ্গে সালিম মরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

আসিয়া তখনই সালিমের হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে দিল, জিনে বাঁধবার থলিগুলি কেটে ফেড়ে চৌচির করে দিলে, তার পর ডেকে পাঠাল শেখ অল-ইসলাম এবং রাজ্যের অন্যান্য হোমরা চোমরা রাজকর্মচারীর দলকে। তাঁরা এলে তাঁদের কাছে সকল ব্যাপার খুলে বলে বললে—এবার আপনারা দেখেশুনে আপনাদের নতুন সুলতান নির্বাচন করুন।

গল্প শুনে তুনিয়াজাদী বললে—দিদি, তোর এ গল্পটা কি সুন্দর আর ভয়ংকর, তা ছাড়া আলাদীন আর তার সেই আশ্চর্য প্রদীপের কথা মনে করিয়ে দেয়!

শাহরিয়ার বললেন—তুনিয়ার লোক যে কত ভাল আর কত মন্দ হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেলে তোমার এ গল্পে, শাহরা। আমার ভাগ্য ভাল, আর খোদার অশেষ দোয়া যে আমার নিজের ভাই এমন তুশমন নয়।

শাহরাজাদী বললে—জাহাঁপনা শুধু তাই নয়, আপনি দেশের সুলতান, খোদার যে কত দোয়া আপনি লাভ করেছেন—সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প শোনাতে পারি আপনাকে—যদি হুকুম করেন—

বেশ, কালই শোনাও তুমি আমায় তোমার সে গল্প।

সুলতান মামুদের দুই জীবন

পরদিন শাহরাজাদী তার প্রতিশ্রুত গল্প শুরু করলে—

সুলতান মামুদ মিশরের নামকরা সুলতান, যেমনি গুণী তেমনি জ্ঞানী, বীরত্ব ও মহত্ত্বের তাঁর তুলনা নেই, কোষাগারে ধনরত্নেরও তাঁর অপ্রাচুর্য নেই। সুতরাং সব দিক দিয়ে সব সময়েই তাঁর সুখে থাকবার কথা। থাকবার কথা হলেও তা তিনি থাকতেন না, মাঝে মাঝে বিনা কারণে তিনি এমন ভীষণ মনমরা হয়ে পড়তেন যে তামাম দুনিয়ায় এক ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু তিনি দেখতে পেতেন না, অথচ আল্লা তাঁকে খুশী করতে সুখে রাখতে কত কি না তাঁকে দিয়েছেন : অটুট স্বাস্থ্য-ভরা যৌবন, শক্তি, রাজভক্ত প্রজা, দুনিয়ার সেরা নগরী রাজধানী, সুনীল আকাশ, নীল নদের স্বচ্ছ নির্মল জলধারা, হারেমে ঐ নদীর তরঙ্গের মতোই অফুরন্ত প্রাণৈশ্বর্যে ভরা নারী। মন খারাপ হয়ে গেলে খোদার এ উদার অপার দানের কথা ভুলেও একবার মনে পড়ত না তাঁর, মনে হত তাঁর চেয়ে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সব চাষী চাষ করছে, জলশূন্য মরুভূমিতে যে সব পথিক দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—তারাও তাঁর চেয়ে সুখী।

একবার অন্যান্য বারের চেয়েও অনেক বেশি মন খারাপ নিয়ে বসে আছেন তিনি নিজের ঘরে, খানাপিনা করা নেই, রাজ্যশাসনে মন নেই, এ বিষাদের ভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কামনা করছেন যখন মৃত্যু, তখন তাঁর প্রধান উজির তাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে বললে—জাহাঁপনা, পশ্চিম মুলুক থেকে একজন শেখ এসেছেন এখানে। তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হল তাঁর মতো জ্ঞানী গুণী

হাকিম এবং বড় জাদুকর হালে আর দুনিয়ার নেই। জাহাঁপনার মনের অশান্তি যদি তিনি কিছু দূর করতে পারেন—এই আশায় তাঁকে আপনার সামনে একবার হাজির করতে চাই, যদি অনুমতি দেন—

সুলতান মাথা নেড়ে অনুমতি জানালে উজির তখনই সেই শেখকে আনতে গেলেন।

উজিরের সঙ্গে যখন শেখ এলেন সুলতানের সামনে তখন সুলতান প্রথমে বুঝেই উঠলেন না, ইনি আল্লার পয়দা কোন মানুষ না মানুষের ছায়া, বয়স আন্দাজ করতে গিয়ে মনে হল—কয়েকশো বছর অন্তত ছাড়িয়ে গেছে। শেখের পোশাক বলতেও কিছু গায়ে নেই, কোমরে জড়ানো একটা চামড়ার চওড়া পেটি তাতেই নগ্নতা নিবারণ করেছে, আর করেছে তাঁর অসম্ভব লম্বা দাড়ি সে দাড়ি তাঁর প্রায় হাঁটু ছোঁয় ছোঁয়। মিশরের মজুরেরা মাটি খুঁড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে গ্রানীটের কবরের মধ্যে যে সব শব দেখতে পায় এঁকে তারই একটা বলে মনে করতে বাধা ছিল না, যদি না উঁচু উঁচু কোটরের মধ্যে অতি বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ জ্বলজ্বল করত।

শেখ সুলতানের সামনে এসে সম্মান দেখাতে কিছুমাত্র নত না হয়ে বললেন—সেলাম, সুলতান মামুদ। গলার আওয়াজ যেন ঠিক মনুষ্যের মতো নয়।

বললেন—পশ্চিম মুলুকের পীর ভাইয়েরা পাঠিয়েছেন আমায় তোমার এখানে, আল্লা যা সব দিয়েছেন তোমায় সে সম্বন্ধে তোমাকে ওয়াকিবহাল করে তুলতে।

এই বলে আর কিছুমাত্র ভনিতা না করে, কোন রকম সম্মান না দেখিয়ে তিনি সুলতানের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন একটা জানালার ধারে। ঘরের চারধারে চারটে জানলা। প্রথম জানালার কাছে গিয়ে শেখ হুকুম করলেন সুলতানকে—খোলো জানালা। অনুগত বাধ্য শিশুর মতো সুলতান খুলে ফেললেন জানালা।

তাকিয়ে দেখ।

সুলতান জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন পাহাড়ের কেল্লা থেকে অশ্বারোহী সৈন্যরা বেরিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে, আর শুধু আসছে না, সামনের দল একেবারে এসে গেছে—তাঁর প্রাসাদের কাছে, উঠতে শুরু করেছে তাঁর দেয়ালে। মামুদের বুঝতে বাকী রইল না, বিদ্রোহী হয়ে তাঁর প্রাণ বধ করতে আসছে। অমনি তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল—আমার সুলতানি হয়ে গেল, আল্লা ছাড়া গতি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শেখ ক্ষিপ্রহস্তে জানালা বন্ধ করে আবার তখনই খুলে দিলেন। সুলতান দেখলেন – কোন সৈন্য নেই, বিদ্রোহের নাম গন্ধ নেই, তাঁর সুন্দর নগরীতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। মিনারের চূড়া-গুলো যেন গলিত সোনায় স্নান করে উঠছে।

সুলতানের মানসিক স্থৈর্য ফিরে আসবার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধ তাঁকে দ্বিতীয় জানালায় নিয়ে গিয়ে বললেন—খুলে দেখ। সুলতান জানালা খুললে যা তাঁর চোখে পড়ল তাতে তাঁর পিলে চমকে গেল: নগরীর মসজিদের চারশো মিনারে, প্রাসাদের গম্বুজে—আর যতদূর চোখ যায় ততদূরের বাড়ির হাজার হাজার ছাদ আর বারান্দায় দাউ দাউ করছে আগুন, তার কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আকাশ, কানে আসছে লক্ষ লক্ষ নরনারীর ভয়ার্ত করুণ কণ্ঠস্বর। দমকা বাতাসে আগুনের সমুদ্র যেন এসে আছড়ে পড়ছে প্রাসাদের সামনের সবুজ বাগানের প্রান্তে। আর রক্ষা নেই, তাঁর এত সাধের কায়রো, উদ্যানে আর সৌধে ভরা দুনিয়ার সেরা নগরী কায়রো কালই মরু-ভূমির অঙ্গীভূত হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে নিজের জানও যাবে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কেঁদে উঠলেন সুলতান—খোদা তুমিই সত্য, তুমিই ভরসা, মানুষের যত সব কিছুরই ভাগ্যনিয়ন্তা তুমি।

বৃদ্ধ ত্বরিতহস্তে জানালা বন্ধ করে আবার তখনই খুলে দিলেন। সুলতান দেখলেন—কোথায় আগুন! তাঁর প্রিয় কায়রো নগরী পাম-উদ্যানের সবুজ চেলী পরে নানা হর্ম্য-অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে সুন্দরী

কুমারী কন্যার মতো তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। চারশো মিনার থেকে চারশো কণ্ঠের আজান ভেসে আসছে, আসছে যেন বেহেস্ত থেকে ধূপ-গুগ্‌গুলের সুরভি।

বৃদ্ধ এবার মামুদকে নীলনদের দিককার জানালায় নিয়ে গিয়ে হুকুম করে খোলালেন। সুলতান খুলেই দেখলেন ভীষণ বন্যা এসে গেছে নীলনদে, বন্যা সবুজ ক্ষেত খামার উদ্যান ডুবিয়ে হাজার ঘরের বারান্দা গ্রাস করে প্রাসাদের প্রাচীরে এসে আছড়ে পড়েছে। এই ভেঙে গেল প্রাসাদের পাঁচিল, নীচের তলার ঘরগুলো বন্যার জলে পেয়ালার চিনির মতো যেন গলে গেল, দেখতে না দেখতে ধসে গেল প্রাসাদের এক অংশ। আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন সুলতান। শেখ জানালা বন্ধ করে আবার তখনই খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাঁপুনি থেমে গেল সুলতানের: কোথায় বন্যা, শান্ত নীল শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে মিশরের ফারাওয়ের মতো গম্ভীর মনে ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলছে।

কি যে তিনি দেখছেন—কি যে হচ্ছে তা ভাববার সময় সুলতানকে না দিয়ে বৃদ্ধ তাঁকে হেঁচকা টানে নিয়ে গেলেন চতুর্থ জানালার কাছে, তা খুললেই চোখে পড়ে—গোলাপ, জুঁই, নর্সিসাস আর তারই মাঝে মাঝে পাপিয়া-বুলবুল-ডাকা কমলাবনের নকসা-আঁকা রূপালি জলধারার জরিটানা একখানা সবুজ গালিচা কে বিছিয়ে দিয়েছে সুদূর চক্রবাল রেখা পর্যন্ত!

খোলো খোলো জানালা।

সুলতান অনুগত ভীত ভৃত্যের মতো বৃদ্ধের আদেশ পালন করতেই দেখেন—কোথায় শত কবিকীর্তিত সে ঘনশস্যের শ্যাম শোভা, তার বদলে অগ্নিবর্ষী সূর্য কিরণে দগ্ধ—খাঁ খাঁ মরুভূমি, উত্তপ্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ক্ষুধার্ত হায়না আর শৃগালের চীৎকার, অজস্র বিষাক্ত সাপের কিলিবিলি।

দেখে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন সুলতান। বৃদ্ধ ত্বরিতহস্তে জানালা বন্ধ করে আবার তখনই খুলে দিলেন। সুলতানের চোখ

এবার জুড়িয়ে গেল—এই ত ঘন সবুজ শস্যের ছবি আঁকা সেই দিব্য গালিচা আবার কে বিছিয়ে দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে চক্রবাল রেখা অবধি!

সুলতান মামুদ বুঝতেই পারছেন না—তিনি ঘুমিয়ে, না জেগে, তিনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন, না জাদু করেছে কেউ! এর বেশি ভাববার সময়ও পেলেন না তিনি, শেখ তখনই তাঁকে ছোট্ট এক ঝরনার সামনের জলাধারে নিয়ে এসে বললেন—তাকাও এর দিকে। সুলতান মাথাটা হেঁট করে তাকালেন জলের দিকে, শেখ তাঁর হেঁট মাথাটায় জব্বর এক ধাক্কা মেরে জলের একেবারে কাছাকাছি করে দিতে তিনি দেখলেন—সমুদ্রযাত্রা করে কূলের কাছের এক পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজ ডুবি হয়েছে তাঁর। মাথায় তখনও তাঁর রাজমুকুট, গায়ে রাজপোশাক। তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে কতগুলো অসভ্য বর্বর চাষীমজুর লোক—তাঁর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে—ইতরের মতো ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে।

দেখে ভীষণ রেগে গেলেন সুলতান মামুদ। তাঁর সব চাইতে বেশি রাগ হল—ঐ বুড়ো শেখের উপর। রাগের চোটে দাঁত কিড়মিড় করে তিনি বলে উঠলেন—হতচ্ছাড়া, শয়তান জাদুকর, তোর জন্যেই আমার জাহাজটা ডুবল, দাঁড়া যাই আগে আমি আমার রাজধানীতে, তখন তোর কি শাস্তির ব্যবস্থা করি আমি, দেখবি।—এই বলে তিনি এগিয়ে গেলেন ঐ চাষীমজুর লোকগুলোর দিকে, গিয়ে বললেন—অসভ্য বর্বরের দল, হাসছিস যে বড়, জানিস কে আমি, আমি সুলতান মামুদ, দূর হ তোরা আমার সামনে থেকে, নইলে তোদের ফাঁসিকাঠে ঝুলাবো।

শুনে তারা আরও হাসতে লাগল : হো হো হো। হাসির চোটে তাদের হাঁগুলো এত বড় হয়ে গেল যে দেখাতে লাগল বিকট, ভয়ঙ্কর। দেখে একটু ঘাবড়েই গেলেন সুলতান, তাদের সামনে থেকে সরে পড়তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তা আর হল না। ওদের ভেতর থেকে সর্দার গোছের একটা লোক দৌড়ে এসে সুলতানের মাথার

মুকুট আর রাজবেশটা খুলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে বললে—ভারী-ভুরি কি ছাই পরেছ, নাও ধরো এই কাজের পোশাক দিচ্ছি, এই পরে লক্ষ্মী ছেলের মতো আমাদের সঙ্গে কাজ করো—এই বলে নীল রঙের এক ফালি কাপড় পরিয়ে দিলে তাঁর হাঁটুর উপর পর্যন্ত, মাথায় দিলে একটা মাথাল।

সুলতান তখন বললেন—এ পরালে কেন তোমরা আমায়, আমি ত কোন কাজ করতে পারিনে।

আ-হা-হা-হা, কাজ করতে পারিনে!—কাজ করতে না পারলে খানাও জুটবে না, আমাদের দেশের এই নিয়ম যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না। কাজ করতে না পারো, গাধা হয়ে যাও, গাধা হয়ে যাওয়া ত একেবারে সোজা, সবাই হতে পারে। যাক—বাজে কথা রাখো, আপাতত আমাদের এই কাস্তে কোদাল নিড়ানিগুলো বয়ে নিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে, আমরা সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত—

এই বলে চাষীরা তাদের কাস্তে কোদাল যন্ত্রপাতিগুলো এক সঙ্গে করে চাপিয়ে দিল সুলতানের মাথায়, তারপর তাঁকে নিয়ে চললো নিজেদের আস্তানায়। ভার-বহনে অনভ্যস্ত সুলতান বহু কষ্টে ঐ ভার বহন করে চললেন তাদের সঙ্গে। ওরা তাদের বাসাতে এসে গেলে একপাল নেংটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সুলতানের চারিদিকে ঘিরে হাততালি দিয়ে বিশ্রীভাবে হাসতে লাগল তা ছাড়া নানা নোংরা কথা যেন ছুঁড়ে মারতে লাগল তাঁর মুখের উপর।

দেখে শুনে জল এসে গেল সুলতানের চোখে।

কিন্তু এ-ও সব নয়, লোকগুলো রাত্রে থাকতে দিল তাঁকে একটা পুরনো খালি আস্তাবলে, খেতে দিলে লাল মোটা রুটির সঙ্গে কয়েকটা পেঁয়াজের ফালি। সকাল হলেই সুলতান দেখেন তিনি একটা গাধা হয়ে গেছেন: ঠিক গাধারই মতো খুরওয়ালা চারটে পা লেজ আর মস্ত বড় বড় দুটো কান।

এরপর চাষীরা এসে তাঁকে লাঙলে জোতবার মতো সাজ পরিয়ে নিয়ে গেল মাঠে। কিন্তু লাঙল টানতে পারবেন কেন সুলতান!

টালমাটাল করতে লাগলেন। চাষীরা রেগেমেগে তাঁকে বিক্রি করে দিলে এক জাঁতাওয়ালার কাছে। জাঁতাওয়ালা তাঁর চোখ বেঁধে তাঁকে জাঁতকলে ঘুরাতে লাগল। সুলতান জাঁতাকলে ঘোরেন, দিন রাত ঘোরেন, এক ফোঁটা বিশ্রাম নেই। একটু বিশ্রাম শুধু ঐ দানাপানি খাবার সময়। শুধু কি এই! একটু থামবার, গড়িমসি করবার উপায় নেই, ও রকমটি করতে গেলেই পিঠে শপাশপ বেতের ঘা। এমনি করে একদিন দু'দিন নয়, পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেল জাঁতকল ঘুরিয়ে। তারপর একদিন কি করে জাঁতাকলটা তাঁর মাথার উপর পড়ে যেতেই দেখেন তিনি মানুষ হয়ে গেছেন।

গাধার জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ হয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি এক দেশের এক শহরে এসে হাজির হলেন। অনেক হাঁটার দরুন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে, তাই দেখে এক মান্যিগণ্যি বণিক তাঁকে ডেকে নিজের ঘরে বসিয়ে বললেন—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি নতুন এসেছ এখানে!

জি।

এসেছ, বেশ করেছ, আনন্দ পাবে এখানে। তোমার বয়সী তরুণেরা অনেকেই আসে এখানে একটু ফুর্তি করতে। তা তুমি কিছুদিন এখানে থাকবে ত?

তা থাকতে পারি, যে কোন জায়গায় আমার থাকতে আপত্তি নেই, যদি এখানকার লোকে আমায় দানা ভুষি খেতে না বাধ্য করে।

বণিক মৃদু হেসে বললেন—দানা খাওয়াবে কি গো! খেতে পাবে এখানে তোফা খাসি দুম্বার মাংস, আর ভাল ভাল রুটি। সেজন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না কিন্তু এখানে যখন এসে পড়েছ তখন এখানকার নিয়ম তোমাকে মানতে হবে। এখনই যেতে হবে তোমাকে এই রাস্তাটার শেষে যে হামাম আছে তার কাছে। ঐ হামামের কাছে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি। এক একটি মেয়ে ঐ হামাম থেকে গোসল করে বেরুবে, আর তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে, তোমার সাদি হয়েছে কি হয়নি। যখনই কেউ বলবে তার

সাদি হয়নি তখনই তুমি তার মালিক হয়ে গেলে, কাজী ডাকবার দরকার নেই, এই এ দেশের নিয়ম। কিন্তু খবরদার, কাউকে বাদ দিতে পারবে না এ প্রশ্ন করতে, বাদ দিলে তোমার সমূহ বিপদ। এ-ও এ দেশের নিয়ম।

বণিকের কথামতো সুলতান দাঁড়ালেন গিয়ে হামাম থেকে বেরুবার পথে। একটু পরেই গোসল সেরে বেরিয়ে এল তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে।

এই, শোনো—

দাঁড়াল মেয়েটি।

সাদি হয়েছে তোমার ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—গেল বছর সাদি হয়ে গেছে আমার, বলেই মেয়েটি তর তর করে পথ বেয়ে চলে গেল। সুলতান একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন : একে বিবি করে পেলে তবু এতদিনের দুঃখ কষ্ট ভোলা যেত ! হায় আল্লা, কি আছে নসিবে তা কে জানে !

এমনি করে একটু আফসোস করতে না করতেই সুলতান দেখেন আর একটি স্ত্রীলোক হামাম থেকে বেরিয়ে আসছে। ইয়া আল্লা, এ যে একেবারে বুড়ী, আর দেখতে কি কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর! কম্পিত বক্ষে এগিয়ে গেলেন সুলতান :

তোমার কি সাদি হয়েছে, না এখনও একাই আছ ?

মর ছোঁড়া, এতদিন সাদি না করে আমি তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি !

সুলতান একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললেন—আল্লা মেহেরবান, তুমি বাঁচালে আমায় !

বুড়ী চলে গেল। সুলতানকে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, প্রায় পরক্ষণেই হামাম থেকে আর একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।

এ আল্লা, এ যে আগেরটারও এক কাঠি উপরে, যেমনি বুড়ী তেমনি শুধু কদাকার নয়, বীভৎস। বুকটা দুর দুর করে কাঁপতে লাগল সুলতানের। ওকে আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না

তাঁর। পরক্ষণেই মনে হল বণিক যে বলে দিয়েছেন প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করা চাই, নইলে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হবে। অগত্যা এক রকম চোখ-কান বুঁজে কম্পিতবক্ষে সুলতান জিজ্ঞাসা করে ফেললেন —বিবির কি সাদি হয়েছে, না এখনও একাই—

যেমনি বলা আমনি বুড়ী তার ফোকলা মাড়ি বের করে কানচাটা হাসি হেসে নিজের নাকটা তুটো আঙুল দিয়ে ঘন ঘন কয়েকবার মলে বলে উঠল—না চাঁদ, না, সাদি হয়নি আমার তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবো বলে আল্লা তোমায় আমার সামনে আজ পাঠিয়ে দিলেন।

শুনে এবার থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেল সুলতানের: না চাচী, না—দোহাই তোমার, আমায় তুমি সাদি করো না। আমি গাধা, দেখছ না আমার চারটে পা, লম্বা তুটো কান আর লেজ! ভাল ঘরের মেয়েরা কেউ গাধাকে বিয়ে করে না।

কে কার কথা শোনে, বুড়ী তখন মাথা নেড়ে সুলতানকে লুফে নেবার জন্মে তাঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল—

না না—বিবি সাহেবা, আল্লার দোহাই, তুমি আমায় সাদি করো না, দেখছ না—আমি গাধা, আমাকে সাদি করতে নেই তোমার—

—বলবার সময় মরিয়া হয়ে সুলতান নিজের মাথাটা এক হেঁচকা টানে যেই সরিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখেন—

আরে—এই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর নিজেরই প্রাসাদে, ডাইনে তাঁর প্রধান উজির বাঁয়ে সেই অতিবৃদ্ধ শেখ। জাহাজডুবি তা হলে তাঁর হয়নি, বিয়ে করবার ফ্যাসাদেও পড়েননি তিনি। তিনি সুলতান, মিশরের মহামান্য সুলতান মামুদ, আঃ—সুলতান হওয়া কি সুখের, কি আনন্দের, ওসব ছাইপাঁশ হওয়ার চেয়ে কত শান্তির, কত স্বস্তির!

সুলতান তাকিয়ে দেখেন তাঁর সামনে এক রূপসী গোরা বাঁদী সোনার পরাতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ নিয়ে দাঁড়িয়ে। উজির বৃদ্ধ শেখকে হাজির করবার কয়েক মূহূর্ত আগে সরবৎ আনবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি।

সুলতান কি বলতে যাচ্ছিলেন, হয়ত বৃদ্ধ একটু সরবৎ খাবেন কিনা তাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজে কোন কথা বলবার আগেই শেখ বললেন—পশ্চিম মুলুকের পীর ভাইয়েরা পাঠিয়েছিলেন আমায় তোমার কাছে আল্লার দান সম্বন্ধে তোমায় ওয়াকিবহাল করতে, এখন বুঝলে ত ?

বলবার সঙ্গে সঙ্গে সুলতান তাকিয়ে দেখেন শেখ সেখানে নেই। তিনি দরজা না জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বুঝা গেল না।

কিন্তু খোদা শেখকে পাঠিয়ে তাঁকে কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন সেটা বুঝতে তাঁর দেরি না। উঃ—ভাবতে এখনও বুকটা কাঁপে, এতক্ষণ যে দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন তিনি সেই জীবন তাঁর যদি হত ! .

তিনি তখনই মাটিতে জানু পেতে বসে চোখের জলে ভেসে খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। খোদার দোয়ায় তিনি সুখী, পরম সুখী ! দুঃস্বপ্নে দেখা ঐ ভয়ঙ্কর জীবন ত যাপন করতে হচ্ছে না তাঁর, অথচ এ-ও ত হতে পারত ! আল্লা ত সব কিছুই করতে পারেন !

গল্প শেষ করে শাহরাজাদী শাহরিয়ারকে বললেন—জাহাঁপনা এই সুলতান মামুদের দুইটি জীবনের কাহিনী : এক—যে জীবন তিমি যাপন করছেন, দুই—যে জীবন তাঁরও হতে পারত।

সাহরিয়ার বললেন—চমৎকার তোমার এ গল্পটি, তাছাড়া রীতিমতো শিক্ষাপ্রদ। আল্লার কাছে এত পেয়েও আমরা সামান্যের জন্যে বৃথাই মন খারাপ করি।

দুনিয়াজাদী বায়না ধরলে—দিদি, রাত ভোর হতে এখনও দেরি আছে, আর একটা ছোট গল্প শোনা না !

শাহরাজাদী অনুমতির জন্যে সুলতানের দিকে তাকালে। শাহরিয়ার বললেন—বেশ, আরম্ভ কর আর একটা, কিন্তু এটা যেন কিছুটা কৌতুকের রসদ যোগায়।

পায়রা-মটরওয়ালার মেয়ে

সুলতানের অনুমতি পেয়ে শাহরাজাদী সেই রাত্রেই আবার বলতে শুরু করলে—

কায়রো শহরে একটা লোক ছিল সে পায়রা-মটর বিক্রি করে সংসার চালাত। আল্লা তাকে তিনটি সন্তান দিয়েছিলেন, তিনটিই মেয়ে। এতে অবশ্য সচরাচর কোন বাপের মন তেমন খুশী হয় না, মনে ক্ষোভ থেকে যায়, কিন্তু এ লোকটার মনে ক্ষোভ ছিল না, খোদার দানকে সে মাথা পেতেই নিয়েছিল, তিনটি মেয়েকেই সে খুব ভাল-বাসত, ভালবাসাটা সহজ হয়েছিল কারণ তিনটি মেয়েই ছিল অপূর্ব সুন্দরী, ছোট মেয়ে জইনা আবার তার উপর অতিশয় বুদ্ধিমতী। মেয়েদের নিজের চেয়ে একটু উঁচু ঘরে বিয়ে দেবার তার বড় সাধ, তাই তার উপার্জনের কিছুই সে আর বাঁচাতে পারত না, খেয়ে পরে যা থাকত তা মেয়েদের শিক্ষার জন্যেই সে ব্যয় করত। মেয়েরা রোজ সকালে নাস্তা খেয়ে এক মেয়ে-কারিগরের কাছে রেশম ও মখমলের উপর সুঁচের কাজ শিখতে যেত। যেতে হত তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে, আর শুধু পাশ দিয়ে নয়, সুলতানের একমাত্র ছেলে তার ঘরের —পথের দিকের যে জানালাটা খুলে রোজ বসে থাকত—তারই সামনে দিয়ে। হোক না পায়রা-মটর-ওয়ালার মেয়ে, ঘোমটার ভেতর দিয়ে তিনটি সুন্দরী তরুণীর মুখের যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তাই দেখবার জন্যেই নিষ্কর্মা শাহাজাদার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। জানালার কাছাকাছি এসে তিন জোড়া হরিণ চোখও শাহাজাদার রকমসকম দেখে কৌতুকে ঝলমল করে উঠত। শাহাজাদা তার জানালার সামনে ওদের দেখতে পেলেই বলে উঠত—সেলাম, পায়রা-

মটরওয়ালার মেয়েরা, সেলাম, তিনটি ফুটন্ত গোলাপের ডাল, সেলাম। বড় দুটি বোন মুখের পর্দা একটু সরিয়ে ফিক করে হেসে পালিয়ে যেত, ছোট জইনা ঘোমটাও সরাত না, হাসতও না, মাথা নীচু করে ধীর মন্থর পদে এগিয়ে যেত।

শাহাজাদা সেলাম ছাড়াও মাঝে মাঝে বাজে কথা বলে রসিকতা করবার চেষ্টা করত, হয়ত বলত—বলি ও পায়রা-মটরব্যাপারীর মেয়েরা, পায়রা-মটরের ব্যাবসা এখন কেমন চলেছে, দাম কত, কত লাভ থাকে গো তোমাদের? তখন উত্তর দিত ছোট মেয়ে জইনা—কি দরকার সাহেব, আপনার পায়রা-মটরের দাম শুনে, পোকা-খেকো, ক্ষুদে পাখী হয়ে পায়রা-মটরের খবরে কাজ কি। শুনে শাহাজাদার মুখে আর কোন কথা যোগাত না। তিন বোন তার রকম দেখে হেসে পালিয়ে যেত। একদিন শাহাজাদা ওদের সঙ্গে ওদের বংশের অমর্যদাকর ঐ রকম রসিকতা করতে গেলে জইনার জবাবটা একটু বেশি রকমের কড়াই হয়ে গেল। শুনে শাহাজাদার মুখ চোখ রাঙা হয়ে গেল। তিন বোনের মধ্যে এই ছোটটির দিকেই শাহাজাদার একটু ঝোঁক ছিল বেশি, হালকা কথা বলে যখন কিছুতেই তার মন নরম করা গেল না, তখন ভারী কিছু করে ওকে সায়েস্তা করা দরকার। কিন্তু কি করা যায়? ভেবে ভেবে ঠিক করলে ওদের বাপকে কিছু বিপদে ফেলা যাক, তাহলেই ছোট মেয়ে জব্দ হবে, বাপকে ও সব চাইতে বেশি ভালবাসে। এমনি যখন ওর মন জয় করতে পারলাম না, তখন ক্ষমতা প্রয়োগ করেই দেখা যাক!

পরের দিনই শাহাজাদা ডেকে পাঠালে পায়রা-মটরওয়ালাকে। মটরওয়ালা এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে শাহাজাদা বললে—যে তিনটি মেয়ে রোজ সকালে আমার ঘরের সামনে দিয়ে সূঁচের কাজ শিখতে যায়, তাদের বাপ তুমি?

মটর-ব্যাপারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—জি হুজুর।

শাহাজাদা চোখ পাকিয়ে বললে—বেশ, কাল সকালে নামাজের সময় এখানে হাজির হবে। হাজির হবে এক সঙ্গে পোশাক পরে

আবার না পরে, একই সঙ্গে হেসে এবং কেঁদে, তা ছাড়া একই সঙ্গে গাধায় চড়ে এবং পায়ে হেঁটে, এ যদি না পারো তুমি, দুটি পেরে যদি বাকিটা না পারো তুমি, তাহলে তোমার গর্দান নেব আমি।

শাহাজাদার হুকুম শুনেই ত মটর-ওয়ালার হয়ে গেল। তারপর কোন রকমে সামনের মাটিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে কুর্নিশ করে আঁধার মুখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এল সে। বাপকে ঐ অবস্থায় আসতে দেখেই মেয়েরা ছুটে এল। ছোট মেয়ে জইনা বাপের হাত ধরে বললে—কি হয়েছে বাপজান, মুখ এত আঁধার কেন, চোখে জল কেন?

আর মা, কি হয়েছে, আমার হয়ে গেল! যা কখনও হয় না হবার নয়, কাল সকালে তাই আমায় করবার হুকুম দিলেন শাহাজাদা তাঁর সামনে, না পারলে গর্দান যাবে।

কি করতে হবে খুলেই বলো না বাপু।

বাপ তখন শাহাজাদার তিনটি বেয়াড়া হুকুমের কথাই মেয়েকে খুলে বললে। জইনা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল: কিছু ভয় নেই, এর সব ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি আমি। আমার কথা শুনে চললে এর সব কিছুই তুমি পারবে।

শুনে বাপ মেয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল: বলিস কি তুই?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সব, পারবে তুমি, শোন না বলছি কি কি করতে হবে তোমায়। প্রথমেই তুমি তোমার দোস্ত কেয়ামৎ জেলের বাড়ি গিয়ে তার জালটা চেয়ে নিয়ে এস তুমি, তাই দিয়ে আজ রাত্রেই তোমার দিব্যি একটা পোশাক তৈরি করে দেব আমি। ওটা পরে গেলে একসঙ্গে পোশাক-পরা এবং না-পরা দুই হবে। দ্বিতীয়টার জন্যে কিছুই ভাবতে হবে না তোমার—বাড়িতে আছ, যাবার সময় রান্নাঘর থেকে একটা পেঁয়াজ হাতে করে যাবে তুমি, ঐ মূর্খটার সামনে পৌঁছে যাবার একটু আগে শুধু চোখে ঘসে দিও, ব্যাস এক সঙ্গে হাসি-কান্না দুই-ই চলবে। তৃতীয়টার জন্যে তোমার যেতে হবে

রসুন-ব্যাপারী করিমদ্দির বাড়ি। হালে ওর গাধাটার একটা বাচ্চা হয়েছে, সেই বাচ্চাটা চেয়ে আনবে, সেটা এত ছোট যে তার উপর বসার ভঙ্গী করে তুমি অনায়াসে পায়ে হেঁটে যেতে পারবে। কেমন—এখন হল ত, বাপজান! এই সব কয়টা খেল দেখিয়ে তোমার শাহাজাদাকে দিব্যি বোকা বানিয়ে আসতে পারবে তুমি।

শুনে বাপের মনের সকল ভয় কেটে গেল। দিলটা হালকা হল, মুখে হাসি ফুটে উঠল, মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে বললে—সাবাস বেটী, সাবাস তোর বুদ্ধি! আল্লা এমন মেয়ে দেন যাকে তার মৃত্যু হয় না।

মনের স্বস্তি ফিরে পেয়ে বাপ মেয়েদের সঙ্গে বসে খানাপিনা করলে, তারপর গেল কেয়ামতের বাড়ি জাল আনতে, গেল করিমদ্দির বাড়ি গাধার বাচ্চা চাইতে, পেঁয়াজ ত বাড়িতেই ছিল।

পরদিন ভোরে নমাজের সময় শাহাজাদা তার বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল তিন মেয়ের বাপ পায়রা-মটরওয়ালা কখন আসে, ভাবছিল—এইবার মজাটা টের পাবে তার ছোট মেয়ে, শাহাজাদার সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ফল বুঝবে, এমন সময় এসে হাজির হল মটর-ব্যাপারী পোশাক পরে অথচ পোশাক না পরে, হেসে অথছ কেঁদে, গাধার পিঠে চড়ে অথচ হেঁটে সে আসছে দেখে ত শাহাজাদার দম ফাটবার যোগাড়। এদিকে গাধার বাচ্চাটা এতগুলো লোকের ভেতর এসে পড়ে কি 'সে বিকট চীৎকার, সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে সশব্দে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। বন্ধুদের মধ্যে লজ্জায় মুখ চুন হয়ে গেল শাহাজাদার।

তিনটিই ঠিক মতো করতে পেরেছে ব্যাপারী, তাই বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাবনা শুরু হয়ে গেল শাহাজাদার: কি করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়, এবার তার বাপকে নয়, এবার মেয়েকে নিয়ে পড়তে হবে।

মেয়ে জইনা তা জানে, বুদ্ধি আছে তার, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। তাই শাহাজাদা তাকে জব্দ করার কোন উপায় খুঁজে বের করবার আগেই নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেললে। আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার

উপায় খোঁজার চেয়ে আক্রমণটা নিজের তরফ থেকে প্রথম করাই ভাল, এই তার মত। সে তখনই বাজারে সব চেয়ে বড় বর্মনির্মাতার দোকানে গিয়ে বললে—ওস্তাদ চাচা, আমার যে জলদি একটা ইস্পাতের বর্ম চাই, আমার হাত পা বুক মুখ মাথা সব ঢাকা পড়বে এতে, শুধু তাই নয়, চলতে গেলে কিংবা একটু ছোঁওয়া লাগলেই এ থেকে এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরুনো চাই যে শুনলে কানে তালা লেগে যায়। তুমি ছাড়া এ ত কেউ করতে পারবে না চাচা, তাই তোমার কাছে এলাম, যত দিনার লাগে দেব।

ঠিক আছে রে বেটী, বিকেলের দিকে এসে তুই নিয়ে যাস: জইনার সুন্দর মুখের মিষ্টি বুলি শুনে ওস্তাদ কারিগর ঠিক সময়েই তা করে দিল। রাত্রি প্রহরখানেক উৎরে গেলে সেই বর্ম পরে এক-খানা ক্ষুর, একখানি কাঁচি আর গাঁইতি হাতে জইনা রওনা হল সুলতানের বাড়ির দিকে। তার এই অদ্ভুত বেশ দেখে আর বর্মের আওয়াজ শুনে দ্বার ছেড়ে দ্বারী পালাল, খোজা, বান্দা যত ছিল সব পালাল, জইনা নির্বিবাদে দরজা পেরিয়ে এসে হাজির হল শাহাজা-দার ঘরে। শাহাজাদা তখন আলো স্তিমিত করে শোয়ার আয়োজন করছিল। হঠাৎ ঘরে এই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত বেশধারীকে দেখে বুকের স্পন্দন বুঝি তার বন্ধ হয়ে গেল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বর্মধারী ছদ্মবেশী জইনার সমুখের মাটি চুম্বন করে সে বললে—দোহাই, বাবা ইফরিদ, আল্লার দোহাই—আমাকে রেহাই দাও, আল্লাও তাহলে তোমায় রেহাই দেবেন।

জইনা কৃত্রিম ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলে বললে—চুপ রও বদখত, বেতমিজ, শয়তান, একটিও কথা বলবে না, একটি শব্দ করলে এই যে দেখছ গাঁইতি—এই দিয়ে তোমার চোখ ছেঁদা করে দেব।

শুনে শাহাজাদা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে পড়ে রইল, আর জইনা ক্ষুর দিয়ে তার কচি গোঁফের এক দিকটা, দাড়ির বাঁ দিকটা—মাথার চুলের ডান দিকটা, আর দুটো ভুরু কামিয়ে কিছুটা গাধার পুরীষ তার মুখে চোখে ঘষে কিছুটা খাইয়ে বর্মের বিকট আওয়াজ

তুলতে তুলতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল, ভয়ে কেউ তার চোখের সামনেও এল না। বাড়ি গিয়ে বর্ম খুলে লুকিয়ে বোনেদের সঙ্গে শুয়ে স্বস্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে যথাসময়ে তিন বোনেই সেজেগুজে সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হল তাদের শিক্ষাদাত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে। পথে সুলতানের বাড়ির কাছে এসে দেখে শাহাজাদা রেশমী কাপড়ে মুখ মাথা ঢেকে মাত্র চোখ দুটি খোলা রেখে তার ঘরের জানালার ধারে বসে আছে। তিন বোনই আজ ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে, কৌতুকভরা হাসি হাসি মুখেই তাকাতে লাগল। দেখে শাহাজাদার মনে হল—আজ এদের মন নরম হয়েছে, ভাল লেগেছে আমায়। তাই হবে, আমার মুখ ঢাকা, শুধু চোখ বাইরে, আমার চোখ দুটি নিশ্চয় সুন্দর, তাতেই আকৃষ্ট হয়ে ওরা তাকাচ্ছে। এই ভেবে শাহাজাদা তখন খুশীমনে তার নিত্য অভ্যাসমতো ওদের এক মধুর সম্ভাষণ করে বললে—ও আমার নয়নের আলো মেয়েরা, ও ফোটা গোলাপের ডালেরা, আজ সকালে পায়রা-মটরের খবর কি ?

যেই বলা অমনি জইনা তার মুখের আবরণ সরিয়ে মাথা উঁচু করে বললে—সেলাম, মুখমাথাঢাকা সাহেব, আজ ভোরে আপনার দাড়িগোঁফের খবর কি, ভুরুর, মাথার চুলের খবর কি, গাধার ও জিনিসটা কেমন লেগেছে, ভোজনে আনন্দ পেয়েছেন নিশ্চয়ই !

শুনে শাহাজাদার সারা শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল, হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে এল, বুঝলে কাল রাত্রে এই জইনাই ইফরিদ সেজে এই কাণ্ড করে গেছে, আরও বুঝলে এর সঙ্গে সন্ধি না করতে পারলে, ভাব না করতে পারলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

শাহাজাদা তার দাড়ি গোঁফ চুল ভুরু নতুন করে ওঠা পর্যন্ত কোন রকমে অপেক্ষা করলে, তার পর ওগুলো ঠিক মতো উঠলে ডেকে পাঠালে পায়রা-মটরওয়ালাকে। মটরওয়ালা এসে সেলাম করে দাঁড়ালে শাহাজাদা, বললে—শোন ব্যাপারী, তোমার ছোট

মেয়েটাকে আমার বড় পছন্দ, ওকে সাদি করতে চাই আমি, এতে তুমি রাজী না হলে তোমার গর্দান নেব আমি।

ব্যাপারী বললে—শাহাজাদা, এ অধিকার ত আপনার আছেই, তবে কি না সাদির ব্যাপারে, যার সঙ্গে সাদি সেই মেয়েকে একবার জিজ্ঞাসা করে তবে উত্তরটা দিতে চাই আমি।

বেশ ভাল কথা, তাকে জিজ্ঞাসা করেই তুমি আমায় মত দাও। তবে হ্যাঁ, এ কথাও বলে রাখছি, সে যদি রাজী না হয় হবে এক সঙ্গে বাপ-বেটী দুজনেরই গর্দান যাবে তোমাদের, এ কথাও মনে রেখো।

ব্যাপারী সে কথা মনে রেখেই ভাবতে ভাবতে বাড়ি এল—এসে জইনাকে খুলে বললে সব কথা। শুনে ছোট মেয়ে বললে—এ তো বেশ ভাল কথা বাপজান, এ তো সৌভাগ্যের কথা, খোদার দোয়া না থাকলে এ রকম প্রস্তাব ত আশাই করা যায় না, তুমি বলে এস, আমি রাজী, সানন্দে রাজী।

বাপ শাহাজাদার কাছে সুখবরটা দিতে রওনা হলেই জইনা ছুটল বাজারের এক ওস্তাদ কারিগরের কাছে—যে চিনি দিয়ে নানা-রকম পুতুল তৈরি করে। গিয়ে সেলাম করে বললে—চাচা, তুমি ত চিনি দিয়ে আঙুলের খেল দেখাও, আমায় একটা চিনির পুতুল তৈরি করে দাও দেখি, যত লাগে দেব। ওটা দেখতে হবে আমারই মতো বড়, আমারই মতো নাক মুখ হাত পা—সব, আর যেখানকার যা রঙ, এমন করে বানাবে যে দেখলে মনে হবে ঠিক আমি।

ঠিক আছে বেটী, বলে ওস্তাদ তখনই চিনি গলিয়ে মূর্তি গড়তে শুরু করল, যখন শেষ হল, মনে হল ঠিক যেন আর একটা জইনা, শুধু তার মতো কথা বলতে পারে না।

যথা সময়ে মহা আড়ম্বরে শাহাজাদার সঙ্গে জইনার সাদি হয়ে গেল। জইনা তার দুই বোনের সাহায্যে পুতুলটাকে নিজের জামা কাপড় পরিয়ে ঠিক নিজের মতো সাজিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়, চারিদিকে হালকা পরদা টাঙিয়ে দিল, তারপর নিজে লুকিয়ে রইল যেখানে লুকানো যায়। বড় দুই বোন ছোটর শেখানোমতো যথা

সময়ে শাহাজাদাকে সংবর্ধনা করে বাসরঘরে ঢুকিয়ে বললে—শাহাজাদা, আমাদের শান্ত কোমল মিঠু বোনটিকে আল্লা ভরসা করে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম, একটু দরদ যেন পায় আপনার কাছ থেকে—বলেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শাহাজাদা ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল, হালকা পরদার ভিতর দিয়ে দেখল : এই ত জইনা দিব্যি চুপ করে শুয়ে আছে। এবার হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। মূহূর্তে মনে পড়ে গেল—ওর দেওয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনা টিটকারির কথা, সে সব কি ভুলেছে শাহাজাদা ?—এবার, এবার কে রক্ষা করে তাকে !—রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাহাজাদা তার মস্তবড় তলোয়ারখানা খাপ থেকে বের করে দিলে বিছানায় শায়িত কনের গলায় জব্বর এক কোপ। মুণ্ডটা ছিটকে বেরিয়ে গেল ধড় থেকে, তারই এক ভাঙা টুকরো—হঠাৎ এসে পড়ল শাহাজাদার মুখের ভেতর, কোপের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দেবার জন্যে হাঁ করেছিল যখন।

আরে, দিব্যি মিষ্টি যে—বেঁচে থাকতে যে দুর্গন্ধ গাধার নাদ খাইয়েছে, মরবার সময় সে কি না সুগন্ধ মেঠাই খাইয়ে দিলে! অনুতাপে উদ্‌ভ্রান্ত শাহাজাদা যে তলোয়ার দিয়ে তার মিষ্টি কনেকে খুন করলে সেই তলোয়ারখানা নিজের পেটে বসাতে যাচ্ছিল এমন সময় সত্যিকার জইনা এসে হাসিমুখে হাত চেপে ধরল তার : পাগল, এ কি করতে আছে, আমিও তোমায় ক্ষমা করি, তুমিও আমায় ক্ষমা করো, তা হলে আল্লা আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন।

শুনে বাঁচল শাহাজাদা। এইবার যেন প্রথম দেখলে জইনার মুখখানাও মিষ্টি, হাসিটাও মিষ্টি, সেই মূহূর্তে সে আগেকার সকল তিক্ততা ভুলে গেল। তখন থেকে তারা দু'জন পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসলে, আর শেষে খোদার কাছে যাবার আগে অনেক সন্তান সন্ততি রেখে গেল।

গল্প শুনে শাহরিয়ার এবং দুনিয়াজাদী দুইজনেই বড় খুশী, কিন্তু

দুনিয়াজাদী হঠাৎ বলে বসল—দিদি, তুই মেয়ে তাই ফলাও করে একটি মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করিল, ছেলেদের বুদ্ধির তারিফ করা যায় এমন কোন গল্প জানা নেই তোর ?

তা আছে বই কি। জাহাঁপনা অনুমতি করলেই শোনাতে পারি।

শুনে শাহরিয়ার বললেন—আজ ভোর হয়ে গেল, কাল শুনব তোমার সে গল্প।

আলি খাজা ও বাগদাদের বণিকের কাহিনী

পরদিন রাত্রিশেষে সুলতানকে তসলিম করে শাহরাজাদী ছুনিয়ার সে ফরমাশী গল্প শুরু করলে—

খলিফা হারুন-অল-রসিদের রাজত্বকালে বাগদাদে এক বণিক ছিল, নাম ছিল তার আলি খাজা। আলি খাজার মূলধনও বেশি নয়, ব্যাবসাও তেমন বড় নয়, জীবিকার জন্মে কোন রকমে সেটা চালিয়ে যাওয়া—এই আর কি। প্রয়োজনও অবশ্য তেমন বেশি ছিল না, কারণ তার ছেলেপিলেও নেই, বউ-ও নেই, কেউই নেই, নির্ঝঞ্ঝাট একা মানুষ। সুতরাং সামান্য কারবারে যা আসে তা-ই যথেষ্ট।

বাগদাদ শহরে বেশ স্বচ্ছন্দেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কি হল—পর পর তিনদিন রাত্রে সে একই স্বপ্ন দেখল। দেখল সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ শেখ এসে তাকে বলছেন—আলি খাজা, তুমি একবার মক্কা গিয়ে তীর্থ করে এসো, আল্লার এই ইচ্ছা।

গরিব ব্যাবসায়ী আলি খাজা, তার পক্ষে মক্কা যাওয়া তেমন সোজা নয়, তবু পর পর তিনদিন এই স্বপ্ন দেখে আর স্থির থাকতে পারলে না সে: আল্লা যখন চাইছেন, তখন তাকে যেতেই হবে। সুতরাং তার বেসাতি যা ছিল তা একে একে সব বিক্রি করল, যার কাছে যা পাওনা ছিল তা আদায় করল, নিজের বাড়িটা দিল ভাড়া। এমনি করে বেশ কিছু অর্থ তার হাতে এল। মক্কা যাওয়ার জন্মে যা কিছু প্রয়োজন সে সবের ব্যবস্থা করেও ঠিক এক হাজার মোহর তার বেঁচে গেল। এটা আর সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় না সে। কিন্তু কোথায় রেখে যাবে? অনেক ভেবে চিন্তে একটা মেটে কলসী কিনলে আলি খাজা, তার অর্ধেকটা ভাল আশফিরি জলপাইয়ে

ভরতি করে—কলসীর মুখটা বেশ ভাল করে বন্ধ করলে। তারপর সেটা নিয়ে প্রতিবেশী এক বণিক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বললে—ভাই শুনেছ ত, আমি তীর্থ করতে মক্কা যাচ্ছি। আর সবের ব্যবস্থা করে ফেলছি আমি, এক কলসী জলপাই ছিল বাড়িতে শুধু তার ব্যবস্থা করতে পারিনি, এটা তোমার বাড়িতে রেখে যেতে চাই, ফিরে এসেই আবার নিয়ে নেব।

বণিক বললে—বেশ ত, রেখে যাও, নিরাপদে থাক্‌বে। এই নাও আমার ভাঁড়ারের চাবি, তার যেখানে খুশি রেখে দরজা বন্ধ করে চাবিটা আমার কাছে রেখে যাও, কেউ হাত দেবে না ওতে, ফিরে এসেই তোমার মাল তুমি নিয়ে যেও।

আলি খাজা তখন চাবিটা নিয়ে বণিকের ভাঁড়ার খুলে তার মোহর আর জলপাইয়ের কলসীটা ঘরের এক কোণে রেখে দরজা বন্ধ করে চাবিটা দিয়ে গেল বণিকের হাতে। যাক—নিশ্চিন্ত!

এবার মক্কা যাত্রার পালা। একটা উটের পিঠে জিনিসপত্র সাজিয়ে আর একটা উটের পিঠে চড়ে আলি যাত্রীদলের সঙ্গে মক্কা যাত্রা করল। যথা সময়ে সেখানে পৌঁছেও গেল। সেটা জু-অল হিজ্জাহের মাস, বহু হজযাত্রী এসেছিল মক্কায়। তাদের সঙ্গে মিশে কাবা মসজিদ প্রদক্ষিণ করলে সে, অন্যান্য তীর্থকৃত্য সারল, তারপর একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে বাগদাদ থেকে আনা তার বেসাতি সাজিয়ে বসল। জিনিস বেশ বিক্রি হতে লাগল। একদিন দু'জন বণিক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে আলি খাজার বেসাতি দেখে থমকে দাঁড়াল। তাদের একজন বললে—দেখছ, কি সুন্দর আর দামী সব মাল, এখানে আর কেউ কোনদিন আনেনি, এই সব কায়রোয় নিয়ে গেল প্রচুর লাভ হয়, সেখানেই ত এমন সব সৌখীন মালের খদ্দের।

শুনে আলি খাজা কায়রো যাওয়া সাব্যস্ত করল। কয়েকদিনের ভেতরেই একদল কায়রোর যাত্রী মিলে গেল, তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। যথা সময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল আলি খাজা। বেশ লাগল কায়রো শহরটা, শুধু শহরটাই না—মিশর দেশটাই বড় ভাল

লাগল তার, এখানকার ফল-ফুল, শস্যক্ষেত্র যেন বেহেস্তের আভাস এনে দেয়, তা ছাড়া নীলনদ! কায়রোতে জিনিস বিক্রি করে প্রচুর লাভ করল আলি। ওখানকার ভাল ভাল জিনিসও কিনে নিল সে, অন্য শহরে গিয়ে বিক্রি করবে। প্রায় একমাস ওখানে থেকে, শহরে এবং তার আশে পাশে দ্রষ্টব্য যত কিছু আছে দেখে—'আল্লা আল্লা' বলে রওনা হল দামস্কসের দিকে। দামস্কসে এসে কিছুদিন বাণিজ্য করে আরও বেশি লাভ হল তার। ওখানকার দেখবার মতো সব কিছু দেখা শেষ করে চলল আলেপ্পো, সেখান থেকে মোস্থল, মোস্থল থেকে সিরাজ, তারপর একে একে আর সব জায়গায়। এমনি করে নানা জায়গায় ঘুরে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে পুরো সাত বৎসর পরে আলি খাজা বাগদাদে ফিরে এল।

এদিকে আলির বন্ধু বাগদাদের বণিক—প্রায় সাত বছরের মধ্যে একদিনও তার কথা ভাবেনি শেষের দিকে একদিন সে আর তার বউ রাত্রে খেতে বসেছে। নানা কথা হচ্ছে, তার মাঝে হঠাৎ বউ একবার বলে বসল—অনেকদিন জলপাই খাইনে গো, বড্ড খেতে ইচ্ছে করছে। কাল কিছু জলপাই বাজার থেকে এনো না!

বণিক একটু কি ভেবে প্রায় তখনই বলে উঠল—কাল কেন, এখনই ত পেতে পারি আমরা!

কেমন করে?

কেন, মনে পড়ে না তোমার—আলি খাজা প্রায় সাত বছর আগে মক্কা যাবার সময় আমার ভাঁড়ারে এক কলসী জলপাই রেখে গেল। এতদিন হয়ে গেল, সে যখন ফিরে এল না, তখন আমার ত মনে হয় সে বেঁচে নেই। মক্কার যাত্রীদল ফিরে এলে তাদের মুখে শুনলাম—সে ওখানে নেই, ওখান থেকে মিশরে চলে গেছে, তারপর কোথায় কোথায় গেছে কে জানে, এতদিন নিশ্চয়ই খোদার কাছে চলে গেছে, নইলে কি আর এতদিন ফিরে না আসত। ওর জলপাই আমরা এখন নিশ্চিন্তে খেতে পারি।

বউ শুনে বললে—ছি ছি, তুমি কি গো, একজন বিশ্বাস করে

তোমার ভাঁড়ারে রেখে গেল, আর তুমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করবে ?—না, তা আমি কিছুতেই করতে দেব না, আজ না হয় কাল, কি দু'দিন বাদে সে ফিরে এসে যদি বলে—ভাই, আমার জলপাইগুলো দাও, তখন কি বলবে তুমি তাকে ? কোন্ মুখে দাঁড়াবে তুমি তার সামনে, লোকেই বা কি বলবে ! তা ছাড়া খোদা এতে রাগ করেন, আর সেই সাত বছর আগের জলপাই সে কি আজও খাবার মতো আছে নাকি, পচে হেজে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে না !

বউয়ের কথা শুনে বণিক একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল। বউ বললে—তুমি ও জলপাই ভাঁড়ার থেকে বের করলে তার একটিও আমি ছোঁব না—তা আগে থাকতে বলে রাখছি !

বউয়ের এই সব কথা শুনে বণিক সেদিনকার মতো চুপ করে রইল বটে, কিন্তু বিনি পয়সায় জলপাই খাওয়ার লোভ সে সংবরণ করতে পারলে না। একদিন সুযোগ বুঝে বউয়ের অলক্ষ্যে ভাঁড়ারে ঢুকে সে জলপাইয়ের কলসীর মুখ খুলে জলপাই বের করতে গেল। কলসীর মুখ খুলতেই তার মুখ দিয়ে বেরুল, এ আল্লা—এ কি এ যে সব পচে গলে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে ! তবুও ছাড়ল না বণিক, দেখা যাক নীচে যদি কিছু ভাল থাকে : সে তখন কলসীটা ঝাঁকি দিয়ে কাৎ করে কিছু জলপাই মাটিতে ঢালল। প্রায় আধাআধি বেরিয়ে আসতে দেখে ওগুলোর ভেতর একটা আসরফি চিক্‌চিক্ করছে : ইয়া আল্লা—এ যে মোহর !—তবে কি ! কথাটা মনে হতেই বণিক কম্পিত বক্ষে কলসীটা উপুড় করে ঢাললে মেঝেতে। যা ভেবেছিল তাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে মোহরগুলো বেরিয়ে পড়ল মেঝেতে। দেখে আনন্দের আবেগে কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে রইল বণিক, তারপর বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটলে বুদ্ধি করে মোহর আর জলপাই দুই-ই কলসীতে ভরে কলসীর মুখ এঁটে সেদিনকার মতো বেরিয়ে এল ভাঁড়ার থেকে। পরের দিন বাজার থেকে কিছু টাটকা জলপাই কিনে এনে—রাত্রে বউয়ের অলক্ষ্যে ভাঁড়ারে ঢুকে আলির কলসী থেকে পচা জলপাই আর আসরফি বের করে তাতে নতুন জলপাই

ভরে দিলে তার মুখ বন্ধ করে। তারপর কলসীটা যথাস্থানে রেখে মোহরগুলো নিয়ে বেরিয়ে এসে দিলে ঘরে তালা লাগিয়ে।

এর মাসখানেক পরেই আলি খাজা সাত বছর পরে বাড়ি ফিরে এল। একটু বিশ্রাম করেই সে তার বন্ধু বণিকের সঙ্গে দেখা করতে গেল। এতদিন পরে দেখা, যেমন আনন্দের সঙ্গে বন্ধুদের ভেতর সেলাম, কুশল প্রশ্ন, আলিঙ্গন ইত্যাদি হওয়া উচিত সে সব হল। তারপর দেশভ্রমণের কথার সঙ্গে আরও দশটা কথা হওয়ার পর আলি খাজা বণিককে বললে—ভাই, বিদেশ যাবার আগে তোমার ভাঁড়ারে আমি এক কলসী জলপাই রেখে গিয়েছিলাম, সেটা এখন নিয়ে যেতে চাই।

বণিক বললে—বেশ, ভাল কথা, এই নাও ভাঁড়ারের চাবি, নিয়ে তালা খুলে যেখানে তুমি তোমার কলসী রেখেছ, সেখান থেকে নিয়ে যাও, কোথায় তুমি ভাই রেখেছ, তা আমি জানিও না।

আলি খাজা সরল মনে ভাঁড়ারের দরজা খুলে ঘরের যেখানে কলসীটা ছিল সেখান থেকে সেটা নিয়ে খুশী মনে বাড়ি ফিরে গেল। কলসীর মুখ বেশ আঁটাই আছে।

ঘরে গিয়ে আলি কলসীর বন্ধ মুখ খুলে ফেললে, তখন তাতে যে জলপাই দেখা গেল সে যেন একেবারে টাটকা। সাত বছরের পুরানো এ কিছুতেই হতে পারে না! তবে কি—ভাবতে গিয়েই আলি খাজার বুকটা কেঁপে উঠল। সে তখনই কলসীটা উপুড় করলে মাটিতে, হড় হড় করে বেরিয়ে পড়ল সব টাটকা জলপাই, আসরফির চিহ্ন নেই তাতে। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় চোখে জল এসে গেল আলির। আশা মানুষের কিছুতেই যেতে চায় না, প্রায় পরক্ষণেই মনে হল, তাড়াতাড়ি চলে এলাম, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হল না : বন্ধু হয়ত কোথাও সরিয়ে রেখেছে মোহরগুলো, না হয় বড় প্রয়োজন হওয়ার খরচ করে ফেলেছে, ভেবেছে আমি এলে দিলেই চলবে। এই ভেবে কিছুটা আশা নিয়েই এল সে তার বন্ধু বণিকের বাড়িতে। এসে বললে—ভাই, আবার এলাম, একটা কথা বলতে।

কি, বলো ?

ভাই, মক্কা যাবার আগে আমি যে জলপাইয়ের কলসীটা তোমার বাড়িতে রেখে যাই তাতে জলপাইয়ের নীচে আমি এক হাজার মোহর রেখেছিলাম, কিন্তু কলসী উপুড় করে একটাও যে পেলাম না আমি ! তুমি যদি কোন প্রয়োজনে পড়ে খরচ করে থাকো, তবে তোমার সুবিধা মতো দিও, আমি শুধু কথাটা জানতে এলাম ।

বণিক রীতিমতো বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললে—কি বলছ তুমি বুঝছি না ! আমার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে তুমিই রেখে গেছ, কোথায় রেখেছ তা-ও আমি জানি না, আবার ভাঁড়ার খুলে তুমিই নিয়ে গেলে। ওতে কি ছিল না ছিল জানিও না আমি। যাবার সময় বলে গেছ ওতে জলপাই রইল এখন বলছ মোহর ছিল। কেমন লোক তুমি ? মোহর ছিল ত বলে গেলে না কেন ? বললে অমনি করে না রেখে আমার সিন্দুকে তুলে রাখতাম।

বণিকের কথা শুনে আলি খাজা অথৈ জলে পড়ে গেল, তবু শেষ চেষ্টা করতে স্বরে মিনতি ঢেলে বললে—ভাই, আমি আল্লা সাক্ষী, কোরান সাক্ষী, পয়গম্বর সাক্ষী করে বলেছি, জলপাইয়ের নীচে আমার এক হাজার আসরফি ছিল, অনেক দিনের বহু কষ্টে উপার্জিত ঐ সামান্য ধন, নিরাপদে রাখবার জন্যে তুমি যদি কোথাও সরিয়ে রেখে থাক একবার মনে করে দেখ, যদি তোমার কোন প্রয়োজনে—

আলির কথাটা আর শেষ করতে না দিয়ে বণিক রাগে ফেটে পড়ল : কি বলতে চাও তুমি ? আমি চোর ? নিজে হাতে ভাঁড়ার খুলে জলপাইয়ের কলসী রেখে গেলে, নিজে হাতে তালা খু তা তুমি আবার নিয়ে গেলে, কলসী রাখতে দিয়ে উপকার পর ছিলাম বলে আমি হলাম চোর ! চোর আমি নই, কিন্তু তুমি হ্‌-ই উপরে, তুমি জুয়াচোর, নেমকহারাম, বেইমান যাও—দূর হয়ে এল আমার সামনে থেকে, তোমার মুখদর্শন করতে চাইনে পাই খবরদার আর আমার বাড়িমুখো হবে না তুমি কোনদিন না, লসী

বণিকের বাড়ির সামনে চেঁচামেচি শুনে অনেক লোক পাই

হয়েছিল সেখানে, ব্যাপারটা তাদের কানে গেলে তারা ঐ নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল. গরিব আলি খাজার হাজার মোহর খোয়া যাওয়ার কাহিনী।

এদিকে আলি খাজা তার ধনী বণিক বন্ধুর প্রতারণায় মর্মাহত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে বসে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর কাজীর কাছে নালিশ করাই সে সাব্যস্ত করলে। কাজীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে বিচারপ্রার্থী হলে কাজী বললেন—কেউ সাক্ষী আছে তোমার ?

জি, না,—এক আল্লা ছাড়া কেউ আমার সাক্ষী নেই। লোকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে বলে কথাটা আমি আর কারো কাছে বলিনি। যার কাছে রেখে গিয়েছিলাম সে আমার অনেক কালের বিশ্বাসী বন্ধু, সে যে এমন করবে, তা আমি কোনদিন ভাবিনি!

বেশ, ডেকে পাঠাচ্ছি তাকে আমি, দেখি সে এসে কি বলে!

কাজী তখন ডেকে পাঠালেন সেই বণিককে। বণিক এসে কাজীকে সেলাম করে দাঁড়াল। কাজী আলি খাজার অভিযোগের বৃত্তান্ত তাকে সবিস্তারে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ওর জলপাইয়ের নীচেকার মোহরগুলো কি হল ?

বণিক বিস্ময়ের ভান করে বললে—আমি কি করে বলব হুজুর, ও নিজে হাতে তালা খুলে নিয়ে গেছে, ও কোথায় কি রেখেছিল, কিছুই আমি জানি না। ও এখন মোহরের কথা বলছে, কিন্তু রাখবার সময় বলে গেল এক কলসী জলপাই রেখে গেলাম। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, হুজুর। উপকার করেছিলাম বলে ও সেই সুযোগে আমার নামে চুরি আর প্রতারণার দায়ে অভিযোগ আনছে, তাই আমিই হুজুরের কাছে ওর নামে মানহানির নালিশ পেশ করছি।

শুনে কাজী কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন বণিকের মুখের দিকে, তার[illegible] বললেন—সে কথা পরে হবে, সাক্ষী সাবুদ্ যখন কারোই কিছু [illegible], তখন আমি কোরান আনছি, ধর্ম সাক্ষী করে কোরান ছুঁয়ে [illegible] বলতে পারবে যে তুমি ওর মোহর নাওনি ?

[illegible]ন বলতে পারব না, হুজুর—সত্যি কথা বলব তা ভয় কিসের ?

তখনই কাজীর হুজুমে কোরান আনা হল। এর পর কোরন হাতে দিয়ে বণিককে মক্কার কাবা মসজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। কাজী হুকুম করলেন—এবার আল্লার নামে শপথ করে তুমি বলো যে, তুমি তোমার বন্ধু আলি খাজার মোহর নাওনি।

বণিক কাবার দিকে মুখ রেখে কোরান হাতে করে বললে—কাবার দিকে চেয়ে কোরান হাতে নিয়ে আমি আল্লার নামে তাঁর পয়গম্বর মহম্মদের নামে শপথ করে বলছি, আলি খাজার কোন মোহর আমি নিইনি, তার মোহরের কথা বিন্দু সিসর্গ আমি জানি না।

বণিকের শপথ শুনে কাজী তাকে বেকসুর খালাস করে দিলেন। আলি খাজা নিরাশ হয়ে দুঃখে ক্ষোভে বণিক আর কাজীকে গালি পাড়তে পাড়তে বাড়ি ফিরে এল : বণিক যেমনি পাজী, তেমনি বিচারক কাজী, চোরের বন্ধু বাটপাড়।

বাড়ি এসে ভেবে ভেবে সে এক উপায় ঠিক করলে : এবার খোদ খলিফার কাছে সে বিচার-প্রার্থী হয়ে যাবে। সেই দিনই সে তার সকল ঘটনা বিবৃত করে একখানা আরজি তৈরি করলে এবং পরদিন জুম্মাবারে খলিফা যখন নমাজ পড়তে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে আরজিটা তাঁর হাতে দিলে। খলিফা দরখাস্ত পড়ে তখনই তাঁর উজির জাফরকে হুকুর দিলেন—কাল দরবারের সময় ফরিয়াদী এবং আসামী দু'জনকেই আমার সামনে হাজির করবে। আমি নিজে এর বিচার করব।

সেইদিনই রাত্রে উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মসরুরকে নিয়ে খলিফা তাঁর পূর্বাভ্যাসমতো ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন, বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে বাজারের কাছে একটা খোলা জায়গায় এসে দেখেন দশ-বারোটা ছেলে সেখানে বেশ একটু হট্টগোল করছে। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালেন খলিফা, দেখা যাক কি ব্যাপার! সেদিন জোছনা ছিল খুব, দেখাও যাচ্ছিল বেশ। দেখলেন বেশ ফরসা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একটি ছেলে বলছে—এবার কাজীর বিচারের খেলা হচ্ছে আমাদের। আমি কাজী, তোমরা আলি খাজা এবং যে

বণিকের কাছে সে মোহর আর জলপাইয়ের কলসী রেখে গিয়েছিল তাকে আমার সামনে নিয়ে এস। এই কথা বলেই ছেলেটা বিচারকের মতো গাম্ভীর্য আর ঠাট নিয়ে একটা উঁচু জায়গায় বসলে। ছেলেরা যারা আলি খাজা আর বণিক সাজবে তাদের বিচারকের সামনে এনে দাঁড় করালো।

বিচারক প্রথমে ফরিয়াদীকে জিজ্ঞাসা করলে তার কি বলবার আছে, সেকথা শুনে আসামীকে তার বক্তব্য জিজ্ঞাসা করলে। আসামী আগে সত্যিকার কাজীর কাছে সত্যিকার আসামী যা বলেছিল, তাই বলে তার উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করতে আল্লার নামে শপথ নিতে যাচ্ছিল, বিচারক-ছেলেটি বললে—শপথ পরে হবে, তার আগে সেই জলপাইয়ের কলসীটা আমি দেখতে চাই।—আলি খাজা, তুমি তোমার সেই কলসীটা নিয়ে এস।

কলসী আনা হলে আসামী ফরিয়াদী দু'জনকেই বিচারক জিজ্ঞাসা করলে—দেখ, এই সেই কলসী ত, ভাল করে দেখ।

দুজনেই দেখে বললে—হ্যাঁ, এই সেই কলসী, কোন ভুল নেই।

বিচারক-ছেলেটি তখন কলসীর মুখ খুলে তা থেকে একটা জলপাই বের করে মুখে দিয়ে চিবিয়ে বললে—এ যে দেখছি একেবারে টাটকা, চমৎকার স্বাদ! সাত বছরের পুরনো জলপাই ত এমন থাকতে পারে না, সে ত পচে হেজে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। যাক—এখনই শহরের দু'জন পাকা জলপাই-ব্যবসায়ীকে এনে হাজির কর আমার সামনে।

তখনই ছেলেরা দুটি ছেলেকে জলপাই-ব্যবসায়ী সাজিয়ে এনে হাজির করলে বিচারক-ছেলেটির সামনে। তারা এসে কাজী-ছেলেটিকে সেলাম করে দাঁড়ালে সে বললে—তোমরা জলপাইয়ের ব্যাবসা করো?

জি, হুজুর, আমরা সাত পুরুষ ধরে জলপাই-ব্যবসায়ী।

আচ্ছা, বলো ত জলপাই খুব যত্ন করে রাখলে কতদিন পর্যন্ত খাবার যোগ্য থাকে?

হুজুর, জলপাই খুব যত্ন করে রাখলেও তিন বৎসরের বেশি তা ভাল রাখা যায় না, তিন বৎসর পরে সেগুলো ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

কাজী-ছেলেটি তখন আলি খাজার কলসী থেকে এক একটি করে জলপাই ওদের হাতে দিয়ে বললে—তোমরা চেখে দেখে বলো ত একবার—এ জলপাই কতদিনের হতে পারে?

ওরা জলপাই খেয়ে বললে—হুজুর, এ জলপাই টাটকা, এই বছরেরই কিছুদিন আগের এ জলপাই, স্বাদ গন্ধ সবই ঠিক আছে।

শুনে হুমকি দিয়ে উঠলো কাজী: মিথ্যে কথা, এ জলপাই সাত বছরের পুরনো।

কিছুতেই হতে পারে না, হুজুর আপনি শহরের আর যে কোন জলপাই-ব্যবসায়ীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের কথা মিথ্যা হলে যে কোন শাস্তি নিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

কাজী তখন বণিককে একটা খেতে দিয়ে বললে—তুমি চেখে দেখে বলো ত—তোমার কি মত?

বণিকও চেখে দেখে বললে—ওরা যা বলছে, হুজুর তাই ঠিক, জলপাই এ বছরেরই, স্বাদ গন্ধ দুই-ই পুরো বজায় আছে।

তা হলে—তা হলে বুঝাই গেল তুমি জোচ্চুরি করে আলি খাজার মোহর সরিয়ে, তার পুরনো জলপাই সরিয়ে কলসীটা তুমি এ বছরের টাটকা জলপাইয়ে ভর্তি করে রেখেছ। তুমি এখনই আলিকে তার হাজার মোহর ফেরত দেবে, আর তুমি যে অপকর্ম করেছ—এর জন্যে যাবে তোমার গর্দান।

ছেলের দল বিচার শুনে তখনই হাততালি দিয়ে হৈ হৈ করে নেচেকুঁদে বণিককে কাল্পনিক বধ্যভূমির দিকে নিয়ে গেল।

খলিফা দেখে জাফরকে বললেন—উজির, যে ছেলেটি কাজী সেজেছিল, ভাল করে চিনে রাখো তাকে, কাল ওকে হাজির করবে আমার দরবারে, ঐ আমার পাশে বসে আলি খাজার নালিশের বিচার করবে। এ ছাড়া বণিককে হাজির করবে, আলি খাজাকে

তার জলপাইয়ের কলসী নিয়ে আসতে বলবে। দু'জন জলপাই-ব্যবসায়ীকে ডেকে আনবে, আর ঐ এলাকার কাজীকেও হাজির থাকতে বলবে বিচার সভায়, বিচার দেখে তার শিক্ষা হবে। উজিরকে এই সব হুকুম দিয়ে খলিফা সেদিনের মতো তাঁর প্রাসাদে চলে গেলেন।

পরদিন ভোরে উজির প্রথমেই গিয়ে হাজির হলেন শহরের যে অঞ্চলে ছেলেরা আলি খাজা আর বণিকের খেলা খেলেছিল সেই অঞ্চলে। গিয়ে হাজির হলেন ও-খানকার মক্তবের মৌলভীর বাড়িতে—

তোমার ছাত্রেরা কই ?

ওরা এখন যে যার বাড়িতে আছে।

দেখিয়ে দাও সবার বাড়ি।

উজিরের হুকুমে মৌলভী তাঁর ছাত্রদের বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। উজির তখন একে একে সকলের বাড়িতে গিয়ে যে ছেলেটি আগের রাত্রে কাজী সেজে বিচার করেছিল তাকে বের করলেন। ছেলেটি উজিরকে সেলাম করে দাঁড়ালে উজির তাকে বললেন—আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে, মহামান্য খলিফা তোমায় তলব করেছেন।

শুনে ছেলেটির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার মা এসে কান্নাকাটি শুরু করল। উজির তার মাকে বললেন—কিছু ভয় নেই, খলিফা ভালো ছাড়া কিছু মন্দ করবেন না তোমার ছেলের, আমি উজির—কথা দিচ্ছি তোমায়।

শুনে মায়ের ধড়ে প্রাণ এল। সে ছেলেকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে তাকে সাধ্যমতো ভালো করে সাজিয়ে দিলে।

এরপর উজির ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর উপর আর যে সব কাজের ভার পড়েছিল সে সব তামিল করে খলিফার কাছে হাজির হলেন।

যথাসময়ে খালিফার দরবার বসল। আসামী, ফরিয়াদী, কাজী, দু'জন জলপাইয়ের ব্যাপারী সবাই হাজির। খালিফা ছেলেটিকে নিজের সিংহাসনের পাশের একটা আসনে বসিয়ে বললেন—কাল রাত্রে তোমাকে আলি খাজা এবং বণিকের বিচারের খেলা খেলতে

দেখেছি আমি ; আজ আর খেলা নয় সত্যিকার আলি খাজা, বণিক এবং দু'জন জলপাই-ব্যবসায়ী তোমার সামনে হাজির, এদের সত্যিকার বিচারের ভার আমি তোমার উপর দিচ্ছি।

ছেলেটি খালিফার হুকুম শুনে কিছুমাত্র না ভড়কে—সত্যিকার কাজীর ঠাটে আলি খাজাকে হুকুম করলে—তোমার কি নালিশ আছে বলো। আলি খাজার বলা হয়ে গেলে বণিকের পালা। বণিক তার জবাবে তার দোষ অস্বীকার করে তার জবানের সত্যতা সপ্রমাণ করতে কাবার দিকে হাত তুলে আল্লার নামে শপথ করতে যাচ্ছিল, ছেলেটি তাকে ধমক দিয়ে বললে—শপথ পরে হবে, দাঁড়াও—

ছেলেটি এরার আলি খাজাকে হুকুম করলে—তোমার জল-পাইয়ের কলসী নিয়ে এস।

আনলে আলি খাজা।

ওর মুখ খোলো।

খুললে আলি খাজা।

এবার ও থেকে একটা জলপাই আমার, আর দুটো এই দুই জলপাই-ব্যবসায়ীর হাতে দাও।

দিলে আলি খাজা। ছেলেটি এবার ব্যবসায়ী দু'জনকে হুকুম করলে—তোমরা এই জলপাই খেয়ে বলো—কত দিনের পুরনো এ ?

জলপাই খেয়ে দুই ব্যবসায়ীই বললে—এ এই বছরের শেষের দিকের জলপাই।

ঝুটা বলবে না, সাত বছর আগে আলি খাজা এগুলি রেখে গেছে তার বণিক বন্ধুর ভাঁড়ারে—মক্কা যাবার আগে।

ছেলেটি যখন কাজীর আসনে বসে কাজীর মতো বিচারই করছে তখন ব্যবসায়ীরা তাকে মর্যাদা দিয়েই বললে—হুজুর, এ হতেই পারে না। আমরা ঠিক কথাই বলছি, বিশ্বাস না হয় শহরের যে কোন জলপাই-ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

ব্যাপারীদের এই কথা শুনে আর রক্ষা নাই দেখে বণিক এবার সকল কথা অকপটে বিবৃত করে নিজের দোষ স্বীকার করলে।

ছেলেটি তখন খলিফার দিকে চেয়ে বললে—হুজুর জাহাঁপনা, আমার যা করবার তা আমি করে দিলাম, এবার আপনার পালা। বণিক যখন আলি খাজার মোহর চুরি করেছে তখন সে মোহর তাকে ফেরত অবশ্য দেবে, আর তার এই দুষ্কৃতির জন্য কোরান এবং হজরত মহম্মদের নির্দেশ অনুসারে যে শাস্তি তার প্রাপ্য তার হুকুম আপনি দিন।

খলিফা আলি খাজার হাজার মোহর পাবার ব্যবস্থা করে বণিকের ফাঁসি দেওয়ার হুকুম দিয়ে দিলেন। কাজীকে বললেন—কাজী, দেখলে ত কি করে বিচার করতে হয়? বুড়ো হয়ে গেলে তবু নিজের কাজ ঠিকমতো করতে শিখলে না, এই বাচ্ছার কাছে শেখো।

ছেলেটিকে খলিফা তখনই রাজকোষ থেকে এক হাজার মোহর দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। তা ছাড়া সেদিন থেকে তার উপর সস্নেহ দৃষ্টি রাখলেন। তারপর সে যখন বড় হল তখন তাকে নিজের একজন ওমরাহ করে নিলেন।

দুনিয়াজাদী গল্প শুনে বললে—দিদি তোর এ গল্পটি বড় মজার

শাহরিয়ার বললেন—শুধু মজার নয়, শিক্ষাপ্রদও বটে!

আমাদের প্রকাশনায় আর

একখানি গ্রন্থ :

॥ উপকথা ॥

মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র

গৌরী ধর্মপাল

[দাম : ১৫'০০]

মূলের নীতিপ্রধান গল্পগুলিকে রসপ্রধান করে রচিত কিশোর উপযোগী এক কল্প কথামালা উপহার দিয়েছেন ঈশান স্কলার শ্রীমতী ধর্মপাল। 'গীতা'র পরে আর কোন গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র'-এর মতো লোকপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। প্রায় অর্ধশত দেশের দুই শতাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই অমর গ্রন্থখানি।

'...কম করে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে লেখা 'পঞ্চতন্ত্র' আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মন কেড়েছে সেই আদি যুগ থেকেই। 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র' মূল সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের বাংলা রূপান্তর। লেখিকার কৃতিত্ব যে, তিনি শুধু এই লোকপ্রিয় গল্পকথার পরিচ্ছন্ন অনুবাদই করেন নি, বিন্যাসে—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে প্রকরণেও প্রয়োজনমত স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পগুলি খুব সুন্দর খুলেছে তাঁর হাতে, গল্প বলার ভঙ্গীটি বেশ মধুর ও অন্তরঙ্গ। বাংলার উর্বর মাটিতে পঞ্চতন্ত্রকে স্থায়ী আসন দিলেন শ্রীমতী ধর্মপাল। শিশুরা তাঁর এই বইটির কথা বড় হয়েও মনে রাখবে।'

আনন্দবাজার পত্রিকা।

আরব্য রজনী

আরবের বাদশাহী মহল থেকে ধূসর মরুপ্রান্তর পর্যন্ত একদিন যে গল্পের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার স্পর্শ আজও বিশ্বের রসিকচিত্তে অম্লান হয়ে আছে।

শাহরাজাদী বাদশার মুখোমুখি বসে শুরু করেছেন তাঁর গল্প। প্রাসাদ থেকে দেখা যাচ্ছে রহস্যময়ী রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশ। কিন্তু এই রাত্রির অবসানেই যে নেমে আসবে শাহরাজাদীর ওপর চির রাত্রির অন্ধকার, দিনের প্রথম আলোকে শাহরাজাদীকে বরণ করতে হবে মৃত্যু—এই হল বাদশাহী ফরমান।

ভোর হয়, তবু শেষ হয় না গল্প। বাদশাহের গল্প-পিপাসু মন বলে ওঠে—আরও আরও আরও। তাই সে দিনের মত রদ হয়ে যায় মৃত্যুর ফরমান।

এমনি করে গল্পের যাদুকরী শাহরাজাদী সৃষ্টি করে চলেন প্রতি রজনীতে এক একটি করে গল্পের যাদু-মহল। সে মহলের প্রতি কক্ষে অপেক্ষা করে থাকে অপার বিস্ময় আর রোমাঞ্চের শিহরণ। তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেন তাঁর শ্রোতাকে গল্পের সেই রহস্য-পুরীর মধ্য দিয়ে।

তারপর যেদিন শেষ হল গল্প সেদিন কি নেমে এসেছিল শাহরাজাদীর ওপর মৃত্যুর খড়গ, না অপেক্ষা করেছিল কোন অভাবনীয় পুরস্কার ?

আমাদের প্রকাশনায়

আরব্য রজনীর

অন্যান্য খণ্ড :

১ম খণ্ড/২য় মুদ্রণ	দাম	৭·৫০
৩য়—৮ম খণ্ড	দাম প্রতি খণ্ড	৬·২৫
৯ম খণ্ড	দাম	৭·৫০

[২য় খণ্ডের ২য় মুদ্রণ এবং ১১শ ও পরবর্তী খণ্ডসমূহ যন্ত্রস্থ]

আরব্য রজনী

দশম খণ্ড

তারাপদ রাহা

১৩৮২

॥ আদিকথা ॥

প্রতারণা আর বেইমানি জগতে কেউই বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেটা আসে প্রিয়জনের কাছ থেকে। জীবনে সবচেয়ে যাকে বেশি ভালবাসা গিয়েছিল তার দ্বারা যদি মানুষ প্রতারিত হয়, তা হলে তা হয়ে ওঠে একেবারে অসহনীয়। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে মানুষের মন।

ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল একদিন ইরানের বাদশা-মহলে, অনেক—অনেক কাল আগে। বাদশা শাহরিয়ার তাঁর প্রিয়তমা বেগমের বেইমানিতে প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁকে হত্যা করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল সমস্ত নারীজাতির ওপর। হারেমের অন্যান্য বেগমের গর্দান নিয়েও তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না, উজিরকে ডেকে তিনি বললেন, শোনো উজির, রোজ সন্ধ্যায় আমীর ওমরাহদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কুমারী মেয়ে যোগাড় করে আনবে; জাঁকজমকে বিয়ে করব তাকে। একটি রাত্রি শুধু বেগমের মর্যাদা পাবে সে আমার কাছ থেকে, পরদিন ভোরেই জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে, এ ভারও রইল তোমার ওপর।

শুনে তো উজিরের বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল, একি বিষম ফরমান বাদশার!—কিন্তু উপায় কি, বাদশার হুকুম তো তাঁকে তামিল করতেই হবে; নইলে তাঁর নিজেরই গর্দান যাবে!

তারপর আমীর ওমরাহদের কোন না কোন এক বাড়ি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল ওঠে, বাদশার হুকুমে উজিরকে কোন না কোন বাড়ি থেকে বাপ-মায়ের কোল শূন্য করে তাদের নয়নের মণি সদ্যফোটা গোলাপের মত তরুণী মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে হয়, আর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে দিতে হয় জল্লাদের হাতে।

এমনি করে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; বছর ঘুরে এল। শেষে এমন দিন এসে গেল যখন উজির দেখলেন, নিজের ছুই মেয়ে ছাড়া বাদশার যোগ্য আর কোন মেয়ে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিন বিষণ্ন মুখে উজির সেই কথাই ভাবছেন, এমন সময় তাঁর বড় মেয়ে শাহরাজাদী কাছে এগিয়ে এল, মেয়েটি যেন হীরের টুক্‌রো ; যেমনি রূপ তেমনি বিত্যা, আর তেমনি বুদ্ধি। এই বয়সেই যত রকমের কেতাব আছে, সবই সে পড়ে ফেলেছে। তা ছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গী এতই মধুর যে, যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

মেয়ে বাপের পাশে বসে বললে, কি ভাবছ আব্বা, এমনি মুখ ভার করে ?

ভাবছি—আজ সন্ধ্যায় বাদশার বিয়ের কনে জোটাব কোত্থেকে? দেশে তো আর বিয়ের বয়সী মেয়ে নেই রে, মা।

মেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, কেন আব্বা, আমার কি বিয়ের বয়স হয়নি?

শুনে চমকে উঠলেন উজির : কি বলছিস তুই ! বাপ হয়ে জেনে-শুনে তোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো?

যাদের এতদিন দিয়েছ, আব্বা, তাদেরও তো বাপ-মা ছিল।

সে বাদশার আদেশ পালন করেছি।

মেয়ে যখন আর দেশে নেই, তখন আমাকে পাঠানই তোমার কর্তব্য। তুমি যদি না নিয়ে যাও, তা হলে নিজেই গিয়ে আমি হাজির হব বাদশার কাছে।

শুনে তো উজিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে শাহরাজাদীর মায়া হল। স্নিগ্ধ হাসি হেসে সে বললে, আব্বা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি এক ফন্দি এঁটেছি, যদি সেটা ঠিকমত খাটাতে পারি, তা হলে আমি তো বাঁচবই—তার সঙ্গে রক্ষা পাবে দেশের কুমারী মেয়েদের জান আর মান।

মেয়ের কথায় পুরো সান্ত্বনা পেলেন না উজির। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তিনি বাদশার দরবারে চলে গেলেন। এগিয়ে এল শাহরাজাদীর

ছোট বোন দুনিয়াজাদী তার দিদির কাছে। জিজ্ঞাসা করল, আব্বার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল রে দিদি তোর?

দিদি হেসে বলল, আমি আজ বাদশার বেগম হতে যাচ্ছি রে, বোন।

তুই?—বলতে গিয়েই দুনিয়ার দু'চোখ জলে ভরে এল

ছিঃ, কাঁদিসনে, বোকা মেয়ে। শোন্, আমি এক ফন্দি এঁটেছি। বেগম হয়ে শেষ রাত্রে বাদশার কাছে বায়না ধরব, আমি আমার ছোট বোনকে জন্মের শোধ একবার দেখবার জন্যে। জানি অনুমতি মিলবে। তুই গিয়ে জন্মের শোধ একবার আমার কাছে গল্প শুনতে চাস্, ব্যস্।

দুনিয়াজাদী হয়ত বুঝল, হয়ত বুঝল না; তখনকার মত চুপ করে রইল সে।

সন্ধ্যাকালে শাহরাজাদীকে বিয়ের কনে সাজিয়ে উজির বাদশার সামনে নিয়ে এলেন। বাদশা দেখে চমকে উঠে বললেন, একি করেছ উজির, তুমি—নিজের মেয়েকে...।

কি করব, জাহাঁপনা।—দেশে আর মেয়ে তো চোখে পড়ে না। তাছাড়া আমি না আনলেও নিজেই আসত, ওর জিদ।

শাহরিয়ার একবার তাকিয়ে দেখলেন শাহরাজাদীর দিকে। যেন একটা সদ্যফোটা বসরাই গোলাপ, চোখে মুখে হীরের ঝলমলানি।

বললেন, তুমি নিজে এসেছ—ইচ্ছে করে—কাল সকালে তোমার কি দশা হবে তা জেনেও?

জি, জাহাঁপনা—জেনেও। একরাত্রি আপনার বেগম হবার সৌভাগ্য লাভের জন্য শতবার মৃত্যুবরণ করতেও রাজী আমি।

উজিরের মেয়ের কথা শুনে বাদশা একেবারে থ।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল।

শাহরাজাদীকে খুব ভাল লাগল বাদশার। অনেক আদর পেলো বাদশার কাছ থেকে সে। সুযোগ বুঝে শাহরিয়ারকে বললে, অনেক পেয়ার পেলাম, জাহাঁপনা, আপনার কাছ থেকে, জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে।—একটা আরজি আছে আপনার কাছে আমার, রাখবেন কি?

বল বল, আজ রাতে কিছুই অদেয় নেই তোমায় আমার।

শাহরাজাদী বলল, জাহাঁপনা—আমার একটি ছোট বোন রয়েছে তাকে খুব ভালবাসি আমি। কাল সকালে তো তুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে আমাকে, তার আগে—যতক্ষণ আছি, মানে আজকের বাকি রাতটুকু আমি তাকে কাছে রাখতে চাই।

বাদশা তখনই লোক পাঠিয়ে শাহরাজাদীর ছোট বোনকে নিয়ে এলেন নিজের শয়নকক্ষে। এনে পাশের একটা পালঙ্কে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রি তিন প্রহর কেটে গেছে, আর একটি প্রহর মাত্র বাকি। তুই বোনের কারো চোখেই ঘুম ছিল না, থাকবার কথাও নয়। তুনিয়াজাদী বললে, দিদি ঘুমোসনি?

কেন রে, তুনিয়া?

ওদের কথা শুনে শাহরিয়ারেরও ঘুম ভেঙে গেল। চুপ করে রইলেন তিনি তু'বোনের কথাবার্তা শোনবার জন্যে।

তুনিয়া বললে, দিদি—একটা গল্প শোনাবি? কি সুন্দর গল্প বলতিস তুই, আর তো শুনতে পাব না, জন্মের শোধ তাই—

শাহরাজাদী জবাব দিলে, জাহাঁপনা জাগুন আগে, তাঁর অনুমতি পেলে তবে শোনাতে পারি।

শাহরিয়ার জেগেই ছিলেন। বললেন, আমি জেগেছি। বেশ তো, শোনাও না তোমার বোনকে গল্প—আমিও একটু শুনি।

বাদশার অনুমতি পেয়ে মনে মনে খোদাকে তসলিম করে ধীর মধুর কণ্ঠে শাহরাজাদী শুরু করলে তার গল্প: সে যেন এক অপূর্ব

সঙ্গীত। তাছাড়া যাদুকরীর মত কথার ইন্দ্রজাল বুনে চলল সে। শাহরিয়ার আর দুনিয়াজাদীর সামনে ভেসে উঠতে লাগল কত মরু প্রান্তর, খর্জুরবীথি, কত সরিৎসাগর পর্বত, কত দৈত্যদানাপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন হীরে জহরৎ, কত রকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত বিপদ ঝঞ্ঝা, প্রমোদবিলাস, কত সুন্দরী বিলাসিনী নর্তকী, কত দুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটিল চক্রান্ত, হিংসাদ্বেষ আর প্রণয়ের কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, গল্প কিন্তু শেষ হল না। শাহরিয়ার বললেন, বেশ—বাকিটুকু কাল আবার শুনব—

গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্য বেগমের গর্দান নেওয়ার হুকুম দিতে পারলেন না বাদশা।

॥ সূচী ॥

মুচি ও তার সব্বনেশে বউ

সুলতান শাহরিয়ারের নির্দেশে শাহরাজাদী তার গল্প আরম্ভ করলে—

মিশরের কায়রো শহরে এক মুচি কাজ করত, নাম ছিল তার মারুফ। মারুফ লোকটি বড় ভাল, ঠাণ্ডা মেজাজ, দেহে দয়াধর্ম আছে, মগজে বুদ্ধি আছে—আল্লা তাকে অনেক কিছুই দিয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জীবনে তার এক ফোঁটা শান্তি নেই, সুখ নেই। তার সর্বনেশে কুঁদুলে বউ ফতিমা জীবন তার দুর্বিষহ করে তুলেছে। মানুষের মনের সঙ্গে অনেক ভাল জিনিসও থাকে, কিন্তু বউ ফতিমার দিলে ভাল বস্তু বলে কিছু নেই। গোটা দিলটা যেন তার আলকাতরা আর পীচ দিয়ে তৈরি। সে হঠাৎ প্রতিবেশীদের সামনে পড়লে তারা, আল্লা আল্লা—বলে নিজেদের চোখ ঢেকে ফেলে, কানে আঙুল দেয়।

আর এদিকে অসীম ধৈর্য বলতে হবে বেচারা মারুফের। দিনের মাঝে হাজার বার বউ তাকে গালাগালি দিয়ে শাপশাপান্ত করছে, ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসছে, মুখে তবু তার একটা রা নেই। মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে কখন কি বলে বসে, করে বসে—লোকে তাতে তাকে মন্দ বলবে, সেই ভয়েই সে তটস্থ। বউয়ের মেজাজ কিসে একটু ঠাণ্ডা রাখা যায় এ চেষ্টারও তার অন্ত নেই। সামান্য কাজই সে করে, পয়জার তৈরি সে ত করে না—ছেঁড়া পয়জার মেরামত করে—তাতে সামান্য সে যা পায় তা সবই এনে বউয়ের হাতে তুলে দেয়। যদি নসিবের ফেরে কোন দিনের রোজগার অন্য দিনের চেয়ে কম হয় তবে সেদিন আর তার রক্ষা নেই, তখনই বউ ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে, আর সেই যে তখন থেকে গালিগালাজ শুরু হল, চলবে তা একেবারে সারারাত্রি ধরে।

এ ছাড়া আবার মাঝে মাঝে বায়না আছে। গরিব মুচির ঘরের বউ হলে কি হয়—বায়না তার একেবারে আমীর ওমরাহের বিবির

মত। না আনতে পারলে বাড়ি ঢুকতে মারুফের বুক কাঁপে, চোখে সরষের ফুল দেখে সে।

একদিন মারুফ যখন তার দোকানে বেরুচ্ছে তখন বউ তাকে ডেকে বললে—শোন, চললে ত—কি আনতে হবে আমার জন্যে—শুনে গেলে না!

মারুফ থমকে দাঁড়াল।

ফতিমা বললে—আমার জন্য পোয়াটাক আচ্ছা কুনাফা পিঠে আনবে, চাকভাঙ্গা টাটকা মধুতে ভেজানো। বুঝলে? নইলে—

মারুফ বললে—দেখি আল্লা যদি মেহেরবানি করে আজ ভাল রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কুনাফা আনব। আপাতত ত আমার ভাঁড় ঢুঢু। যাক ভেবো না তুমি—আল্লা আমায় দোয়া করবেনই।

কি সব আল্লার দোয়া দোয়া করছ? তোমার কাছে চাইছি, তুমি আনবে, আল্লার কি অন্য কারো দোয়ার আমি কি ধার ধারি? ফের বলে দিচ্ছি—টাটকা মধুতে চপচপ একপো কুনাফা যদি না আন তুমি, তাহলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন—হ্যাঁ।

শুনে মারুফের কপাল ঘেমে উঠল—আল্লা মেহেরবান, বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে তার দোকানের দিকে রওয়ানা হল।

দোকান খুলে মারুফ তার দুটো হাত উপরের দিকে তুলে আকুলকণ্ঠে বললে—খোদা, দীন দুনিয়ার মালিক, একটু মুখ তুলে চেও এ অধমের দিকে, বউয়ের কুনাফা কিনবার মত রুজি যেন আজ হয়, মালেক, নইলে বউ আর আমায় আজ আস্ত রাখবে না।

এ কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও মারুফের নসিবে সেদিন কিছু জুটল না: কোন লোকই তার ছেঁড়া পয়জার মেরামত করতে তার দোকানে এল না। সুতরাং কুনাফা ত ভাল, রাত্রে খাবার এক টুকরো রুটি কিনবার মত অর্থও সে উপার্জন করতে পারল না। ভয়ে দোকান বন্ধ করবার সময়ই তার হাত কাঁপতে লাগল। তারপর

যখন সে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল তখন দেহ তার আ করেছিল
ছুর ছুর করছে। া আমতা

বাড়ি যাবার পথের পাশেই পড়ে এক মেঠাইওয়ালার দে আমার মেঠাইওয়ালার জুতো মারুফই মেরামত করে। সে যখন দে ক্রমতা মারুফ নিতান্ত মনমরা হয়ে ছলছল চোখে বাড়ি ফিরছে তখন কেমন মায়া করতে লাগল তার জন্যে। সে তখন ডাকলে—ও ভাই মারুফ, কি হল তোমার আজ, অমন মিইয়ে পড়েছ কেন? এস, এস আমার দোকানে এস দেখি—শুনি।

মিঠাইওয়ালার কথায় দরদের আমেজ পেয়ে মারুফ ঢুকল তার দোকানে।

কি হয়েছে বলত, এত মন খারাপ হল কিসে?

নসিব, মিঞা, নসিব। আল্লার এমন গোসা হয়েছে আমার উপর যে রাত্রের রুটি কিনবার মত রুজিও হয়নি আমার আজ—বলতে গিয়েই মারুফের চোখের পাতাদুটি ভিজে এল।

মেঠাইওয়ালা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে—শুধু এই, না আরও কিছু আছে?

মারুফ কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললে—তাও আছে বই কি: বউ আবার বাড়ি থেকে হুকুম করে দিয়েছে তার জন্যে টাটকা মধু চপ-চপ কুনাফা নিয়ে যেতে হবে।

কতটা?

তা ধরো পোয়া খানেক ত বটেই।

মিঠাইওয়ালার দিলটা বেশ উঁচু, বললে—এর জন্যে তোমার মন খারাপ করবার দরকার নেই। আমি তোমায় একপোয়া কুনাফা দিয়ে দিচ্ছি, দামের জন্য ভাবতে হবে না। আল্লা যখন তোমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন তখন দিলেই চলবে। এই বলে সে মাখন আর রসে ভরা বেশ খানিকটা কুনাফা কেটে একটা রেকাবে করে মারুফের হাতে দিয়ে বললে, যা দিলাম তোমায়, মিঞা ভাই, এ আমীর ওমরাহ বাদশাদের খাবার।

মত। নকুনাফা চাকের মধুতে ভিজাই নি, ভিজিয়েছি আকের সরষের তাতে স্বাদটা এর একটু পালটে আরও অনেক ভাল এ:। বেচারা মারুফ জীবনে কোন রকম কুনাফা খেতে পায়নি, তাকে কাছে এমন একটা দুর্লভ জিনিস মেঠাইওয়ালা তার স্ত্রীর জন্যে সেধে দিচ্ছে দেখে কৃতজ্ঞতায় গলে তার হাতে চুমু দিতে যাচ্ছিল, মেঠাইওয়ালা তাতে বাধা দিয়ে বললে—উঁহু, পাগলামি করে না। শোন, তোমার বউয়ের নসিবে আজ রাত্রে কুনাফা লেখা আছে, তা ত মিললো। এখন তোমার হবে কি? আল্লা তোমার জন্যে আজ যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন দেখ তা-ও তোমায় দিচ্ছি—এই বলে সে সন্থ চুল্লি থেকে বের করে কিছু গরম রুটি আর খানিকটা পনির ডুমুরের পাতায় মুড়ে মারুফের হাতে তুলে দিল। নগদ দামে বউ বা নিজের জন্য এত সব ভাল খাবার কিনে নেবার ক্ষমতা মারুফের কোনদিনই হয় নি, তাই মেঠাইওয়ালা সেধে যখন তার হাতে তুলে দিল তখন কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটি তার আবার ছলছল করে এল, মুখে কিছু না বলে পথে বোধহয় আসমানের দিকে চেয়ে এই সদাশয় লোকটির জন্য খোদার দোওয়া মাঙতে মাঙতে সে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

বাড়ি ঢুকতেই তার বউ খনখনে গলায় ভুরু কুঁচকে বলে উঠল—কি গো মিঞা, আমার কুনাফা আনা হয়েছে?

হ্যাঁ, আল্লার দোয়ায় পেরেছি আনতে তোমার কুনাফা, এই বলে মারুফ সোনালি রসে ভিজানো কুনাফার রেকাবটা বউয়ের সামনে ধরলে।

যেমনি দেখা অমনি সর্বনেশে বউটা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—অলক্ষুণে মিনসে, তোকে আমি টাটকা মধুতে ভেজানো কুনাফা আনতে বলেছিলাম না?—ঝোলা গুড়ে ভেজানো পিঠে আনলি তুই,—তুই ভেবেছিস আমি ফারাক বুঝতে পারব না?—ঘেয়ো কুত্তা, তুই আমাকে গোরে পাঠাতে চাস?

যেমন করেই হোক সে বউয়ের বায়না মত কুনাফা আনতে

পেরেছে ? এতে বউয়ের একটু খুশী মুখ দেখবে আশা করেছিল মারুফ—তার বদলে এ কি কাণ্ড ! ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে সে বললে—শোন, ভাল মা-বাপের বেটী, শোন, আমার কথাটা আগে শোন : এই কুনাফা আমার কিনে আনবার ক্ষমতা হয় নি, অথচ তোমার জন্যে এ আমার না আনলে চলবে না শুনে আমার পুরনো খদ্দের এক মেঠাইওয়ালা বাকীতে দিয়েছে এ পিঠে, দাম—যখন পারি দিলেই চলবে,—তাই—

ঐ সব ভাঁওতা দিয়ে ভুলাবি আমায় ভেবেছিস ? নে, এই নে তোর পচা নোংরা কুনাফা নে—বলে রেকাব সুদ্ধ কুনাফা সে মারুফের মাথায় ছুড়ে মারলে : যা, হল ত ?—এবার জলদি গিয়ে মধুতে ভেজানো কুনাফা নিয়ে আয়। রেকাবটা মাথায় বেশ মোক্ষম জোরে লেগেছিল—মারুফ তাই বউয়ের কথায় কোন জবাব না দিয়ে আহত জায়গাটায় হাত বুলাচ্ছিল—বউ তাতে আরও ক্ষেপে গিয়ে তার মুখে এমন জবর ঘুষি মারলে যে তাতে মারুফের একটা দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগল। বউ আর একটা লাগাবার উদ্যোগ করেছে দেখে আত্ম রক্ষার তাগিদে মারুফ ডান হাত দিয়ে ওকে সরাতে যাচ্ছিল—হাত আল্‌তো করে, বউয়ের মাথা ছুঁয়ে গেল।

তবে রে কুত্তা, তুই আমাকে মারলি ? বলে দুই হাতে মারুফের ঘাড় ধরে বউ চীৎকার করতে লাগল—কে কোথায় মুসলমান আছ, ছুটে এস, আমাকে মেরে ফেললো।

চীৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে অনেক কষ্টে বউয়ের হাত থেকে মারুফের দাড়ি ছাড়ালে। মারুফের মুখ দিয়ে তখন গল গল করে রক্ত পড়ছে—অনেক দাড়ি গেছে ছিঁড়ে,—তা ছাড়া বউয়ের হাতে তার কি রকম নির্যাতন ভোগ করতে হয় তা সবই তাদের জানা, তাই তারা অনেক ভাল কথায় বউকে বুঝালে—সে সব যুক্তির কথা শুনলে আর যে কোন লোকের বুদ্ধির গোড়ায় জল যেত,—কিন্তু ফতিমার কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তারা এও

বললে—দেখ, ঐ ঝোলাগুড়ে চুবানো কুনাফা আমরাও খেয়ে থাকি, মধুতে ডেবোনোর চেয়ে এ খেতে ভাল,—আর তাই এনেছে বলে তুমি তোমার স্বামীর এই দশা করলে!—ছি ছি ছি—এই বলে তারা যে যার নিজের বাড়িতে চলে গেল।

প্রতিবেশীরা যখন ফতিমাকে ভাল উপদেশ দিচ্ছিল তখন সে ঘরে গিয়ে বাড়ির এক কোণে বসেছিল, এবার তারা চলে যেতেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে মারুফকে শাসালে—তুই এমনি করে প্রতিবেশীদের আমার উপর লেলিয়ে দিলি, আচ্ছা দাঁড়া আমিও তোর মজা দেখাচ্ছি।

—এই বলে ফতিমা মারুফের দিকে বাঘিনীর মত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আর বেচারা মারুফ তখন ভাঙা রেকাবের টুকরো থেকে কুনাফা কুড়িয়ে নিজেদের একটা রেকাবে করে বউয়ের সামনে ধরে বললে, লক্ষ্মীটি, আজকের মত এইটাই খেয়ে নাও দেখি, আল্লার মর্জি হলে কাল আমি তোমায় মনোমতটা এনে খাওয়াব।

কিন্তু এতে কি শান্ত হবার মেয়ে ফতিমা? সে মারুফকে এক জোর লাথি ঝেড়ে বললে—ফেলে দে তোর ঐ পচা কুনাফা,—ঐ আমি খেতে যাচ্ছি! দেখ না ভোর হলে তোর আমি কি করি!—আল্লা সহায় হলে কাল তোকে আমি শেষ করব।

এরপর আর কি করতে পারে মারুফ। জীবনে সে অনেক পয়জার তালি দিয়ে সারিয়েছে,—কিন্তু সে তার ঘরের মানুষটির মনটার কিছুই করতে পারল না। সারাদিন সে খিদের জ্বালায় জ্বলেছে—বউয়ের জ্বালা যখন কিছুতেই দূর করা গেল না, তখন পেটের জ্বালাটাই অন্তত দূর করা যাক ভেবে প্রথমে সেই সুস্বাদু কুনাফা, তারপর রুটি আর পনির যতটা এনেছিল তার সবটা খেয়ে সে নিজেই শেষ করলে। আর তার খাওয়ার সময় বউ দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করে তার দিকে চেয়ে সমানে বলে গেছে—মর, মর, মর তুই, ঐ গলায় বেধে মর—ওর বিষে জ্বলে পুড়ে তুই মর।

মারুফ এ সব কটূক্তির একটারও জবাব না দেওয়ায় ফতিমার

মেজাজ একেবারে পঞ্চমে চড়ে গেল। একে খিদের জ্বালা তাতে এই রাগ। রাগের চোটে সে শেষে ঘরে যত কিছু ছিল সব ছুঁড়ে মারতে লাগল স্বামীর মাথা লক্ষ্য করে। সব ছোঁড়া যখন শেষ হয়ে গেল তখন সে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিল। সে রাত্রে ঘুমের মাঝেও যা মুখে এসেছে তাই বলে মারুফকে অভিশাপ দিয়েছে।

পরদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশি ভোরে উঠেই মারুফ তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে বাজারে গিয়ে দোকান খুললে। দেখা যাক, আজ যদি আল্লা মুখ তুলে চান। অন্য দিনের চেয়ে আজ রোজগার যদি কিছু বেশি হয়, তা হলে বউয়ের মনোমত কুনাফা কিনে নিয়ে তার গোসা ভাঙবে। কিন্তু তা কি হতে পারল? সে ঠিকমত গোছগাছ করে বসতে না বসতেই কাজীর কাছ থেকে দুই জন কোতোয়াল এসে তাকে ধরে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে একেবারে আদালতে নিয়ে গিয়ে হাজির। মারুফ সেখানে যেতেই দেখে কাজীর সামনে তার বউ ফতিমা দাঁড়িয়ে—মাথায় তার রক্তমাখা কাপড় বাঁধা,—বাহুতে পট্টি,—তা ছাড়া একটা ভাঙা দাঁত তার হাতে। দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল সে। আর তাকে সামনে পেয়েই কাজী অমনি গর্জে উঠলেন—তুমি যে নিরীহ জেনানার হাত ভেঙেছ, দাঁত ভেঙেছ,—মাথা ফাটিয়েছ,—উপরে আল্লা আছেন—তাঁর ভয় করো না তুমি?—শুনে মারুফ ত একেবারে থ। মনে হচ্ছে তার তখন—ধরণী তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মাঝে প্রবেশ করি। মারুফ অবশ্য তার প্রতিবেশীদের ডেকে এ ব্যাপারে সাক্ষী মানতে পারত, কিন্তু শান্তিপ্রিয় ভালো মানুষের যে এ সব করা চলে না, তা ছাড়া মুচি হলেও আত্মমর্যাদা বলে একটা জিনিস তার আছে,—সুতরাং কাজী তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর প্রহরীকে হুকুম দিলেন—ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলে ওর পায়ের তলায় আচ্ছা করে একশোটা লাঠির ঘা বসাও। প্রহরীরা তখনই কাজীর আদেশ যথাযথ পালন করলে মারুফ কাজীর সামনে থেকে উঠে অতিকষ্টে কোনরকমে নীলনদের তীরে একটা ভাঙা ঘরে

গিয়ে হাজির হল। পায়ের ফুলো আর ব্যথা না কমা পর্যন্ত সে ওখান থেকে আর নড়ল না। কারণ তখন তার যা মনের অবস্থা তাতে বাড়ি ফিরে বউয়ের কাছে যাওয়ার চেয়ে তার মাথাটা যদি কেউ এক কোপে উড়িয়ে দেয় সেও তার কাছে ভাল। হাঁটবার মত অবস্থা হলে সে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এক নৌকায় দাঁড় বাওয়ার কাজ নিল। ঐ নৌকো বন্দরে এসে হাজির হলে সে পাল মেরামতের কাজ নিয়ে আল্লার নাম করে এক জাহাজে চাপল; যা থাকে নসিবে!

জাহাজখানা ভূমধ্যসাগরে কয়েক হপ্তা চলার পর হঠাৎ একদিনকার এক দারুণ ঝড়ে গেল ডুবে। একমাত্র মারুফ ছাড়া জাহাজের মাঝি মাল্লা, আরোহী সবাই মারা গেল। ভাগ্যক্রমে মারুফ তার হাতের কাছে এক ভেসে-আসা জাহাজের মাস্তুল পেয়ে গেছল,—সেটা ধরে তাতে ভর দিয়ে পা দিয়ে দাঁড়ের মত জল ঠেলে চলতে লাগল। কিন্তু এগুতে কি পারে?—সে যেন সমুদ্রের ঢেউ আর বাতাসের হাতের খেলনা। একদিন একরাত্রি এমনি করে চলে এবং বেশির ভাগ ঢেউ আর বাতাসের কৃপায় পরদিন ভোরেই সে তীরে এসে হাজির হল। খোদা তাকে এমনি করে যেখানে এনে ফেললেন সেটা একটি অতি সুন্দর শহর।

মারুফ যখন তীরে উঠল তখন শরীর তার রীতিমত অবসন্ন। নিস্তেজ নিশ্চল হয়ে সে অমনি সমুদ্র তীরের বালুর উপরেই শুয়ে পড়ল, পরক্ষণেই গভীর ঘুমে অচেতন। যখন ঘুম ভাঙল তখন সে দেখে দস্তুরমত দামী পোশাক পরা একটা লোক তার উপর ঝুঁয়ে একদৃষ্টে তাকে নিরীক্ষণ করছে, তার দুই পাশে দুটি বান্দা বাহুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। মারুফকে ভাল করে চোখ মেলতে দেখেই লোকটা সোল্লাসে বলে উঠল, 'আলহামদুল্লা' (আল্লার জয় হোক) —তারপর একটু নীচু গলায় মারুফকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কোন দেশের লোক, ভাই,—তোমার পোশাক দেখে ত মনে হচ্ছে তুমি মিশরের লোক।

ঠিকই ধরেছেন, জনাব, আমি মিশরের লোক, ওখানকার কায়রো শহরে আমার জন্ম, কায়রোতেই আমার বাড়ি।

কিছু মনে করো না, ভাই,—কায়রোর কোন পাড়ায় তোমার বাড়ি?—বলবার সময় লোকটার গলাটা যেন একটু কাঁপছে।

মারুফ জবাব দিলে—কায়রোর লাল সড়কের ধারে, জনাব।

ওখানকার কাকে কাকে চেন তুমি, ভাই,—তোমার পেশাই বা কি?

পেশা আমার পয়জার মেরামত করা,—জনাব। আমি মুচি, আর আমাদের স্বজাত যারা ঐ কাজ করে তাদের সবাইকে আমি চিনি।—এরপর কয়েকজনার নামও শুনিয়ে দিল মারুফ লোকটাকে। আর লোকটা এদিকে যত শুনছে ততই মুখটা তার খুশীতে চক্চক্ করে উঠছে।

আচ্ছা, ভাই, তুমি ও পাড়ার শেখ আহমদকে চেন যে খোশবু বিক্রি করে?

শুনে মারুফও খুশীতে বলে উঠল—আল্লা আপনার ভাল করুন, জনাব, তিনি আমারই প্রতিবেশী, দুই বাড়ির মাঝে একই পাঁচিল আমাদের।

ভাল আছেন তিনি?

আল্লার দোয়ায়—খুবই ভাল।

এখন তাঁর ক'টি ছেলে মেয়ে?

তিনটি ছেলে, জনাব, মুস্তাফা, মহম্মদ আর আলি।

কি করে তারা?

বড় মুস্তাফা এক মকতবের মৌলভী, জবর এলেম তাঁর, গোটা কোরাণ তাঁর মুখে মুখে, আর সাত রকম উচ্চারণে তিনি তা আবৃত্তি করতে পারেন। মেজো মহম্মদ দাওয়াই আর খোশবু বিক্রি করে তার বাপের মত। বাপ তাঁর নিজের দোকানের কাছেই একটা আলাদা দোকান করে দিয়েছেন। আর সবার ছোট আলি—আল্লা

ভাল করুন তার, যেখানেই থাক, সুখে রাখুন—সে ছিল আমার ছেলেবেলার সাথী, আমরা এক সঙ্গে থেকেছি, খেলেছি, অপরের বাগিচায় গিয়ে কত দৌরাত্ম্য করেছি, তারপর হঠাৎ একদিন একটা খৃষ্টান ছেলের সঙ্গে কি নিয়ে বচসা হতে সে তাকে এমন মার দিল যে সে হল মরার সামিল। ছেলেটির বাপ চাচা আর ওখানকার আর আর খৃষ্টানরা সব একজোট হয়ে আলির খোঁজে আহমদ সাহেবের বাড়িতে চড়াও হতে যাচ্ছে দেখে আলি ঐ যে পালাল—সেই পালাল, প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল তার কোন পাত্তা নেই। আল্লা তাকে ভাল রাখুন।

মারুফের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা দুই হাতে মারুফের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়ে বললে—ভাই মারুফ, আমিই সেই আহম্মদ সাহেবের বেটা আলি।

মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর আলি যখন শুনল তার দোস্তের একদিন একরাত্রি পেটে কিছু পড়েনি, সে তখনি তার পিছনে গাধার পিঠে চড়িয়ে নিজের ইমারতে নিয়ে এল। তারপর তার বান্দাদের হুকুম দিলে তারা মারুফকে গোসল করিয়ে—ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে বেশ পরিতুষ্ট করে খাওয়ালে। আলির মস্ত বড় কারবার—পরদিন ভোরের আগে আর তার পুরনো দোস্তের সঙ্গে দেখা করবার ফুরসুত হল না। পরদিন সকালে এক সঙ্গে বসে যখন দুই বন্ধুর প্রাণ খুলে কথা বলবার সুযোগ হল তখন আলি মারুফের মুখেই শুনল তার এখানে এসে পড়ার সকল বৃত্তান্ত। সেই সর্বনেশে মেয়ে ফতিমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে তার প্রতিদিনের দুর্বিষহ জীবন, কুনাফার ব্যাপার নিয়ে বউয়ের নির্যাতন, বিনা দোষে বউয়ের কারসাজিতে কাজীর বিচারে শাস্তি ইত্যাদি করে সব কিছুই মারুফ তার দোস্তকে খুলে বললেঃ আর সহ্য করতে পারলাম না, ভাই,—তাই দোকান ফেলে, ঘর-বাড়ি ফেলে আল্লা যেখানে নিতে চান নিয়ে যান—ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। আলি বললে তার নিজের কথাঃ আল্লা অনেক দোয়া করেছেন, অনেক

দিয়েছেন, এখন এই 'ইখতিয়ান অল খাতন' শহরের সব চেয়ে ধনী বণিক, সবার চেয়ে বেশি মান্যগণ্য আমীর সে।

এরপর দু'জনের ছেলেবেলার অনেক কথা হবার পর আলি বললে, শোন ভাই মারুফ, আমার যে বিপুল ধনসম্পদ দেখছ তার মালিক আমি নই,—মালিক খোদা, আমি তাঁর জিম্মাদার। এর যোগ্য সদ্‌ব্যবহার হয়, এই তাঁর ইচ্ছা, তোমার মত লোককে এর বেশ কিছুটা দেওয়ার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, তাই সামান্য কিছু তোমায় দিচ্ছি—বলে আলি তখনই এক হাজার দিনারের একটা থলে তার হাতে দিল, অতি চমৎকার একটা পোশাক তাকে পরালে তারপর বলল—শোন, এখন কি করতে হবে তোমায় শোন, কাল সকালে এই পোশাক পরে আমার যে সব গাধা আছে তার মধ্যে যেটি সবার সেরা, সেটিতে চড়ে তুমি এখানকার বাজারে যাবে, সেখানে গিয়ে দেখবে এখানকার নামকরা বড় বড় বণিকদের মাঝে আমি বসে আছি। আমি তোমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে এগিয়ে এসে তোমার গাধার লাগাম ধরব, হাতে চুমু দিয়ে সম্মান দেখাব, এতে সবাই বুঝবে তুমি একটা যা-তা লোক নও। ওখানকার বণিক সমাজে তোমার রীতিমত মান বেড়ে যাবে। এই হল শুরু। এরপর তোমায় আমি অনেক ভাল মালপত্রে ভরা খুব বড় একটা দোকান দেব। শীগগিরই এখানকার আমীর লোকদের সঙ্গে তোমার জানাশুনা হয়ে যাবে, আল্লার দোয়ায় দিনদিন তোমার সম্পদ বৃদ্ধি হবে, উন্নতি হবে, দেখবে সর্বনেশে কুঁদুলে বউয়ের দেওয়া জ্বালার কথা তুমি ভুলে গেছ, অভাব দৈন্যের জ্বালা ভুলে গেছ, দিল খুশী হয়েছে তোমার, শান্তি পেয়েছ।

কৃতজ্ঞতায় কি যে করবে মারুফ বুঝতে না পেরে বন্ধুর আচকানের প্রান্ত চুম্বন করতে যাচ্ছিল,—আলি তা করতে না দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

পরদিন ভোরে বন্ধুর কথামত বিদেশী ধনী বণিকের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে বেশ ভাল করে সাজলো, তারপর আলির একটা

ছাই রঙা সুন্দর গাধায় চড়ে নির্দিষ্ট সময়ে সে বণিকদের ওখানে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখা মাত্র আলি আগের দিন যেমনটি বলেছিল তেমনটি করায় অন্যান্য বণিকদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না: ইনি কোথাকার কত বড় বণিক যে আলি সাহেব নিজে গিয়ে তার হাতে চুমু দেন,—গাধার লাগাম ধরেন! আর বসালেনই বা ওকে কোথায়, নিজের গদির একেবারে সেরা জায়গায়!

এরপর একে একে সদাগররা সব আলির কাছে এসে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করে—ইনি একজন খুব বড় সদাগর বুঝি?

শুনে আলি যেন তাদের অজ্ঞতায় বিস্মিত—বড় মানে? দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সদাগর বলতে পার! নানা জায়গায় ওঁর এত দোকান আর গুদাম যে তামাম দুনিয়ার আগুন তা পুড়িয়ে শেষ করতে পারে না। ওঁর কাছে আমি ত একটা সামান্য ফেরিওয়ালা। মিশর, ইরান থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ, চীন—সব দেশে ওঁর মুসুদ্দী হবার জন্যে লোকের ঝুলোঝুলি। তাছাড়া মহাজনী কারবারও ওঁর দুনিয়ার সব জায়গায়। ভাল করে পরিচয় হোক আগে ওঁর সঙ্গে দেখবে কি লোক উনি!

আলি এসব কথা এমন জোর দিয়ে এমন ভঙ্গীতে বললে যে বণিকদের এতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না। তারা তখনই মারুফের চারিদিকে ভিড় করে তাকে সেলাম জানিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে, স্বাগত জানিয়ে অতিষ্ঠ করে তুললো। এরপর চললো নিমন্ত্রণের পালা: বণিকদের প্রত্যেকেই তাকে রাত্রে খানাপিনার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। মারুফ এর মধ্যেই রীতিমত সেয়ানা হয়ে উঠেছে। মৃদু হেসে বলে—সে কি করে হয়, আমি যে আমার দোস্ত আলি সাহেবের বাড়িতে উঠেছি, এখন অন্য কোথাও খেলে উনি ব্যাজার হবেন।

বণিকদের মুখে বিদেশ থেকে এতবড় এক বণিক এসেছে শুনে সিন্ধিক নিজেই মারুফের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এটা অবশ্য বণিক সমাজের রেওয়াজ নয়। বাইরে থেকে কোন নতুন সদাগর

এলে তারই প্রথম গিয়ে সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করবার কথা। সেই গিয়ে সিদ্দিককে নিজের দেশের পণ্য এবং তার বর্তমান মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করবে। যাই হোক মারুফের কারবার যাতে এখানে ভাল চলে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যে উনি এসেছেন এটা বুঝতে পেরে সিদ্দিক তার সঙ্গে দেখা হতেই শুরু করলেন—জনাব, আপনার যে মাল আসছে, তার মধ্যে অনেক গাঁট হলদে কাপড় আছে নিশ্চয়? এখানে ঐ কাপড়ের বড় চাহিদা। মারুফ তখনই জবাব দিয়ে দিল, —হলদে কাপড়? প্রচুর, প্রচুর, যত চান।

ভাল খুনখারাপি রঙের?

যথেষ্ট—আর তার এমন চোখ ধাঁধানো রঙ যে দেখে খদ্দেরের তাক লেগে যাবে। এই রঙ, আমার কাপড়ের মত দুনিয়ার আর কোথাও পাবেন না।

সিদ্দিক তার কাছে এই রকম সব যত প্রশ্ন করতে লাগলেন মারুফের সে-ই ঐ এক উত্তর, প্রচুর, প্রচুর, যথেষ্ট। এই রকম সব শুনবার পর সিদ্দিক তখন একটু বেশ নম্র কণ্ঠে বললেন,—জনাব, আপনার ঐ সব কাপড়ের কিছু কিছু নমুনা দেখতে পারি কি?

মারুফ অমনি বলে উঠল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, তবে একটু সবুর করতে হবে। এক হাজার উঠের পিঠে আমার সব মাল আসছে, ওগুলি এসে গেলেই—

শুনে অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে সিদ্দিকও একেবারে থ: লোকটা বলে কি, এক হাজার উটের পিঠে মাল!—সে কত রে আল্লা!

বিস্ময়ের মাত্রা একেবারে ছাড়িয়ে গেল এর পরের ঘটনায়: মারুফ আর বণিকদের নিয়ে সিদ্দিক যেখানে বসেছিলেন—সেখানে এসে প্রায় তখনই এক ভিখারী একে একে সবারই কাছে ভিক্ষা চাইলে। কেউ দেন এক ফুফা (তাম্র মুদ্রা), কেউ আধলা, আর মারুফের কাছে আসতেই যে জামার জেব থেকে এক মুঠো দিনার বের করে ভিখারীর হাতে দিলে। দাতার মুখের ভাব দেখে

মনে হয় যেন সে একটা ফুকা দিল। দেখে সকলে একেবারে হাঁ করবার যোগাড়।

মারুফের ঐশ্বর্যের খ্যাতি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে শেষে ওখানকার সুলতানের কানে গিয়ে পৌঁছল। সুলতান তাঁর উজিরকে ডেকে বললেন—শোন উজির, শুনছি আমার এখানে যে এক নতুন সদাগর এসেছে, হাজার উটের পিঠে না কি তার মাল আসছে! এতে লাভ হবে ত এখানকার বণিকদের। আমি বলি আর কেন, অনেকই ত খেয়েছ তোমরা, অনেক খেয়ে ত পেট মোটা হয়ে গেছে, আর খেলে যে পেট ফেটে যাবে, তার চেয়ে এবার না হয় আমরাই কিছু খাই, আমরা মানে আমার বেগম, বেটী আর আমি।—এতে কি বলো তুমি?

উজির অতি বিজ্ঞ লোক, বিচক্ষণ, বললেন—এ তো বেশ ভাল কথা। কিন্তু জাহাঁপনা, ওঁর মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগে থেকেই কোন কিছু করা ঠিক হবে কি?

সুলতান এতে রেগে গিয়ে বললেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি উজিরি করো ঃ কুকুরের পেটে চলে যাবার পর কেউ মাংস কেনে? যাও এখনই তুমি সেই বিদেশী বণিককে নিয়ে এস আমার সামনে, আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

উজির মনে মনে গজ গজ করতে করতে মারুফকে এনে সুলতানের সামনে হাজির করল। মারুফ এসে সুলতানের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যে ভাষায় যে ভঙ্গীতে তাঁর সঙ্গে কথা বললে তাতে সুলতানের একেবারে তাক লেগে গেল। এরপর সুলতান মারুফের ধনসম্পদ, কারবার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই তাকে করলেন,—মারুফ সব প্রশ্নেই মৃদু হেসে ঐ একই উত্তর দেয়—হাজার উটের পিঠে আমার মাল পত্তর ত আসছে, জাহাঁপনা, এলেই বুঝতে পারবেন। শুনে অবিশ্বাস করবার আর কোন কারণ রইল না সুলতানের। তবু তাকে একটু ভাল করে বাজিয়ে নেবার জন্যে অন্তত হাজার দিনার দামের একটা বড় মুকতো মারুফের

সামনে ধরে বললেন—দেখুন ত, এ রকম মুকতো হবে ত আপনার কাছে ?

মারুফ মুকতোটা দুই আঙ্গুলের মাঝে নিয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে তখনই গুঁড়ো করে ফেললে।

একি, একি, কি করলে তুমি? আমার হাজার দিনারের মুকতোটা তুমি অমনি গুঁড়ো করে ফেললে! ক্রোধ, বিরক্তি আর বিস্ময়ে সুলতানের মুখ কেমনই যেন হয়ে গেছে।

মারুফ হেসে উঠল : হ্যাঁ হাজারেরই মত দাম বটে এর, তবে এর চাইতে বড়, টলটলে আর দেখতে অনেক সুন্দর পাবেন আপনি আমার কাছ থেকে। আমার মাল আগে আসুক এর চেয়ে ভাল মুকতোর বস্তা আমার অনেক আসছে।

শুনে সুলতানের লোভ রীতিমত বেড়ে গেল, মনে মনে ভাবলেন তিনি, এরই সঙ্গে আমার মেয়েটার সাদি দিয়ে একে জামাই করে নেব আমি।

এর একটু পরেই তিনি মারুফকে বললেন—জনাব, একটা কথা বলতে চাই আমি, আপনার মত লোককে আমার এখানে পেয়ে আমি যে কত খুশী হয়েছি তা জানাতে আমার একটি মাত্র মেয়েকে আপনার বাঁদী করে দিতে চাই আমি। আপনি রাজী হলে আপনার সঙ্গে তার সাদি দি। সে ছাড়া আমার আর সন্তান নেই, সুতরাং আমার মৃত্যুর পর এ রাজ্যও আপনিই পাবেন। এখন ভেবে বলুন আমার এ প্রস্তাবে আপনি রাজী কিনা।

দক্ষ অভিনেতার মত মারুফ প্রথমে একটু ভাবার ভান করলে তারপর অতি বিনয়ের সঙ্গে বললে—এ বান্দার কাছে এ তো মহা সম্মানের কথা, নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। কিন্তু জাহাঁপনা, আমি বলি কি,—আমার মালগুলি এসে যাবার পরে সাদিটা হলে ভাল হয় না? আপনার মত সুলতানের বেটীকে সাদি করতে হলে তার মর্যাদার যোগ্য যে যৌতুক আমার দেওয়া দরকার আমার মাল

আসার আগে তা ত আমি দিয়ে উঠতে পারব না। আপনিই বুঝে দেখুন—সাদির দিনেই শাহাজাদীকে আমি হাজার দিনারের অন্তত দুই লক্ষ থলি উপহার দিতে চাই, এ ছাড়া গরিব দুঃখীদের মধ্যেও আমি হাজার দিনারের হাজার থলি বিতরণ করতে চাই, এরপর হাজার দিনারের অনেক থলি দিতে হবে আমার যারা উপহার নিয়ে আসবে তাদের, এ ছাড়া ভোজ দিতেও আমার বহু হাজার থলি খরচ করতে হবে। এরপর আছে হারেমের বিবিদের প্রত্যেকের একটি একটি করে বড় মুকতোর মালা, এবং আপনি এবং আমার শাশুড়ী বেগম সাহেবার জন্যে সবচেয়ে সেরা রত্নের কিছু সেলামি। যা তা ব্যাপার নয় ত! হাজার উটের পিঠে আমার মালপত্র এসে না পৌঁছলে আমি এ সবের ব্যবস্থা করি কোত্থেকে?

মারুফের চেহারা, আদব কায়দা, বোলচালেই সুলতান প্রথমে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন—এবার এই সব জিনিসের ফিরিস্তি শুনে তিনি আর মাথাটা ঠিক রাখতে পারলেন না। তখনই বলে উঠলেন, না, না, তোমার বিয়েতে যা যা তুমি দরকার মনে করো—সে সব আমিই যোগাব। মোট কথা, তোমাদের বিয়েটা যত শীগগির হয় আমি সেরে ফেলতে চাই। আমার মেয়ের যা তুমি যৌতুক দিতে চাও, তা না হয় তুমি তোমার মালপত্তর এলেই দিও। আর নগদ খরচের জন্য তোমার যা দরকার মনে কর তা তুমি আমার রাজকোষ থেকেই নিতে পার, কারণ এখন ত তোমার অর্থে আর আমার অর্থে কোন তফাত রইল না।

এই কথার পর মারুফ তখনকার মত বিদায় নিলে। সুলতান তখনই তার উজিরকে ডেকে বললেন—তুমি একবার জলদি গিয়ে এখানকার শেখ-অল-ইসলামকে ডেকে আন ত—আমি এই মারুফের সঙ্গে আমার মেয়ের সাদি দিতে চাই, এ সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো আমি তার সঙ্গে। ব্যাপারটা উজিরের আদৌ মনঃপুত হল না তাই সে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হে, তুমি চুপ করে রইল যে।

উজির ধীরে ধীরে সুলতানের কাছে এগিয়ে এসে তাঁর কানের কাছে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—জাহাঁপনা, এই বিদেশী বণিকটাকে, কেন জানি না, আমার তেমন ভাল লাগছে না। ওঁর যে সত্যিই ঐ সব মাল আসছে—মানে আমি বলছি ওঁর হাজার হাজার উটের পিঠে ঐ সব মাল না আসা পর্যন্ত ওঁর কথায় পুরো বিশ্বাস করে শাহাজাদীর মত একটি রত্নকে এই অচেনা অজানা বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া কি ঠিক হবে?

উজিরের কথা শুনে সুলতানের মুখটা আঁধার হয়ে গেল, তিনি রাগ আর সামলাতে না পেরে বলে উঠলেন—তুমি বেইমান, তুমি নিমকহারাম, আমার অন্ন খেয়েও তুমি আমার ভাল কিছু দেখতে পার না। এ বিয়েতে তুমি খুশী নও, কারণ তোমার মতলব আছেঃ তুমি নিজে শাহাজাদীকে সাদি করতে চাও। কিন্তু এ কথা তুমি স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না যে তোমার হাতে আমি মেয়ে দেব। আর এও বলে রাখছি—এই সুদর্শন তরুণ ধনী বণিকের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়েতে ভবিষ্যতে যদি তুমি কোনরকম ভাংচি দিতে এস তা হলে তোমাকে আমি আর আস্ত রাখব না। এরপর সুলতান একটু থেমে আবার শুরু করলেন—তুমি বোধ হয় চাও আমার মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাক্। যখন কেউ আর তাকে খুশী হয়ে বিয়ে করতে চাইবে না, তখন তোমার সুবিধা হবে, না? তোমার কোন ফন্দি খাটবে না আমার কাছে। এমন সুযোগ্য পাত্র আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না। ও যে আমার মেয়েকে সুখী করবে শুধু তাই নয়, আমরা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হব, অতুল, অতুল, অতুল। সুতরাং এখন আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে ছুটে যাও, গিয়ে এখনই শেখ-অল-ইসলামকে নিয়ে এস আমার সামনে। যাও—।

উজির মনমরা হয়ে মাথা নীচু করে শেখ-অল-ইসলামের কাছে গিয়ে তাঁকে এনে হাজির করল সুলতানের সামনে। সুলতানের নির্দেশে তিনি এসেই মারুফ আর শাহাজাদীর বিয়ের চুক্তিপত্র লিখে ফেললেন।

সুলতানের আদেশে গোটা শহরটা সাজিয়ে ফেলা হল, ঝুলানো হল—নানান রঙের বাতি। যে মুচি মারুফের জীবনে দুর্ভোগ দুর্গতির অন্ত ছিল না—সে বসল সুলতান মহলের চত্বরে এক সিংহাসনে। তার সামনে গাইয়ের দল গান শোনাতে লাগল বাজিয়ের দল নানা রকমের বাজনা, কুস্তীগীরেরা নানা রকম কসরৎ করে নিজেদের কেরামতি দেখাতে লাগল, ঘোড়সওয়ারেরা ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে অনেক কসরৎ দেখালে। নর্তক-নর্তকীরা দেখালে নাচ। আর এদিকে মারুফ উজিরকে দিয়ে রাজকোষ থেকে মোহর আনাচ্ছে আর দু'হাতে ছড়াচ্ছে তা চারিদিকে। এক থলি ফুরোলেই আর এক থলি; দিনারের থলি টানতে টানতে উজিরের কাঁধ-পা দুই-ই ব্যথা হয়ে গেল। আর এ ব্যাপার শুধু ঐ একদিন নয়—পুরো তিনদিন কাবার করে চতুর্থ দিনের রাত্রি পর্যন্ত: ঐ রাত্রে বরকনের—দেখা হবে—এক ঘরে তারা রাত কাটাবে।

বাসরঘরে কনেকে বেশ জমকালো মিছিল করে আনা হল, ঐ সময় আশেপাশের বিবিরা তাকে যে সব উপহার দিল কনের বাঁদীরা সে সব নিয়ে এক সঙ্গে কনের জন্যে সাজিয়ে রাখলে। শেষে শাহাজাদী যখন তার বরের ঘরে এসে পরদা দেওয়া বিছানায় গিয়ে বসল, তখন মারুফ তার সামনে না এসে ঘরের এক কোণে গিয়ে নিজের মনে মনে বলছে—সর্বনাশ, সর্বনাশ—এ কি হল, এ কি হল—এখন আমি কি করি!—কায়রোর পুরনো ছেঁড়া জুতোয় তালি-দেওয়ার মুচি আমি—আর আমার এই—! যাক গে আমি আর কি করব আমার ত কোন দোষ নেই—সবই নসিব—আল্লার মর্জি!

এদিকে মারুফ কনের কাছে আসছে না দেখে সে পরদা সরিয়ে বলতে লাগল—জনাব, আপনি আমার কাছে আসছেন না কেন,—আমি কি কোন কসুর করেছি, না—আমাকে পছন্দ হচ্ছে না আপনার—ঘৃণা করছেন?

মারুফ এবার এগিয়ে এল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বলে উঠল—আল্লা ছাড়া গতি নেই—সবই তাঁর মর্জি।

এ কথা বলছেন কেন, জনাব,—কি আপনার দুঃখ—আমাকে কি কুৎসিত বদাকার মনে হচ্ছে আপনার?

না, সে সব কিছু না, যত দোষ তোমার বাপজানের।

কেন, কি ক্ষতি করলেন আপনার আমার বাপজান?

ক্ষতি না—তাঁর জন্যই আমি লোকচক্ষে হেয় হয়ে গেলাম, তোমার এবং তোমার সখীদের যোগ্য মর্যাদা দিতে পারলাম না। তিনিই ত হাজার উঠের পিঠে আমার মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না। মালগুলি এসে গেলে আমি অন্তত তোমার গলায় পাঁচ ছয় নরীর বড় বড় মুক্তোর মালা ঝুলাতে পারতাম, দুনিয়ার কোন শাহাজাদী চোখে দেখে নি এমন কয়েকটা পোশাক দিতে পারতাম, তোমার পছন্দসই কিছু মণিরত্নও তোমায় দিতে পারতাম, কিন্তু এ কি হল! এ যে বাজারের একজন পনিরের ব্যাপারীর মত সাদি করতে হল তোমাকে। তোমার বাবা এমন তাড়াহুড়া করলেন বলেই ত এই লজ্জাকর ব্যাপারটা ঘটল!

শাহাজাদী মৃদু মধুর হেসে মারুফের হাত ধরে স্বর্ণপালঙ্কে তার পাশে বসিয়ে বললে—কি সব ছাই পাঁশ বলছ তুমি, তোমার ধনরত্নের আমার কিছু প্রয়োজন নেই—মেয়েদের কাছে স্বামীর চেয়ে দামী আর কিছু দুনিয়ায় আছে? এ কি শুনছে মারুফ তার নব পরিণীতা সুন্দরী তরুণী শাহাজাদীর মুখে! সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তার ফতিমার খর তিক্ত রসনার দৌরাত্ম্যে বিনিদ্র রজনী যাপনের কথা। একবার ভাবল সে, খোয়াব দেখছে না ত!—একবার মনে হল—আল্লা এ কি খেলা খেলছেন তাকে নিয়ে! রাত্রির অন্ধকারে শাহাজাদীর মিষ্টি কথা শুনে, আদর পেয়ে কতবার যে তার চোখের পাতা দুটি জলে ভিজে ওঠল তা আল্লাই জানেন। বেহেস্তের সুখ পেতে গিয়ে কতবার যে সে নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল তার লেখাজোখা নেই, কিন্তু প্রতিবারই নিজের

মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—আমার এতে হাত নেইঃ উপরের সেই তিনি কলার বাসনার মত দরিয়ায় ভাসিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

একটা সুখস্বপ্নের মত রাতটা কেটে গেল। ভোরে শাহাজাদীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুফ হারেমে ঢুকল। সেখান থেকে গোসল সেরে এসে জমকালো পোশাক পরে দরবারে এসে সুলতান শ্বশুরের ডান দিকে বসল ঃ রাজ্যের আমীর ওমরাহ আর গণ্য-মান্য লোকদের অভিনন্দন লাভ করবে সে। সে প্রথমে নিজে থেকেই উজিরকে হুকুম করলে উপস্থিত সকলকে খিলাত দিতে। তারপর তার হুকুম হল আমীর, আমীরদের বিবি, খোজা-প্রহরীদের সব নানা ভাল ভাল উপহার দেবার। শুধু এই নয়, রাজকোষ থেকে মোহরের থলি আনিয়ে তা থেকে মুঠো মুঠো ছড়াতে লাগল চারিদিকে—যে নেয় তার। এর ফলে দরবারে সেদিন যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আল্লার কাছে তার দীর্ঘজীবন কামনা করতে লাগল।

এইরকম শুধু ঐ এক দিন নয়। বিশ দিন ধরে চললো মারুফের ঐ রকম দান খয়রাত উপহার।

বিশ দিন ত মারুফ এইভাবে মহাসমারোহে কাটিয়ে দিল, কিন্তু তার হাজার উটের পিঠে বহু হাজার বস্তা মাল কই? সবাই ভাবছে—কই এখনও ত পৌঁছল না—এদিকে রাজকোষ যে একেবারে শূন্য। রাজকোষের এমনি হাল দেখে উজির চাপা রাগ বিরক্তি আর হতাশা নিয়ে সোজা সুলতানের কাছে গিয়ে বললে—জাহাঁপনা, কথাটা না বললে আমার কসুর হবে—আপনার জামাইয়ের হাজার উটের পিঠে ধনরত্ন বেসাতি ত এখনও এসে পৌঁছাল না—কিন্তু এদিকে রাজকোষ যে একেবারে ঢুঢু।

একটু উদ্‌বেগের রেখা সুলতানের চোখে মুখে দেখা দিয়ে আবার তখনই তা মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন—হ্যাঁ, একটু দেরি হচ্ছে বটে—তবে দু'চার দিনের ভিতরেই এসে পড়বে নিশ্চয়। শুনে

উজির একটু ক্রূর হাসি হেসে বললে—আল্লা আপনাকে দীর্ঘজীবী করে সুখে রাখুন, জাহাঁপনা—কিন্তু আপনি আর এখন অস্বীকার করতে পারেন না যে আমীর মারুফ সুলতান মহলে আসার পর থেকে আমরা বেশ একটু দুর্দিনেই পড়েছি। মুশকিল আসানের ত আমি আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না,—কারণ রাজকোষ একেবারে শূন্য—অথচ এই অচেনা অজানা বিদেশীর সঙ্গে আপনি ত আপনার বেটীর বিয়ে দিয়ে বসে আছেন।

উজিরের কথায় সুলতান এবার একটু ভয় পেয়েই গেলেন, তিনি বিরক্তির সুরে উজিরকে বললেন—তুমি যদি তাই বুঝে থাক, তা হলে অত বাক্‌পটুতা দেখানোর চেষ্টা না করে তোমার উচিত ছিল কি করে এ মুশকিলের অবসান হয় তারই যুক্তি দেওয়া আর আমার জামাই যে সত্যিই মিথ্যাবাদী জোচ্চোর তার প্রমাণ সংগ্রহ করা।

জাহাঁপনা ঠিকই বলেছেন, উত্তর দিলে উজির—অপরাধী সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, দোষীকে শাস্তি দেওয়া চলে না। আমার মনে হয়, মালেক, আপনার—মেয়েই আমাদের—এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন। আপনি তাঁকে এখানে ডাকুন আমি তাঁকে প্রশ্ন করব, তিনি পরদার আড়াল থেকেই আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা আপনার জামাইয়ের সত্যিকার পরিচয় পেতে পারব।

বেশ তাই হোক—বললেন সুলতান,—আর যদি দেখি মারুফ আমাদের প্রতারণা করেছে, তা হলে দেখো প্রাণদণ্ডের কি রকম নিষ্ঠুর ব্যবস্থা করি আমি তার।

মারুফ তখন ঘরে ছিল না, সুতরাং তার অজান্তে মেয়েকে ডেকে আনতেও কোন অসুবিধা হল না। সামনে একটা পরদা খাটিয়ে তার ওপাশে শাহাজাদীকে বসানো হল। পরদার এ পাশ থেকে সুলতান তাঁর মেয়েকে বললেন, বেটী—উজির সাহেব তোকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছেন, তুই ঠিক ঠিক উত্তর দিবি।

পরদার ওপার থেকে শাহজাদীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—বলুন, কি বলতে চান আপনি বলুন।

উজির বললে—মালকিন, আমীর মারুফের দরাজ হাতের দানে আমাদের রাজকোষ একেবারে শূন্য, অথচ তাঁর পণ্যবাহী হাজার উট এখনও এসে পৌঁছল না, তাই আমাদের মহামান্য সুলতান আমার উপর আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জেনে নেবার ভার দিয়েছেন।

বলুন, কি কথা আপনি জানতে চান?

উজির একেবারে একসঙ্গে বলে গেল—এই বিদেশী লোকটার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা, আপনার মন এঁকে পেয়ে খুশী হয়েছে, না ব্যাজার হয়েছে—আর এই বিশ দিন যে আপনাদের এক সঙ্গে কাটল এর মধ্যে তাঁর উপর কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে কি না আপনার?

উত্তরে শাহাজাদী বললে—আল্লা আমার স্বামীকে সুখী করুন, দীর্ঘজীবী করুন। তাঁর সম্বন্ধে আমার কি ধারণা জিজ্ঞাসা করছেন আপনি, তার উত্তরে বলব ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেখতে পাই নি আমি—তাঁর মধ্যে ঃ মিষ্টি তাঁর কথাবার্তা, মিষ্টি তাঁর ব্যবহার, তাঁর রুচি এবং আর সবকিছুই সুন্দর। তাঁর সঙ্গে আমার সাদি হবার পর থেকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে আমার, চেহারার খোলতাই হয়েছে আমার, লোকের পাশ দিয়ে যেতে গেলে লোকে আল্লার দোয়া মাঙে—মন্দ কিছুতে যেন আমায় নজর না দেয়। আমরা দু'জন সুখে আছি—আল্লা যেন এই সুখ আমাদের বজায় রাখেন।

শুনে উজির যেন একটু নিরুপায় হয়ে পড়লেন। সুলতান তার দিকে চেয়ে বললেন—এবার—শুনলে ত হে নিজের কানে?—জামাই আমার সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই বেকসুর লোককে সন্দেহ করেছ তুমি, এর জন্য তোমার গায়ের ছাল ছাড়ানো উচিত।

কিন্তু উজির এতেই দমবার পাত্র নয়, পরদার এদিক থেকে সে

শাহাজাদীকে প্রশ্ন করলে—আচ্ছা মালকিন, ঐ যে উটের পিঠে তাঁর মাল আসবার কথা, সে সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান ?

উটের পিঠে মাল আসুক না আসুক—তাতে আমার কি এসে যায়। আমার আনন্দের বিন্দুমাত্র তারতম্য হবে না তাতে।

উজির স্বরে শ্লেষ ঢেলে বললে—মাল যদি না আসে তা হলে আমার মালকিনের খানাপিনার কি হবে, তাঁর স্বামীর খরচ পত্রই বা চলবে কিসের থেকে, রাজকোষের সিন্দুক যে এদিকে ঢু ঢু।

আল্লার অশেষ দোয়া, তিনি মেহেরবান তিনিই যা হয় ব্যবস্থা করবেন—উত্তর দিলে শাহাজাদী।

সুলতান এবার উজিরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আর নয়, এবার থাম। মেয়ে আমার ঠিক কথাই বলেছে। এরপর তিনি নিজেই মেয়েকে বললেন—তুই ঠিকই বলছিস, বেটী—কিন্তু উটের পিঠে মাল কবে নাগাদ এসে পৌঁছতে পারে এটা যে আমারও বড় জানা দরকার রে, কারণ আসার দেরি থাকলে এখনকার খরচ পত্রের দায় মেটানোর জন্য নতুন করে কোন কর বসাতে হবে আমায়। তাই, কবে তক ওটা এসে পৌছতে পারে—তুই তাকে কৌশলে একবার জিজ্ঞাসা করে আমায় জানাস, রে মা।

আচ্ছা, বাপজান—আমি আজ রাত্রেই ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে তোমায় বলব।

সেদিন রাত্রে শাহাজাদী মারুফকে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পেয়ার করলে। নারী নিজের উদেশ্য সিদ্ধির জন্য পুরুষের উপর যে সব ছলাকলা প্রয়োগ করে, তার কোনটাই বাদ গেল না শাহাজাদীর, তারপর যখন বুঝলে স্বামীর মন তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে, এখন তাকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে পারে তখন সে মারুফের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—আচ্ছা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন গভীর প্রেম জন্মে তখন তাদের দু'জনার দিল এক হয়ে যায়, তাই না ?

নিশ্চয়।

তা হলে তোমার ও আমার দিল এক হয়ে গেছে ?

নিশ্চয়।

তা হলে তোমার বা আমার মনে এমন কোন কথা থাকতে পারে না যা আমাদের একজন অপরের কাছে গোপন রাখতে চাইবে?

নিশ্চয়ই না।

এই সব বলে একটু চুপ করল শাহাজাদী। তারপর হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে—দেখ, আমি যে আজ এই সব কথা বললাম এর একটা কারণ আছে; হাজার উটের পিঠে তোমার মাল আসবে, কবে আসবে, এখনও ত এল না, ব্যাপার কি—এইসব নিয়ে উজির সাহেব আর বাপজানের মাঝে অনেক কথা হয়। তাঁদের কথার ভাবে বুঝি তাঁদের মনে যেন কেমন একটা সন্দেহ জেগেছে। এটা আমার ভাল লাগে না। তোমার মাল এসে পৌঁছানো সম্বন্ধে যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে, কিংবা আর কিছু—মানে সংকোচে, তাদের কাছে খুলে বলতে পারছ না এমন কিছু থাকে, তা হলে তা আমার কাছে খুলে বল আর এমনও যদি হয় যে কোন দিনই ঐ সব এসে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নেই—তা-ও আমাকে খুলে বল, যেমন করে হোক আমি তোমার নিষ্কৃতির পথ খুঁজে বের করব, লক্ষ্মীটি, খোদা আমাদের দুটি দিল এক করে দিয়েছেন—তুমি আমার কাছে কিছু লুকিও না।

শুনে মারুফ প্রথমে হো হো করে খানিকটা হেসে নিল, তারপর বললে—এমন সহজ কথাটা শুনবার জন্যে তোমার এত ভণিতা করবার কি দরকার ছিল!

এরপর এক লহমা চুপ করে রইল মারুফ, যেটুকু বাধো বাধো লাগছিল সেইটুকু হয়ত কাটিয়ে উঠল। তারপরেই বললে—শোন দিলজান, আমি কোন বণিকও নই, উটের পিঠে কোন মালও আমার কিছু আসছে না, ধনসম্পদের কোন বালাই-ই আমার নেই, নিজের দেশে ছিলাম আমি সামান্য এক মুচি, লোকের ছেঁড়া পয়জার মেরামত করে আমি দিন গুজরান করতাম। ফতিমা বলে এক

হতচ্ছাড়ী সর্বনেশে মেয়ের সঙ্গে আমার সাদি হয়েছিল,—সে দিন-রাত আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খেয়েছে, বুকটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সে আমার। একদিন ভোরে উঠে কাজে বেরুবার আগেই···। এই বলে শুরু করে মারুফ কুনাফা নিয়ে ফতিমার সঙ্গে কাণ্ড, কাজীর ব্যাপার, জাহাজডুবির ব্যাপার, তারপর দৈবচক্রে বাল্যবন্ধু আলির সঙ্গে দেখা ইত্যাদি করে সমস্ত বৃত্তান্তই সে তার স্ত্রী শাহাজাদীর কাছে অকপটে খুলে বললে।

মারুফের কাহিনী শুনে শাহাজাদী ত হেসে একেবারে লুটোপুটি। মারুফও প্রথমে খানিকটা হেসে নিলে তারপর বললে, সবই আল্লার মর্জি। তোমাকে এমনি করে পাব আল্লা এ আমার নসিবে লিখে রেখেছিলেন, নইলে কি এমন অসম্ভব সম্ভব হয়?

শাহাজাদী তখনও হাসছে—সত্যি তোমার তুলনা মেলে না, তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি, ধূর্ততা আর নসিব দেখে আমি একেবারে—থ হয়ে যাচ্ছি। সে ত হল—কিন্তু বাপজান আর উজিরের কাছে কি বলা যায়—বল ত। সত্যি কথা ত বলা যাবে না, বললে ওঁরা তোমাকে আস্ত রাখবেন না। আর তোমার অমনি কিছু করলে আমিও বাঁচব না। সুতরাং এরপর শাহাজাদী একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, আপাতত তুমি এক কাজ করো; আজ রাত্রেই তুমি এখান থেকে পালিয়ে দূর দেশে গিয়ে আত্মগোপন করে থাক। আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দিনার দিচ্ছি এই নিয়ে তুমি ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাও। তারপরে সুবিধামত একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানে আস্তানা নাও। সেখান থেকে এক দূত পাঠাবে আমার কাছে, লোকটা যেন বেশ তোমারই মত ধূর্ত হয়, সেই তোমার ও আমার মাঝে সংবাদ আদান-প্রদান করবে। আজ তুমি চলে গেলে আজ রাত্রেই আমি ভেবে ঠিক করব বাপজান আর উজিরের কাছে তোমার হঠাৎ অন্তর্ধান এবং উটের পিঠে মাল আসা সম্বন্ধে কি বলা যায়।

শুনে মারুফ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—সেই ভাল,

আমি তোমার স্বামী, তোমার হাতে আমি নিজেকে সঁপে দিলাম, তুমি আমাকে বাঁচাও।

এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আসন্ন বিদায়ের জন্য চোখের জল ফেলে শাহাজাদী মারুফকে নিজে হাতে সুলতানের গোরা বান্দার বেশে সাজালে, পঞ্চাশ হাজার দিনারের থলি হাতে দিলে, তারপর আস্তাবল থেকে সবচেয়ে সেরা দামী ঘোড়াটা বের করে তাতে চড়িয়ে তাকে দূর দেশে রওয়ানা করে দিলে।

রাত্রি ভোর হল। সুলতান তাঁর উজির নিয়ে দরবার ঘরে বসেই ডেকে পাঠালেন তাঁর মেয়েকে। পরদা টাঙানো ছিল। শাহাজাদী এসে পরদার ওধারে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—কি বলছ, বাপজান?

সুলতান বললেন—কাল তোর স্বামীর কাছ থেকে যে কথাটা কৌশলে জেনে নিতে বলেছিলাম,—তার কি হল?—কি শুনলি তাই বল।

শুনেই অমনি ফোঁস করে উঠল: কি শুনলাম আমি? আল্লা বেইমান সয়তান চুকলিখোরদের নিপাত করুন, নিপাত করুন তোমার কালামুখ সর্বনেশে উজিরকে।

কেন, এ সব বলছিস কেন?

কেন বলছি?—তার আগে তুমিই আমায় বলো—কি করে তোমার এই দুশমন উজিরকে তুমি বিশ্বাস করো, তার কথায় তুমি ওঠো বসো—যার কাজই হচ্ছে আমার স্বামীর নামে তোমার কাছে চুকলি করা, তোমার মনে অকারণ সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া।

বলতে গিয়ে উত্তেজনায় যেন কাঁপতে লাগল শাহাজাদী; একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল — আমার স্বামীর মত সাচ্চা লোক আমার তো মনে হয় দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নেই। তোমরা যা জানতে চেয়েছিলে তারই কথা বলছি এবার শোন: কাল রাত্রে আমার স্বামী যখন আমার কামরায় আসছেন তখন যে খোজাটা আমার ফাই ফরমাস খাটে সে এক জরুরী ব্যাপার নিয়ে ওঁর সঙ্গে

কথা বলতে চাইল। আমি অনুমতি দিলে সে একখানা চিঠি আমার স্বামীর হাতে দিয়ে বললে, জমকাল পোশাক পরা দশজন গোরা বান্দা এসে এই চিঠিখানা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বল্লে, তা ছাড়া একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। চিঠিখানা আমার স্বামী পড়ে শেষ করবার পর আমার হাতে দিলেন। আমি চিঠিখানা পড়ে দেখলাম ওটা এসেছে ওরই এক কর্মচারীর কাছ থেকে যে বান্দার দল উটের পিঠে ওর মাল নিয়ে আসছে তাদেরই সর্দার সে। আসবার পথে প্রথমেই একদল খুনে বেদুইনের হাতে পড়ে ওরা, তারা অবশ্য বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি, কারণ হাজার উটের মাল রক্ষা করবার জন্য পাঁচশো সশস্ত্র মরদ বান্দা ছিল এদের। এই ঝামেলা মেটাতেই কিছু দেরি হয়ে যায়। আর একটু এগুতে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আর একটা বড় দল এদের আক্রমণ করে, তাদেরই সঙ্গে লড়াইতে কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয় এদের ঃ পঞ্চাশ বান্দা আর দুশো উট মারা পড়ে—খোয়া যায় চারশো গাঁটের মত দামী মাল। উটের পিঠে মাল পৌঁছতে দেরি হচ্ছে এই সব কারণে।

এ চিঠি পড়ে আমার স্বামীকে কিন্তু একটু মুসড়ে পড়তে দেখলাম না, আমার চিঠি পড়া হয়ে গেলে তিনি একটু হেসে সেটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন, যে দশটা বান্দা চিঠি নিয়ে এসেছিল তাদের কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না তিনি। আমাকে একটু ভাবতে দেখে তিনি মৃদু হেসে বললেন, কি হল? এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, দুশো উট আর চারশ গাঁট—কতই বা হবে, ন'লাখ দিনারের বেশি নয়। ও নিয়ে তোমার ভাববার কিছু নেই, ভাবনা হচ্ছে অন্য; কয়েক দিনের জন্য তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে আমার, নইলে মাল এসে পৌঁছতে আরও দেরি হয়ে যাবে।

উনি আমায় ছেড়ে দূরে যাবেন শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল দেখে উনি হেসে আমার মাথা চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—পাগলামি কর না, আমি দু-চার দিনের মধ্যে মাল নিয়ে ফিরে আসছি। এই বলে উনি বাইরে সেই দশটা গোরা বান্দার

সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম — কি চেহারা তাদের ; বান্দা ত নয় যেন দশটি আসমানের চাঁদ ! তাদের সঙ্গে কথা বলেই তিনি তাদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

পরদার ওপারে কয়েক বার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনাগেল, কান্নার। পরে মেয়েরা যেমন করে, তারপরেই ক্রুদ্ধ অনুযোগঃ আচ্ছা বাপজান, তুমি একবার ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখত, তুমি যেমনটি বলেছিলে, তোমার ঐ কেলো হাঁড়িমুখো উজির যেমন বলেছিল, তেমন করে যদি আমি আমার স্বামীকে ঐ সব কথা জিজ্ঞেস করে বসতাম তা হলে কি কাণ্ডটা হত, উনি কি আমায় আর কোন দিন ভাল চোখে দেখতেন—কি বিশ্বাস করতেন আমায়? পেতাম শুধু ঘৃণা, বিষের মত দেখতেন তিনি আমাকে — এই বলেই রাগ জানাতে নিজের পোশাক ঝেড়ে এক রকম অদ্ভুত আওয়াজ তুলে শাহাজাদী সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে গেল।

সুলতান অমনি রাগে ফেটে পড়লেন উজিরের ওপর—কুত্তার বাচ্চা, এবার শুনলে ত, দেখলে ত! তোমার কথামত মেয়ে জামাইকে জিজ্ঞাসা করলে কি সর্বনাশটা হয়ে যেত! তোমার বাঁচোয়া যে আল্লা আমার দিলটা একটু নরম ধাতু দিয়ে গড়েছেন, নইলে মুণ্ডুটা তোমার এতক্ষণ ঘাড়ে থাকত না। ফের যদি আমার জামাই সম্বন্ধে কোন চুকলি করতে আস আমার কাছে — তখন দেখো তোমায় আমি কি করি ! এই বলে উজিরের দিকে কটমট করে চাইতে চাইতে সুলতান তাঁর দরবার ঘর থেকে উঠে গেলেন।

এদিকে মারুফের কি হল দেখা যাকঃ রাত্রি হলেও মরুভূমির ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলতে তার দস্তুরমত কষ্ট হচ্ছিল। মুচির ছেলে মুচি, ঘরে বসে চিরকাল জুতো সেলাই করে এসেছে, তাজী ঘোড়ায় চড়ে বাদসাহী কসরৎ করা অভ্যাস নেই তার। চলতে চলতে মনে হচ্ছিল শাহাজাদীর কাছে সত্যিকথা বলে বড় ভুলই করা গেছে। এবার ফিরে চল মন, শাহাজাদীর ফুলের বাগিচা থেকে ফতিমার আগুনের চুল্লির মাঝে গিয়ে পড়। আবার পরক্ষণেই

শাহাজাদীকে ছেড়ে আসার বেদনাটা প্রবল হয়ে ওঠায় দু-একটা নিঃশ্বাসও বেরিয়ে আসছে বুক থেকে। কতদিন একে ছেড়ে থাকতে হয়, জীবনে আর দেখাও না হতে পারে ভেবে মাঝে মাঝে চোখে জলও এসে যাচ্ছে। কায়রোতে থাকতে এর ওর মুখে দু-একটা বিরহের গানও সে শুনত, ফতিমার সঙ্গে যে জীবন যাপন করত, তাতে সে সব তার অন্তর স্পর্শ করত না, এখন সেই সব গানের দু-চার কলি নিজের মনেই আওড়াতে আওড়াতে চলেছে। এমনি করে চলতে চলতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল। দিনের আলো দেখা দিলেই সে দেখে—সামনে একটা ছোট গ্রাম। সারা রাত্রি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে খিদে পেয়েছে খুব। তাড়াহুড়া করে ইখতিয়া-অল-খাতন থেকে পালাতে গিয়ে খাবারের থলি আনতেও সে ভুলে গেছে। কি করা যায়? এদিক সেদিক চাইতেই দেখে সামনে একটু দূরে এক চাষী দুটো বলদের কাঁধে লাঙ্গল জুতে জমি চষছে। মারুফ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—সেলাম, মিঞা ভাই।

চাষী লাঙ্গল থামিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে মারুফের দিকে চেয়ে বললে, আলেকুয়াম সেলাম। জনাব নিশ্চই সুলতানের লোক? মারুফ 'হ্যাঁ' বললে চাষী আরও খুশী হয়ে তাকে আপ্যায়ন করে বললে, জনাব, আমার কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধূলি দিয়ে আমাকে আপনার সেবা করবার সুযোগ দিলে আমি ধন্য হই।

মারুফ চাষীর মুখের দিকে একবার চেয়েই বুঝে নিয়েছে লোকটার মনটা দরাজ হলেও সে বড় গরিব। তাই বললে—না ভাই, থাক, বড্ড খিদে পেয়েছে আমার, তুমি যা দিতে পারবে তাতে আমার পেট ভরবে না।

চাষী অমনি বলে উঠল—সে কি, জনাব, কি বলছেন, আল্লার দেওয়া সব রকম খাবার ছড়ানো রয়েছে এখানে ওখানে, যেমন চান তেমন, যত চান তত, কুড়িয়ে আনলেই হল। আপনি মেহেরবানি করে ঘোড়া থেকে নামুন, এই যে কাছেই গ্রাম, আমি এখুনি দৌড়ে গিয়ে ওখান থেকে আপনার খাবার নিয়ে আসছি।

মারুফ বললে, গ্রাম যখন কাছেই তখন পায়ে হেঁটে কষ্ট করে আর যাওয়ার দরকার কি, আমিই বরং ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে বাজার থেকে কিছু কিনে নি।

কথাটা শুনে সরল ধর্মপ্রাণ চাষীর মনে বড় দুঃখ লাগল, ক্ষুধার্ত বিদেশী তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবে আর সে তার খাবার দিয়ে সেবা করবার সুযোগ পাবে না,—এ কি করে হয়! সে তখন অন্য পথ ধরলে, বললে—বাজার বাজার করছেন, জনাব, এখানে বাজার কোথায় পাবেন? ছোট্ট গ্রাম—আমাদের গোবর মাটির সব ঘর, এখানে বাজার-টাজার কিছু নেই, কেনা-বেচার কারবারই নেই। এখানে, যার ক্ষেতে যে যা অর্জায়, তাই দিয়ে জান বাঁচায়। আপনি মেহেরবানি করে ঘোড়া থেকে নেমে এখানে একটু বসুন আমি দৌড়ে গ্রামে গিয়ে আপনার খাবার যোগাড় করে নিয়ে আসি। একটুও দেরি হবে না, যাব আর আসব।

আর আপত্তি করলে লোকটা মনে দুঃখ পাবে ভেবে মারুফ ঘোড়া থেকে নেমে আলের উপর বসলে, আর চাষী যত জোরে পারে গ্রামের দিকে ছুটল।

একটু পরেই মারুফের মনে হল, লোকটা গরিব, কায়রোতে থাকতে আমার যে দশা ছিল এরও সেই দশা। আমারই জন্যে কাজ কামাই করে ও গ্রামে ছুটল, যতক্ষণ ও না আসে ততক্ষণ ওর কাজটা আমি করে দিই না। এই ভেবে ও তখনই উঠে লাঙল ধরে জমি চষতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ পরই লাঙলটা হঠাৎ থেমে গেল, কেমন যেন একটা শব্দও হল। মারুফ বলদ দুটোর লেজ কত মোচড়ালে, পিঠে বাড়ি দিলে, বলদ দুটি এগুতে চেষ্টাও করলে কিন্তু কিছুতেই তারা লাঙলের ফাল সেখান থেকে টেনে এগুতে পারল না। কি, ব্যাপার কি, বুঝবার জন্যে মারুফ তখন ফালের আশেপাশের মাটি দুই হাতে সরাতে আরম্ভ করলে। কিছুটা সরালেই দেখে লাঙলের ফালটা একটা মস্ত বড় তামার আংটার মাঝে বেধে গেছে। আর একটু মাটি সরিয়ে সরিয়ে দেখে আংটাটা একটা শ্বেতপাথরের

ঢাকানার সঙ্গে আঁটা। একটু নাড়াচাড়া করতেই ঢাকনাটা সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল নীচে নামবার শ্বেতপাথরের এক সিঁড়ি। আল্লার নাম নিয়ে নামতে লাগল মারুফ সেই সিঁড়ি বেয়ে। একটু নেমেই দেখে হামামের মত চৌকা একটা ইমারত, চারটে বেশ বড় বড় কামরা তাতে। প্রথম কামরাটার মেঝে থেকে ছাদের নীচে পর্যন্ত একেবারে মোহরে ঠাসা। দ্বিতীয়টায় অমনি মুক্তো, পান্না আর প্রবাল। তৃতীয়টায় হীরে, চুণী, পোকরাজ—চতুর্থ কামরাটা সব চেয়ে বড় হলেও এ সবের কিছু নেই—আছে দেখলে সেখানে আবলুস কাঠের একটা বেদী। আর সেই বেদীর উপর স্ফটিকে তৈরি ছোট একটা কৌটো। কৌটোটা দেখেই এত ভাল লাগল মারুফের যে তখনকার মত সে অন্য-ঘরের মণিরত্ন মোহরের কথা ভুলেই গেল। অতি সন্তর্পণে কৌটোটার স্বচ্ছ ডালাটা খুলতেই দেখে ওর মাঝে রয়েছে ফিকে লাল তেরচা এক পাথর বসানো একটা সোনার আংটি। পাথরের ওপর পিঁপড়ের সারের মত অক্ষরে কি সব মন্ত্রতন্ত্র লেখা। নিজের অজ্ঞাতেই দেখে সে কোন সময় আংটিটা নিজের আঙুলে পরে ফেলেছে, তারপর সেই আংটির পাথরটা একটু ঘষে দেখতে গেছে, অমনি কোত্থেকে কে বলে উঠল—এই যে আমি এসেছি, দোহাই—আর ঘষা দিও না আমায়। বল কি করতে হবে আমায়? কোনো কিছু ধ্বংস করতে হবে, না গড়তে হবে কোন বাদশা বেগমকে মারতে হবে, না বেঁধে আন্‌তে হবে,—কোন পাহাড় উড়িয়ে দেব না সাগর শুকিয়ে দেব, জিন রাজের হুকুমে আমি তোমার বান্দা, কি চাই তোমার বলো? হ্যাঁ আবার তোমায় বলে রাখছি আমায় জোরে ঘষো না—কখনও দুবার ঘষো-না।

মারুফ বুঝলে এ আওয়াজটা আসছে আংটির ঐ পাথর থেকে, বললে—মনে থাকবে সব, কিন্তু কে তুমি?

আমি?—আমি হচ্ছি এই আংটির বান্দা, আমার মনিবের হুকুম আমি পাওয়া মাত্র তামিল করি, আর এই আংটিটা যার হাতে থাকবে সে আমার মনিব, আমার মালিক। দুনিয়ায় এমন কিছু

নেই যা আমি করতে পারি না—কারণ আমি জিন, ইফরিদ, শয়তান, আউন, মারীদ, ইত্যাদি করে বাহাত্তর শ্রেণীর নেতা, আর এর প্রত্যেক দলে রয়েছে একলাখ বিশ হাজার করে সবল দক্ষ মরদ, হাতীর চেয়েও তারা বলবান, পারার চেয়েও তারা পিছল। আমার এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শিশু যেমন তার মায়ের, আমিও তেমনি আমার মালিকের আজ্ঞাবহ। শুধু একটি কথা তোমায় আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যদি একবারের জায়গায় দুইবার আমার গায়ে ঘষা দাও তাহলে আমার গায়ে এই যে সব নাম লেখা আছে তাদের আগুনে আমি ভস্মীভূত হয়ে যাব, আর তুমি আমায় কোনদিন পাবে না।

মারুফ বললে—সর্দার, তুমি যে সব কথা আমায় বললে তার প্রত্যেকটি আমি মনে গেঁথে রাখব, একটিও ভুলব না। কিন্তু আমার শুনতে ইচ্ছে করছে, কেই বা তোমায় এই আংটিতে বন্দী করলে আর এখানকার এই সব ধনসম্পদই বা কার?

আংটির পাথর থেকে জিন সর্দার উত্তর দিলে—বহু স্তম্ভের ইরান শহর যিনি গড়েছিলেন সেই সাদ্দাদ ইবন আদের ধনসম্পদ এ, তিনিই আমায় এর মাঝে বন্দী করেছিলেন, তাঁরই বান্দা ছিলাম আমি—এখন আমি তোমার।

কায়রোর লাল সড়কের মুচি মারুফ তখন নিমরোদের বংশধর সাদ্দাদের উত্তরাধিকারী হয়ে আংটির জিনকে হুকুম করলে, সর্দার তা হলে তুমি প্রথমে পাতালপুরীর এই তিন কামরায় যে ধন রত্ন আছে সে সব বাইরে আলোতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। একটিও যেন এখানে পড়ে না থাকে।

বহুৎ খুব—বলে জিন তখনই হুঙ্কার দিলে—এই তোরা কোথায়? শীগগির আয়। এগুলি বের করে দে।

সঙ্গে সঙ্গে অতি সুদর্শন বারোটা বাচ্চা বান্দা বড় বড় ঝুড়ি মাথায় মারুফের সামনে হাজির হয়ে তাকে কুর্নিশ করে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তিন কামরার ধনরত্ন সব বাইরে নিয়ে রেখে মারুফকে আবার কুর্নিশ করে তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মারুফ তখন খুশী হয়ে আংটির জিনের উদ্দেশ্যে বললে, ঠিক আছে, কিন্তু এবার আমায় কিছু সিন্দুক, গাধা, উট আর উট গাধা চালিয়ে নেবার জন্য কিছু লোক চাই যে! তারা এই সব ধনরত্ন ইখতিয়ান-অল-খাতন শহরে পৌঁছে দেবে। মারুফের কথা শুনে আংটির জিন হুঁম করে একটা আওয়াজ করতে মারুফ দেখে তার সামনে ঐ সব কিছুই এসে গেছে, শুধু তাই নয়, ঐ গুলি পাহারা দিয়ে নিরাপদে ইখতিয়ান শহরে পৌঁছে দিতে এসেছে ছয়শ চাঁদের মত সুন্দর গোরা-বান্দা। তাদের শুধু চেহারাই সুন্দর নয়, যে জাঁকের পোশাক পরে এসেছে তারা তা দেখলে তাক লেগে যায়। আর কি জলদি সব গোছানো হয়ে গেল, চোখ খুলতে আর বন্ধ করতে যে সময় লাগে তার মাঝেই মারুফ দেখলে অত রত্ন সব সিন্দুক আর বস্তাবন্দী হয়ে উট আর গাধার পিঠে উঠে গেছে আর গোরাবান্দারা সব শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তার চারিধারে দাঁড়িয়ে, যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

মারুফ আংটির জিনকে বললে—আমার আরও চাই যে, সর্দার। চাই আমার আরও হাজার উট, তাদের পিঠে থাকবে মিশর, সিরিয়া, গ্রীস, ইরান, ভারত আর চীনের সব নানা রঙের দামী কাপড়ের গাঁট। ইচ্ছাটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মারুফ দেখে সেগুলি সবই এসে গেছে, সাজানো হয়ে গেছে আগের দলের পিছনে, এরও চারিদিকে বহু গোরাবান্দার পাহারা।

এসব দেখে মহাখুশী হয়ে মারুফ অদৃশ্য জিনকে বললে—সর্দার, এবার রেশমী কাপড়ের তাঁবু আর তার মাঝে বসে খাবার জন্য চাই ঠাণ্ডা সিরাজি আর ভাল ভাল খানা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর একটা তাঁবু হয়ে গেল, তার মাঝে ভাল ভাল খানাও এসে গেল। বিছানার চাদরের উপর মারুফ সবে খাবার উদ্যোগ করছে এমন সময় দেখে সেই সদাশয় চাষীটা গ্রাম থেকে ফিরে এল। মাথায় তার কাঠের পাত্রে কিছুটা সবজির ঝোল, ডান বগলে কালো আটার রুটি আর পেঁয়াজ, বাঁ বগলে অতিথির ঘোড়ার জন্যে এক থলি শুকনো ঘাস। তার ক্ষেতের সামনে এত উটগাধার পিঠে

বোঝা বোঝা মাল, কত গোরাবান্দা আর তার অতিথি রেশমী তাঁবুর নীচে খানা খেতে বসেছেন দেখে সে প্রথমে বেশ একটু হক-চকিয়েই গেল, তারপরেই মনে হল তার—সুলতান এসে গেছেন, এ কি করলাম আমি! এমন মাননীয় অতিথির জন্য আমার যে দুটো মুরগী ছিল তা গাওয়া ঘিয়ে ত রসুই করে আনতে পারতাম! নিজের ভুল সংশোধনের জন্য সে ফিরবার উদ্যোগ করছে এমন সময় মারুফের তার দিকে নজর পড়তেই যে দুটি বান্দা তার পরিবেশন করতে এসেছিল সে তাদের বললে, নিয়ে এস ত ঐ লোকটাকে।

বান্দারা তখনই ডেকে নিয়ে এল চাষীকে মারুফের সামনে। চাষীর বগলে মাথায় তখনও সেই সব জিনিস রয়েছে। চাষী কাছে আসতেই মারুফ উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমার ভাই, আমার দুর্দিনের বন্ধু, এত সব কি বয়ে আনলে তুমি?

কাণ্ড দেখে আর কথা শুনে চাষীত একেবারে থ! এত বড় একটা লোক আমাকে এমনি করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—আর ওঁর নাকি দুর্দিন, এত থাকতেও ওঁর যদি দুর্দিন হয়,—তা হলে আমরা কোথায় আছি! যাই হোক কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে মারুফের কথার জবাবে বললে—মালেক, আপনার ঘোড়া এবং আপনার জন্যে কিছু খাবার এনেছিলাম আমি, কসুর হয়ে গেছে, আমি আগে জানতে পারিনি যে আপনি স্বয়ং সুলতান। জানলে—আমার যে দুটো মুরগী ছিল তা গাওয়া ঘিয়ে ভেজে—হুজুর, আমি গরিব, বড় গরিব, গরিব হলেই মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পায়, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমি মাফ চাইছি, মালেক, আমায় মাফ করুন আপনি—বলে মাথাটা সে নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

চাষীকে দেখে মারুফের নিজের সাবেক অবস্থার কথা মনে পড়ায় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কায়রোতে তার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ ছিল। সে তখন চাষীকে বললে—তুমি ঘাবড়িও না ভাই, আমি সুলতান নই, সুলতানের জামাই, তাঁর সঙ্গে একটু মনান্তর হওয়ায় আমি সুলতানমহল থেকে চলে

এসেছিলাম। এখন তাঁর মনের গোলমাল মিটে গেছে তাই তিনি আমাকে ফিরিয়ে নিতে এত সব লোকজন আর উপহার পাঠিয়েছেন, আমি এখন শহরে তাঁর কাছে আবার ফিরে যাব। তুমি আমায় না চিনেই আতিথেয়তা দেখাতে যে দরাজ মনের পরিচয় দিয়েছ খোদার তুনিয়ায় তা কখনও বৃথা হতে পারে না, তুমি এস এই বলে মারুফ তার হাত ধরে নিজের ডাইনে বসিয়ে বললে, এই যে সব নানা ভাল ভাল খাবার দেখছ—এ সবই তুমি খাবে, আমি এর এক টুকরো মুখে দেব না,—তোমার আনা রুটি, পেঁয়াজ আর ঝোল ছাড়া আর কোন কিছু খাব না আমি। চাষী তাতে রাজী হচ্ছিল না, কিন্তু মারুফ তাকে জোর করেই ঐসব ভাল ভাল খানা খাওয়ালে, নিজে খেলে চাষীর আনা রুটি, পেঁয়াজ আর ঝোল।

খাওয়া হয়ে গেলে আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মারুফ চাষীকে নিয়ে এল যেখানে উট গাধা নিয়ে তুই দল বান্দা তার দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে এসে চাষীকে সে বললে, আগের দল আর পিছনের দল—তুই দল থেকে মাল সমেত এক এক জোড়া উট গাধা তুমি বেছে নাও ত ভাই। এ তোমায় আমি উপহার দিলাম। তা ছাড়া যে তাঁবুতে বসে আমরা খেলাম সে তাঁবু এবং তার মাঝে যে জিনিসপত্র আছে,—সে-ও রইল তোমার। এরপর চাষীর আপত্তি বা ধন্যবাদ কোন কিছুতে কর্ণপাত না করে এক লাফে তার ঘোড়ায় চড়ে মারুফ তার তুই দলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা বান্দাকে তখনই দূত করে পাঠিয়ে দিল সুলতানের কাছে—তার আগমন বার্তা জানাতে।

মারুফের দূত যখন সুলতান মহলে এসে হাজির হল তার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই সুলতান আর উজিরের মাঝে ঐ মারুফকে নিয়েই কথা হচ্ছিল। উজির বলছিল—জাহাঁপনা, আর এর ধাপ্পাবাজীতে ভুলবেন না আপনি,—আপনার মেয়ে আপনার জামাইয়ের সুলতান মহল ছেড়ে যাবার যে কারণ বলেছেন তা বিশ্বাস করবেন না,—আমীর মারুফ তাঁর মাল আর উট তাড়াতাড়ি এখানে এনে ফেলবার জন্য

গেছেন—ও সব বাজে কথা, বিলকুল ঝুটা। মিথ্যাবাদী জোচ্চোর তার জান বাঁচাতে পালিয়ে গেছে। সুলতান উজিরের কথায় প্রভাবিত হয়ে কিছুটা বিশ্বাস করেই কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন,—ঠিক এই সময়—দূত এসে সুলতানের সামনে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে বললে, জাহাঁপনা, আমি সুখবর এনেছি: আমার মনিব আপনার জামাই আমীর মারুফ হাজার উটের পিঠে তার মাল নিয়ে শহরে আসছেন, ভারী বোঝার জন্য উট গাধাগুলি তেমন জোরে চলতে পারছে না বলে তাঁর আসতে একটু দেরি হচ্ছে—বলেই দূত সুলতানের দু'হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে যেমনি জলদি এসেছিল তেমনি জলদি চলে গেল।

দূতের মুখে হঠাৎ এই খবর শুনে অত্যধিক আনন্দে সুলতানের বুক কয়েকবার দুলে দুলে উঠল, চোখে তাঁর জল এসে গেল, পরক্ষণেই অসহ্য রাগে তিনি উজিরের উপরে ফেটে পড়লেন: দুশমন বেই-মান, বেতমিজ, তোমার দিলটা যেমন কালো, আল্লা তোমার মুখটা তেমনি কালো করে দিন। তোমার এত বড় স্পর্ধা যে আমার মেয়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে আমার মন বিষাক্ত করে তুলতে চাও! যাও—আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তুমি, তোমার—মুখ দেখলে পাপ হয়,—যাও।

উজির সুলতানের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুলতান তাকে সে সুযোগ না দিয়ে সেই অবস্থায় ফেলেই সেখান থেকে চলে গিয়ে তাঁর লোকজনদের হুকুম দিলেন শহরটা বেশ ভালো করে সাজাতে,—আর একটা বড় মিছিল করে জামাইকে এগিয়ে আনতে।

এর পরেই ছুটলেন তিনি তাঁর মেয়ের কাছে সুখবরটা দিতে। বাপের মুখে খবর শুনে শাহাজাদী ত একেবারে থ—সে কি করবে, কি বলবে দিশে পায় না,—স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে যে মিথ্যা, সে অনেক বুদ্ধি করে বানিয়ে বলেছিল তা এমন সত্য হয়ে উঠবে কি করে: স্বামী কি বাপজানকে নতুন করে আর এক ধাপ্পা দিচ্ছেন,—না

সত্যিই তিনি মস্ত বড় সদাগর, তার ভালবাসা পরীক্ষা করতে নিজের দারিদ্র্যের গল্প বানিয়ে বলেছিলেন? যাই হোক তখনকার মত বাপের কাছে মহা খুশীর ভাব দেখিয়ে দলবল আর মাল সমেত স্বামীকে এগিয়ে আনবার জন্য বাপকে তাগিদ দিল।

সবচেয়ে তাজ্জব বনে গেল মারুফের বাল্যবন্ধু আলি—মহানুভব আলি। সে যখন দেখলে সারা শহর সাজানো হচ্ছে—সব বাড়ির সামনে রঙিন আলো ঝুলানো হচ্ছে—কেন না, আমীর মারুফ তাঁর হাজার উঠের পিঠে মাল নিয়ে শহরে আসছেন—তখন সে নিজের মনে হাত কচলে ভাবতে বসল—মুচির এ আবার কি নতুন ফন্দি রে আল্লা! জুতোয় তালি দিয়ে লোকে হাজার উটের পিঠে মাল আনে এ ত আমি বাপের জন্মেও শুনিনি। তার পরেই মনে হল—হ্যাঁ, খোদার মর্জিতে সবই সম্ভব। তাই যেন হয়ঃ আল্লা আমার পুরনো দোস্তের মুখ রক্ষা করুন—লোকের কাছে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান। এরপর আলি আর দশজনার মতই পথের দিকে চেয়ে বসে রইল—কখন মারুফ তার হাজার উটের পিঠে মাল নিয়ে শহরে ঢোকে।

একটু পরেই শহরে হৈহৈ রৈরৈ পড়ে গেল—আমীর মারুফ আসছেন, আমীর মারুফ আসছেন। আলি তাকিয়ে দেখে সত্যিই তাই, পরপর মাল বোঝাই উট আর গাধার মস্ত বড় এক সার—দু দিকে তার জমকালো পোশাক পরা গোরা বান্দা প্রহরী—আর ওর সামনে অতি সুন্দর এক তাজী ঘোড়ায় চড়ে যেন বিজয়ী বীরের মত আসছে মারুফ। আর কি তার ঠাট, দুনিয়ায় সকল সুলতান বুঝি হার মেনে যায়! ব্যাপার দেখে শহরের তামাম লোকের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। আলি মনে মনে হেসে নিল একবারঃ এসেছে, বউয়ের সঙ্গে যুক্তি করে সুলতানকে ধাপ্পা দেবার এক নতুন ফন্দি বের করেছে। আলি দু'হাত দিয়ে জনতা ঠেলে বন্ধুর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে—এ আবার কি ভেলকি দেখালে, দোস্ত, দুনিয়ায় তামাম

জাদুকরকে যে তুমি হার মানিয়ে দিলে !—দেখাও দেখাও ভেলকি দেখাও, খেল খেলো,—এই-ই তোমার কাছে আমি চেয়েছিলাম, এতেই আমার আনন্দ—আল্লা তোমায় রক্ষা করুন। আলির কথার জবাবে মারুফ শুধু একটু হাসলে, মুখে বললে—কাল দেখা হবে।

এরপর মারুফ সুলতান মহলে এসে দরবার ঘরে সুলতানের পাশে বসে রাজকোষে যত থলি ছিল সব আনিয়ে তা মোহর মণি-রত্নে ভর্তি করলে, তারপর সে নিজে হাতে ধনরত্নের সিন্দুক আর দামী কাপড়ের গাঁট খুলে দুই হাতে বিলাতে লাগল আমীর, ওমরাহ, তাদের বিবি এবং দরবারে আর আর যে লোক ছিল তাদের মধ্যে। এরপর দিতে লাগল গরিব দুঃখীদের। দিয়ে যাচ্ছে ত দিয়েই যাচ্ছে, থামা নেই। তার কাণ্ড দেখে সুলতান এদিকে ছটফট করতে লাগলেনঃ সবই যে দিয়ে দিলে, বাবা, এরপর আমাদের যে কিছুই থাকবে না। মারুফ সে কথায় কান না দিয়ে পাগলের মত দিয়েই চলেছে। সিন্দুক আর গাঁটের সমস্ত মাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এই রকমই চালাবে। সব শেষ হলে—তবে তার স্বস্তি। সুলতান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—আমাদের আর কিছুই রইল না। মারুফ মৃদু হেসে উত্তর দিলে, আপনি ঘাবড়াবেন না, আমার ধনরত্নের শেষ নেই।

এদিকে উজির এসে খবর দিলে, জাহাঁপনা, রাজকোষ একে-বারে ভরতি হয়ে গেছে আর বিন্দুমাত্র স্থান নেই।

বেশ আর একটা কামরা খালি করে সেটা ভরতি করো—বলে উঠ্‌লেন সুলতান। মারুফ তখনও লোকজনদের বিলিয়েই চলেছে, তার মাঝেই সে উজিরকে বলে উঠল—তারপর আর একটা ঘর খালি করুন—আর একটা, এখনও অনেক আছে—সুলতানের আপত্তি না থাকলে গোটা সুলতান মহলটা আমি এ সব দিয়ে ভরতি করে দিতে পারি।

উজির আরও কামরা খালি করতে চলে গেল আর সুলতান

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ধনরত্নের সিন্দুক, কাপড়ের গাঁট আর মারুফের দিকে।—মাথা তাঁর ঝিমঝিম করছে, তিনি বুঝেই উঠছেন না তিনি জেগে না ঘুমিয়ে।

প্রাণভরে এমনি দান খয়রাত করবার পর মারুফ ছুটল তার প্রিয়া শাহাজাদীর কাছে। শাহাজাদী ত তাকে দেখে আনন্দে তার চোখের জল রুখতে পাচ্ছে না। তারপর সে মারুফের হাতে চুমু দিয়ে বলে—ওগো, তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছিলে! না আমার ভালবাসা পরীক্ষা করতে তোমার দারিদ্র্য আর বিত্নঘুটে সর্বনেশে বউ ফতিমার গল্প বানিয়ে বলেছিলে? যাই হোক আল্লার দোয়ায় আমি বুদ্ধি করে বাপজানকে এই সব বলেছিলাম, তাই রক্ষে।

মারুফ মৃদু হেসে তার চিবুকে হাত দিয়ে একটু আদর করে একটা অতি চমৎকার পোশাক আর দশ নরী একটা টলটলে মুক্তোর হার বউয়ের হাতে তুলে দিল আর দিল অপূর্ব কারুকাজ-করা এক জোড়া রত্ন নূপুর। এত সুন্দর জিনিসগুলি হাতে পেয়ে শাহাজাদী আনন্দে ছোট্ট মেয়ের মত চীৎকার করে বলে উঠল—এগুলি আমি তুলে রাখব, বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন পরব।

মারুফ হেসে বললে—না গো না, তুমি এখুনি পরবে এগুলি। রোজ পরবে, প্রতিদিন আমি তোমায় এই রকম সব, এমন কি এর চেয়েও ভাল ভাল সব পোশাক আর অলঙ্কার দেব, শেষে দেখবে তোমার সিন্দুকে আর ধরবে না।

পরদিন ভোরে, তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি মারুফ এমন সময় দরজার বাইরে তার শ্বশুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, তিনি ভিতরে আসতে চাইছেন। মারুফ তখনই উঠে দরজা খুলে দিলে। সুলতান ভিতরে ঢুকলেন কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তাঁর চুল দাড়ি এলোমেলো, মুখ একেবারে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তা ছাড়া তাঁর শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। মারুফ শ্বশুরের হাত ধরে এনে বিছানায় বসালে,—শাহাজাদী বাপের চোখে মুখে গোলাপ জলের

ছিটে দিলে। এতে কিছুটা সুস্থ হয়ে সুলতান মুখ খুললেন—বেটা বড় দুঃসংবাদ বলব, কি বলব না।

নিশ্চয়ই বলবেন।

সুলতান বিষণ্ণ মুখে বললেন, এই এক রাত্রের মধ্যে তোমার তামাম গোরাবান্দা, উট গাধা সব কিছু উধাও। কোথায় কোন দিকে যে গেল তার চিহ্ন মাত্র নেই। তোমার সব কিছু গেল, বাবা, এতে আমি এত অস্থির হয়ে পড়েছি যে তোমায় কি বলব, কি করব দিশে পাচ্ছি না।

শুনে মারুফ হো হো করে হেসে উঠল—ঘাবড়াবেন না আপনি, কিচ্ছু ভয় নেই, এ ক্ষতি আমার কিছুই ক্ষতি নয়, সমুদ্র থেকে এক ফোঁটা জল গেলে তার যে ক্ষতি হয়, আমার এ তা-ও নয়। আজ কাল পরশু—যে কোন দিন যে কোন সময় ঐ সব দিয়ে সুলতান মহল ভরে ফেলবার ক্ষমতা আমি রাখি। সুতরাং আপনার ভাবনার কিছু নেই। আপনি ঠাণ্ডা হয়ে সাজগোজ করে খানা পিনা করুন।

জামাইয়ের এই কথা শুনে সুলতান আরও তাজ্জব বনে গেলেন। কি ব্যাপার—কি ব্যাপার! অনেকক্ষণ ধরে ভেবেও কোন হদিস পেলেন না, কিনারা বের করতে পারলেন না। অবশেষে আর থাকতে না পেরে তিনি উজিরকেই ধরলেন—তুমি কি বলো উজির, আমার জামাইয়ের ক্ষমতার যে সীমা পরিসীমা দেখতে পাচ্ছি না আমি! দেখে শুনে মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে আমার।

সুলতানের কথা শুনে উজিরের মনে হল—প্রতিশোধ নেবার এই সুবর্ণ সুযোগ, বারবার তার যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সহ্য করতে হয়েছে—তার কিছুই ভোলে নি সে। সে সুলতানের কথার জবাবে বললে—জাহাঁপনা, আমার যুক্তি ত আপনার কোনদিনই মনে লাগল না, তবু আজ মুখফুটে চাইছেন যখন তখন বলি, এক কাজ করুন আপনি। আপনার জামাইয়ের এত ধনসম্পদ কোথা থেকে আসছে যদি জানতে চান তবে তাকে আচ্ছা করে সিরাজি খাইয়ে দিন।

বেশি সিরাজি পান করবার ফলে যখন দিলের দরজা তার বিলকুল খোলা হয়ে যাবে তখন প্রশ্ন করলে আসল ব্যাপারটা সে অমনি বলে ফেলবে।

ঠিক বলেছ উজির, ঠিক, ঠিক। উজিরের এবারের যুক্তিটা সুলতানের মনে ধরল।

তিনি তখনই মারুফকে ডেকে উজিরের সঙ্গে সিরাজির পাত্র নিয়ে বসলেন। তিনজনেরই চলতে থাকল, সুলতান ও উজিরের কার্য সিদ্ধির জন্য রয়ে সয়ে, মারুফের পাত্রে ঢালতে লাগলেন তাঁরা দেদার—একবার ফুরোলেই আবার। জিনিসের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ওঁরা যখন দেখলেন মারুফ দস্তুর মত মাতাল হয়ে গেছে, ডান বাঁ হুঁস নেই, তখন সুলতান জামাইকে বললেন,—বেটা, এতদিন হল তুমি আমার বেটীকে সাদি করে আমার পরম আত্মীয় হয়ে গেছ কিন্তু এ পর্যন্ত তুমি তোমার জীবনের তাজ্জব কাহিনী আমায় শোনালে না, শুনতে পেলে দিলটা আমার বড় খুশী হত।

সিরাজির প্রভাবে মারুফের দিল দরজা তখন সবগুলিই খুলে গেছে, মনের বাঁধন ঢিলে। আত্মরক্ষার যুক্তি দেন যিনি সকলের অন্তরে থেকে তিনি বেহুঁশ, সুতরাং মারুফ অকপটে তার জীবনের আদ্যোপান্ত খুলে বললে শ্বশুরকে—কায়রোয় জুতো সেলাই আর সর্বনেশে ফতিমার কাণ্ড থেকে শুরু করে চাষীর ক্ষেতের নীচে জাদু আংটি পাওয়ার বৃত্তান্ত পর্যন্ত।

শুনে সুলতান আর উজির পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। তারপর এক সময় উজির মারুফকে বলে উঠল—জনাব, আপনার সেই তাজ্জব আংটিটা একবার দেখতে পাই না আমরা?—মাতাল মারুফ অমনি বলে উঠল, কেন পাবেন না, এই যে সে আংটি, বলে নিজের আঙুল থেকে খুলে উজিরের হাতে দিল: আংটিতে বসানো ঐ যে পাথর ওর মাঝেই রয়েছে আমার সেই দোস্ত, যে বলামাত্র আমার সব কিছু এনে দেয়, সব কিছু করে দেয়।

আংটির কাছ থেকে কি করে সব আদায় করতে হয় একটু

আগেই মারুফ তার নিজের মুখে সুলতানকে বলেছে, সুতরাং আংটিটা হাতে পাওয়া মাত্র উজির তা নিজের আঙুলে পরেই সেই জাদু পাথরে দিলে ঘষা,—সঙ্গে সঙ্গে ওর মাঝ থেকে আওয়াজ বেরুল—এই যে আমি এসেছি, কি করতে হবে বলুন, কোন শহর ধ্বংস করতে হবে, সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে, না কোন সুলতানকে হত্যা করতে হবে? উজির তখনই বলে উঠল,—সর্দার,—এই অপদার্থ সুলতান আর তার মুচি জামাইকে এক ফোঁটা জল নেই এমন এক মরুভূমিতে ফেলে এস। অমনি সুলতান আর মারুফকে কে ছুটো কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে ফেললে এমন এক মরুভূমিতে যেখানে তৃতীয় আর জনপ্রাণী নেই, আছে কেবল ছাতি ফাটানো তেষ্টা আর মৃত্যু।

উজির তখনই গিয়ে দরবার ডেকে সবাইকে সমঝিয়ে দিলে—রাজ্যের কল্যাণে অপদার্থ সুলতান—এবং তার জামাইকেও মরুভূমিতে নির্বাসন দিতে হয়েছে—এখন থেকে সেই এখনকার সুলতান, আর কেউ যদি এই নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে না চায়, তা হলে তাদেরও নসিবে আছে ঐ রকম নির্বাসন।

আমীর ওমরাহরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এ নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হল। উজির-সুলতান কাউকে উঁচু পদে বসালো কাউকে নীচু পদে,—কাউকে বা শত্রু ভেবে পুরো বরবাদ করে দিল। এরপর সে এক খোজা দিয়ে বলে পাঠাল শাহাজাদীর কাছে—আমি এখন সুলতান, তুমি হতে যাচ্ছ আমার বেগম, আমি মালিক হয়ে এসেছি এখন তোমার কাছে তুমি আমায় সেইভাবে অভ্যর্থনা করে নিতে প্রস্তুত হও।

উজিরের ষড়যন্ত্র আর বিদ্রোহের কথা এর মধ্যেই শাহাজাদীর কানে এসে গেছে, সে তার নিজের খোজাকে দিয়ে বলে পাঠাল: আপনার বেগম হতে পারা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আজ এখনই আপনাকে সংবর্ধনা করে নেওয়ার আনন্দ লাভ করতে পারছি না, দিন কয়েক কিছু অসুবিধা আছে আমার—কয়েকটা

দিন পরে আমার কামরায় আপনার পায়ের ধুলি পড়লে আমি ধন্য হব।

খোজা মারফত উজিরের কাছ থেকে জবাব গেল—কোন অজুহাত আমি শুনতে চাইনা, আমি এখনই আসছি।

শাহাজাদী যখন বুঝলে উজিরকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তখন সে উজির আসার আগেই ভাল জামাকাপড় পরে চোখে সুর্মা দিয়ে ভাল করে সাজলে। তারপর উজির এলেই মধুর হেসে তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে হাত ধরে আপ্যায়ন করে বিছানায় বসিয়ে বললে—আজ আমি ধন্য হলাম যে আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। বাপজানের চোখ ছিল না—তাই আপনাকে ছেড়ে আমায়—

কথাটা আর শেষ না করে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল শাহজাদী ওড়নায় মাথা মুখ ঢেকে থর থর করে কাঁপতে লাগল—

উজির ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, কি হল, কি হল অমন করছ কেন?

ছি, ছি, ছি,—অন্য পুরুষের সামনে—

কই অন্য পুরুষ ত কেউ নেই এ ঘরে আমি ত দেখছি না কাউকে।

শাহাজাদী আঁতকে আংটির পাথরটা দেখিয়ে বললে, ঐ যে ঐখানে।

ঐখানে দেখতে পাচ্ছ তুমি কাউকে?—কই আমি ত পাচ্ছি না! তা ও ত কোন মানুষ নয়—ইফরিদ।

ইফরিদ?—ও আল্লা, আমি গেছি, ইফরিদে আমার জব্বর ভয়, আপনি মেহেরবান, হাত থেকে খুলে ওটা সরিয়ে রাখুন।

শাহাজাদীকে খুশী করতে উজির মৃদু হেসে তখনই আংটিটা খুলে বালিশের নীচে রাখল। হাতটা উজির সরিয়ে নিতে না নিতেই শাহাজাদী তার পেটে মারল—জব্বর এক লাথি। লাথির চোটে উজির ডিগবাজি খেয়ে দূরে ছিটকে পড়তেই শাহাজাদী বিদ্যুৎ গতিতে আংটিটা বালিশের নীচে থেকে নিয়ে নিজের আঙুলে পরেই পাথরে

দিলে ঘষা। অমনি তার ভিতর থেকে আওয়াজ হল—হুকুম, হুজুরাইন ?

হুকুম ? আমার হুকুম হচ্ছে এখনই এই বেইমান নিমকহারাম উজিরকে নিয়ে এখানকার জঘন্য হাজতে পোরো, আর আমার বাপ আর স্বামীকে যেখানে রেখেছ সেখান থেকে তাঁদের এনে আমার সামনে এক্ষুনি হাজির কর।

বলার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন উজিরকে পুরোনো কাপড়ের পোঁটলার মত ধরে নিয়ে গিয়ে সুলতানের সবচেয়ে ওঁছা হাজতের মাঝে নিয়ে ফেললো। আর, কোত্থেকে মারুফ আর সুলতান শাহাজাদীর ঘরের ভিতরে এসে হাজির হলেন। সুলতানের মুখেচোখে আতঙ্কের ছায়া আর মারুফের মত্তাবস্থা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। দুই প্রিয়জনকে ফিরে পেয়ে শাহাজাদীর আনন্দের সীমা রইল না। বহু দূর দেশ থেকে তাঁদের বিদ্যুৎ গতিতে আনা হয়েছে, তাঁরা ক্লান্ত, তা ছাড়া তাঁদের খিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে এবং তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—শাহাজাদী তাঁদের মুখ দেখেই বুঝলে। তাই তখনই সে তাঁদের হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে তাঁদের খেতে বসালে। ওঁরা খেতে থাকলে শাহাজাদী উজিরের অপচেষ্টার কথা এবং কি করে তাকে ভোগা দিয়ে আংটিটা আবার হস্তগত করেছে সে সব কাহিনী সে সবিস্তারে বর্ণনা করলে। সুলতান শুনে ভীষণ রেগে গিয়ে বলে উঠলেন—ও কুত্তাটাকে আমি শূলে দেব, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর লাস পুড়িয়ে ভস্ম করব।

মারুফ সুলতানের কথায় সায় দিয়ে তার স্ত্রীকে বললে, এবার আমার আংটি আমায় ফিরিয়ে দাও।

শাহাজাদী মৃদু হেসে বললে, সেটি আর হচ্ছে না, তোমার হাতে থাকবার সময় তুমি যখন ওটাকে রাখতে পারলে না,—তখন এটা তোমার কাছে আর নয়, এখন থেকে এটা আমার হেফাজতেই থাকবে।

মারুফ শুনে খুশী হয়ে বললে, সেই ভালো।

পরদিন ভোরে সুলতান মহলের সদর দরজার সামনে খেলার মাঠে বহু লোকের সামনে শূল খাটানো হল, তার গোড়ায় জ্বালা হল অনেক কাঠের আগুন। তারপর হাজত থেকে উজিরকে এনে সেই শূলে চড়ানো হল। একই সঙ্গে বিদ্ধ এবং দগ্ধ হয়ে উজির তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করল।

এরপর সুলতান জামাই মারুফকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে নিয়ে তার সঙ্গে একত্র হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন,—জাদু আংটিটা সব সময় এখন শাহাজাদীর আঙুলেই থাকে। সুতরাং মারুফের জীবন বেশ সুখেই কাটতে লাগল।

কাহিনী আমাদের এইখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু তা আর হল না মারুফের নসিবে আর একটা ফাঁড়া লেখা ছিল :

একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত মারুফ শাহাজাদীর ঘরে নানা গল্পগুজব করে কাটিয়ে সবে নিজের শোবার ঘরে ঢুকেছে এমন সময় দেখে তার বিছানা থেকে চোখ পাকিয়ে হাত উঁচিয়ে বেরিয়ে আসছে এক খাণ্ডারণী, তার কুৎসিত ভয়ংকর মুখ আর উঁচু দাঁত দেখে তাকে সর্বনেশে ফতিমা বলে চিনবার আগেই সে মারুফের উপর লাফিয়ে পড়ে তার চোয়ালে দুটো মোক্ষম ঘুষি লাগিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল—হতচ্ছাড়া মিনসে, কুত্তার বাচ্চা, আমাকে না বলে কয়ে কোথায় পালিয়েছিস তুই, ভেবেছিলি আমি খুঁজে বের করতে পারব না—এই বলে পরপর আরও কয়েকটা ঘুষি। ঘুষির চোটে মারুফের আরও দুটো দাঁত গেল।

মারুফ চোয়ালে হাত দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে—ইফরিদ জিনের সর্দার আমায় বাঁচাও, বাঁচাও—বলে ছুটতে ছুটতে শাহাজাদীর ঘরে এসে তার পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। এরপর শাহাজাদী তার চোখে মুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে সবে তার মূর্চ্ছা ভাঙানোর চেষ্টা করছে এমন সময় সেই খাণ্ডারণী সর্বনেশে ফতিমা কায়রো থেকে বয়ে আনা তার মুগুর হাতে করে উগ্রমূর্তিতে তার ঘরে ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, কই, কোথায় গেল সেই হতচ্ছাড়া, বিটকিলে মিনসে?

ফতিমাকে এই মূর্তিতে আসতে দেখেই শাহাজাদী তার আংটির পাথরে ঘা দিতেই—তা থেকে আওয়াজ হল। কি করতে হবে?

একে পাথর করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে ফতিমা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়ই পাথর হয়ে গেল: হাতে শাসানির ভঙ্গীতে উঠানো মুগুর, ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকানো, রাগে রক্তচক্ষু।

কিন্তু এদিকে মারুফের জ্ঞান হলে সে যখন শাহাজাদীর ঘরে ফতিমাকে ঐ মূর্তিতে দেখলে, তখনই সে আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লো। বুদ্ধিমতী শাহাজাদী তখন আংটির জিনকে আবার ডেকে হুকুম দিলে ফতিমাকে এখান থেকে সরিয়ে বাগানে নিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছের সঙ্গে শক্ত লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে। হয়ত ওর হালচাল পাল্টাবে, নয় ত ঐখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে।

এরপর মারুফ আর শাহাজাদীর সুখের জীবনে আর কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি। সুলতানের মৃত্যুর পর মারুফই তাঁর সিংহাসনে বসে রাজ্য চালিয়েছে, আংটির বান্দার দৌলতে পার্থিব ভোগ সামগ্রীরও তাদের কোন দিন অভাব হয় নি।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বললে, দিদি, অতি চমৎকার তোর এ গল্পটা, তা ছাড়া তাজ্জবও বটে। অনেকটা যেন আলাদীনের গল্পের মত।

শাহরাজাদী বললে, এর চেয়েও চমৎকার আর তাজ্জব গল্প আমার জানা আছে,—জাহাঁপনার যদি—

কথা শেষ না হতেই শাহরিয়া বলে উঠলেন, বেশ, কাল শোনাবে আমাদের সেই গল্প।

জুমুরুদ ও আলিশারের কাহিনী

পরদিন রাত্রি শেষে সুলতানের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদী তার সেই তাজ্জব গল্পটি শুরু করলে—

অনেক দিন আগে খোরাশানে এক বণিক ছিলেন, নাম ছিল তাঁর গুলজার। তাঁর একটি মাত্র ছেলে, নাম আলিশার, আসমানের চাঁদ হার মেনে যায়—এমনি তার রূপ। অনেক বয়স হয়েছিল গুলজারের, শরীরটাও ভেঙে পড়েছিল। একদিন যখন তিনি বুঝলেন—তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বললেন—বেটা, আমার খোদার কাছে যাবার ডাক এসেছে। যাবার আগে কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই তোমাকে—এগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করবে।

আলিশার বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—কি কথা, বাপজান, বলুন—আমি নিশ্চয়ই তা মেনে চলব।

বাপ বললেন—আমার প্রথম কথা, যে দুনিয়াটা ছেড়ে যাচ্ছি আমি এর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না তুমি, এর সঙ্গে কোন বাঁধনে তুমি নিজেকে বাঁধবে না, কারণ এ দুনিয়াটা হচ্ছে একটা কামারের হাপর। এর আগুনে যদি তোমার গা নাও পোড়ায়, ফুলকি যদি তোমার চোখ জখম নাও করে তবু এর ধুঁয়ো তোমার নির্ঘাত দম আটকে দেবে। এই জন্যেই আমাদের দেশের এক কবি বলেছেন—

পথের সাথী ব্যথার ব্যথী
পাবে না খুঁজে এই দুনিয়ায়।
পেয়ার যদি করতেই হয়—
করো পেয়ার নির্জনতায়॥

আর এক কবি বলেছেন—

এই দুনিয়ার ছবির তুমি দুই পিঠেতেই পাবে যা, তা—
আর কিছু নয়, নানান ঢঙে মিথ্যাচরণ, কপটতা।

বেটা, এই সব কবিদের বয়েৎ মনে রাখবে তুমি।

ছলছল চোখে আলিশার বললে—রাখব. আর কিছু বলবেন, বাপজান?

হাঁ বলব: তুমি যখনই পারবে, লোকের ভাল করবে কিন্তু প্রতিদানে তারা তোমার ভাল করবে বা কৃতজ্ঞতা দেখাবে—এটা কখনও প্রত্যাশা করো না।

না, করব না। আর কিছু?

মনের রেখো, লোকের ভাল করবার সুযোগ রোজ আসে না।

আর?

আর যে সব ধনরত্ন সম্পদ তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি সে সব যা তা করে উড়িয়ে দিও না। এ ছাড়া নিজের কর্তব্য ঠিক মত নির্ধারণ করতে না পারলে বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিতে দ্বিধাবোধ করো না। কারণ আমাদের দেশের কবিই বলেছেন—

মুখটি শুধু দেখতে চাও ত
এক মুকুরেই চলে,
আর একটির হবে জরুরৎ
পিছন দেখতে হলে।

আর আমার শেষ কথা, বেটা, সরাব থেকে সাবধান। সরাব অশেষ অনর্থের মূল: এ লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়, লোকের ঘৃণা এবং উপহাসের পাত্র করে তোলে। যে সব কথা বললাম তোমায় সেগুলি মনে রেখো, পালন করো, আল্লা তোমার ভাল করুন—বলেই বণিক গুলজার তাঁর ডান হাতের তর্জনীটা চোখের সামনে ধরে কোরানের একটা বয়েৎ পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মা শান্তিময়ের কাছে গিয়ে চির শান্তি লাভ করল। বাড়িতে অমনি কান্নাকাটির রোল উঠল।

বড় সদাশয় লোক ছিলেন গুলজার, তাই তাঁর অন্ত্যেষ্টির মিছিলে শহরের ছোট বড় সবাই যোগ দিলে।

শোকের পর্ব কেটে গেলে আলিশার বাজারে বাপের বড় গদিতে গিয়ে বসতে লাগল। বাপ যা সব বলে গিয়েছিলেন তা অক্ষরে

অক্ষরে পালন করতে লাগল। বিশেষ করে লোকের সঙ্গে মিশবার সম্পর্কে। পুরো একটা বছর এই রকমে কাটানোর পর নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলে না সে। ইবলিসে এসে ধরলে তাকে, তার মনে হতে লাগল—বাপ এত সোনাদানা অর্থ রেখে গেলেন, তা যদি একটু ফুর্তিতে না খরচ করলাম, তা হলে আর কি হল! পরে এ সব ত তাহলে অপরে ভোগ করবে! ফলে ফুর্তিতে সে একেবারে গা ভাসিয়ে দিলে। ভাসতে ভাসতে শেষে পাপে একেবারে ডুবে গেল। শহরের যত অকর্মণ্য বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো নেশাখোর ছেলে তারাই হল তার দোস্ত। নিজেদের ফুর্তির রসদ যোগানোর জন্য রক্তখাকী নিশাচরের মত এরা দিনের পর দিন আলিশারের সমস্ত সম্পদ শোষণ করে নেবার পর যখন তার কাছ থেকে নেবার মত আর কিছু রইল না তখন রসহীন ছিবড়ের মত তাকে পরিত্যাগ করে যে যার চলে গেল।

আলিশার যখন নিজের দিকে ফিরে তাকাল তখন দেখল শুধু যে তার পিতৃদত্ত ধনরত্ন অর্থই নিঃশেষ হয়েছে তাই নয়, তার বাড়ি-ঘর আসবার পত্র এমন কি জামা কাপড়ও আর নেই। বাপের দেওয়া উপদেশগুলির কথা একে একে মনে পড়তে লাগল তার—না শোনার জন্য অনুতাপে মন ভরে যেতে লাগল। কিন্তু এখন আর অনুতাপে কি ফল হবে। ইবলিসের মন্ত্রণায় সব ত শেষ করেই ফেলেছে সে। এরপর পেটের দায়ে, যে সব বন্ধুদের একদিন তোফা খানাপিনা ফুর্তির রসদ যুগিয়ে আপ্যায়ন করেছে, একে একে তাদেরই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে লাগল সে। তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে লাগল। শেষে বাধ্য হয়ে শহরের একটা জঘন্য সরাইখানায় আস্তানা নিলে সে—জীবিকার জন্য ভিক্ষা অবলম্বন করলে।

একদিন ভিক্ষার জন্যই বোধহয় বাজারের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে দেখে একটা জায়গায় বেশ ভিড়। কি বা কাকে কেন্দ্র করে চারিদিকে চক্রাকারে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল

আলিশার, গিয়ে দেখে এক অপরূপ সুন্দরী গোরা বাঁদীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব দালাল, বণিক ও অন্যান্য ক্রেতার দল। মেয়েটির উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুটের মত—গাল দুটি যেন দুটি বসোরাই গোলাপ! তা ছাড়া চোখের ভঙ্গী আর দেহের গঠনই বা কি, দেখলে তাক লেগে যায়। কবিরা এর দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে ভাষা খুঁজে পাবে না। আলিশার মেয়েটিকে দেখে কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘোর একটু কাটলে কি হয় দেখবার জন্য ধীরে ধীরে ক্রেতা আর বণিকদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। তারা ভাবলে আলিশারেরও বোধ হয় এই গোরা বাঁদীটাকে কিনবার ইচ্ছে আছে, মস্ত বণিকের ছেলে এ,—হাতে অনেক রেস্ত আছে। ওদের কেউই আলিশারের বর্তমান অবস্থার কোন খবর রাখত না।

একটু পরেই প্রধান দালাল হাঁকতে শুরু করল : সাহেবদের—যাঁরা বাঁদী কিনতে চান,—আসুন, দেখুন, আপনাদের সামনে আজ চাঁদের রানী, সাগর তলের সেরা মুক্তো, দুনিয়ার তামাম ফুলের বাগিচা কুমারী জুমুরুদকে হাজির করেছি, নীলাম শুরু করুন, ডাকুন—যার যা খুশি বলে ডাক শুরু করুন, আসমানের চাঁদ সামনে হাজির করেছি, ডাকুন।

পাঁচ শো দিনার—বলে একজন বণিক প্রথম ডাক দিল, আর একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—পাঁচ শো দশ। এর পর রুদাকার এক কুৎসিত বুড়ো, নীল চোখে তার ছানি, নাম রসিদলদ্দীন, সে এগিয়ে এসে বললে—আমি হাঁকছি আর এক শো বেশি। তখনই আরেক জন বললে, আরো দশ। হাতছাড়া হয়ে যায় বুঝি ভেবে রস্দিলদ্দীন বলে উঠল—আমার ডাক হাজার।

ডাক আর এর চেয়ে বেশি উঠল না, আর আর ক্রেতারা সব চুপ করে রইল। দালাল তখন বাঁদীর মালিকের দিকে চেয়ে বলল কেমন, এতে আপনার চলবে, রাজী আপনি? মালিক বললেন—হ্যাঁ আমার এতেই চলবে কিন্তু বাঁদীর কাছে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার, আমি ওর কাছে খোদার কসম নিয়ে বলেছি যে কিনলে ওর

কোন আপত্তি নেই এমন লোক ছাড়া আর কারো কাছে আমি ওকে বিক্রি করব না। দেখ, তুমি ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে।

দালাল তখন জুমুরুদের দিকে চেয়ে বললে—কি গো, আপত্তি আছে তোমার এই রসিদলদ্দীন সাহেবের ঘরে যেতে, ইনি বুড়ো হলেও মান্যিগণ্যি লোক, মস্ত বড় ধনী।

জুমুরুদ ঠোঁট উল্টে চোখ কুঁচকে বললে—বয়ে গেছে, ঐ সাদা চুল সাদা দাড়ি বিটকেলে বুড়োর বাঁদী হতে যাব কেন আমি, থুঃ—

দালাল বললে—প্রত্যাখ্যান করে তুমি ঠিকই করলে। এক হাজার দিনার তোমার দাম কিছুই নয়, আমার মতে তোমার দাম দশ হাজার দিনার হওয়া উচিত।

এরপর দালাল ক্রেতাদের দিকে ফিরে বললে—আপনাদের আর কেউ এই বাঁদীকে এই দামে নিতে রাজী আছেন?

একজন ক্রেতা অমনি বলে উঠল—আমি রাজী।

জুমুরুদ অমনি তার দিকে ফিরে চাইল, লোকটা রসিদলদ্দীনের মত কদাকার বুড়ো নয় বটে, চোখ দুটিও তার নীল অথবা কালি পড়া নয় তবে লোকটা নিজের বয়স কম করে দেখাবার জন্যে চুল দাড়ি লাল রঙে রাঙিয়েছে। জুমুরুদ তখন তার দিকে চেয়ে তখনই মুখে মুখে ছড়া কেটে তাকে বললে—

আমি তোমার ঘরে যেতাম,
পীরের মান্যি সবই দিতাম,
চুল দাড়ি সব রাখতে যদি সাদা।
কিন্তু দাড়ি চুলেতে রং
জোয়ান সাজতে কতই না ঢং
কি বিটকেলই দেখতে হলে দাদা!

তোমার ঘরে আমি যাব না।

দালাল জুমুরুদকে বললে—বেটী, মুখে তোর সাচ বলতে আটকায় না দেখছি!

জুমুরুদ দ্বিতীয় ক্রেতাকে নাকচ করে দেবার পর আর একটি

লোকও এক হাজার দিতে চাইল, কিন্তু জুমুরুদ তার দিকে চেয়ে দেখল—তার একটি চোখ নেই, তখন সে হেসে উঠে তার দিকে চেয়ে বললে—এক চোখ কানা সম্বন্ধে একটা ছড়া আছে—শুনেছ কোনদিন? না শুনে থাক ত বলছি আমি শোন—

মিথ্যুক আর এক চোখ কানার
তফাত কোথায় বল ত, ভাই!
পারলে না ত?—দোষ দেব না
দুইয়ে কিছুই তফাত নাই।

এরপর আর একজন লোকও অবশ্য এক হাজার দিনারই দিতে চাইল কিন্তু জুমুরুদ যখন তাকিয়ে দেখলে লোকটা অসম্ভব বেঁটে, কিন্তু তার দাড়ি পড়েছে একেবারে কোমর ছাড়িয়ে, তখন সে তাকেও নাকচ করে দিলে।

দালাল তখন জুমুরুদকে বললে—বিবিসাব, যারা তোমায় কিনতে চাইলেন, তাদের কারো ঘরেই যখন তুমি যেতে চাইলে না, তখন এই যে সব বণিক আর সাহেবসুবা ক্রেতা দাঁড়িয়ে রয়েছেন এঁদের মাঝে কে কিনলে তোমার দিলটা খুশী হয় বলো, তার কাছে একবার প্রস্তাবটা দিয়ে দেখি!

এই কথা শুনে খুশী হয়ে জুমুরুদ একে একে জমায়েত সকলের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, দেখতে দেখতে নজরটা যখন আলিশারের উপর পড়ল, তখনই যেন সে তার মন কেড়ে নিলে। আলিশারের চেহারাটা সত্যিই এত সুন্দর যে—যে-কোন নারীই তাকে দেখলে নিজেকে তার পায়ে বিকিয়ে দিতে চাইবে। জুমুরুদ তখনই আলিশারকে দেখিয়ে বললে ঐ, উনি যদি আমায় কেনেন তা হলেই আমার দিলটা খুশী হয়। দেখছেন ওঁর চেহারা—কি সুন্দর মুখ আর অঙ্গের কি গড়ন, আর শরীরটা এমন হালকা যেন হাওয়ায় উড়ে চলে। ওঁরই মত তরুণকে দেখে আমাদের দেশের কবিরা যে সব কবিতা লিখেছেন—তার কয়েকটা শুনাচ্ছি আপনাকে, এই বলে জুমুরুদ আবেগভরা কণ্ঠে স্পষ্ট নিখুঁত উচ্চারণে পর পর অনেক কবির

বয়েৎ আউড়ে গেল। শুনে দালাল মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তার মালিককে বললে—আপনার এ বাঁদীটি দেখছি একটি রত্ন: কত কবির কত সুন্দর বয়েৎ শুনালে এ আমাকে!

মালিক বললেন—তুমি ত ওর সব গুণ জান না, শুধু ওর রূপ দেখে আর বয়েৎ আওড়ানো শুনেই তাজ্জব বনে গেছে। ও নিজেই একজন উঁচুদরের কবি। ও সাতটি ভাষা সাতটি ছাঁদে লিখতে পারে, আর হাতের অক্ষরই বা কি—যেন এক একটি মুক্তো। এ ছাড়া ও সূচী-কাজ, গালিচা আর রেশমী কাপড় বোনায় একেবারে পাকা ওস্তাদ। এক-একটা গালিচা বা ঘরের পরদা ও এক হপ্তায় শেষ করতে পারে, আর কি সুন্দর সেগুলি দেখতে। এক-একখানা বাজারে বিক্রি হয় পঞ্চাশ দিনার করে। সুতরাং যে ওকে হাজার দিনার দিয়ে কিনবে কিছু দিনের মধ্যেই সে যা খরচ করেছিল তা সুদে আসলে উঠে আসবে।

দালাল রীতিমত অবাক হয়ে গেল মেয়েটির এত গুণ শুনে। সে তখন আলিশারের কাছে প্রায় ভূমি পর্যন্ত নত হয়ে তাকে সেলাম জানিয়ে তার কর চুম্বন করে বললে—জনাব, আপনার নসিব বড়ই ভাল যে এ মেয়েটির যা দাম হওয়া উচিত তার শত ভাগের এক ভাগ দিয়ে একে ঘরে নেবার আপনি সুযোগ পাচ্ছেন। খোদার অশেষ দোয়া আপনার উপর। একে ঘরে নিয়ে আপনি সুখী হোন।

দালালের কথা শুনে আলিশার মাথা নীচু করে বড় দুঃখে নিজের মনেই হাসতে লাগল—হায় রে নসিব, এরা ভাবছে এই মেয়েটা কিনবার মত অর্থের আমার অভাব নেই, অথচ আমার এখন এক টুকরো রুটি কিনবার মত সঙ্গতি নেই। যা হোক, হ্যাঁ না,—কিছুই আমি বলব না,—তা হলে আমার সত্যিকার অবস্থাও প্রকাশ পাবে না, লোকের কাছে লজ্জা পেতেও হবে না—এই ভেবে আলিশার কোন কথা না বলে মাথা নীচু করেই সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে চোখ ইশারায় জুমুরুদ তাকে উৎসাহ দিতে লাগল, কিন্তু আলিশার মাথা নীচু করে থাকায় তা দেখতেই পেল না। জুমুরুদ

তখন দালালকে বললে—আপনি আমার হাত ধরে আমায় ওঁর কাছে পৌঁছে দিন, আমি নিজে ওঁর সঙ্গে কথা বলে ওঁকে আমায় কিনতে রাজী করাব। আমি ওঁর ঘরেই যাব, আর কারো ঘরে কিছুতেই নয়।

জুমুরুদের অনুরোধে দালাল তাকে আলিশারের কাছে নিয়ে গেলে নিজের সৌন্দর্যে তার মন আকৃষ্ট করবার ভঙ্গীতে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—জনাব, তুমি আমার দিল কেড়ে নিয়ে এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? নীলামে তুমি আমায় ডাকছ না কেন? আমার দাম যদি বেশি মনে কর ত বেশি ডাক—কম মনে কর ত কম ডাক—মোটকথা ডাক, আমি তোমারই বাঁদী হতে চাই আর কারো নয়।

শুনে আলিশার মাথা নাড়তে নাড়তে বললে—উঁহু, বেচা-কেনার কোন বাধ্যবাধকতা ত নেই।

জুমুরুদ বললে—এক হাজার যদি বেশি মনে হয় তোমার কাছে ত ন শো বলো। তা হলেও তুমি আমাকে পাবে।

আলিশার—কোন কথা না বলে শুধু মাথা নাড়তে লাগল।

তা হলে আট শো ডাক।

আলিশার তাতেও কোন কথা বলে না দেখে জুমুরুদ বললে—না হলে সাত শো দিয়ে আমায় কেনো।

আলিশার—নীরব।

বেশ, এক শো দিনার দিয়ে কেনো আমায় তুমি।

এক শো দিনারও নেই আমার কাছে এখন।

জুমুরুদ তখন হাসতে হাসতে বললে—বেশ কত তোমার কম পড়ছে বলো?—পুরো এক শো যদি আজ দিতে না পার, বেশ পরে দিও।

বিবিসাব—এক শো দিনার আমার কোত্থেকে হবে—একটি দিনারও আমার নেই। শুধু তাই নয় খোদার কসম নিয়ে বলছি

একটি রূপোর দিরহামও আমার ট্যাকে নেই। আমার কাছে শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে তুমি অন্য খদ্দের যোগাড় করো।

জুমুরুদ বললে—না থাকুক তোমার কিছু, তবু তুমিই আমায় কিনবে। তুমি আমার—বাহুতে একটা চাপড় মেরে আচকান দিয়ে জড়িয়ে একটা হাত দিয়ে আমার কোমর ধরো, এতেই বুঝবে সবাই তুমি আমায় কিনছ তারপরে যা করতে হয় আমি করব। জুমুরুদের কথা মত আলিশার তাই করলে, জুমুরুদ অপরের অলক্ষ্যে নিজের জামার জেব থেকে একটা থলি বের করে তার হাতে দিয়ে বললে, একহাজার দিনার আছে এতে, এ থেকে ন শো আমার মনিবকে দাও, বাকী এক শো নিজের কাছে রাখো, কাজে লাগবে। জুমুরুদের কথা মত ন শো দিনার তার মনিবকে দিয়ে আলিশার তাকে নিয়ে নিজের আস্তানায় এল।

জুমুরুদ আলিশারের ঘরে এসে দেখে ঘরটা যেমনি ছোট তেমনি অপরিষ্কার, থাকবার মধ্যে আছে সেখানে একটা পুরনো ছেঁড়া মাদুর। এতে কিছুমাত্র বিরক্তি না দেখিয়ে সে আর একটা থলিতে আর এক হাজার দিনার আলির হাতে দিয়ে বললে—এই নিয়ে এখুনি বাজারে যাও, গিয়ে কি কি আনবে তা তোমায় বলে দিচ্ছি: আনবে সব চেয়ে ভাল বিছানা, আসবাবপত্র, সবচেয়ে ভাল খাবার আর আমার কাজের জন্য আনবে বেশ কিছু লাল রঙের চৌকো দামস্কাসের রেশমী কাপড়, সোনা আর রূপোর জরি, আর সাত রঙের রেশমী সুতো, কয়েকটা বড় বড় সুঁচ, হ্যাঁ আর আমার আঙুলের জন্য একটা ভাল অঙ্গুস্তানা (ঠুলি)।

আলিশার ঐ সব জিনিস আনতে বাজারে রওনা হলে জুমুরুদ ঘরটা বেশ করে ঝাড়ু দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেললে, তারপর বাজার থেকে সব জিনিস এলে সে ঘরে গালিচা বিছিয়ে যথাস্থানে গদি পেতে বিছানা করে আসবাব পত্র দিয়ে ঘর সাজিয়ে ফেললে। তারপর ঘরে মশাল জ্বেলে গালিচার উপর একটা কাপড় বিছিয়ে

তারা দুজনে খেতে বসল। অনেকদিন পর আলিশারের নসিবে আবার ভাল খানা-পিনা জুটল।

ভোরের আলো দেখা দিলেই একটুও সময় নষ্ট না করে জুমুরুদ কাজে বসে গেল : দামস্কসের লাল রেশমী কাপড়টা দিয়ে সে একটা পরদা তৈরি করতে শুরু করলে। নানা রঙের সুতো দিয়ে নানা জীবজন্তুর ছবি করলে তার উপর। এমন ওস্তাদি হাত জুমুরুদের যে ছবিগুলি দেখে মনে হয়—ওগুলি যেন জ্যান্ত, পা-ওয়ালা জীবগুলি যেন সত্যিই চলছে, পাখীগুলি যেন গান গাইছে। পরদার মাঝখানে আবার নানা রকম ফুল আর ফলে ভরা গাছ, ওগুলির আবার ছায়া পড়েছে—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর এ পরদাটা করতে জুমুরুদের লাগল মোটে আট দিন।

পরদাটা তৈরি হলেই জুমুরুদ ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে ভাঁজ করে আলিশারের হাতে দিয়ে বললে—এবার তুমি এটা বাজারে নিয়ে গিয়ে যে কোন দোকানদারের কাছে বিক্রি করে এসো, পঞ্চাশ দিনারের কমে ছাড়বে না কিন্তু—মনে থাকে যেন। হ্যাঁ, আরেকটা কথা,—দোকানদার বা বাজারের কোন চেনা লোক ছাড়া নবাগত বা অপরিচিত কোন পথচারীর কাছে এটা কখনও বিক্রি করবে না, করলে তোমার আমার নিদারুণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। আমাদের দুইজনের শত্রুরা সব ওত পেতে বসে আছে, সুতরাং আগন্তুক থেকে সাবধান। আলিশার জুমুরুদের সব কথা মেনে নিয়ে বাজারে গিয়ে তার এক চেনা বণিকের কাছে পরদাটা বিক্রি করে পঞ্চাশ দিনার ঘরে নিয়ে এল।

আলিশার আবার নতুন করে রেশমী কাপড় সোনা ও রূপোর জরি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এল। জুমুরুদ সেটা হাতে পাওয়া মাত্র কাজ শুরু করল—এ দিয়ে আটদিনে এমন সুন্দর একটা গালিচা তৈরি করে ফেললে, যা আগের পরদাটার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। আলিশার সেটা বাজারে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ দিনারে বিক্রি হয়ে গেল।

এমনি করে জুমুরুদ এক একটা সৌখিন জিনিস তৈরি করে আর আলিশার তা বাজারে বিক্রি করে—দিনার নিয়ে আসে। তাই ভাঙ্গিয়ে খাবার দাবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে খেয়ে পরে তাদের স্বচ্ছন্দেই দিন যায়। একটি বছর বেশ সুখেই কেটে গেল, তাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আরও গভীর হল। তারপর একদিন—

আলিশার জুমুরুদের তৈরি একটা সুন্দর গালিচা নিয়ে বাজারে গিয়ে এক দালালের হাতে দিয়েছে—দালাল পরিচিত বণিকদের গদির সামনে সবে নীলামের ডাক শুরু করেছে, এমন সময় এক অপরিচিত খৃষ্টান এসে সেখানে হাজির হল। বাজারে ঢুকবার পথে এমন অনেক খৃষ্টানই দেখা যায় তারা নীলামের সময় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এ তাদেরই একজন। খৃষ্টান লোকটি আলিশার আর দালালের কাছে এগিয়ে এসে বললে, আমি এই গালিচার জন্যে ষাট দিনার দিতে রাজী আছি।

আলিশার অমনি বলে উঠল, না, হবে না।

আলিশার এই খৃষ্টান লোকগুলোকে বিশ্বাস করে না, ঘৃণা করে, তাছাড়া জুমুরুদ তাকে অপরিচিত লোকের কাছে বিক্রি করতে নিষেধ করে দিয়েছে—তাই দশ দিনার বেশি হাঁকলেও লোকটাকে সে দিতে চাইল না।

কিন্তু খৃষ্টান হটবার পাত্র নয়, তখনই বলে উঠল একশো দিনার দিচ্ছি আমি, ওটা আমায় দিয়ে দাও।

দালাল তখনই আলিশারের কানে কানে বললে—দাও, দিয়ে দাও এমন সুযোগ তুমি আর পাবে না, কোথায় পঞ্চাশ আর কোথায় একশো! এমনি করে নানা কথা বলে আলিশারকে এমন প্রলুব্ধ করে তুললো যে আলিশার শেষে রাজীই হয়ে গেল। আসলে—খৃষ্টান এর আগেই তার পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে দালালকে দশ দিনার ঘুষ দিয়ে রেখেছিল। তার চেষ্টা সফল হলঃ আলিশার লোভে

পড়ে গালিচাটা এক শো দিনারে বিক্রি করে দিয়ে দুরুদুরু বুকে বাজার থেকে বাড়ি চললো।

পথে একটু যেতেই ফিরে দেখে খৃষ্টান লোকটা তার পিছু পিছু আসছে :

তোমাদের কেউ ত এদিকে থাকে না, আসে না, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

খৃষ্টান বললে, এই রাস্তার শেষের দিকেই আমার একটু কাজ আছে, জনাব, তাই যাচ্ছি।

মনে মনে বিরক্তি আর দুশ্চিন্তা নিয়ে পথ চলতে লাগল আলিশার, বাসার একেবারে দরজার কাছে এসে আর একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে খৃষ্টানটা অন্য কোন পথ দিয়ে আবার তার পিছনে এসে গেছে :

আচ্ছা বদলোক ত তুমি, এখানেও তুমি আমার পিছু নিয়েছ?

রাগ করবেন না, জনাব, পিছু নিই নি আমি—হঠাৎ এসে পড়েছি। মানে—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে আমার, তেষ্টায় একেবারে ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মেহেরবানি করে এক গ্লাস পানি যদি আমায় দেন—আল্লা আপনার ভাল করবেন।

এতেই কাৎ হয়ে গেল আলিশার : পাগলা কুকুরে জল খেতে এলে কোন মুসলমান তাড়ায় না তাকে—না করে না—একে সে প্রত্যাখ্যান করবে কি করে!

দাঁড়াও একটু—বলে ঘরে ঢুকে সবে আলিশার জলের কলসীতে হাত দিয়েছে, এমন সময় জুমুরুদ তার কাছে ছুটে এল : ভালবাসার জন এতক্ষণ কাছে ছিল না, এবার ফিরে এসেছে বেশ আবেগ নিয়েই ছুটে এসে আলিশারের বাঁ হাতটা ধরে বললে,—এত দেরি করলে কেন আজ, এতক্ষণ একা থাকতে আমার ভাল লাগে না। গালিচাটা কার কাছে বিক্রি করলে—কোন নামকরা জানা বণিক না কোন আগন্তুকের কাছে?

জুমুরুদের কথায় আলিশার প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল,

তারপর বললে—বাজারে আজ বড্ড ভিড় কি না, তাই একটু দেরি হয়ে গেল, বিক্রি অবশ্য একটা জানা বণিকের কাছেই করেছি।

আলিশারের রকমসকম দেখে কেমন একটু সন্দেহ হল জুমুরুদের, বললে, কিন্তু আমার যেন কেমন ভাল বোধ হচ্ছে না, তুমি ঐ জলের কলসী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

দালাল এসেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে, তেষ্টা পেয়েছে তার, জল খেতে চাইছে—তাই—

ব্যাপারটা তেমন ভাল বোধ হল না, জুমুরুদের, সে মনে মনে বলতে লাগল—রাহু যে চাঁদ গ্রাস করতে আসছে, চাঁদ সে কথা জানে না।

এদিকে আলিশার খৃষ্টানকে জল দিতে এসে দেখে সে এর মধ্যে তার ঘরের ঘেরা বারান্দায় উঠে এসে বসেছে।

দেখেই আলিশারের চারিদিক যেন আঁধার হয়ে এল, রাগ আর সামলাতে না পেরে বেশ রুক্ষ স্বরেই বলে উঠল—তুমি আচ্ছা লোক ত হে, বলা নেই, কওয়া নেই—তুমি আমার অসাক্ষাতে আমার একেবারে বাড়ির ভিতরে এসে গেলে!

রাগ করবেন না, জনাব,—হেঁটে হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তা ছাড়া বাইরে যা রদ্দুর, দাঁড়ানো যায় না—তাই। আর, দরজা আর বারান্দার তফাত কি—একটু জিরিয়ে দমটা নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে তাড়াবেন না আপনি, আল্লাও তা হলে আপনাকে তাড়াবেন না। এই বলে আলিশারের হাত থেকে কলসী নিয়ে সে ঢক ঢক করে জল খেয়ে কলসী ফিরিয়ে দিল। আলিশার—কলসী হাতে দাঁড়িয়ে, এই দুশমন অতিথিটা কখন যায় তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু খৃষ্টানের নড়বার নাম নেই, এক ঘণ্টা কেটে গেল—তবু সে বারান্দা থেকে নড়ল না। আলিশার তখন মহা বিরক্ত হয়ে রেগে তাকে বলে উঠল—মতলব কি তোমার, তুমি আমার বাড়ি থেকে যাবে কি না?

খৃষ্টান তাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললে, ওঃ আপনি ত

দেখছি—যারা অপরের ভাল করতে পারলে খুশী হয়, সে দলে পড়েন না, তা আপনাকে আর দোষ দেব কি!—আজকাল দুনিয়াটাই হয়ে পড়েছে এই রকম। এই দেখেই ত কবি দুঃখ করে বলেছেন—

আগের—দিলদরিয়া লোকগুলি সব
দরাজ হাতে করত দান,
পোশাক পেয়ে, খানা পেয়ে
গরিব লোকের বাঁচত প্রাণ।
এখন—দুনিয়ার হাল পালটে গেছে
কঞ্জুস হলেন আমীর খাঁন
ক্লান্ত পথিক চাইলে পানি
দিতে গিয়ে হাত গুটান॥

এখন আমার কথা হচ্ছে এই—পানি দিয়ে আপনি আমার তেস্টা দূর করলেন বটে, কিন্তু খিদেয় আমি এত কাতর হয়ে পড়েছি যে এক পা নড়বারও আমার আর সাধ্য নেই। আপনাদের খানা পিনার—পর—যা পড়ে আছে—তা হোক না সে কিছু শুকনো রুটি আর পেঁয়াজ—তাই দিন আমায় খেতে, আমি তাই খেয়ে চলে যাই।

শুনে আরও ভীষণ চটে গিয়ে আলিশার চেঁচিয়ে উঠল—তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, বেরোও, বেরোও তুমি আমার বাড়ি থেকে—দূর হও। হবে না, বাড়িতে কিছ্ছু নেই।

খৃষ্টান এতেও না দমে হাত জোড় করে বললে—কিছু মনে করবেন না, জনাব, মাফ করবেন, বাড়িতে যদি কিছু নাও থাকে, তা হলে আপনি ত এই একটু আগে আমার কাছ থেকে এক শো দিনার পেয়েছেন, তারই কিছু খরচ করে পাশের কোন দোকান থেকে আমায় কিছু পনির আর রুটি এনে দিন—তা হলে ত আর আপনার বাড়ি থেকে কোন কিছু না খেয়ে আমায় চলে যেতে হয়েছে, এ কথা আর বলতে হবে না কারো কাছে!

এই শুনে আলিশারের মনে হল, এই দুশমন খৃষ্টানটা দেখছি এক

বদ্ধ পাগল—একে গলাধাক্কা দিয়ে বের করা ছাড়া দেখছি আর গত্যন্তর নেই! এই ভেবে আলিশার যেই তাকে ধরতে যাবে অমনি সে আবার বলে উঠল, আমার জন্যে বেশি কিছু খরচ করতে হবে না ত, জনাব। সামান্য একখানা রুটি আর একটা পেঁয়াজ হলেই পেট ঠাণ্ডা হবে আমার। বিজ্ঞ লোক সামান্যতেই খুশী। কবি ঠিকই বলেছেন—

বিজ্ঞজনে করতে খুশী
বেশি কিছু লাগে না,
কোর্মা কাবাব পোলাও পেলেও
পেটুকের খাঁই যাবে না।

আলিশারের বুঝতে বাকী রইল না—যে লোকটা একেবারে নাছোড়-বান্দা, একে কিছু খেতে না দিয়ে রেহাই পাওয়া যাবে না—তখন তাকে বললে—ঠিক আছে, তুমি বসে থাকো এইখানে, উঠবে না, নড়বে না, আমি এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসছি।—এই বলে সে ঘরে চাবি দিয়ে চাবিটা জামার জেবে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাজারে গিয়ে সে ভাপে সেদ্ধ মাংস, পনির, সদ্য চুল্লি থেকে বেরুনো গরম গরম রুটি, নানা রকমের মেঠাই কলা আঙুর ইত্যাদি করে নানা রকমের ফল কিনে নিয়ে এল। এসে সেগুলি খৃষ্টানের সামনে দিয়ে বললে, নাও এবার খাও।

খৃষ্টান বললে—বহুৎ দোয়া আপনার, বহুৎ দরাজ দিল, কিন্তু এ কি করেছেন আপনি, এতো এনেছেন, এ তো দশজনে খেয়ে ফুরুতে পারে না! আমি একা খাব কি করে, আপনিও বসে যান।

না আমার খিদে নেই,—বিরক্ত হয়ে বললে আলিশার।

সে কি জনাব, দুনিয়াসুদ্ধ লোকে জানে—অতিথিকে খেতে দিয়ে যে নিজে না বসে তার সঙ্গে—সে, কি আর বলব, লোকে বলে সে বেজন্মা।

খৃষ্টানের মুখে এই কথা শুনে আলিশার আর কোন কথা না বলে চোখমুখ কুঁচকে তার সঙ্গে খেতে বসল। খেতে বসে জুমুরুদের কথা

মনে পড়ায় আলিশার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে খৃষ্টান একটা কলা ছুলে দুখণ্ড করে তার মাঝে আফিমের নির্ঘাস মাখানো কড়া ভাং পুরে জোড়া দিয়ে আবার আস্তর মত করে ফেললো। সেটা হাতীর পেটে ঢুকাতে পারলে এক বছর তার ঘুম ভাঙবে না—এমন বস্তু হয়ে উঠল সেটা। এরপর কলাটাকে লোভনীয় করে তুলবার জন্যে খৃষ্টান সেটা মধুর মাঝে ডুবিয়ে আলি-শারের হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এটা খেয়ে দেখুন, জনাব, কি চমৎকার লাগবে ভোজের সময় আমাদের সমাজের লোকেরা কলা এই রকম করেই খায়।

ও আপনিই খান, আমার দরকার নেই।

খৃষ্টান এতে চোখ উল্টে বিস্ময়ের ভান করে বললে—কি জনাব, অতিথি আদর করে কিছু খেতে সাধলে তা প্রত্যাখ্যান করা ভদ্রতা বিরুদ্ধ, ধর্ম-বিরুদ্ধ তাও আপনার জানা নেই ?

আর পেরে উঠছে না আলিশার খৃষ্টানের সঙ্গে, যত শীগগির হয় তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে মধু মাখানো কলাটা নিল। কিন্তু সেটা পেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলিশার অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আলিশারের এই অবস্থা হবার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান খাওয়া ফেলে ছুটে বেরুল রাস্তায় ; তার একধারে জঙ্গলের আড়ালে একটা গাধা নিয়ে কয়েকটা লোক অপেক্ষা করে ছিল, তাদের সঙ্গে সেই ছানি-পড়া নীল চোখো বুড়ো রসিদলদ্দীন, নীলামের সময় যার কদাকার চেহারা দেখে জুমুরুদ যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রত্যাখ্যাত অপমানিত হবার পরই রসিদলদ্দীন প্রতিজ্ঞা করেছিল—ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক—যত দিনেই হোক—সে ঐ জুমুরুদকে ঘরে নেবেই।

এই রসিদলদ্দীন আসলে বিধর্মী খৃষ্টান, ঐ অঞ্চলে, বাণিজ্যের বেশি রকম সুযোগ সুবিধা পাবে বলে নিজেকে মুসলমান বলে প্রচার

করত আর যে খৃষ্টানটা এই মাত্র আলিশারকে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেললে সে ঐ রসিদলদ্দীনেরই আপন ভাই—নাম বারসুম।

বারসুম তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে তার সাফল্যের কথা জানালেই সে তার লোকজনদের নিয়ে—ভাইয়ের সঙ্গে আলিশারের আস্তানায় এসে হাজির হল। তারপর আলিশার যে ঘরটা তার হারেম করেছিল তাতে ঢুকে তার লোকজনের সাহায্যে জুমুরুদের মুখে কাপড় গুঁজে তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নিজের বাড়িতে এনে হাজির করল।

এরপর বুড়ো রসিদলদ্দীন জুমুরুদকে একটা নিরালা কামরায় আনিয়ে তার পাশে বসে তার মুখের কাপড় খুলিয়ে উৎকট হাসি হেসে বললে—কেমন হল ত? এখন তুমি আমার মুঠোর মধ্যে। তোমার ঐ বদখত দুশমন আলির সাধ্য নেই, আমার ডেরার মাঝ থেকে সে তোমায় বের করে। তোমার ভালর জন্যে দুটো প্রস্তাব তোমার কাছে দিচ্ছি। তার প্রথমটা হচ্ছে—লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার বিবি হয়ে সুখে থাক। দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমার ঐ ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার মত খৃষ্টান হও। নইলে প্রভু যীশুখৃষ্ট এবং তাঁর মা কুমারী মেরীর নামে শপথ করে বলছি তোমাকে আমি আস্ত রাখব না। সব খুলে বললাম, এখন তুমি বুঝে দেখ।

রসিদের কথা শুনে জুমুরুদের দুই চোখ জলে ভরে এল, রাগ এবং দুঃখের উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, বিটকেলে বুড়ো, তোমার যা ইচ্ছে করো, আমায় কেটে ফেললেও আমার ধর্ম ত্যাগ করাতে পারবে না, আমার জান গেলেও আমি তোমার বিবি হতে পারব না। তুমি জোর করে যদি আমার দেহকে কলুষিত কর তা হলে আল্লাই তোমার পাপের শাস্তি দেবেন—এই বলে জুমুরুদ অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রসিদলদ্দীন যখন দেখলে তার কথাতে কোন কাজ হল না, তখন সে তার বান্দাদের ডাকল। বান্দারা এলে সে তাদের হুকুম দিলে—একে উপুড় করে মাটিতে পেড়ে ফেল। বান্দারা জুমুরুদকে

উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলে বুড়ো রসিদ একটা চাবুক হাতে নিয়ে তার গায়ে যত জোর ছিল তত জোরে জুমুরুদকে বেদম মার মারতে লাগল। মারের চোটে মেয়েটির কোমল অঙ্গ কেটে রক্ত বেরুতে লাগল। অনেক জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে কালশিরে পড়ে গেল। জুমুরুদ মার খেয়ে কেবল আল্লার নাম করছে। বুড়োর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, পাগলের মত সে কেবল মেরেই চলেছে। মারতে মারতে শেষে হাত যখন আর চলে না—অবশ হয়ে গেল, তখন ক্ষান্ত দিয়ে সে তার বান্দাদের ডেকে বললে, যা তোরা একে রান্নাঘরে আর আর বাঁদীদের মাঝে ফেলে আয়—ওখানকার সবাইকে বলে আসবি, কেউ যেন ওকে আজ কোন খানাপিনা দেয় না।

এদিকে আলিশার পরের দিন পর্যন্ত তার বাইরের ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল—তারপর ভাঙ আর আফিমের নেশা কেটে যাওয়ায় যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন সে উঠে বসে—জুমুরুদ, জুমুরুদ, বলে কয়েকবার ডেকে উঠল।

কিন্তু কয়েক ডাকেও যখন কোন সাড়া মিলল না, তখন সে উঠে ত্রস্তপদে ভিতরে তাদের শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু একি, ঘর যে খালি, জুমুরুদ কোথায় গেল?—তখুনি তার খৃষ্টান লোকটির কথা মনে হল, বুঝতে বাকী রইল না যে সেই দুশমনই তার জুমুরুদকে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আছড়ে পড়ল মাটিতে, বুক মাথা চাপড়ে কাঁদতে লাগল, নিজের জামা কাপড় ছিঁড়তে লাগল। জুমুরুদকে হারানোর বেদনা যখন আরও তীব্র হয়ে উঠল তখন সে আর ঘরে থাকতে না পেরে পাগলের মত রাস্তায় ছুটে বেরুল। রাস্তায় দুখানা বড় বড় পাথর পড়ে ছিল, তা দুই হাতে কুড়িয়ে নিয়ে তা-ই দিয়ে বুকে ঘা মারতে মারতে—জুমুরুদ—জুমুরুদ, বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তায় ছুটোছুটি করতে লাগল। তাই দেখে পথের আশেপাশের বাড়ি থেকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে—পাগল, পাগল—বলে তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। বড়দের মধ্যে যারা আলিশারকে চিনত তারা তাকে এই অবস্থায়

দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—ইস, আল্লার কি কাম, গুলজার সাহেবের ছেলেটা শেষে পাগল হয়ে গেল। সহানুভূতিতে অনেকের চোখে জলও এসে গেল।

আলিশার যখন চোখের জলে ভেসে বুকে এমনি পাথরের ঘা মারতে মারতে পথে ছুটাছুটি করছে—সেই সময় এক বুড়ী সেই পথ দিয়ে আসতে আসতে তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বড় ভালো লোক বুড়ী, প্রাণে দয়ামায়া আছে, মগজে বুদ্ধিও আছে। বুড়ী আলিশারের দিকে চেয়ে বললে—বেটা, এ দশা তোর কবে থেকে হয়েছে, কি হয়েছে তোর—আমার কাছে খুলে বল দেখি, জুমুরুদ, জুমুরুদ করছিস, জুমুরুদ তোর কে, কি হয়েছে তার? তুই সব খুলে বল আমার কাছে, দেখি আল্লার দোয়ায় তোর কোন উপকার করতে পারি কিনা আমি।

বুড়ীর কথায় আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে কান্না থামিয়ে আলিশার বুড়ীর দিকে চেয়ে বললে,—এ্যাঁ, পারবে তুমি আমার উপকার করতে, আমার জুমুরুদকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে?

আল্লার মর্জি হলে পারব বই কি, বেটা, তুই সব কিছু খুলে বল আগে আমার কাছে, তারপর দেখি কতটা কি করতে পারি।

আলিশার তখন খৃষ্টান বারসুমের সঙ্গে বাজারে দেখা হওয়ার পর থেকে সমস্ত ঘটনা বুড়ীকে খুলে বললে। দরদী বুড়ী সব কিছু শুনে মাথা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিলে, তারপর মাথা তুলে বললে—বেটা, তুই এখনই বাজারে গিয়ে আমার জন্যে একটা চুপড়ি কিনে আন, যেমন চুপড়িতে করে আমার মত সব বুড়ীরা লোকের বাড়িতে বাড়িতে জিনিস ফেরি করে বেড়ায়। হ্যাঁ,—আর শুধু চুপড়িই নয়, সেই চুপড়ি ভরে আনবে রঙীন কাচের চুড়ি, তামার উপর সোনারূপোর গিল্টি করা আংটি, কানের দুল, ঘুঙুর ইত্যাদি—অর্থাৎ আমার মত বুড়ীরা চুপড়িতে করে যে সব জিনিস আমীর ওমরাহ বণিকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের বাঁদাদের কাছে বিক্রি করে। এ সব এনে দিলেই চুপড়ি মাথায় আমি শহরের বড়লোক

হোমরা চোমরাদের ঘরে ঘরে যাব, দেখি সব বাঁদীদের সঙ্গে একথায় ওকথায় জুমুরুদের কোন পাত্তা যদি পাই, তা হলে আল্লার মর্জি হলে কোন না কোন কৌশলে তাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব।

বুড়ীর সহানুভূতিতে আলিশারের চোখে আবার নতুন করে জল এসে গেল। সে কৃতজ্ঞতা জানাতে বুড়ীর হাতে চুমু দিয়ে বুড়ীর ফরমাস মত জিনিস আনতে বাজারে ছুটল। যাবার আগে নিজের বাড়িটা সে বুড়ীকে দেখিয়ে দিয়ে গেল। বুড়ী গেল নিজের বাড়িতে তার বেশ পালটাতে : এবার ফেরিওয়ালীর বেশে সাজতে হবে তাকে। তাই সাজলে সে : মধুর মত ঘন বাদামী রঙের অবগুণ্ঠনে সে মুখ ঢাকল, মাথায় দিল একটা কাশ্মিরী শাল, গায়ে জড়াল এক কালো রেশমী চাদর। তারপর আলিশারের বাড়ি এসে তার কাছ থেকে বেসাতিভরা চুপড়ি নিয়ে মাথায় করে একটা লাঠি ভর দিয়ে বেরুল সে জুমুরুদের খোঁজে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় আমীর ওমরাহ বণিক ও অন্যান্য হোমরা চোমরাদের হারেমে ঘুরতে ঘুরতে বুড়ী শেষে রসিদলদ্দীনের হারেমে এসে হাজির হল। জুমুরুদ তখন শয়তান রসিদের নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত হয়ে ওর রান্নাঘরে বান্দাবাঁদীদের মাঝে একটা পুরনো ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়ে কাতরাচ্ছিল।

বুড়ী গিয়ে রান্নাঘরের দরজায় টোকা দিতেই একটা বাঁদী এসে দোর খুলে দিলে। বুড়ী বললে—বেটী, তোমাদের গায়ে পরবার মত অনেক ভাল ভাল জিনিস এনেছি আমি—কেউ কিনবে?

কিনব বই কি, তুমি এস, ভিতরে এস—বলে বাঁদীটা তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে আর সবার সঙ্গে পরিচর করিয়ে দিল—সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীরা সব বুড়ীকে ঘিরে বসে বুড়ীর চুপড়ির নানা জিনিস দেখতে লাগল, কিনতে লাগল। চুড়ি, আংটি, কানের দুল ইত্যাদি করে অনেক কিছু বুড়ী বিক্রি করলে, বেশ সস্তা দরেই বিক্রি করল। বুড়ীর কাছে জিনিস কিনে সবাই খুশী : ভাল জিনিস পেয়ে খুশী, খুশী তার মিষ্টি বুলিতে।

বুড়ী তখন লম্বা রসুই ঘরের এদিকে ওদিকে চোখ বুলুতে ওর এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়ে জুমুরুদকে কাতরাতে দেখে বাঁদীদের জিজ্ঞাসা করলে—কে বটে মেয়েটি, অমন করে কাতরাচ্ছে কেন ? বাঁদীরা জুমুরুদ সম্বন্ধে যতটা জানত—ততটা বললে বুড়ীর আর জানতে বাকী রইল না, যার খোঁজে বেরিয়েছে সে, এই সেই জুমুরুদ ।

বুড়ী তখন বাঁদীদের বললে, তোমরা তোমাদের নতুন কেনা অলংকার সব পরে দেখ, আমি ততক্ষণ ঐ মেয়েটিকে একটু দেখে আসি ।

বাঁদীরা তখন মনের আনন্দে নিজের নিজের অলংকার পরতে মত্ত হয়ে রইল, বুড়ী সেই ফাঁকে জুমুরুদের কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললে—বেটা, আল্লা তোমার ভাল করুন, আমি বণিক গুলজার সাহেবের বেটী আলিশারের কাছ থেকে তোমার খোঁজেই এই, এই ফেরিওয়ালীর ছদ্মবেশে এসেছি। কাল সন্ধ্যার পরেই তোমায় এখান থেকে খালাসের ব্যবস্থা করছি আমি। রান্নাঘরের জানালাগুলিতে ত শিক নেই, যে জানালাটা রাস্তার ধারে, তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি, আলিশার ওর কাছেরই কোন অন্ধকার জায়গায় এসে আত্মগোপন করে থাকবে। সুযোগ বুঝে সে শিস দিলেই তুমি ছোট্ট শিস দিয়ে তার জবাব দেবে, তারপর জানালা খুলে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসবে। ব্যস, আর কিছু ভাবতে হবে না, এরপর আলিশার তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে ।

শুনে জুমুরুদ কৃতজ্ঞতায় গলে বুড়ীর কর চুম্বন করলো, আনন্দে আশায় দু'ফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ।

বুড়ী আর দেরি না করে তখনই বেরিয়ে পড়ল রসিদলদ্দীনের বাড়ি থেকে, ছুটল আলিশারের কাছে। সেখানে সে তার সাফল্যের কথা, এবং পরদিন সন্ধ্যার পর জুমুরুদের উদ্ধারের জন্য কি কি তার করতে হবে সে সব কথা খুলে বললে আলিশার খুশী হয়ে বুড়ীর কর

চুম্বন করে উপহার দিতে যাচ্ছিল, বুড়ী তা নিলে না, বললে আমি যা বলে গেলাম ঠিক ঠিক করতে পারলেই আমায় বকশিশ দেওয়া হবে। যা যা বলে গেলাম ভুলো না যেন—আল্লা তোমার ভাল করুন।

বুড়ী চলে গেলে আলিশার কখনও বিরহের বয়েৎ আউড়ে, কখনও জুমুরুদকে ফিরে পাবার আশার স্বপ্ন দেখে সময় কাটাতে লাগল, সেদিন রাত্রে তার চোখে ঘুমও এল না, আর খানাপিনাও করলে না সে।

পরদিন সন্ধ্যার পর সে বুড়ীর নির্দেশ মত পথ ধরে রসিদলদ্দীনের বাড়ির রান্নাঘরের পাশে এসে হাজির হল। সেখানে রাস্তার ধারে জানালার পাশে একটা দেয়ালের মাথায় বসে রইল। ছ'দিন ছ'রাত্রি নাওয়া খাওয়া নেই—একটু বসে থাকবার পরই আলিশার ঘুমে ঢলে পড়ল।

নসিবের এমনি কারসাজি—সেই সময়ই এক পাকা চোর এসেছিল সেখানে—রসিদলদ্দীনের বাড়িতে চুরি করবার আগে তদারক করতে। রান্নাঘরের পাশে এসে ঘুমন্ত আলিশারের গায়ে ভাল পোশাক দেখে সে তার ওস্তাদি হাতে ধীরে ধীরে তার মাথার পাগড়ী গায়ের আচকান খুলে নিয়ে পরলে, তারপর সেখান থেকে সরে পড়বার আয়োজন করছে এমন সময় খুট করে একটা আওয়াজ তার কানে গেল। ব্যাপারটা হচ্ছে—জুমুরুদ যখন দেখলে রসুই ঘরের বাঁদীরা নিজেদের কাজকর্ম সেরে খেয়েদেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অথচ আলিশার এসে শিস দিচ্ছে না, তখন সে আর থাকতে না পেরে জানালা খুলে নিজেই একবার দেখতে গেল, আঁধারে কিছু বুঝতে না পেরে নিজেই ছোট্ট করে একটা শিস দিলে। সেয়ানা চোর বুঝলে এর মাঝে কোন ব্যাপার আছে, ভাল করে বুঝবার জন্যে সেও একটা শিস দিলে। আলিশার এসেছে মনে করে জুমুরুদ দড়ির সাহায্যে খোলা জানালা দিয়ে নিচে নেমে পড়ল। চোর একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে জানালা দিয়ে নামতে দেখে তখনই তাকে কাঁধে করে ছুটতে থাকল। চোর আলিশারের পাগড়ী আর আচকান

পরেছিল বলে আঁধারে জুমুরুদ প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি, কোন সন্দেহও করেনি—কিন্তু একটু পরেই তার ছোটার রকম দেখে সন্দেহ হল। জুমুরুদ তখন বলে উঠল—ওগো, বুড়ী যে বললে আমার জন্যে ভেবে ভেবে না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি এত দুর্বল হয়েছ যে, উঠতে পার না, তা হলে এমন ঘোড়ার মত ছুটছ কি করে! —শুনে চোর কোন কথা না বলে আরও জোরে ছুটতে শুরু করলে। জুমুরুদ তখন তার একটা হাত বাড়িয়ে লোকটার মুখে হাত বুলিয়ে দেখলে হামামের খ্যাংরার চেয়েও কড়া দাড়ি এর মুখে! তখনই ভয়ে রাগে উত্তেজনায় লোকটার মুখে দুই ঘুসি লাগিয়ে দিয়ে বলে উঠল—কে – কে তুমি, শীগগির বলো। তারা তখন লোকালয় ছেড়ে খোলা মাঠে নির্জনতার মাঝে এসে পড়েছে।

চোর অমনি বলে উঠল—আহা হা হা, ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি জবান, শহরের সব চাইতে বড় চোর, পাকা চোর, চল্লিশ মরদের সর্দার, চলো আমার সঙ্গে—সুখে থাকবে, তোমায় আমার বিবি করে নেব। শুনে জুমুরুদ নিজের বিপদের কথা বুঝে নিজের ভুল স্মরণ করে প্রথমে নিজের কপাল খানিকটা চাপড়ে নিল, তারপর মনে মনে বুঝল—এখন তার নসিব মন্দর দিকে চলেছে, কোন চেষ্টা করে ফয়দা নেই—আল্লা যা করেন—আল্লাই বল, আল্লাই ভরসা। দুনিয়ার সব আদমিই নিজের নসিব সঙ্গে করে নিয়ে আসে, এর রদবদল করবার ক্ষমতা আর কারো নেই।

দুর্দান্ত চোরের সর্দার জবান জুমুরুদকে কাঁধে করে দৌড়াতে দৌড়তে অনেকগুলি পাহাড়ের মাঝে একটা লুকানো গুহায় নিয়ে এল। এখানে কি একটা সঙ্কেত করতেই এর মাঝ থেকে এক বুড়ী বেরিয়ে এল। বুড়ী জবানের মা, গুহাতে থেকে চোরাই মাল পাহারা দেয়, এবং তার ছেলে আর চল্লিশ চোরকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায়। জবান জুমুরুদকে গুহায় রেখে তার মাকে বললে—একে একটু ভাল করে পাহারা দিও—একে আমি আমার বিবি করে নেব। আমি এখন চললাম, আজ রাত্রে আর ফিরব না, দলবল নিয়ে

একটা বড় রকমের ব্যাপারে চলেছি,—ফিরব একেবারে কাল দুপুরে। নজর রেখ—ও যেন না পালায়।

জবান চলে গেলে বুড়ী জুমুরুদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—বেটী, তুই এখানে খুব সুখেই থাকবি,—আমার বেটা জবান যেমন জোয়ান মরদ, তেমনি তার রূপ—চল্লিশ পাকা চোরের সর্দার সে—এই দেখ গুহার চারিধারে কত ধনরত্ন, পোশাক—আরও কত কিছু সে চুরি করে এনেছে!

জুমুরুদ এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে ওড়নায় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না তার চোখে। শুয়ে শুয়ে সে কেবল ভাবতে লাগল। ভাবল, কোন কিছু না করে একেবারে চুপ করে বসে থেকে এই বদখত চোরের কাছে ইজ্জত খোয়ানোর কোন মানে হয় না—উপায় একটা ভেবে বের করতেই হবে। চেষ্টা করে দেখা যাক—তারপর আল্লা যা করেন। উপায় একটা ভেবে বের করলেও সে।

ভোর হলে যখন বাইরে রোদ্দুর উঠল তখন সে উঠে বুড়ীর হাতে চুমু দিয়ে বললে—চাচী, তোমার বেটার ত আসতে দেরি আছে, চলো আমরা একটু বাইরে যাই, বাইরে বেশ রোদ্দুর উঠেছে। তোমার মাথাটা একেবারে বাবুইয়ের বাসা হয়ে আছে, উকুন কিলবিল করছে। চলো, বাইরে গিয়ে বসে তোমার উকুন বেছে দি, মাথা আঁচড়ে চুল পাট করে দি। শুনে বুড়ী জবর খুশী হয়ে জুমুরুদের হাত ধরে বললে—ঠিক বলেছিস রে বেটী, বড় ভাল করছিস, এই গুহায় আসা ইস্তক আমার মাথা ধোয়া হয়নি, চিরুনি পড়েনি এতে—কত যে নিব্বংশের বেটারা বাসা বেঁধেছে এতে তার লেখাজোখা নেই, আর শুধু কি এক রকম, কেউ বা ছোট, কেউ বা বড়, কেউ বা সাদা, কেউ বা কালো, কারো লম্বা লেজ—পিছন দিকে হাঁটে—সারা রাত্তির ওরা আমার গায়ে ঘোড়দৌড় করে—আর কি ওদের দুর্গন্ধ।—চল বেটী, চল—বাইরে চল—আমার ভাল করে উকুন বেছে দে, মাথা আঁচড়ে দে।

এই বলে বুড়ী তখনই একটা চিরুনি নিয়ে জুমুরুদের হাত ধরে এসে বাইরে রোদ্দুরে আরাম করে বসল। জুমুরুদ উকুন বাছতে বসে দেখলে বুড়ী যা বলেছে, মাথায় যে তার কত রকমের উকুনের বাসা—আর সংখ্যা যে তাদের কত তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়! জুমুরুদ চুলের গোড়া অবধি চিরুনি চালিয়ে প্রথমে মুঠো করে দূরে ছুড়ে ফেলতে লাগল, তারপর যখন উকুনের সংখ্যা ক্রমে কমে এল—তখন আঙুলে ধরে টিপে মারতে লাগাল, সঙ্গে সঙ্গে সে এত ধীরে ধীরে আরাম দিয়ে বুড়ীর চুল আঁচড়ে দিতে লাগল যে বুড়ী অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়ল।

আর এক লহমা সময় নষ্ট না করে জুমুরুদ তখনই গুহার মাঝে ঢুকে সেখান থেকে চুরি করা একটা পুরুষের পোশাক পরে, একটা দামী পাগড়ী মাথায় দিয়ে—বাইরে চোরদেরই একটা ভাল ঘোড়া চরছিল—তাতে জিন লাগাম এঁটে, চড়ে আল্লার নাম স্মরণ করে সেখান থেকে পালাল। সারাদিন সে একটুও না থেমে ঘোড়া ছুটাল। রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন ভোরেই আবার ঘোড়ার পিঠে, পথে খাবার যোগ্য কিছু ফলমুল পেলে শুধু খেয়ে নেওয়া, এবং ঘোড়াকে চরিয়ে নেওয়া, তা ছাড়া থামা নেই। এমনি করে চলে দশদিন দশ রাত্রির পর মরুভূমি পার হয়ে সে এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হল যেখানে চোখ-জুড়ানো সবুজ তৃণ, সবুজ গাছপালা ফলফুলের বাগান, তাতে সব রঙ-বেরঙের পাখী গান গাইছে, দলে দলে হরিণ, গরু, মেষ করছে। যেন চির বসন্ত বাস করছে এখানে! জানটা বাঁচল জুমুরুদের। এখানে এসেও ঘোড়া থেকে না নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সে সুন্দর রাস্তা ধরে। রাস্তার দু-পাশে ঝোপঝাড় আছে বটে—কিন্তু তাজা টাটকা—সবুজ তাদের ডাল-পাতার রঙ। আর একটু এগুলেই একটা শহরের মিনার চোখে পড়ল তার—সূর্যকিরণে ঝলমল করছে।

শহরের পাঁচিল আর সদর দরজার কাছাকাছি যেতেই সে বহু লোকের বিপুল হর্ষধ্বনি শুনতে পেল। এখানকার কোন একটা

উৎসব হবে হয়ত মনে করে সে আর একটু এগুতেই দেখে এখানকার আমীর ওমরাহ সৈন্যাধ্যক্ষেরা এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারা জুমুরুদের একেবারে সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে তার সামনের মাটি চুম্বন করে তাকে সম্মান দেখালে—ঠিক যেমনি করে দেশের সুলতানকে তাঁর কর্মচারী এবং প্রজারা সম্মান দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পেছন থেকে অসংখ্য লোক সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল—আমাদের নতুন সুলতানের জয় হোক, তাঁর রাজত্ব সুখের হোক, আল্লা দীর্ঘজীবী করুন আমাদের সুলতানকে। সঙ্গে সঙ্গে জুমুরুদের যাবার পথের দু-ধারে সৈন্যেরা সব দু'সারি করে দাঁড়িয়ে গেল।

জুমুরুদ ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে যে কয়েকজন ওমরাহ তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলে—জনাব, আপনাদের শহরে এ কি ব্যাপার হচ্ছে—আমাকে নিয়ে আপনারা কি করতে চান? তারা উত্তর করলে—মালেক, আমাদের উপর খোদার অশেষ দোয়া যে তিনি আপনার মত একজনকে, মহান তুর্কীবংশের এমন একজন সুসন্তানকে, এমন প্রিয়দর্শন একজন তরুণকে—আমাদের সিংহাসনে বসাতে নিজে হাতে এমনি করে পৌঁছে দিলেন। ধন্য হোক তাঁর নাম। এ না করে তিনি যদি আজ কোনো ভিক্ষুককে, কোনো হীনবংশের সামান্য লোককেও আমাদের সামনে পাঠিয়ে দিতেন, তা হলে তাঁকেই আজ আমাদের এমনি করে সম্মান দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসাতে হতো। আমাদের দেশের চিরকালের এই নিয়ম যে সুলতান যদি অপুত্রক মারা যান—তা হলে ভোরে শহরের দরজা খুলে বড় রাস্তায় বেরিয়েই আমরা প্রথমেই যাকে দেখতে পাব তাকেই নিয়ে গিয়ে রাজ্যের তকতে বসাতে হবে। আমাদের নসিব ভাল যে মেহেরবান খোদা আপনার মত উচ্চবংশের সুযোগ্য এক তরুণকে আমাদের সুলতান করে পাঠিয়েছেন।

বুদ্ধিমতী জুমুরুদ ওঁদের এ সব অদ্ভুত কথা শুনে কিছুমাত্র না ঘাবড়ে নিজের ঠাট বজায় রাখতে বিশেষ ডাঁটের সঙ্গে বললে—

ঠিক আছে, আপনারাও জেনে রাখুন—আমি তুরস্কের যা-তা ঘরের ছেলে নই—ওখানকার বিশেষ নাম করা বংশের বেটা আমি, বাড়ির লোকের সঙ্গে রাগারাগি করে দেশে দেশে ঘুরতে বেরিয়েছি। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে আর এক তাজ্জব অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে আমার! আপনারা আমায় আপনাদের সুলতান করতে যাচ্ছেন। এতে রাজী আছি আমি।

জুমুরুদ তখন ওখানকার লোকের বিপুল জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে আমীর ওমরাহদের সঙ্গে মিছিলের আগে আগে চলে সুলতান প্রাসাদের সামনে এসে হাজির হল। আমীর ওমরাহরা তখন তাকে সসম্ভ্রমে ঘোড়া থেকে নামিয়ে হাত ধরে দরবার কামরায় নিয়ে এল, —তারপর তাকে সুলতানের পোশাক পরিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে সুলতানের সিংহাসনে বসিয়ে নিজেদের আনুগত্যের বচন আউড়ে তার দুই হাতের সামনের মাটি চুম্বন করল।

সিংহাসনে বসে জুমুরুদের প্রথম কাজই হল রাজকোষ মুক্ত করা। রাজকোষে বহু অর্থ জমা হয়েছিল। জুমুরুদ দরাজ হাতে তা থেকে সৈন্য আর দেশের গরিবদের দান করতে লাগল। তাতে সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। তার জন্যে আল্লার দোওয়া মাঙতে লাগল। জুমুরুদ শুধু সৈন্য আর গরিবদেরই দান করলে না, আমীর ওমরাহ উজির ইত্যাদিকে সে খিলাত বকশিশ দিয়ে, হারেমের বিবিদের দিলে নানা অলংকার আর দামী জামা। এ ছাড়া সে শহর এবং পল্লী অঞ্চলের অনেক শুল্ক তুলে দিলে, বন্দীদের কারাগার থেকে মুক্তি দিলে, রাজ্যে যত গলদ ছিল সংশোধন করলে। এমনি করে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশের ছোট বড় সবার চিত্তই জয় করলে সে। এ ছাড়া আরও আছে—রাজ্যের সবাই তাকে পুরুষ বলেই জানে—অথচ সে হারেমে কোন বিবির ঘরে যায় না, ওদিকে তার কোন ঝোঁক নেই—এতে সবাই তার সংযম দেখে, সততা দেখে বিস্মিত হয়ে তারিফ করতে লাগল। রাত্রে

তার শোবার ঘরের দরজায় দুইজন অল্প বয়স্ক খোজা শুধু শুয়ে থাকে—ব্যস।

পুরুষবেশী জুমুরুদকে সুলতান পেয়ে রাজ্যের সকল লোকই খুশী বটে—কিন্তু তার নিজের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। সে দিনরাত আলিশারের কথা ভাবে, রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভিজায়। অপরের অজান্তে অনেক খোঁজ সে তার করেছে, —পাত্তা মেলে নি। এমনি করে এক বছর কেটে গেল, হারেমের বেগম বিবিরা তার দেখা না পেয়ে নিজেদের মাঝে বলাবলি করে—দুনিয়ায় এমন সুলতান ত কেউ কোনদিন দেখে নি।

এদিকে পুরো একটি বছর মনের গভীর দুঃখে কাটাবার পর জুমুরুদের মনে হঠাৎ একটা ফন্দি এল। সে তার উজির আমীর ওমরাহদের ডেকে বেশ অনেকখানি জায়গা দেখিয়ে বললে, এই জায়গাটা সমান করে এখানে এমন একটা পটমণ্ডপ তৈরি করাতে চাই আমি যার মাঝে আমার সব উজির আমীর-ওমরাহ এবং শহরের অন্যান্য মন্যিগণ্যি সব লোক বসতে পারেন। গোটা মণ্ডপটায় দামী গালিচা পেতে দিতে হবে—মাঝখানে থাকবে আমার জন্য একটা সিংহাসন—তার আশেপাশে আর সবার মর্যাদা অনুযায়ী সব বসবার আসন। মজুর মিস্ত্রী ওস্তাদ ডেকে আজ থেকেই আপনারা এ তৈরির ব্যবস্থা করুন।

সুলতানের ইচ্ছামত কাজ সেই দিনই শুরু হয়ে গেল। কিছু দিনের মধ্যেই পটমণ্ডপ তৈরি এবং জুমুরুদের নির্দেশ মত সাজানো হয়ে গেল। জুমুরুদ তখন তার উজির আমীর ওমরাহদের নিয়ে ঐ মণ্ডপে বসে এমন খানাপিনা করলে যা আগের সুলতানের আমলে কেউ কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। খানাপিনার শেষে জুমুরুদ তার আমীর ওমরাহদের বললে—প্রতি মাসের প্রথম দিনে আপনাদের সবার এখানে নিমন্ত্রণ রইল, শুধু তাই নয় ঐ দিনে শহরের সকল লোকের এমন কি বাইরের যে এখানে হঠাৎ এসে পড়েছে তারও থাকবে নিমন্ত্রণ, তারা সব মণ্ডপের বাইরে ঐ খোলা

জায়গায় বসে একসঙ্গে খাবে। ঢেঁড়া পিটিয়ে শহরে একথা প্রচার করে দিন—ঢেঁড়াদার যেন সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঘোষণা করে দেয় যে—যে আমার এ ভোজে যোগদান করতে না চায় তার গর্দানও নেওয়া হবে।

পরের মাসের প্রথম দিনের ভোরেই ঢেঁড়াদার ঢেঁড়া পিটিয়ে শহরে উঁচু গলায় বলে এল—দোকানদার, খরিদ্দার, ধনী-নির্ধন সবাই যে যেখানে আছ শোন : সুলতান তাঁর পটমণ্ডপে তোমাদের সবাইকে খানাপিনার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন—সবাই আসবে, আল্লার জয়ধ্বনি দিয়ে খাবে—যে না আসবে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

সুলতানের নিমন্ত্রণ, খানাপিনা ভালই হবে ভেবে দলে দলে লোক গিয়ে মণ্ডপের চারিধারে ভিড় করে বসল—মণ্ডপের মাঝে উজির, আমীর ওমরাহ সব নিজের নিজের মর্যাদা অনুযায়ী সুলতানের চারিদিকের আসনে বসলেন।

খানাপিনা শুরু হয়ে গেল। নানান ভাল ভাল সব খাবার—ভেড়ার কোর্মা, পোলাও, সুস্বাদু কাবাব। মণ্ডপের বাইরে সাধারণ লোকেরা খাবারের উপরে যেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মণ্ডপের বাইরের লোকেরা খেতে শুরু করলে জুমুরুদ একটির পর একটি করে তাদের প্রত্যেকের দিকে বেশ ভাল করে চেয়ে দেখতে লাগল। প্রত্যেকেই তার পাশের লোককে বলে—সুলতান আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছেন কেন বলত। এদিকে আমীর ওমরাহরা উপর থেকে তাদের বলতে থাকেন—খাও, ফুর্তিসে খাও, পেট ভরে খাও, তোমরা যে যত বেশি খেতে পারবে সুলতান তার উপর তত বেশি খুশী হবেন।

শুনে লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—আল্লার কসম নিয়ে বলছি, এমন সুলতান আমরা কোনদিন চোখে দেখিনি—প্রজাদের কি ভালোটাই ইনি বাসেন!

এদের ভেতর যারা বেশি পেটুক, তারা দেখতে না দেখতে প্লেটের পর প্লেট সাবাড় করে দিচ্ছিল, আর এদের সবাইকে

হার মানিয়ে দিচ্ছিল যে, তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছিল, বড় পেটুক—সে হচ্ছে সেই বদখদ খৃস্টান বারসুম—যে আলিশারকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে জুমুরুদকে রসিদলদ্দীনের জন্মে চুরি করেছিল। কাছেপিঠে যেসব ভাল খাবার ছিল সেগুলি শেষ করে সে যখন দেখল তার নাগালের বাইরে এক প্লেট সরের সঙ্গে চিনি আর দারচিনির গুঁড়ো মাখানো ঘি ভাত রয়েছে তখন তার ছ'পাশের সামনের লোকগুলিকে হাত দিয়ে কনুই দিয়ে ঠেলে সেটা টেনে নিয়ে এসে গপাগপ গলাধঃকরণ করতে লাগল।

তাই দেখে পাশের এক ভদ্র মুসলমান তাকে বলে উঠল, সবাইকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে অমন একটি খাবারের প্লেট আপনি একাই সাবাড় করে দিলেন—লজ্জা করল না একটু। নিজের সামনে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়াই যে ভদ্রসমাজের রীতি একথা আপনার জানা নেই নাকি? বারসুমের পাশেই একজন রগুড়ে ভাংখোর বসে ছিল, সে মৃদু হেসে বলে উঠল—ভাইসাহেব, একটু রয়ে-সয়ে আমাদের ছুই এক গ্রাস খেতে দিন। বারসুম বেশ ঘৃণার সঙ্গে তার দিকে মুখ বাড়িয়ে বললে, এ জিনিস তোমাদের জন্য নয় হে,—পেটে সইবে না—বলে হাত বাড়িয়ে নিতে গেল। জুমুরুদ তাকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল,—এবার আর চিনতে বাকী রইল না। সে তখনই তার চারজন প্রহরীকে হুকুম করলে, তোরা যা ত, ঐ যে লোকটা চিনি সরমাখা ঘি-ভাত খাচ্ছে—ওকে এক্ষুণি আমার কাছে ধরে নিয়ে আয়। প্রহরীরা তখনই বারসুমের উপর লাফিয়ে তার হাত থেকে মুখের গ্রাস ছুড়ে ফেলে দিলে—তাকে মাটির উপর উপুড় করে ফেলে পা ধরে টেনে আনতে লাগল তাদের সুলতানের সামনে। আর আর লোকেরা খাওয়া বন্ধ করে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ব্যাপার কি দেখবার জন্য—কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—ভাল জিনিস অপর সকলকে বঞ্চিত করে পেটুকের মত গপ্ গপ্ করে নিজে গিলবার কি ফল হয় তাই একবার দেখো। ভাংখোর তার পাশের লোককে বললে, আল্লা বাঁচিয়েছেন—আমিও ও জিনিসটা

একটু খেতে চেয়েছিলাম ওর কাছে—ভাগ্যিস্ ও দিতে রাজী হয়নি।

প্রহরীরা বারসুমকে এনে জুমুরুদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। জুমুরুদের চোখ তখন রাগে জ্বলছিল, অন্তর টগবগ করে ফুটছিল—কোনরকমে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বারসুমের দিকে চেয়ে বললে—তোমার নাম কি, পেশা কি—আর আমাদের এদেশে আসারই বা তোমার উদ্দেশ্য কি? বারসুম নিজেকে মুসলমান প্রতিপন্ন করবার জন্যে তাদেরই মত সাদা পাগড়ী পরে এসছিল—হাতজোড় করে বললে—হুজুর, নাম আমার আলি—ফিতে তৈরি করা আমার পেশা—হাতের কাজ করে কিছু রুজি-রোজগারের জন্যে আমার এখানে আসা।

জুমুরুদ তার এক বাচ্চা খোজা বান্দাকে বললে, ওরে তুই একবার দৌড়ে আমার গণনার চৌকি, বালু আর তামার কলমটা নিয়ে আয় ত।

বাচ্চা বান্দাটা তার হুকুম মত সব জিনিস এনে দিলে জুমুরুদ চৌকির উপর বালু বিছিয়ে তামার কলম দিয়ে তার উপর একটা বানরের ছবি আঁকলে তারপর অপরের অজানা হরফে কি সব লিখে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল এরপর হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে সবাই শুনতে পায় এমন জোর গলায় বলে উঠলে—তবে রে কুত্তা—তোমার এত বড় বুকের পাটা যে সুলতানের কাছে মিছে কথা বলার সাহস করো তুমি?— ঠিক করে বলো ত তুমি একজন খৃষ্টান কিনা, তোমার নাম বারসুম কিনা, তুমি একজনের বাঁদী চুরি করেছিলে,—সে পালিয়েছে, তার খোঁজে তুমি এদেশে এসেছ কি না? ওস্তাদের কাছে শেখা বালুর গণনায় আমি এই পাচ্ছি, আর আমার এ গণনা কখনও মিথ্যা হয় নি, হতে পারে না।

এই শুনে বারসুম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে জুমুরুদকে বললে, জাহাঁপনা—আপনার গণনা বিলকুল ঠিক, আমার যে কসুর হয়েছে তার জন্য মাফ চাইছি আমি।

ব্যাপার দেখে সকল লোকের একেবারে তাক লেগে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আমাদের সুলতান কি ওস্তাদ গণৎকার রে, দুনিয়ার কোন সুলতান এমন গণনা করতে পারেন, আমাদের বাপ ঠাকুরদা কোনদিন শোনেন নি।

এদিকে জুমুরুদ তখন জহ্লাদ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গকে ডেকে হুকুম দিলে, তোরা এই শয়তান কুত্তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত ওর গায়ের ছাল ছাড়াবি—এই ছালটার মাঝে পুরনো পাতা খড়কুটো পুরে শহরে ঢুকবার দরজার কাছে ঝুলিয়ে রাখবি, তারপর ওর ছালছাড়ানো দেহটা ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই নর্দমায় ফেলে দিবি। জহ্লাদ আর তার লোকজন তখনই বারসুমকে সুলতানের হুকুম মত শাস্তি দিতে শহরের বাইরে নিয়ে গেল, পটমণ্ডপ এবং তার আশেপাশের লোকেরা সব বলাবলি করতে লাগল—সুলতান এ বিচার ঠিকই করেছেন, লোকটা যেমন পাজী, ওর এই শাস্তিই পাওয়া উচিত।

বারসুমের কাছাকাছি যারা খেতে বসেছিল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আল্লাই বাঁচিয়েছেন,—ভাগ্যিস আমরা চিনি সর মাখা ঘিভাত খেতে যাইনি, যতদিন বেঁচে থাকব আমরা ততদিন আর ঐ খাবারের নাম করছিনে। একজন বললে—জিনিসটি আমি বড়ই ভালবাসতাম গো, কিন্তু আর কোন দিন খেতে সাহস হবে না আমার।

পরের মাসের প্রথম দিনে মণ্ডপে এবং তার আশপাশে আবার ভোজের আয়োজন হল। মস্তবড় একটা পরাতে চিনি সর মাখা ঘিভাত রাখা হল, কিন্তু ভয়ে তার কাছে আর কেউ এগুলো না, —সবাই বসলে তা থেকে দূরে দূরে ; সুলতানকে খুশী করতে সবাই অন্যান্য যার যতটা ইচ্ছা খেতে লাগল, নিজের সামনের প্লেট ছাড়া অন্য কোন প্লেটের দিকে কারো দৃষ্টি নেই, জুমুরুদ বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েই সবার খাওয়া দেখছে এমন সময় ভয়ংকর দেখতে একটা লোক আর সবাইকে হাত দিয়ে, কনুই দিয়ে ঠেলে—সেই চিনি সর মাখা

ভাতের কাছে গিয়ে হাজির হল। এ আর—কেউ নয়—সেই চোরের সর্দার জবান যে জুমুরুদকে চুরি করে এনে মায়ের জিম্মায় রেখে ফের চুরি করতে বেরিয়েছিল। পর দিন দুপুরে এসে সে যখন দেখল যে জুমুরুদ পালিয়েছে তখন তার ভীষণ রাগ হল, জিদ চেপে গেল—সে যেখান থেকে হোক যেমন করেই হোক ঐ মেয়েটিকে খুঁজে বের করবেই—এর জন্য যদি ককেসাস ডিঙতে হয়,—সে-ওভি আচ্ছা। সে সেইদিনই তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে—এ দেশ ওদেশ খুঁজে শেষে এইখানে এসে পড়েছে।

জবান চিনি সর মাখা ভাতের সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসে তখনই ভাতের মাঝে হাত ঢুকাল। চারদিকে অমনি লোকেরা সব—রা রা, করে উঠল ঃ আরে কর কি, করছ কি—এখনই যে তোমার জ্যান্ত ছাল ছাড়ানো হবে। চুপ রও সব—লোকগুলির দিকে কটমট করে চেয়ে বলে উঠল জবান—বাজে কথা বলো না, এ ভাত খেতে আমি বড্ড ভালবাসি। ভাংখোর লোকটির নেশার ঘোর তখন আর ছিল না, সে আত্মরক্ষার জন্যে ঐ লোকটার কাছ থেকে আরও খানিকটা দূরে সরে বসল, মানে বলতে চায়—এসব গোলমেলে ব্যাপারের মাঝে সে নেই।

জবান তার মস্ত বড় হাতটা সর মাখানো ভাতের মধ্যে দিয়ে রাশীকৃত তুলে গপ্ গপ্ করে গিলতে লাগল, আর সে গেলার আওয়াজই বা কি, সবাই দেখতে পাচ্ছে যে থালা সে প্রায় সাবাড় করে ফেললে। তার আশেপাশের নানা জনে ভয় পেয়ে তার সম্বন্ধে নানা কথা বলছে— জবান তাতে কিছুমাত্র কান না দিয়ে মহা ঔদরিকের মত খেয়েই চলেছে।

জুমুরুদ অনেকক্ষণ ধরে তার খাওয়া লক্ষ্য করছিল, জবান যখন শেষবার ঐ থালা থেকে সর চিনি মাখা ভাত তুলতে যাচ্ছে তখন সে তার চারজন প্রহরীকে হুকুম দিলে তোরা গিয়ে ঐ খাবার মুখে দেবার আগেই ওকে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে।

প্রহরীরা তখনই ছুটে গিয়ে জবানকে ধরে দ্রুত ওস্তাদি হাতে

তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাদের সুলতানের সামনে নিয়ে হাজির করল। আর সবাই দেখে বলাবলি করতে লাগল—এখন ঠেলা বোঝ—আগে কত আমরা বারণ করলাম,—গ্রাহ্যই নেই।

এদিকে জবানকে সামনে পেয়ে জুমুরুদ তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম তোমার, কি পেশা—কি কাজেই বা তুমি আমাদের এ দেশে এসেছ?

আমার নাম উঠমান—মালীর কাজ করি আমি, কাজের খোঁজেই আমি এ দেশে এসেছি।

জুমুরুদ তখনই একটা খোজা বান্দাকে হুকুম দিলে, ওরে, আমার গণনার চৌকি বালু আর তামার কলমটা নিয়ে আয় ত।

বান্দা তখনই গণনার সরঞ্জাম এনে দিলে জুমুরুদ আগের মত চৌকির উপর বালু ছড়িয়ে, ছবি এঁকে গণনার ভান করে বললে, মিথ্যাবাদী জোচ্চোর—মিছে কথার জায়গা পেলে না! আমি গণনা করে পেলাম—তোমার নান জবান, পেশা তোমার চুরি-ডাকাতি, খুন। সত্যি করে বলো ঠিক কিনা?—মিথ্যে বললে এখনই শপাং শপাং করে চাবুকের ঘা পড়বে পিঠে।

জবান অবশ্য স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে মেয়েটিকে সে চুরি করেছিল সেই তার সামনে সিংহাসনে বসে সুলতান; তাই তার গণনায় সত্য বেরিয়ে পড়ল দেখে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁত খটখট করতে করতে বললে—জাহাঁপনা, আপনার গণনায় ঠিকই ধরেছেন আপনি, আমি আপনার সামনে নিজের এই নাক কান মলে খোদার কসম নিয়ে বলছি, আজ থেকে ও পাপ আর আমি করব না—ঠিক পথে চলব।

শুনে জুমুরুদ হুঙ্কার দিয়ে উঠল—ও সব কথায় চলবে না—মুসলমানদের রাজ্যে অসৎ কাজ করে কেউ রেহাই পায় না। ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস—একে শহরের বাইরে নিয়ে—গায়ের ছাল ছাড়িয়ে, তাতে পচা খড়পুরে দরজার সামনে টাঙিয়ে দে, তারপর আগেকার খৃষ্টানের যা করেছিলি একেও তাই করে আয়।

সুলতানের লোকেরা যখন জবানকে শহরের বাইরে নিয়ে চললো তখন ভাংখোর নিজের মনে বলে উঠল—আল্লা রক্ষা করুন—ঐ সর-মাখানো খাবারের দিকে আর কোন দিন চেয়ে দেখব না আমি,—ওর দিকে পিছন ফিরে থাকব, ওতে থুথু দেব।

পরের মাসের প্রথম দিনে সুলতানের মণ্ডপের ওখানে আবার শহরের লোক জমা হল। সুলতানের নিমন্ত্রণে খানা খাবে তারা, সবাই চিনিসর-মাখা ভাতের থালাটা থেকে দূরে সরে বসল। খাওয়া শুরু হয়ে গেছে সবার—এমন সময় ধবধবে সাদা দাড়ি-ওয়ালা এক বুড়ো—না এলে, না খেলে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে—এই ভয়ে আর সবাইয়ের পাশ দিয়ে এসে সর-মাখানো ভাতের থালার পাশে যে খালি জায়গাটা ছিল—সেখানে বসলে। দেখে চিনে ফেললে তাকে জুমুরুদঃ এই বুড়ো—খৃষ্টান রসিদলদ্দীন, যে তাকে নীলামে কিনতে না পেরে ভাই বারসুমকে দিয়ে তাকে চুরি করবার ব্যবস্থা করেছিল।

রসিদলদ্দীন—তার ভাই বারসুমকে নিখোঁজ বাঁদীর খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে এক মাস অপেক্ষা করবার পরও যখন দেখলে ভাই ফিরে এল না—তখন কপাল ভাবনা করে নিজেই সে বেরিয়ে পড়ল জুমুরুদের খোঁজে। নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে নসিবের ফেরে সে এখানে এসে পড়েছে।

রসিদলদ্দীন চিনিমাখা ভাত সামনে পেয়ে যেই ভাত খেতে শুরু করেছে অমনি জুমুরুদ তার প্রহরীদের হুকুম দিলে—দৌড়ে গিয়ে তোরা ধরে নিয়ে আয় ঐ বুড়োটাকে যে ঐ চিনিসর-মাখা ঘি ভাত খাচ্ছে। প্রহরীরা তখনই বুড়ো রসিদলদ্দীনের দাড়ি ধরে টেনে নিয়ে এসে তাদের সুলতানের সামনে হাজির করল। জুমুরুদ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি, পেশা কি—এখানেই বা এসেছ কেন তুমি?

বুড়ো উত্তর দিলে—জাহাঁপনা, নাম আমার রস্তম—ভিক্ষাই আমার পেশা বলতে পারেন—আমি দরবেশ।

ওঃ তাই বুঝি!—আচ্ছা দেখছি আমি—বলে জুমুরুদ তখনই তার এক বাচ্চা বান্দাকে হুকুম দিলে—যা দৌড়ে গিয়ে আমার গণনার সরঞ্জাম নিয়ে আয় ত।

বান্দা ছুটে গিয়ে সেই চৌকি, বালু আর তামার কলমটা নিয়ে এল। জুমুরুদ তখন সেই চৌকির উপর বালু বিছিয়ে কলম দিয়ে ছবি এঁকে অঙ্ক লিখে তার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে শেষে মুখ তুলে বুড়োর দিকে কটমট করে চেয়ে বললে—মিথ্যা কথা বলেছ তুমি, বুড়ো সয়তান,—আমার গণনায় পাচ্ছি, তোমার নাম রসিদলদ্দীন, মুসলিম মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে তাদের নিজের ঘরে আটকে রাখাই তোমার কাজ। বাইরে তুমি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দাও,—কিন্তু আসলে তুমি একজন মহাপাপী খৃষ্টান। এই সত্য কথা স্বীকার কর, নইলে খড়্গাঘাতে এখনই তোমার মাথাটা তোমার পায়ের কাছে পড়ছে। নিজের মাথা বাঁচাতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রসিদ তখনই স্বীকার করল তার অপরাধ। জুমুরুদ তখন তার বান্দাদের হুকুম দিলে—তোরা এখনই ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলে ওর দুই পায়ের নীচে এক হাজার করে লাঠির ঘা লাগা, তারপর ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত ওর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে তাতে পচা খড় পুরে দরজার সামনে ঝুলিয়ে রাখ, তারপর এর আগে আর দুই সয়তানের যা করেছিস—তাই কর।

প্রহরীরা তাদের সুলতানের নির্দেশ মত রসিদলদ্দীনকে শাস্তি দিতে নিয়ে গেলে নিমন্ত্রিত লোকজন সুলতানের জ্ঞানবুদ্ধি সুবিচারের তারিফ করতে করতে আবার খানাপিনা শুরু করল।

এ মাসের ভোজের পর্ব শেষ করে জুমুরুদ প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তার কামরার দরজা বন্ধ করলে। মনে সুখ নেই তার। খোদাতালা তার একটা মনস্কামনা শুধু পূর্ণ করেছেন: প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সে, কিন্তু তার আলিকে সে ত এখনও ফিরে পায় নি! মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে সে: আল্লা সর্বশক্তিমান,

তাঁর দোয়া মাঙলে, তাঁর শরণ নিলে একদিন হয়ত তিনি তার এ বাঞ্ছাও পূর্ণ করবেন। আলিশারের কথা মনে হতেই তার দুই চোখ জলে ভরে এল। সে রাত এক রকম কেঁদেই কাটাল।

চতুর্থ মাসের প্রথম দিনে আবার ঐ রকম ভোজের আয়োজন করে জুমুরুদ তার উজির আমীর ওমরাহদের নিয়ে বসে একান্ত মনে একটা প্রার্থনা জানালে সর্বনিয়ন্তা খোদাতালার কাছেঃ হে সর্বশক্তিমান খোদা, তুমিই ত জোসেফকে তার বুড়ো বাপের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে পুণ্যাত্মা জবের হৃদয়ক্ষত নিরাময় করেছিলে—দিন দুনিয়ার মালেক, তুমিই ত বিপথগামীকে সুপথে ফিরিয়ে আন, আর্তের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দাও তুমি,—মেহেরবান,—তুমি তোমার এ দুঃখিনী বাঁদীকে দোয়া করঃ তার আলিকে ফিরিয়ে দাও।

জুমুরুদ এই প্রার্থনা করতে না করতে দেখা গেল এক অপরূপ সুন্দর তরুণ প্রবেশ করছে মণ্ডপের চত্বরে—কোমর যেন বাতাসে দোলানো—উইলো শাখা—রুক্ষ কেশ মলিন বেশ, দেখেই মনে হয় পথশ্রমে বিশেষ ক্লান্ত। তরুণ অন্য কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে চিনিসর-মাখানো খাবারের পাশে যে ফাঁকা জায়গা ছিল, সেইখানে এসে বসে পড়ল। দেখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে।

জুমুরুদ কিন্তু তাকে দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছে। একটা বিপুল আনন্দের চীৎকার বেরিয়ে আসছিল তার কণ্ঠ দিয়ে, অতি কষ্টে সে সেটা চাপলে, ভাবলে এত লোকের সামনে নিজের মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতে দেওয়া কিছুতেই ঠিক নয়, তাই চেষ্টা করে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সে আলিশারকে কাছে ডেকে আনবার হুকুম দিলে না।

এবার আলিশারের কথা কিছুটা বলে নেওয়া যাক :

আলিশার ঐ যে সেই দেয়ালের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল, উঠল গিয়ে সেই একেবারে ভোরের আলো যখন তার চোখে এসে লাগল।

এ আল্লা—এ আমি কোথায়, আমি একেবারে রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!—হঠাৎ কপালে হাত পড়তে দেখে তার পাগড়ি নেই, এ আল্লা, আচকানও যে নেই! ঘুমের ঘোর পুরো কাটলে তার মনে পড়ল আসল ব্যাপার। ঘুমন্ত অবস্থায় তার পাগড়ি আর আচকান চুরি গিয়েছে, যাক,—কিন্তু যে জন্যে তার এখানে আসা, তা বুঝি সব ব্যর্থ হয়ে গেল! সে তখনই দুরু দুরু বুকে ছুটে বুড়ীর কাছে গিয়ে সব কথা তাকে খুলে বলে কাঁদো কাঁদো মুখে তার হাত ধরে বললে—চাচী, তুমি এখনই একবার ও বাড়িতে গিয়ে তার খবরটা এনে দাও। বুড়ী রসিদলদ্দীনের বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ একেবারে আঁধার।

বেটা, জুমুরুদ আর ও বাড়িতে নেই—কোথায় গেল তা কেউই বলতে পারলে না—তুমি তার আশা ছেড়ে দাও, দোষ তোমারই, কি আর বলব? এখন আল্লার শরণ নাও—তিনি যদি কোন উপায় করে দেন!

বুড়ীর মুখে এই কথা শুনে আলিশারের চোখে দিনের আলো নিভে গেল, কাঁদতে কাঁদতে সে বুড়ীর পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বুড়ী অনেক চেষ্টায় তার চৈতন্য ফিরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলে। জুমুরুদকে হারানোর শোক সহ্য করতে না পেরে সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে আপন মায়ের চেয়েও বেশি এই দরদী বুড়ী যদি তার সেবা শুশ্রূষা না করত, তাকে উৎসাহের কথা না শোনাত তা হলে এই অসুখেই তার কবরে যেতে হত। পুরো একটি বছর এই রকম শয্যাশায়ী হয়ে ছিল আলিশার। এই অবস্থায় বুড়ীই তার দেখাশুনা করেছে, তাকে নানা দাওয়াই, জোরালো খাবার—মাংসের ক্বাথ খাইয়েছে, তবু আলিশার বিছানা থেকে উঠতে পারে না। অবশেষে কিছুতেই আর না পেরে বুড়ী তাকে মৃদু ভৎর্সনার সুরে বললে—বেটা, তুই যদি সব সময়ই এমনি শুয়ে থাকিস, একটু গা না তুলিস, মনে বল না আনিস তা হলে কোনদিনই ত তাকে পাবি না। মনে বল এনে একটু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ,—উঠে দেশ

বিদেশের শহরে শহরে একটু তালাস কর—তবে ত। কোন চেষ্টা না করে যে কেবল শুয়ে থেকে চোখের জল ফেলে, আল্লার দোওয়া সে পায় না। এই হক কথা বলে দিলাম তোকে আমি। বুড়ী দিনের পর দিন আলিশারকে এমনি করে স্নেহের সঙ্গে তিরস্কার করতে থাকলে অবশেষে আলিশার একদিন বিছানা ছেড়ে উঠল। বুড়ী তখন তাকে হামামে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে গোসল করিয়ে এনে সরবৎ আর মুরগীর ঝোল খেতে দিলে। শুধু সেই একদিন নয়, পুরো এক মাস ধরে এমনি করে নানা পুষ্টিকর জিনিস খাওয়ানোর পর আলিশারের গায়ে আবার তাকত ফিরে এল, দেহ তার দেশ ভ্রমণের উপযুক্ত হল। এরপর বুড়ীর হাতে চুমু দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জুমুরুদের তালাসে সে দেশে দেশে ঘুরতে বেরুল। অনেক দেশে ঘুরে কোথাও না পেয়ে অবশেষে সেই দিনই সে—জুমুরুদ যেখানে সুলতান হয়েছে সেখানে এসে পৌঁছেছে। এখানে এসেই শুনেছে সে—সুলতানের মণ্ডপে শহরের সবারই সেদিন খানার নিমন্ত্রণ, শুনেই সে ছুটে এসেছে। তারপর সর চিনি-মাখা দারচিনি গুঁড়ো মাখানো ঘি-ভাতের থালাটার ওখানে জায়গা খালি দেখে সেখানেই এসে বসে পড়েছে সে।

বহু পথ হেঁটে এসে দারুণ খিদে পেয়েছে তার তাই আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে, কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে বিসমিল্লা বলে তখনই সেই সরমাখা ভাত খেতে শুরু করে দিলে। পাশে যারা বসে ছিল তারা ওর প্রিয়দর্শন চেহারা দেখে পই পই করে ওকে ও জিনিসটা খেতে মানা করলে: খেয়ো না, ভাই, ও খেয়ো না—ছুঁয়ো না, ভাংখোর বললে—ও ভাত খেলে তোমার ছাল ছাড়ানো হবে, ফাঁসি কাঠে ঝুলানো হবে।

হোক—তাই আমি চাই—মরণ হলে ত জানটা জুড়ায় আমার—বলে আলিশার আর কারো কথায় কর্ণপাত না করে মহানন্দে সেই সুস্বাদু খাবার খেতে লাগল।

জুমুরুদ তার সিংহাসনে বসে সব দেখছে আর মনে মনে ভাবছে,

—তৃপ্তির সঙ্গে ও আগে ভরপেট খেয়ে নিক তারপর ওকে ডেকে পাঠাব। সে যখন দেখল আলিশার খাওয়া শেষ করে খোদাকে ধন্যবাদ জানালে তখন সে তার প্রহরীদের বললে—চিনিসর-মাখা ভাতের থালার সামনে বসে ঐ যে তরুণ লোকটি সবে তার খাওয়া শেষ করলে—ওর কাছে গিয়ে বেশ ভদ্রভাবে সম্ভ্রম দেখিয়ে বলবি. —আমাদের সুলতান আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। প্রহরীরা তখনই আলিশারের কাছে গিয়ে তাকে সেলাম করে সেই কথা বললে। আলিশার, বহুৎ খুব বলে উঠে তখনই সুলতানের কাছে চললো। দেখে নানা জনে নানা রকম কথা বলতে লাগল: কেউ বললে—হায় হায়—এমন যে খুবসুরত চেহারা ছেলেটার—হয়ে গেল! শুনে আর একজন বললে—না হে না,—দেখো তেমন কিছু হবে না—সুলতানের যদি শাস্তি দেবার মতলব থাকত, তা হলে ওকে পুরো খাবার খেতে দিতেন না—এক গ্রাসের পর আর এক গ্রাস তুলবার আগেই প্রহরীদের দিয়ে ধরিয়ে নিতেন। আর একজন বললে—হ্যাঁ, আমারও এই ধারণা; দেখছ না—প্রহরীরা ওর পা ধরে টেনে নিচ্ছে না, সসম্ভ্রমে ওর পিছু পিছু যাচ্ছে।

এদিকে আলিশার সিংহাসনের কাছে এসে তার সামনের মাটি চুম্বন করে দাঁড়ালে জুমুরুদ ঈষৎ কম্পিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—জনাব, আপনার কি নাম—কি পেশা আর আমাদের এ দেশেই বা আপনি কেন এসেছেন?

আলিশার উত্তরে বললে—জাহাঁপনা, আমার নাম আলিশার, খোরাসানের নামকরা বণিক গুলজারের বেটা আমি, আমারও বাণিজ্যই পেশা ছিল, কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে সে পেশা এখন আর আমার নেই। একটি মেয়েকে আমি গভীরভাবে ভালবাসতাম —সে আমার জানের চেয়েও বেশি ছিল—তাকে হারিয়ে আমি তারই খোঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঘুরতে ঘুরতে আপনার রাজ্যে এসে পড়েছি, এখানেই যদি তাকে না পাই, জাহাঁপনা—

তবে—এ জান আর আমি রাখব না—বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আলিশার সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

জুমুরুদ তখনই তার তুই বাচ্চা খোজা বান্দাকে গোলাপ জল এনে ওর চোখে মুখে ছিটোতে হুকুম করলে। বান্দা তুটি তাই করলে—অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সংজ্ঞা ফিরে এল। জুমুরুদ তখন তার এক বান্দাকে তার গণনার সরঞ্জাম আনতে বললে। সরঞ্জাম আনা হলে জুমুরুদ ঠিক সেই আগের মত চৌকির উপর বালু ছড়িয়ে, তামার কলমে আঁক কেটে বহুক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মাথা তুলে আলিশারের দিকে চেয়ে বললে—জনাব, আমার গণনায় পাচ্ছি—আপনি বণিক গুলজারের বেটা আলিশারই বটে—আপনি মনে ফুর্তি আনুন—কারণ আমার গণনায় এ-ও পেলাম যে আল্লার দোয়ায় খুব শীগগিরই আপনি আপনার ভালাবাসার জনকে ফিরে পাবেন। এই বলে তাকে একটি দামী জমকালো পোশাক খিলাৎ দিয়ে তার তুই বাচ্চা বান্দাকে হুকুম দিলে—তোরা এঁকে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে গোসল করিয়ে ঐ পোশাক পরিয়ে একটা তাজী ঘোড়ায় চড়িয়ে রাত্রে আমার কাছে নিয়ে আসবি।

লোকজন সব চোখের সামনে এই সব ব্যাপার দেখে, এবং সুলতানের এই সব কথা শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—কি ব্যাপার বল দেখি, সুলতান ওকে এমন সম্মান দেখালেনই বা কেন, আর ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এত ব্যস্ত হয়েই বা পড়লেন কেন? তখনই কে একজন বলে উঠল, আহা—হা—বুঝলে না ভাই সায়েব—তরুণের চেহারাটা যে সুন্দর! সুন্দর মুখের কোথায় না খাতির—সে পুরুষেরই হোক—বা মেয়েরই হোক। আর একজন বললে—সুলতান যখন ওকে সবটা সরমাখা ভাত খেতে দিলে তখনই বুঝেছি আমি। কিন্তু তাজ্জব হচ্ছি—ভেবে পাচ্ছি না—চিনিসর-মাখা খাবার খাওয়ার ফল এমন বিভিন্ন হতে পারল কি করে! এই রকম সব বলাবলি করতে করতে শহরের লোকজন সব নিজের নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

শুধু শহরের সাধারণ লোকেরাই নয়—সুলতানের উজির আমীর ওমরাহরাও সুলতানের এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে নানা জল্পনাকল্পনা মন্তব্য করতে করতে পটমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলেন। কেউ বললেন —তরুণের সুন্দর চেহারা দেখেই সুলতান তাঁর ভোল পালটেছেন। কেউ বললেন—দেখো, আমি বলছি—সুলতান ওকে উজির করেই নেবেন—এমন কি প্রধান উজিরও হতে পারে। আর একজন বললেন—উঁহু, আমার মনে হয় সুলতান ওকে সেনাপতি করে নেবেন, দেখলে না—কেমন আঁটসাঁট ওর চেহারা! আর একজন বললে— অতটা নয়, তবে এ কথাও ঠিক সুলতান ওকে অন্তত একটা আমীর ওমরাহ বা ঐ রকম কোন কিছু না করে ছাড়বেন না।

এদিকে সন্ধ্যার পর থেকেই জুমুরুদ আলিশারের আসার পথ চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাতে লাগল। অল্প বয়সী খোজা বান্দাদের দিয়ে তার বসবার ঘরেই সে সুকোমল রেশমী কাপড় ঢাকা সুন্দর একটা বিছানা পাতালে, নানা সুখাদ্য পানীয় আনালে —তারপর রাজবেশ পরা অবস্থায়ই মণিরত্নের কাজ-করা হাতীর দাঁতের তৈরী একটা পালঙ্কে বসে রইল।

একটু পরেই সুলতানের বাসভবনের সামনে এসে আলিশার তার তাজী ঘোড়া থেকে নামল। দুই বান্দা তাকে সসম্ভ্রমে সুলতানের বসবার কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে পর্দা টেনে দিল। আলিশার সুলতান-বেশী জুমুরুদের সামনের মাটি চুম্বন করে তাকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। জুমুরুদ বললে—সে কি জনাব, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন,—নিজের পালঙ্কেরই এক পাশ দেখিয়ে বললে এইখানে বসুন।

আলিশার ইতস্ততঃ করায় জুমুরুদ বললে—অত সঙ্কোচ কিসের আপনার—এতো আমার মসনদ নয়—

আলিশার তবুও বসে না দেখে জুমুরুদ মৃদু হেসে বললে—এতেও আপত্তি থাকলে ঐ যে আর একটা বিছানা পাতা আছে—ওতেই বসুন।

আলিশার সন্তর্পণে গিয়ে সেই বিছানায় বসল বটে, কিন্তু জুমুরুদ তখনই নিজের পরিচয় না দিয়ে বললে—ওরা আপনাকে হামামে ভাল করে গোসল করিয়েছে ত?

জি।

ভাল করে খোশবু দিয়েছে?

জি।

গোসলের পর আপনার খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

আলিশার কোন কথা না বলে মুখ নীচু করে রইল। জুমুরুদ বললে—আপনার জন্যে সামান্য কিছু খানাপিনার আয়োজন করে রেখেছি, দেখুন এদেশের খাবার আপনার কেমন লাগে।

গোসলের পর আলিশারের সত্যিই বড় খিদে পেয়েছিল, সে আর দ্বিরুক্তি না করে খেতে শুরু করল: ভাপে সেদ্ধ মুরগীর মাংস, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও—নানা রকমের মিষ্টি আর সুস্বাদু শুকনো আর তাজা ফল। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলে আলিশার তারপর পান করলে নানা রকমের সিরাজি।

একে পথশ্রমের ক্লান্তি, আরামে গোসল, তারপর আবার ভরপেট ভাল খানাপিনা। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল আলিশারের। দেখে জুমুরুদ মৃদু হেসে বললে—আপনি শুয়ে পড়ুন জনাব, বিছানা পাতাই আছে — ঝাড়া আছে, আর কথাবার্তা কাল হবে—বলে জুমুরুদ নিজের হাতে আলো নিভিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়েই রাজবেশ ছেড়ে নিজের আসল বেশে সাজল।

তারপর?

তারপর আলিশার এর মাঝে হয়ত একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ কে যেন তাকে মোক্ষম জোরে এসে জড়িয়ে ধরল।—কি! কেউ কি তাকে মেরে ফেলতে চায়! কিন্তু না দেহটা যে তার নরম তুলতুলে। কিচ্ছু বুঝতে না পারায় আলিশারের মুখ দিয়ে অদ্ভুত কি রকম একটা আওয়াজ বেরুল। জুমুরুদ অমনি তার মুখ চেপে ধরলে— চুপ, চুপ, আমি জুমুরুদ, বলেই আলিশারের বুকে মুখ রেখে সে

কেঁদে ফেটে পড়ল—এতক্ষণ দেখে কেন তুমি আমায় চিনতে পারলে না?

আলিশারের বুকের মাঝে তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছে, প্রথমে সে কোন কথাই বলতে পারলে না, তারপর কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—তুমি, তুমি!—তু-তু-তুমি কি করে এলে এখানে?

আনন্দের কান্নার মাঝেই হেসে উঠল জুমুরুদ—কেন, এতক্ষণ কে তোমার সঙ্গে কথা বলল?

তুমিই সুলতান?

হাঁ, গো, হাঁ, — আমিই সুলতান!

তারপর?

তারপর এতদিন পর ফিরে পাওয়ার আত্যন্তিক আনন্দে, বিস্ময়ে আর এত দিনের সহস্র সুখদুঃখের কথা বলতে বলতে সে রাত্রি যে তাদের কি করে কেটে গেল তা তারা বুঝতেও পারলে না।

ভোর হলেই জুমুরুদ আবার রাজবেশ পরে উজির আমীর-ওমরাহদের নিয়ে দরবার বসালে। সে দরবারে সেদিন আর কোন রাজকার্য হল না, সমবেত রাজ্য-প্রধানদের সম্বোধন করে সে বললে—আপনারা আমায় আপনাদের তক্তে বসিয়ে আমাকে পরম সুখেই রেখেছিলেন, কিন্তু সে সুখেও আমার মন ভরল না। এর চেয়েও বেশি সুখের ব্যবস্থা খোদা আজ আমায় করে দিয়েছেন—তিনি আমার মনোমত এক দোস্ত পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুমতি করলে এই দোস্তের সঙ্গে আজই আমি আমার নিজের দেশ খোরাসানে ফিরে যেতে চাই, জীবনের বাকী দিনগুলি আমি এরই সঙ্গে কাটাব। আপনারা আজ আবার রাস্তায় বেরিয়ে আল্লার দেওয়া আর কোন নতুন সুলতানকে বরণ করে আনুন।

সুলতানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আর রাজ্যে তাঁকে আটকে রাখা যায় না—সুতরাং উজির, আমীর ওমরাহ আর রাজ্যের গণ্যমান্য সব লোকেরা তখনই যাত্রার আয়োজন করতে লেগে গেলেন। দ্রুত-

গামী একটা উটের পিঠে বেশ বড় সুদৃশ্য একটা তাঞ্জাম সাজান হল, যাতে দুটো লোক বেশ আরামে বসে যেতে পারে—বিশটা উটের পিঠে সাজান হল নানা ধনরত্ন সাজ পোশাক এবং আরও নানা মূল্যবান দ্রব্য। সঙ্গে দেওয়া হল জুমুরুদের সেই দুটো বাচ্চা খোজা বান্দা।

কয়েকদিন মরুপথে চলে জুমুরুদ আলিশারের সঙ্গে নানা জিনিষপত্র নিয়ে ফিরে এল খোরাসানে—উঠল গিয়ে নিজেদের বাড়ীতে। অনেক অনেক দান খয়রাৎ করল গরিব দুঃখী অন্ধ আতুর বিধবাদের। এরপর পরম সুখেই তাদের দিন কাটতে লাগল—অনেক ছেলে পিলে হল। একমাত্র অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ করবার আগে কোন অসুবিধাই আর তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বললে—দিদি এ গল্পটা তোর সত্যিই তাজ্জব, আর জুমুরুদের কি বুদ্ধি! ভাবলে তাক লেগে যায়। আচ্ছা, বুদ্ধি না থাকলেও শুধু সততার জন্যে শেষে কেউ সুখী হল—এমন কোন গল্প তোর জানা নেই?

আছে বইকি, জাহাঁপনা অনুমতি করলেই শুনাতে পারি।

শুনে সুলতান শাহরিয়া বললেন—বেশ—কাল শুনব তোমার সেই গল্প।

সাপের রাণী যমলিকা

পরদিন রাত্রি শেষে সুলতানের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদী তার বোনের কাছে প্রতিশ্রুত সেই গল্পটি শুরু করল—

অনেক—অনেক দিন আগে সুলতান কারাজদানের রাজ্যে দানিয়েল নামে এক গ্রীক পণ্ডিত ছিলেন। অনেক তাঁর এলেম—মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু, ইহুদী—সবার ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, আইন—এ সবের এমন কিছু ছিল না—যা তিনি না জানতেন। আর কত রকমের কেতাব আর পাণ্ডুলিপিই যে তাঁর ঘরে তার লেখা-জোখা নেই। এই সবে তাঁর ঘর ঠাসা। দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসত। বিদ্যাদানে তাঁর আলস্য ছিল না, কার্পণ্য ছিল না, তাই শুধু ছাত্ররা নয় তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে সবাই তাঁকে ভালবাসত, সুখ্যাতি করত।

দানিয়েলের বড় সাধ ছিল—ছাত্রদের যেমন তিনি বিদ্যাদান করছেন, তেমনি তাঁর বংশধরকেও তাঁর অর্জিত বিদ্যার সবটুকু না হলেও অন্তত কিছুটা দিয়ে যান। কিন্তু সে সাধ আর তাঁর মিটল না। প্রথম দিকে তাঁর কোন ছেলেপিলে হয় নি—একেবারে শেষ বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার কিছুকাল আগে যখন তাঁর একটি ছেলে হল, তখন তার নাম রাখলেন তিনি হাসিব।

নাম ত রাখলেন, কিন্তু হাসিবকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি—সারা জীবনের বহুকষ্টে অর্জিত বিদ্যার কিছুই ত হাসিবকে দান করে যাওয়ার সময় নেই, পরপারের ডাক এসে গেছে! ডাক ত এসে গেছেই কিন্তু তাতেও দমবার পাত্র নন দানিয়েল। এক ওস্তাদ লিখিয়েকে দিয়ে তিনি সারাজীবনে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তার পাঁচ হাজার কেতাব ও পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা আছে তার সারমর্ম মাত্র পাঁচ খানা কাগজে লিখিয়ে নিলেন। লেখা শেষ হলে ঐ পাঁচ খানা কাগজ অনেকক্ষণ ধরে বেশ ভাল করে পড়লেন। পড়ে দেখলেন—ও সব আরও সংক্ষেপ করা যায়।

তাই পুরো একমাস ধরে ভেবে ঐ পাঁচখানা কাগজের বক্তব্য সংক্ষেপিত করে মাত্র একখানা কাগজে লিখে ফেললেন তিনি। যাক—এবার নিশ্চিন্তি। এরপর তিনি তাঁর কেতাব পাণ্ডুলিপি সব সমুদ্রের জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঐ কাগজখানা তাঁর স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—এটা যত্ন করে তুলে রাখ। ছেলে তোমার বড় হয়ে পৈতৃক সম্পদের খোঁজ করবে, হিসাব চাইবে, তখন এইটা তার হাতে দিও। এতে যা লেখা রইল পড়তে শিখে সে যদি তা বোঝে তা হলে তার জীবিত কালে তার মত এলেমওয়ালা লোক ছুনিয়ায় আর দোসরা মিলবে না।

বড়ই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন দানিয়েল; এই কথা বলার পর তাঁর ইহলোকের কর্তব্য শেষ হল মনে করে স্বস্তিতে ঐ যে তিনি চোখ বুজলেন সে চোখ আর তিনি মেললেন না।

তাঁর ছাত্রেরা এবং শহরের যাবতীয় লোক চোখের জল ফেলতে ফেলতে মিছিল করে তাঁকে কবর দিতে নিয়ে গেল।

দানিয়েল বিষয় সম্পদ কিছু রেখে যেতে পারেন নি তাই হাসিবের মা হাসিবকে অতি কষ্টেই মানুষ করতে লাগলেন; অতবড় পণ্ডিতের ছেলে, কিছুটা পণ্ডিতও যদি হয় এই আশা বুকে নিয়ে। ছেলের ভাগ্য গণনা করবার জন্যে একবার জ্যোতিষীদেরও ডাকলেন তিনি। জ্যোতিষীরা সবাই তাঁর স্বামীর বন্ধু অথবা ছাত্র সুতরাং তাঁদের ডাকতেই তাঁরা এসে কোন দর্শনী না নিয়েই হাসিবের ভাগ্য গণনা করে তার মাকে বললেন—বিবিসাব, আপনার এই ছেলের যৌবনে একটা ফাঁড়া দেখছি আমরা। খোদার দোয়ায় সেটা যদি সে কাটিয়ে ওঠে তা হলে বিপুল জ্ঞান ও বিত্তের অধিকারী হবে সে।

হাসিবের মা মনে একটু ছুশ্চিন্তা রেখেই হাসিবকে মানুষ করেন। হাসিবের বয়স যখন পাঁচ বছর হল তখন তিনি পাশেরই এক মক্তবে তাকে পড়তে দিলেন। পড়তে দিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া তার কিছুই হল না, কিছুই শিখলে না হাসিব। লেখাপড়া হল না দেখে মা হাসিবকে মক্তব থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাতের কাজ শিখতে দিলেন,

কিন্তু তা-ও কিছু শিখলে না হাসিব। কিছুই করতে চায় না সে। মা বড় মুশকিলেই পড়লেন। বয়স তখন হাসিবের প্রায় পনের ষোল হয়ে গেছে।

আর কি করা যায়—মা যখন ভাবছেন অথচ দিশে পাচ্ছেন না, তখন প্রতিবেশিনীরা এসে তাঁকে যুক্তি দিলে—হাসিবের মা, তোমার হাসিবের সাদি দাও, একটা টুকটুকে বউ ঘরে আনো, দেখো তোমার হাসিব শুধরে যাবে, কাজে মন বসবে ওর, অন্তত বউয়ের মুখ চেয়ে—বসবে।

যুক্তিটা মন্দ নয় ভেবে হাসিবের মা প্রতিবেশীদের ঘরেই খোঁজ করে একটা খুবসুরত মেয়ে দেখে হাসিবের বিয়ে দিলেন। বউ পেয়ে হাসিব খুব খুশী—বউকে পেয়ারও করতে লাগল খুব, কিন্তু কাজ কর্ম দেখবার কোন নাম নেই।

দেখে আরও ভাবনায় পড়লেন হাসিবের মা: বাড়িতে খাবার লোক বাড়ল অথচ আয় নেই! মা ভাবেন—দিন রাত ভাবেন। এই সময় কয়েক জন প্রতিবেশী—কাঠুরে প্রতিবেশী এসে হাসিবের মাকে বললে—হাসিবের মা, তুমি এক কাজ করো, তুমি বাজার থেকে একটা কুড়ুল, কিছু দড়ি আর একটা গাধা কিনে এনে হাসিবকে দাও। আমরা ওকে নিয়ে বনে যাব, ওকে কাঠ কাটা শেখাব, তাতে বেশ কিছু রোজগার হবে ওর।

যুক্তিটা বেশ ভালই লাগল হাসিবের মায়ের। তিনি সেই দিনই হাসিবের জন্যে একটা গাধা, কিছু দড়ি আর একটা কুড়ুল কিনে এনে ছেলেকে কাঠুরেদের সঙ্গে দিয়ে বললেন—তোমরা একে একটু দেখো বাবারা সব, কাজ কর্ম একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিও।

ওরা বললে—কিছ্ছু বলতে হবে না আপনার, আমাদের সবার গুরু দানিয়েল সাহেবের ছেলে ও, ও আমাদের ভাই, ওর ভার আমরা নিলাম। দেখুন না শিখিয়ে পড়িয়ে ওকে কেমন কাজের লোক করে দিই আমরা।

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন মা।

হাসিবেরও এ কাজ বেশ ভালই লাগল ; খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে গাধায় চড়ে আর দশজন কাঠুরের সঙ্গে হৈ হৈ করে কেমন বনে যাওয়া, তারপর এক সঙ্গে তালে তাল কুড়ুল দিয়ে কেমন কাঠ কাটা, সেই কাঠ গাধার পিঠে চাপিয়ে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে বেশ কিছু দিরহাম ঘরে আনা, তাই দেখে মা আর বউয়ের মুখে হাসি, খাসা এ জীবন—তোফা।

এমনি করে হাসিবের জীবন বেশ কিছুদিন খাসাই কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন সেই অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটল :

সেদিনও আর আর কাঠুরেদের সঙ্গে বনে গিয়েছে হাসিব কাঠ কাটতে, হঠাৎ বজ্রনাদের সঙ্গে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কাঠুরেরা কুড়ুল হাতে দৌড়ে গিয়ে কাছেরই এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল, তাদের সঙ্গে হাসিবও। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা, তাই গুহার ভিতরে গিয়ে কাঠুরেরা নিজেদের শরীর তাতাতে আগুন জ্বেলে নিল, আর হাসিবকে ওরা গুহার আর এক কোণে বসিয়ে দিলে—ঐ আগুনের জন্য কাঠ কুচাতে। কাঠ চেলা করতে গিয়ে হাসিব দেখলে কুড়ুলটা যখনই মাটিতে লাগে তখনই কেমন ঢ্যাব ঢ্যাব শব্দ হয়। এমন আওয়াজ হয় কেন, এখানকার মাটিটা কি তবে নিরেট নয়, ফাঁপা। কাঠে ঘা না দিয়ে কুড়ুলের ভারী দিকটা দিয়ে মাটিতেই কয়েকটা ঘা দিলে হাসিব। হ্যাঁ! তাই মনে হচ্ছে। হাসিব তখন কুড়ুল আর হাত দিয়ে ওখানকার মাটিটা খুঁড়তে শুরু করলে। কিছুটা খুঁড়লেই বেরিয়ে পড়ল পেতলের আংটা লাগানো মস্ত বড় শ্বেতপাথরের ঢাকনা। ওটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই হাসিব তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠল—এই তোমরা শীগগির ছুটে এস, এখানে কি রয়েছে দেখো।

কাঠুরেরা আগুন পোহানো ফেলে তখনই ছুটে এল হাসিবের কাছে তারপর সবাই একসঙ্গে পাথরের আংটাটা ধরে তুলে ফেললে পাথরটা সেখান থেকে। নীচে নজর পড়তেই দেখে মস্ত বড় এক গুহা—চৌবাচ্চার মত চারকোণা, গভীরও বেশ। ঐ গুহার নীচে

মেঝেতে সারি সারি সব মুখ আঁটা কলসী সাজানো। সবারই কৌতূহল—কি,—কি রয়েছে ওতে! ওরা হাসিবকে বললে—তুমি একবার নেমে দেখ কি রয়েছে ওগুলোতে।

হাসিব বললে,—কি করে যাব আমি অত নীচে?

সে ব্যবস্থা আমরা করছি।

কাঠুরেরা তখন তাদের কাঠ বাঁধবার দড়ি হাসিবের কোমরে বেঁধে নামিয়ে দিল সেই গুহার মধ্যে। হাসিব গুহার নীচে নেমে তার কুড়ুলের মাথা দিয়ে একটা কলসীর কানা ভেঙে ফেলেই দেখে পরিষ্কার হলুদ রঙের টাটকা মধু। হাসিবের মুখে কলসীতে মধু আছে শুনে অবশ্য তত খুশী হল না—ওরা ভেবেছিল ধনরত্ন কিছু হবে। যাক—আল্লা যা দিয়েছেন সেই ভাল, এত মধু বাজারে নিয়ে যেতে পারলে রোজগার মন্দ হবে না। ওরা তখন হাসিবকে বললে—তুমি তোমার কোমরের দড়ি একটার পর একটা কলসীর গলায় বেঁধে দাও, আমরা টেনে টেনে উপরে তুলি। সব গুলো তোলা হয়ে গেলে শেষে তোমায় তুলে নেব।

হাসিব তাই করলো—একে একে সব কলসী উপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কলসীগুলিই উপরে তোলা হয়ে গেল—কিন্তু হাসিবকে তুলবার জন্যে ওরা আর দড়ি নামালে না। কাঠুরেদের একজন দুষ্টলোক অপর সকলকে যুক্তি দিলে—ওকে আর উঠিয়ে কাজ নেই। মধুর কলসী যখন ঐ দেখেছে তখন এতে ওরই পুরো অধিকার। কাজীর কাছে বিচার করতে গেলে আমরা এক রকম কিছুই পাব না, তুলেছি বলে কিছু পেলেও অতি সামান্য, তার চেয়ে ও থাক পড়ে ওখানে, মরুক, তা হলেই সবটা আমাদের লাভ।

শুনে সবাই বললে—এই যুক্তিই ঠিক। চলো আমরা মধু নিয়ে কেটে পড়ি।

কাঠুরেরা তখন নিজের নিজের গাধায় অনেকগুলো করে মধুর কলসী সাজিয়ে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অনেক অনেক দিরহাম পেল। তারপর হাসিবের মায়ের কাছে এসে অনেক

চোখের জল ফেলে মহাশোকের ভান করে বললে—আল্লা আপনার বুকে বল দিন, সহ্য করবার শক্তি দিন। কি বলব, আম্মাজান আজ আমরা বনে যাওয়া মাত্র দারুন ঝড় বৃষ্টি এসে গেল—আমরা দৌড়ে কোন রকমে একটা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম, হাসিবের গাধাটা হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আসতে দেখে ভয় পেয়ে দিল ছুট—হাসিব তার পিছু পিছু ছুটল—ঠিক সেই সময় কোন ঝোপের মাঝ থেকে এক নেকড়ে এসে লাফিয়ে পড়ল তার উপর—আমরা দেখেই অবশ্য কুড়ুল হাতে ছুটলাম তাকে তাড়াতে, কিন্তু ঐ দারুন বৃষ্টির মাঝে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখন দেখি নেকড়েটা তাকে সাবাড় করে ফেলেছে বাকী রয়েছে কেবল কিছু হাড় গোড়—কি করব, আম্মাজান, আমরা তা-ই ওখানে করব দিয়ে এলাম। হাসিব আর যে কয় বছর বাঁচতে পারত সে কয় বছর আল্লা আপনার আয়ুর সঙ্গে যোগ করুন।

শুনে মা বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, বউটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঠুরেরা কিন্তু ঐ মধু বিক্রি করে প্রচুর দিরহাম পাওয়ায় তাদের কাঠুরে বৃত্তি ছেড়ে প্রত্যেকেই এক একটা দোকান দিয়ে ধনবান বণিক হয়ে উঠল।

আর এদিকে কাঠুরেরা হাসিবকে ঐ গুহার মধ্যে একা ফেলে গেলে, প্রথমে সে জোর গলায় ওদের ডাকতে লাগল—যখন কেউই তার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল না, তখন সে নিজের অবস্থা বুঝে মাথার চুল ছিঁড়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে গুহার মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। কিছুক্ষণ এই রকম কাটবার পর সে একটু শান্ত হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল। দু'চোখ দিয়ে তার তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। এই সময়ে তার হঠাৎ নজরে পড়ল কোত্থেকে একটা কাঁকড়া বিছে তার একেবারে পায়ের কাছে এসে গেছে। সেটা তাকে কামড়াতে উপক্রম করতেই সে কুড়ুলের গোড়া দিয়ে তাকে থেঁতলে মেরে ফেললে। কিন্তু এটা এল কোত্থেকে—কোন

খান দিয়ে! চারকোনা চৌবাচ্চার মত গুহাটার চারিদিকে বেশ ভাল করে তাকাতে দেখে ওর একদিকে একটা কাঠের দরমা আছে, তারই গা একটু চেরা, ওরই ফাঁক দিয়ে—এসেছিল ওটা। হাসিব তখন কৌতূহলী হয়ে ঐ চেরা জায়গাটায় চোখ রাখল, রাখতেই দেখে বেশ কিছুটা দূরে যেন খানিকটা আলো দেখা যায়। এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচবার হয়ত একটা উপায় হতে পারে—এই আশা নিয়ে সে তখন তার কুড়ুলটা দিয়ে দরমার চেরা জায়গাটার আশ-পাশের কাঠ একটু একটু করে কাটতে শুরু করল। কাটতে কাটতে জায়গাটা যখন একটা মানুষ বেরুনোর মত বড় হল তখন সে ঐ মধুর গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেরিয়ে যেখানে গিয়ে পড়ল সেটাও একটা গুহা, বিরাট গুহা, কিন্তু তার গায়ে অনেক মণিরত্ন আঁটা থাকায় বেশ কিছুটা আলো আছে সেখানে। সেই আলোতে সে দেখলে—সমস্ত গুহাটার চারিদিকে চক্রাকারে থাকে থাকে সব বসবার বেদি। কারা বসে সভা করে এখানে কিছুই বুঝতে পারলে না হাসিব। এদিক ওদিক এলোমেলো তাকাতে তাকাতে দেখে এ গুহাটায়ও একটা দরজা আছে, লোহার দরজা, কিন্তু তাতে রুপোর কুলুপে সোনার চাবি। হাসিব তখনই এগিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেললো, খুলেই দেখে খোলা আকাশের নীচে অতি সুন্দর এক উপত্যকা। আলাহমদুলিল্লা—বলে হাসিব খুশী মনে এসে পড়ল সেই উপত্যকায়। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই যা তার চোখে পড়ল তাতে সে একেবারে থ হয়ে গেল: পান্নার মত সবুজ একটা সুন্দর পাহাড়, সামনে তার একটা হ্রদ, মুক্তোর মত টলটলে তার জল। আর ঐ হ্রদের ধারেই মণিমুক্তা-খচিত একটা স্বর্ণ-সিংহাসন, তার আশপাশে এক একজন করে বসবার মত সোনা, রুপো, আর শ্বেত পাথরের বহু হাজার বেদি। হাসিব চারিদিক বেশ ঘুরে ঘুরে দেখে ক্লান্ত হয়ে শেষে সেই স্বর্ণসিংহাসনে এসে আরাম করে বসলে। একটু পরেই দিব্যি ঘুম এসে গেল তার। কতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল তা তার ঠিক নেই—হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক আওয়াজে সে জেগে উঠে দেখে—

আগে সোনা, রুপো ও শ্বেত পাথরের যে শূন্য আসনগুলি সে দেখেছিল তাতে প্রকাণ্ড বড় বড় সব সাপ বসে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখে তার দিকে চেয়ে হিস্ হিস্ করছে। দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল হাসিব ; কি করবে সে বুঝে উঠছে না, এমন সময় দেখে সামনের হ্রদ থেকে এদের সবার চেয়েই বড়—বিকট বড় একটা সাপ মস্ত বড় একটা সোনার পরাত মাথায় করে উঠে আসছে—পরাতের উপর অতি দিব্য বর্ণের দেহ বিশিষ্ট একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে, মুখখানা তার এক অপরূপ সুন্দরী নারীর। ওকে দেখা মাত্র সব সাপগুলো তাদের আসন থেকে নেমে মাটিতে সর্বাঙ্গ বিছিয়ে তাকে অভিবাদন করলে। তাদের দেখাদেখি হাসিবও সিংহাসন থেকে নেমে ঠিক অমনি করে তাকে সেলাম করলে। পরাত-মাথায় বড় সাপটা এবার সিংহাসনের কাছে এসে পরাতটা তার উপর রাখলে। হাসিবের বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা থাকলেও তার এটুকু বুঝতে বাকী রইল না—মানুষের মত মুখওয়ালা সাপটা ওদের রাণী।

সিংহাসনের উপর এসেই ঐ সাপটা বেশ কিছুটা বিস্মিত হয়ে হাসিবের দিকে তাকালেই সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। তার রকম দেখে সাপটা মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, কিছু ভয় নেই তোমার, তোমার চারিদিকে যারা রয়েছে—এরা তোমার অনিষ্ট করবে না, এরা আমার প্রজা, আমি এদের রাণী, নাম আমার যমলিকা। তোমার নাম কি ?

রাণীর মিষ্টি কথায় হাসিবের ভয় অনেকটা কেটে গেল—সে বললে—হুজুরাইন, আপনার বান্দার নাম হাসিব করিম অলাদ্দিন,—দানিয়েল সাহেবের বেটা আমি।

যমলিকা তখন এক সাপকে বললে—একে দেখে মনে হচ্ছে এর বড় খিদে পেয়েছে—একে কিছু খাবার এনে দে।

সাপটা তখন একটা রুপোর পরাতে করে আঙ্গুর, বেদানা, আপেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, কলা ইত্যাদি ফল এনে হাসিবের

সামনে ধরলে, ক্ষুধার্ত হাসিব বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সে সব খেল। খাওয়া শেষ হলে যমলিকা তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মানুষের এলা কা থেকে সাপের রাজ্যে সে কি করে এল। উত্তরে হাসিব তার এখানে আসার কাহিনী সব খুলে বললে, যমলিকাও তাকে নিজের কাহিনী বলে তাকে নিজের রাজ্যে থাকবার জন্য অনুরোধ জানালে। শুনে হাসিব খুশী হয়ে রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে।

সাপের রাণী যমলিকার কাছে আদর যত্ন পেয়ে পুরো দুই বছর হাসিব সাপের রাজ্যে কাটিয়ে দিল। এখানে তাজ্জব যা কিছু ছিল তা-ও তার দেখা হয়ে গেল। এরপর তার নিজের বাড়ির জন্য মন কেমন করতে লাগল। তার বউ, মা কেমন আছে—কতই না জানি ভাবছে তারা তার জন্য!

হাসিব তখন সাপের রাণীর সামনে গিয়ে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললে—হুজুরাইন, আজ দু বছর আমি বাড়ি ছাড়া। বাড়িতে আমার মা, বউ রয়েছে, তাদের জন্যে আমার বড় মন কেমন করছে—আপনি যদি অনুমতি দেন—

শুনে যমলিকা একটু চুপ করে থেকে বললে—হ্যাঁ তোমাকে যাবার অনুমতি দিতে পারি—কিন্তু কয়েকটা শর্তে—

হুকুম করুন।

যমলিকা বললে—তার প্রথমটা হচ্ছে এখানে এসে তুমি যা যা দেখলে তা কারো কাছে বলবে না।

না, বলব না।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে এর চেয়ে আরও কঠিন: শহরে গিয়ে তুমি কোনদিন হামাম গোসলে যাবে না।

না, যাব না।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার—তুমি তোমাদের শহরে গেলেই এ সব ভুলে যাবে, ভুলে গেলে তোমার আমার দুইজনেরই ভীষণ অনিষ্ট হবে।

হাসিব হাত জোড় করে বললে—বিশ্বাস করুন আমায়, আমি,

ভুলব না, খোদার কসম নিয়ে বলছি আমি—আমি এখানকার কথা কাউকে বলব না, আর যতদিন বাঁচি ততদিন আমি হামামে যাব না।

শুনে যমলিকা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—ঠিক আছে মনে থাকে যেন।

যমলিকা তখন তার একটা অনুচরকে বললে—একে আমাদের এলাকা থেকে মানুষের এলাকায় রেখে এস।

সাপটা তখন হাসিবকে মাথায় করে প্রথমে তাকে যে গুহাটায় মধুর হাঁড়ি ছিল সেখানে নিয়ে গেল, তারপর সেখান থেকে তাকে বের করে দিল মানুষের এলাকায়। হাসিব হাঁটতে হাঁটতে যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতেই ভিতর থেকে মা বললে—কে?

আমি, মা, তোমার হাসিব।

মা, হুড়মুড় করে দরজা খুলে হাসিবকে দেখেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন: বাবা, তুই বেঁচে আছিস! বউ ছুটে এসে দরজা ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল: অত্যধিক আনন্দের কান্না। কিছুক্ষণ এইরকম কাটবার পর ওরা যখন একটু শান্ত হল—তখন তিনজনই ঘরের ভিতরে এসে বসল। হাসিব তখন তার মাকে বললে—আমার কাঠ কাটার সাথী কাঠুরেদের খবর কি বলো।

মা মহাক্রোধ আর বিরক্তিভরে মাথা নেড়ে বললেন—ওরে বাবা, তাদের কথা আর বলিস নে। ওরা এসে বললে—কি, ঝড় বৃষ্টিতে ভয় পেয়ে তোর গাধা ছুটে পালাতে তুই তার পিছু ছুটছিলি, এমন সময় কোন ঝোপ থেকে এক নেকড়ে এসে তোকে খেয়ে ফেলেছে, শুনে কি দুঃখেই যে আমাদের এই দুই বছর কেটেছে তা আল্লাই জানেন।

তা, তারা সব আছে কেমন?

তা আল্লার দোয়ায় তারা বেশ ভালই আছে, খুবই ভাল; সবাই ভাল বাড়িঘর করেছে, দোকান দিয়েছে—এখন তারা সবাই বড়

বড় ব্যাপারী। তারাই ত এতদিন আমাদের—দানাপানি যুগিয়ে এসেছে, তাই ত আমরা বেঁচে আছি।

হাসিব শুনে একটু চুপ করে থেকে বললে—মা, তুমি একটা কাজ করবে—তুমি একবার ওদের কাছে যাও, গিয়ে বলো—হাসিব বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরেছে, সে তোমাদের সেলাম জানিয়েছে। তোমরা যদি তার সঙ্গে একবার দেখা করো, তা হলে তার দিলটা বড় খুশী হয়।

মা তখনই গিয়ে কাঠুরেদের সে কথা বললে তারা রীতিমত ভড়কে গেল, কিন্তু বাইরে সে ভাব কিছু প্রকাশ না করে তাদের প্রত্যেকেই মণিরত্নের কাজ করা দামী রেশমী পোশাক মায়ের হাতে দিয়ে বললে, এগুলি হাসিবকে দেবেন—আমাদের প্রীতি-উপহার। আর তাকে বলবেন—কাল ভোরেই আমরা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব।

মা সেগুলো নিয়ে চলে গেলেই কাঠুরেরা ওখানকার বড় বড় সদাগরদের ডেকে তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। শুনে তাঁদের মাঝে যিনি সবার চেয়ে বেশি বৃদ্ধ এবং বিচক্ষণ তিনি বললেন—ব্যাপারটা তোমাদের নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলাই ভাল। ও যদি কাজীর কাছে যায়, তা হলে তোমাদের বেশ মুশকিলে পড়তে হবে। তার চেয়ে তোমরা এক কাজ করো ; তোমরা তোমাদের—সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক ওর হাতে তুলে দিয়ে ওর সঙ্গে একটা রফা করে ফেল।

ওরাও তা-ই ভাল বুঝলে, তাই প্রত্যেকেই এক একটা থলিতে নিজের নিজের হিসাব মত দিনার আর মণিরত্ন নিয়ে পরদিন ভোরে হাসিবের বাড়িতে হাজির হয়ে তাকে সেলাম করে থলেগুলি তার হাতে দিয়ে বললে—ভাই, আমাদের সকল কসুর তুমি মাফ করে এগুলি তুমি নিলে আমাদের দিলটাও খুশী হয় আর আল্লাও তোমার ভাল করবেন।

ওদের সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে হাসিব আর ও সব নিতে আপত্তি

করলে না। সে সরল মনেই বললে—যা হবার তা হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর তোমরাও মাথা ঘামিও না, আমিও ঘামাব না—ত্বনিয়ার সব কিছুই আল্লার ইচ্ছায় ঘটে।

ওরা বললে—তুমি অতীতের কথা আর কিছু মনে রেখো না, ভাই।

না, রাখব না।

ওরা যখন বুঝলে হাসিব সত্যিই তাদের ক্ষমা করতে পেরেছে ; তখন ওরা খুশী হয়ে বললে—যাক, আমাদের সকল গোল যখন মিটে গেল—তখন চলো সকলে মিলে একটু ফুর্তি করা যাকঃ সবাই এক সঙ্গে মিলে হামামে যাই,—চলো।

হাসিব হাত জোড় করে বললে—আমাকে মাফ করতে হবে, ভাইসব।

কেন মাফ কেন ?

আমি আল্লার নামে শপথ নিয়েছি—যত দিন বেঁচে আছি হামাম গোসলে যাব না।

ওরা এতে নিরুৎসাহ না হয়ে বললে বেশ, তা হলে এক কাজ করো, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এসে এক একদিন খানাপিনা করো।

হাসিব তাতে রাজী হল। সুতরাং ওদের প্রত্যেকেই এক একদিন হাসিবকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে দিন এবং রাত্রি ত্বই ওক্তের খানাই পরিতোষ করে খাওয়ালে। কয়েক দিন এই রকম খানাপিনার পর হাসিব নিজেও তাদের মত এক দোকান দিলে—কারণ, সে নিজেও এখন অনেক ধনরত্নের মালিক।

এরপর মা বউ আর দোকান নিয়ে হাসিবের দিন বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল। হাসিব একদিন এক হামামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় দেখে ওর মালিক ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মালিক হাসিবের চেনা, শুধু চেনা নয়,—এক রকম দোস্ত বললেই হয়। সে হাসিবকে

দেখেই অমনি বলে উঠল—আরে হাসিব যে, কতদিন পরে দেখা! এস এস, আমার হামামে এস গোসল করে যাও। অনেক তালিম দেওয়া ওস্তাদ বান্দা আছে আমার হামামে, আচ্ছা করে ডলাই মলাই করে গায়ের ময়লা তুলে গোসল করিয়ে দেবে তোমায়, বহুৎ আরাম পাবে; এস এস, অনেক দিন পরে পেলাম তোমায় আজ, তোমায় ছাড়ছি না, আজ তুমি আমার অতিথি।

হাসিব হাত জোড় করে বললে—মাফ করো, ভাই, আমি হামামে ঢুকতে পারব না।

কেন, কি হল তোমার। আপত্তিটা কি?

আমি আল্লার নামে শপথ নিয়েছি, যতদিন জান আছে হামামে গোসল আর করব না।

শুনে অপমানিত বোধ করল হামামের মালিক, ভীষণ রেগে গিয়ে তার বান্দাদের হুকুম দিলে—একে ধরে নিয়ে যাও ত ভিতরে, নিয়ে আচ্ছা করে গোসল করিয়ে দাও। মনিবের হুকুমে বান্দারা তখনই হাসিবকে ধরে নিয়ে গেল—গোসলখানায়; নিয়ে তার জামাকাপড় খুলে সবে জল ঢেলেছে তার মাথায়, এমন সময় কোত্থেকে তিনটি লোক এসে হাসিবের সেই অবস্থায়ই—তাকে বললে—এখনই আমাদের সুলতানের বাড়িতে যেতে হবে তোমায়। হাসিব ব্যাপার কিছু না বুঝে তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। লোক তিনটি তখনই তাদের আর একজন সঙ্গীকে পাঠাল প্রধান উজিরের কাছে। খবর পেয়ে উজির তখনই সুলতানের অনেক লোক লস্কর নিয়ে হাজির হলেন হামামে, তারপর হাসিবের সামনে এসে শুভকামনা জানিয়ে বললেন—আল্লা মেহেরবান, তাই তোমাকে মিলিয়ে দিলেন, এক্ষুনি সুলতান কারাজদানের প্রাসাদে যেতে হবে তোমায়, বড় জরুরী দরকার।

হাসিবকে কোন আপত্তি করবার সুযোগ না দিয়ে উজির তখনই তাকে একটা তাজী ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে আর একটায় চড়ে আগুপিছু লোকজন দিয়ে নিয়ে এলেন সুলতানের প্রাসাদে।

সেখানে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে একটা ভাল কামরায় এনে লোকজনদের হুকুম দিলেন—ভাল খানাপিনা আনতে। ওরা ভাল ভাল খাবার আর পানীয় আনলে উজির হাসিবকে তা খাইয়ে নিজে খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে হাসিবকে পাঁচ হাজার দিনার দামের একটা জমকালো পোশাকে পরিয়ে নবাব আমীর ওমরাহদের সঙ্গে হাসিবকে নিয়ে সাত দরজা পার হয়ে চললেন সুলতান কারাজদানের কামরায়।

সুলতান কারাজদান শুধু পারস্যের সুলতান নন আরও ত্রিশটি রাজ্য তাঁর অধীন, বহু লক্ষ সেপাই, বহু লস্কর, কিন্তু হলে হবে কি দারুণ কুষ্ঠব্যধিতে তিনি মরমর। হাসিবকে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হলে হাসিব তাঁর সামনের ভূমি চুম্বন করে দাঁড়িয়ে দেখলে সুলতানের মুখ থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা, তাতে সব কাপড়ের পটি বাঁধা। উজির একটা সোনার কাজ-করা কুর্সি আনিয়ে সুলতানের ডাইনে রেখে তাতে হাসিবকে বসিয়ে বললেন—শোন হাসিব, খোদার অশেষ দোয়া যে আজ আমরা তোমার দেখা পেয়েছি। আমাদের কেতাবে আছে দানিয়েলের বেটা হাসিবই কেবল সুলতান কারাজদানের এই দারুণ ব্যাধি সারাতে পারবে। তুমি সুলতানের এ ব্যাধি সারিয়ে দাও, যে পুরস্কার চাও তুমি তাই তোমাকে দেব আমরা, এমন কি অর্ধেক রাজত্ব যদি তুমি চাও, তাও তোমাকে দেওয়া যাবে, ব্যামো সারিয়ে দাও তুমি।

উজিরের কথা শুনে হাসিব প্রথমে তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর জোড়হাত করে বললে—হুজুর, আমার বাপজান দানিয়েল সাহেব অনেক গুণী লোক ছিলেন বটে, হাকিমিও তিনি বেশ ভালই জানতেন কিন্তু আমি ও সব কিছুই শিখিনি, হাকিমি শিখতে আমাকে দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু অপদার্থ আমি কিছুই শিখতে পারিনি সুতরাং আপনার এ আদেশ পালন করা আমার সাধ্যাতীত।

শুনে উজিরের চোখ-মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠল, রুক্ষ স্বরে

তিনটি শিশি,—একটি সোনার, একটি রূপোর, একটি পান্নার। সাপের রাণীর দেহের চেকনাইহতে যেন চারিদিক আলো করেছে!—কিন্তু মুখখানা তার রাগে ঘন কালো মেঘের মত দেখাচ্ছে। রাণী সেই মুখে এদিক ওদিক চেয়ে উজিরকে দেখতে পেয়ে 'বলে—উঠল—শয়তান,—কেতাবে লেখা আছে যে তুমি তোমার জাদু দিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবে,—তাই রক্ষা পেলে, নইলে এখনই তোমাকে আমি ভস্ম করে দিতে পারতাম। যাক—বেশি কথায় কাজ নেই, এই যে তিনটি শিশি আছে এর ভিতর থেকে রূপোর শিশিটি তুমি নিয়ে নাও—এতে জীবন রসায়ন আছে,—সুলতানের অসুখ সারবার পর তুমি এটা পান করবে তার আগে নয়। এ পান করলে আর কোনদিন তোমার কোন অসুখ বিসুখ করবে না।

শুনে উজির সন্তর্পণে শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে সাপের রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে।

এরপর সাপের রাণী এদিক ওদিক তাকিয়ে হাসিবকে দেখতে পেয়ে বললে—এই যে হাসিব, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারনি,—কিন্তু আমি জানি তুমি ইচ্ছা করে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো নিঃ লোকে জোর করে তোমায় হামামে নিয়ে গেছে, আর তোমাকে অনেক নির্যাতন করে তোমার কাছে থেকে আমার ঠিকানা যোগাড় করেছে, তাই তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। আমার এ থালায় আর যে দুটো শিশি আছে তা তুমি নিয়ে নাও। এর মধ্যে সোনার শিশিটায় যা আছে তা তুমি নিজে পান করে নেবে—সুলতানের সামনে যাবার আগেই, আর পান্নার শিশিটায় যা আছে, খাওয়াবে সুলতানকে, খাওয়ালেই তাঁর রোগ সেরে যাবে।

যো হুকুম—বলে শিশি দুটো নিয়ে হাসিব সাপের রাণীর সামনের ভূমিচুম্বন করে তাকে কুর্নিশ করলে। সাপের রাণী এবার উজিরের দিকে চেয়ে বললে—আমার কাছে তোমাদের যে দরকার ছিল তাত মিটে গেল, আর আমায় শুধুশুধু আটকে রেখ না।

শুনে উজির আবার তাকে কুর্নিশ করে দুটো হাত আড়াআড়ি

রেখে কি রকম একটা ভঙ্গি করে বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে আরও বেশি ভয়ংকর ভূমিকম্প এবং বজ্রনাদ হতে লাগল, এবং তার সঙ্গেই সাপের রাণী—বাহন সমেত অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার ফিরবার পালা। উজির হাসিব আর নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সুলতানের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সুলতানের প্রাসাদে ঢুকবার আগেই হাসির সাপের রাণীর দেওয়া সোনার শিশিতে যা ছিল তা পান করে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ খুলে গেল।—মহাজ্ঞানী হয়ে উঠল সে, কারণ ওতে ছিল জ্ঞান-রসায়ন। উপরে তাকিয়ে দেখে সে সপ্তস্বর্গের দ্বার তার কাছে উদ্ঘাটিত, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি তার নখদর্পণে। নীচে তাকিয়ে দেখে পাতালপুরীর ধনরত্ন ভেষজ সব তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে সমস্ত নরনারীর মনের অন্তস্তল পর্যন্ত সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

এই বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে এগিয়ে গেল সে শয্যাশায়ী সুলতানের কাছে, গিয়ে পান্নার শিশিতে যে পানীয় ওষুধ ছিল তা দিল সুলতানকে পান করিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে সুলতান ঘুমিয়ে পড়লেন। সাতঘণ্টা পরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন দেখা গেল, দেহে তাঁর রোগের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তাই নয়।—তিনি রোগের আগে যেমন ছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি সুস্থ ও সবল।

সুলতান সুস্থ হওয়ায় রাজধানীতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল— রাস্তা ঘাট বাড়ি সব ফুল আর পতাকায় সাজানো হল, চলল নাচ গান তামাসা।

এরপর সুলতান সুস্থ হয়েছেন বুঝে উজির সাপের রাণীর নির্দেশ মত রূপোর ছিপি খুলে ভেতরে পানীয়টা যেই নিজের গলায় ঢেলে দিলেন অমনি শিশিটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহটাও প্রাণহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল: আর কোন দিন তাঁর দেহে কোন অসুখ করবে না—সাপের রাণী তা-ত বলেই দিয়েছিলেন।

উজিরের মৃত্যুতে সুলতান ও তাঁর আমীর ওমরাহরা শোক-পর্ব পালন করলেন। এরপর সুলতান হাসিবকেই বসাতে লাগলেন তাঁর পাশে। শুধু তাই নয়, এক সঙ্গে বসে খানাপিনা, নানা আলোচনা। কিছুদিন এই রকম যাবার পরই সুলতান বুঝলেন দানিয়েলের বেটা হাসিবের মত বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক তাঁর রাজ্যে ত ভাল, দুনিয়ায়ই বুঝি নেই! এই বোঝার পরই তিনি তাঁর আমীর, ওমরাহ, লস্করদের ডেকে বললেন—এই দানিয়েল সাহেবের বেটা হাসিব আমায় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করেছে, তা ছাড়া এতদিন আমি এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম—সব বিষয়ে এর অগাধ জ্ঞান। এই জন্য একে আমি আমার প্রধান উজির করে নিচ্ছি। এখন থেকে একে মান্য করলেই আমাকে মান্য করা হবে—এর হুকুম তামিল করলেই—আমার হুকুম তামিল করা হবে—।

সমবেত আমীর ওমরাহরা শুনে বললেন—বহুৎ খুব, বহুৎ খুব।

দানিয়েলের বেটা হাসিব উজির হয়ে তার মা-বউ নিয়ে এরপর বেশ সুখে শান্তিতেই তার জীবন কাটিয়েছিল আর সব কিছুতে তার সমান এলেম দেখে রাজ্যে সবাই বলাবলি করত—যেমন বাপ তার তেমনি বেটা।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বললে, বেশ লাগল তোর এ গল্পটি দিদি।

শাহরাজাদী বললে, গুলাবকলি আর জাহানখুশের গল্প এর চেয়েও ভাল, আর একদিন যদি আয়ু থাকে আমার তা হলে কাল শোনাতে পারি সে গল্প।

শুনে শাহরিয়ার মৃদু হেসে বললেন, গল্প শুনিয়ে যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছ আমায়, তাতে—যাক কাল শুনিয়ো আমাদের সে গল্প।

গুলাবকলি ও জাহানখুশের কাহিনী

পরদিন শেষ রাত্রে সুলতান শাহরিয়ারকে তসলিম করে শাহরাজাদী তার সেই গল্প বলতে আরম্ভ করলে—

অনেক—অনেক দিন আগে সামিখ নামে এক সুলতান ছিলেন। তাঁর প্রধান উজিরের নাম ছিল ইব্রাহিম। এই উজিরের একটি মেয়ে ছিল—নাম ছিল তার গুলাবকলি। এমন সার্থক নাম দুনিয়ায় খুব কম মেয়েরই হয়, কারণ গুলাবকলি যেমনি দেখতে তেমনি তার বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, শিল্পজ্ঞান। তার এই সব গুণে মুগ্ধ হয়ে সুলতান সামিখ নিজের বাড়ির প্রতি উৎসবেই তাকে পাশে বসিয়ে খানাপিনা করতেন।

সুলতান প্রতি বছরই শরৎকালে একটা খেলার আয়োজন করতেন, এতে যোগ দিত তাঁর দরবার আর সেনা বিভাগের উচ্চপদস্থ তরুণের দল। খেলাটা হচ্ছে খোলা ময়দানে ঘোড়ায় চড়ে ডাণ্ডা আর গোলা নিয়ে।

একবার শরৎকালে এই রকম খেলা শুরু হয়েছে। সুলতান ময়দানের একপাশে লাল রেশমী কাপড়ের তাঁবুর নীচে বসে এক মনে দেখছেন। খেলার মাঠ উজিরের বাড়ির একেবারে গা ঘেঁষে, তাই জানালার ধারে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বসে গুলাবকলিও দেখছে, তার পাশেই রয়েছে তার ধাইমা। একটি খেলোয়াড়ের অপরূপ সুন্দর মুখ, অঙ্গের গঠন আর খেলায় কেরামতি দেখে মুগ্ধ হয়ে আর থাকতে না পেরে গুলাবকলি তার ধাইমাকে বলে উঠল—চাচী বলতে পার ঐ ছেলেটি কে?

কোন ছেলেটি, রে বেটী?

ঐ যে সুন্দর ছেলেটি গো।

ওরা সবাই সুন্দর রে মা, কোনটি ছেড়ে কোনটি দেখাচ্ছিস তুই বুঝতে পারছি না আমি!

আচ্ছা, বসো,—খেলার শেষে এই পথেই ত একে একে যাবে ওরা তখন দেখাব।

কিছুক্ষণ খেলার পর খেলা যখন ভেঙে গেল তখন খেলোয়াড়েরা ঘোড়ায় চড়ে একে একে গুলাবকলির জানলার সামনে দিয়ে যেতে লাগল। গুলাবকলি যে তরুণের পরিচয় জানতে চাইছিল—ঘোড়ায় চড়ে সে ওর জানলার কাছ দিয়ে যেতেই গুলাবকলি উপর থেকে একটা আপেল ফেলে দিল ঠিক ওর সামনে। তরুণ থমকে উপরের দিকে চাইতেই দুজনের চোখোচোখি হয়ে গেল। দুই জনের কেউই যেন নিজের চোখ আর ফিরাতে পারে না।

ছেলেটি চলে গেলে গুলাবকলি তার ধাইমাকে বললে দেখলে ত! এই ছেলেটির কথা বলছিলাম আমি। চেন ওকে?

এতদিন আছি আমি এখানে ওকে চিনব না! লোকে ওকে জাহানখুশ বলে—ওর আসল নাম আনসল উজুদ, সুলতান বড়ই পেয়ার করেন ওকে,—একটা সৈন্য দলের নেতা।

গুলাবকলি তখন নিজের মনেই বলে চলেছে, দিলখুশ, খাশা নাম রাখা হয়েছে ত—লোকের রুচির তারিফ করতে হয়।

গুলাবকলি আর আনসলের ঐ যে চোখোচোখি হয়ে গেল, এর পর থেকে ওদের কেউই আর সাবেক মানুষ রইল না। ধাইমা ত গুলাবকলির রকম সকম দেখে একরকম ভড়কেই গেল। মেয়ের নাওয়া খাওয়ার দিকে মন নেই, আগেকার মত আবদার করে কথা বলা নেই, দিনরাত জানলার ধারে বসে কি যেন ভাবে, মাঠের দিকে—আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন বেশ একটু দূরে লুকিয়ে থেকে দেখলে—মেয়ে একটা চিঠির কাগজের উপর কি লিখছে! বুঝতে বাকী রইল না ধাইমার—এ কি!

গুলাবকলি জাহান খুশের কাছে চিঠি লিখল বটে; কিন্তু ভেবে পায় না এ চিঠি তার কাছে পাঠাবে কি করে! যাকে তাকে ত আর এ কথা বলা যায় না, তা ছাড়া আনসলের মনও তার জন্যে এমন ছটফট করছে কি না, তা না জেনেই বা পাঠাতে যাবে কেন সে!

অনেক ভেবে চিন্তে কিছু বুঝতে না পেরে তখনকার মত চিঠিখানা বালিশের নীচে রেখে দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে। দূরে দাঁড়িয়ে ধাই-মা সবই দেখলে।

পরদিন ভোরে গুলাবকলি ঘুম থেকে উঠে জানলার ধারে বসে গালে হাত দিয়ে যখন ময়দানের দিকে চেয়ে ছিল, তখন ধাই-মা হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে তাকে ডাকলে—বেটী।

চমকে ফিরে তাকাল গুলাবকলি।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোকে। আমি তোর ধাই-মা, মায়ের সামনে, সাচ বাত বলবি, ঝুটা বলবি না।

কি কথা—বলো ?

কি হয়েছে তোর আমায় খুলে বল, তোর ভাল হবে। এই কয়দিন ধরে দেখছি তোর ভাল করে গোসলকরা নেই, ঘুমের মাঝে চমকে উঠিস, মুখখানা চুপসে গেছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে, আমার ত দেখেশুনে কিছুই ভাল লাগে না।

কিছুই ত হয় নি আমার, ও তোমার চোখের ভুল।

ধাই-মা এবার একটু কৌশল অবলম্বন করলে; কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—ছাখ, গেল রাত্রে আমি এক তাজ্জব খোয়াব দেখেছি: দেখলাম পীরের মত দেখতে এক শেখ এসে আমায় বলছেন—আল্লার ইচ্ছে তোমার গুলাবকলি আর জাহানখুশ এক সঙ্গে ঘর বাঁধে। তুমি যদি এর যোগাযোগ করে দাও তা হলে তোমার ভাল হবে। আর তুমি চুপ করে থাকলে মাঝ থেকে বকশিশটা তোমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এদের দুটিকে তিনি এক সঙ্গে মিলাবেনই, এখন তুমি কি করবে বুঝে দেখ।

বুড়ীর কথা শুনে গুলাবকলির চোখদুটি ছলছলিয়ে এল, বুড়ীর অলক্ষ্যে তা মুছে সে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—চাচী, তুমি লোকের কথা গোপন রাখতে পার ?

তা আর পারি নে! আর তোর কথা গোপন রাখব না, কার

রাখব? আমার মত শুভাকাঙ্ক্ষিণী তোর কজন আছে! তুই নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বলতে পারিস আমার কাছে তোর মনের কথা।

গুলাবকলি ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—চাচী, আনসলের জন্মে আমি একখানা চিঠি লিখে রেখেছি। এটা যদি তুমি তার কাছে পোঁছে দাও তা হলে আল্লা তোমার অনেক ভাল করবেন। আর সে যদি এর কোন উত্তর দেয় তবে তা-ও তুমিই নিয়ে এস—এই বলে গুলাবকলি বালিশের নীচে থেকে চিঠিখানা নিয়ে তার হাতে দিলে।

বুড়ী চিঠি হাতে নিয়ে যথাস্থানে লুকিয়ে বললে আমি এক্ষুনি জবাব নিয়ে আসছি, যাব আর আসব।

বুড়ীর কাছে গুলাবকলির চিঠি পেয়ে জাহানখুশ ভেবে পেলে না সে খোয়াব দেখছে, না বেহেস্তে। সে সেটা পড়ে তখনই তার একটা জবাব লিখে দিল। গুলাবকলি জাহানখুশের চিঠি পেয়ে একবার বুকে একবার মাথায় রাখে, তারপর পড়ে আনন্দে কি করবে দিশে পায় না, একবার হাসে পরক্ষণেই চোখের জল ফেলে।

এই রকম কয়েকদিন চলবার পর একদিন ভোরে ধাই-বুড়ী গুলাবকলির চিঠি নিয়ে সবে হারেম থেকে বেরিয়েছে এমন সময় তার সামনে পড়ে গেল হারেমের এক রক্ষী খোজা।

এই বুড়ী, এমন সাত সকালে তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ?

শুনেই বুড়ী রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে জবাবদিহির জন্মে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে—হাঁ,—না,—এই এক্ষুনি আসছি, বাবা—মানে একটা জরুরী কাজ, বাধা দিও না—আসছি আসছি এক্ষুনি ফিরে আসছি আমি—বলে বুড়ী খোজার হাত থেকে তখনকার মত নিষ্কৃতি পেল বটে, কিন্তু ঐ ভড়কে যাবার সময়—কোন ফাঁকে তার জামা-কাপড়ের ভিতর থেকে গুলাবকলির চিঠিখানা মাটিতে পড়ে গেল, বুড়ী তা জানতে পারলে না।

বুড়ী চলে গেলে খোজা সে চিঠিখানা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে সোজা তার মনিব উজির সাহেবের কাছে গিয়ে সেটা তাঁর হাতে

দিলে : হুজুর আমি এই চিঠিখানা কুড়িয়ে পেলাম, দেখুন এতে কি লেখা আছে। ধাই-মা বুড়ী তাড়াহুড়া করে কোথায় বেরিয়ে গেল, বোধ হয় তারই জামাকাপড়ের মাঝ থেকে চিঠিখানা পড়েছে।

চিঠিখানা হাতে পেয়েই উজির সাহেব খুলে দেখেন—এ তার মেয়ে গুলাবকলির হাতের লেখা,—লিখেছে সে আনসল অজুদের কাছে। রাগে তাঁর গা থর থর করে কাঁপতে লাগল। চিঠির বিষয়-বস্তু পড়ে তিনি বুঝলেন চিঠি লেখালেখি বেশ কিছুদিন ধরে চলছে, ব্যাপার বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। রাগে দাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে তখনই তিনি চিঠি হাতে বৈঠকখানা ঘর থেকে উঠে অন্দরমহলে গুলাবের মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। গুলাবের মা স্বামীকে এই মূর্তিতে অসময়ে হঠাৎ অন্দরমহলে আসতে দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন : কি হল, এমন করছ কেন তুমি ?

উজির চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এই দেখ তোমার মেয়ের কীর্তি—পড়ে দেখ একবার চিঠিখানা।

চিঠি পড়ে গুলাবের মায়ের দুই চোখ জলে ভরে এল, কোন কথা বেরুল না তাঁর মুখ থেকে, স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তিনি কেবল চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

উজির তাকে ধমক দিয়ে বললেন—তুমি এখন কান্না থামাও ত, কি করা যায় তাই বলো। আনসল যদি আমাদের গুলাব-কলিকে সাদি করে বসে তাহলে সুলতানের রাগে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আনসলকে সুলতান নিজের বেটার চেয়েও বেশ পেয়ার করেন—আমি তাঁর নিজের মুখে শুনেছি তিনি কোন রাজার শাহাজাদীর সঙ্গে ওর সাদি দিতে চান।

গুলাবের মায়ের বোধহয় কথাটা শুনে আত্মাভিমানে আঘাত লাগল, তিনি তখনই বলে উঠলেন—আমার ধারণা সুলতানের মতলব অন্য ; আমাদের গুলাবকে তিনি যা পেয়ার করেন তাতে মনে হয় তাকে তিনি নিজেরই বেগম করে নিতে চান।

উজির বললেন—সে যাই হোক—আনসলের সঙ্গে গুলাবের

সাদি হলে সুলতানের রোষ থেকে কিছুতেই আমাদের নিস্তার নেই,—সুতরাং ওদের দুইজনের চিঠির আদানপ্রদান যাতে বন্ধ হয়, দেখাশুনা না হয় তার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। গুলাবকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও পাঠাতেই হবে। কিন্তু কোথায় পাঠানো যায় বলো ?—স্থানটা এমন হাওয়া চাই যে হাজার চেষ্টা করলেও আনসল যার সন্ধান না পায়।

গুলাবের মা কথাটা শুনে চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়েই বললেন, হাঁ, হয়েছে। তোমার মুখেই শুনেছি 'বাহর অল কুহুজ' সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে 'আম্‌মা' নামে এক পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের উপর আছে এক দুর্গ, তাতে কোন লোকজন নেই—দ্বীপেও নেই। আমার মনে হয় আমাদের গুলাবকে ঐ দুর্গে রেখে আসাই ভালো। বছর খানেকের খানা-পিনার ব্যবস্থা অবশ্য করে রাখতে হবে।—ফুরিয়ে গেলে আবার—।

স্ত্রীর যুক্তি উজিরের খুব মনে লাগল, তিনি অমনি বলে উঠলেন—ঠিকই বলেছ তুমি, আমি আজ তাকে ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

উজির তখনই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে তার লোকজনদের ডেকে ওখানে যাওয়ার তোড়জোড় করতে হুকুম দিলেন। তোড়-জোড় চলতে থাকলে উজির এক সময় মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন—বেটী,—কিছু দিন যাবৎ তোর শরীরটা বেশ একটু ভেঙে পড়েছে দেখছি—তাই হাওয়া পালটানোর জন্য দূরে একটা ভাল জায়গায় পাঠাচ্ছি আমি। তোর সুখসুবিধার সব রকম ব্যবস্থাই থাকবে সেখানে, ভাবিস নে তুই।

কথাটা শুনে মেয়ের মাথায় যেন একেবারে আকাশ ভেঙে পড়ল। মেয়েকে এই কথা বলার পরে উজির আর দাঁড়ালেন না সেখানে। গুলাবকলি সকল ব্যাপার বুঝে বিছানায় শুয়ে চোখের জলে শুধু বালিশ ভিজাতে লাগল: ধাই-মা পথে চিঠিখানা হারিয়ে ফেলেছে, সে খবর সে আগেই শুনেছে—বুঝলে সেই চিঠিই কি করে বাপের হাতে পড়েছে। আর রক্ষা নেই।

কিছুক্ষণ কাঁদার পর কোনরকমে উঠে গুলাবকলি আনসলকে আর একখানা চিঠি লিখল। ছোট্ট চিঠি,—বেশি লিখবার শক্তিও তার আর নেই—তারপর ধাই-মা ঘরে এলে চিঠিখানা তাকে দিয়ে বললে—কাল যখন হোক যেমন করে হোক—এই চিঠিখানা তার হাতে পোঁছে দেবে।

এদিকে যাত্রার আয়োজন শেষ হলেই উজির মেয়েকে বললেন প্রস্তুত হতে। মেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাপ মায়ের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আট বেহারার বড় তাঞ্জামে গিয়ে উঠল সঙ্গে একজন বাঁদী। রাত্রির অন্ধকারে মশাল জ্বেলে উট আর গাধার পিঠে তাঁবু, এক বছরের খাবার জিনিস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালপত্র বোঝাই করে খোজাবান্দা, বাঁদী, ছুতোর মিস্ত্রীর দল সেই তাঞ্জাম ঘিরে বাহর-অল-কুলুমের দিকে রওনা হয়ে গেল। উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরের ভিতর দিয়ে কয়েক দিন চলবার পর একদিন শেষে তারা বাহর-অল-কুলুমের তীরে এসে হাজির হল। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে ছুতোর মিস্ত্রীরা বন থেকে কাঠ কেটে এনে আম্‌মা পাহাড়ের দ্বীপে যাবার জন্যে মজবুত এক জাহাজ তৈরি করলে। গুলাবকলির সঙ্গের লোকজন তখন তাকে সেই জাহাজে চড়িয়ে উজিরের দেওয়া সংবৎসরের খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে সেই দ্বীপের দিকে রওনা হল। ওখানে পোঁছে আম্‌মা পাহাড়ের সেই দুর্গে গুলাবকলিকে এবং তার দেখাশুনা করবার জন্য খোজা বান্দা এবং বাঁদীদের রেখে উজিরের লোকজন জাহাজ নিয়ে ফিরে এল। এসেই তারা জাহাজখানা পুড়িয়ে ফেললে। উজিরের এই রকমই নির্দেশ ছিল।

এদিকে আনসল অজুদ সকালে নমাজ করে উঠে সুলতানের দরবারে যাবার আয়োজন করছে এমন সময় ধাই-বুড়ী এসে গুলাবের সেই চিঠিখানা তার হাতে দিল। কম্পিত হস্তে চিঠিখানা সে খুলে পড়ল। এ চিঠিতে বেশি কিছু লিখতে সুযোগ পায়নি গুলাব, শুধু লিখেছে : আল্লা আমাদের সকল আশায় বাদ সাধলেন—

বাপজান আমায় আজ দূরদেশে পাঠাচ্ছেন।—কোথায় তা আমি কিছুই জানি না, জীবনে তোমায় আর একবার হয়ত দেখতেও পাব না।

চিঠিটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আনসল মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ধাই-বুড়ী অনেক চেষ্টায় তার চৈতন্য ফিরিয়ে এনে দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেলেই চলে গেল—ধরা পড়বার ভয়ে বেশিক্ষণ থাকবার তার সাহস নেই—লুকিয়ে এসেছে সে। বুড়ী চলে গেলে ঘরে দরজা দিয়ে আনসল কেবল কাঁদতে লাগল। স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারে না সে, ঘরের মাঝে দ্রুত পায়চারি করে, মাথার চুল ছেঁড়ে—আর চোখের জল ফেলে। এমনি করে সারা দিনটা কেটে গেল—খানাপিনা কিছুই করলে না। রাত্রে চারিদিক নিশুতি হলে গুলাবকলির জন্যে অস্থিরতা তার আরও বেশি বেড়ে গেল। দরবারে যাবার জন্যে সকালে যে দামী রেশমী জামাকাপড় সে পরেছিল সেগুলো গা থেকে খুলে, ছিঁড়ে—ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরবেশ ফকিরের পোশাক পরে সে পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল—তামাম দুনিয়া টুঁড়ে গুলাবকলির পাত্তা সে বের করবেই। কোথায় কোনদিকে সে গেছে তা জানা নেই, তখন সব দিকই তার কাছে সমান, সুতরাং দু'চোখ যে দিকে যায় সেই দিকেই সে চলতে লাগল। সারারাত পাগলের মত—মাতালের মত সে পথ চললো। দিনের আলো দেখা দিল তখনও সে চলেছে। কত জনপদ, নদী-নালা, বন-জঙ্গল সে পার হল, পার হল কত মরুভূমি। হেঁটে হেঁটে পায় ব্যথা হয়ে গেল, ফুলে গেল, ঘুম নেই—গোসল নেই, পথের আশেপাশে কোন ফল পেলে কোনদিন খায়, নইলে খাওয়াও নেই। পথে কারো সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে গুলাবকলির কথাঃ বহু উট ঘোড়া নিয়ে যাত্রীদলের মাঝে তাঞ্জাম-চড়া কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখছে কি তারা? সবাই বলে—না।

এমনি করে মাস দুয়েক হাঁটবার পর তার সামনে পড়ল এক বন। বনটায় খাবার যোগ্য অনেক ফল—পাশ দিয়ে ঝিরঝির

করে একটা ঝরনাও বয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত আনসল একটা গাছ থেকে কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেয়ে ঝরনার জল পান করে একটা গাছের ছায়ায় বসলে একটু জিরিয়ে নেবে বলে। যেমনি বসা অমনি সামনে চোখ পড়তে দেখে অতি ভংয়কর এক সিংহ গজরাতে গজরাতে এসে ওঁৎ পাতল তাকে ধরবে বলে।

এ আল্লা, গেছি,—বলে আনসল তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—আল্লা,—তুমিই বল, তুমিই ভরসা। আল্লাকে স্মরণ করে আনসল মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হতে যাচ্ছিল—তখনই মনে পড়ল সে অনেক কেতাবে পড়েছে—স্তুতিতে অনেক সময় সিংহের মন গলে, তখন হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে তারা পরম মিত্র হয়ে যায়। এই কথা মনে হতেই সে সিংহের সামনে নতজানু জোড়হাত হয়ে বলতে লাগল—হে বনজঙ্গল মরুপ্রান্তরের অধীশ্বর, হে পশুর সুলতান, তুমি আমায় দয়া কর, তুমি মহাবিক্রম, মহানুভব, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি আমার ভালবাসার জনকে হারিয়ে মরতে বসেছি—তুমি তাঁর খোঁজ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও। দেখছ ত আমার হাল—হাড়ের উপর কেবল চামড়ার ছাউনি, আমায় খেতে গেলে তোমার শত্রুরা হাসবে, ভাববে জবরদস্ত কোন জীবকে তুমি আর ঘায়েল করতে পার না। অবশ্য মরণের ভয়ে যে আমি এ কথা বলছি তা নয়, কারণ তোমার নখরের চেয়ে আমার নসিবের নখর অনেক বেশি ধারাল।

অনুনয়ের সুরে জাহানখুশের মুখে—এই সব কথা শুনে পশুরাজের মন গলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তার ভয়ংকর মূর্তি অনুকম্পায় কোমল হয়ে এল। সে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে জাহানখুশের দিকে চেয়ে থাবা উঁচিয়ে তাকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে চলতে সুরু করল। আনসল তার পিছু পিছু চলতে লাগল। সিংহ বনের বড় বড় গাছের ভিতর দিয়ে চলে তাকে নিয়ে এসে হাজির হল এক মরুভূমিতে। সেখানে এসে পায়ের থাবা দিয়ে দেখাল

অনেক উট ঘোড়া সমেত এক বড় যাত্রীদলের পায়ের দাগ। দাগ দেখেই স্পষ্ট বুঝা যায় যাত্রীদল কোন দিকে গেছে।

আনসল খুশী হয়ে সিংহকে সেলাম জানিয়ে সেই পায়ের দাগ দেখে দেখে চলতে শুরু করল, মনে মনে বলতে লাগল—খোদা মেহেরবান। এই দুর্গম মরু পথে দু'দিন অনাহারে চলে সে এক সমুদ্রতীরে এসে হাজির হল। সেখানে এসে—যাত্রীদল সেখানে যে তাদের তাঁবু খাটিয়েছিল, সেখানে যে তাদের জাহাজটা পুড়িয়ে ফেলেছে—সে সবের চিহ্নই সে স্পষ্ট দেখতে পেল। ওরা যে ফিরে গিয়েছে—পায়ের দাগে যে চিহ্নও আঁকা দেখতে পেল আনসল। বুঝতে বাকী রইল না তার—এই সমুদ্রেরই কাছাকাছি কোন দ্বীপে গুলাবকে তারা রেখে গেছে—কিন্তু কেমন করে যাবে সে সেখানেঃ জাহাজ বা নৌকা কোন কিছুই যে নেই এখানে। জনমুনিষ্যিও নেই—যে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। নিতান্ত হতাশ হয়ে সমুদ্রতীরে বালুর উপরে গালে হাত দিয়ে বসে সে ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই—পাশের একটা পর্বতের গুহা থেকে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলে সেঃ কে যেন উচ্চ কণ্ঠে নমাজ পড়ছে। 'আল্লাহমদুলিল্লা'—বলে জাহানখুশ তখনই এগিয়ে গেল সে গুহার সামনে, গিয়ে দেখে পীরের মত সৌম্যমূর্তি শেখ একমনে পরম ভক্তিভরে নমাজ পড়েছেন। নমাজ শেষ হাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল আনসল। নমাজ শেষ করে শেখ যখন বাইরের দিকে তাকালেন তখনই আনসল—তাঁকে সেলাম জানালে, শেখও তাকে সেলাম জানিয়ে তার আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ করলেন।

আনসলের ফকির দরবেশের বেশ দেখে তাকে তাই মনে করেছিলেন। তাকে পথশ্রমে কাতর এবং ক্ষুধার্ত দেখে শেখ গুহায় যে ফলমূল ছিল তা খাইয়ে তাকে একটু সুস্থ করবার পর যখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন তখন আনসল কোন কিছু না লুকিয়ে নিজের বিষাদের কাহিনী তাঁর কাছে সমস্ত বিবৃত করলে। শুনে ধর্মপ্রাণ শেখের চোখ ছলছলিয়ে এল। পরক্ষণেই নিজেকে

সামলে নিয়ে বললেন—বাপু হে—পুরো বিশ বছর আমি এখানে আছি,—কোন জনমুনিষ্যির সাক্ষাৎ পাই নি—বনের পশু পাখীই কেবল আমার সাথী। কিন্তু এই কিছুদিন আগে আমি আমার এই গুহা থেকেই দেখলাম—একদল লোক অনেক উঁট ঘোড়ার পিঠে অনেক জিনিসপত্তর নিয়ে এখানে এই সমুদ্রতীরে এল, তাঁবু খাটিয়ে কয়েকদিন থেকে মিস্ত্রীদের দিয়ে একখানা জাহাজ তৈরি করে তাতে চড়ে কাছের কোন দ্বীপে গেল, কয়েকদিন পরে তাদের কেউ কেউ ঐ জাহাজে করেই আবার এখানে ফিরে এল, তারপর জাহাজটা পুড়িয়ে তারা এখান থেকে চলে গেল।

ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে জাহানখুশ বললে—তাদের মাঝে কোন জেনানা দেখেছিলেন, জনাব,—কোন তাঞ্জাম?

হাঁ—তাও দেখেছি। এক তাঞ্জামে হয়ত কোন বড়ঘরের মেয়েই ছিল, তা ছাড়া অনেক বাঁদী।

শুনে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো আনসল, বললে—আপনার মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন: যার খোঁজে বেরিয়েছি আমি—তাকেই ওরা ঐ জাহাজে করে কাছের কোন দ্বীপে রেখে এসেছে। কিন্তু কি করে এই সাগর পার হয়ে আমি তার কাছে যাব—নৌকো জাহাজ ত কিছুই এখানে নেই?

আনসলের কথা শুনে শেখ চোখ বুজে একটু কি যেন ভেবে নিলেন তারপর বললেন—তুমি এক কাজ করো: সমুদ্র তীরে অনেক তাল গাছ আছে, তার নীচে অনেক আঁশ পড়ে আছে দেখতে পাবে। তুমি ওখান থেকে যত আঁশ পার কুড়িয়ে নিয়ে এস আমার কাছে তারপর আর কি করতে হবে বলে দেব।

আনসল তখনই গিয়ে সমুদ্র তীর থেকে অনেক তালের আঁশ কুড়িয়ে নিয়ে এল। শেখ সেগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি করলেন, সেই দড়ি দিয়ে করলেন মস্ত একটা জাল। এরপর শেখ আনসলকে বললেন—সমুদ্র তীরের উপরেই যে সব ক্ষেত রয়েছে

খাওয়ার আগেই আনসল খোজাকে জিজ্ঞাসা করলে—জনাব, এ দুর্গের মত মজবুত বাড়িটা কার—কে তৈরি করেছে—আছেই বা কারা?

এ বাড়ি কে কবে তৈরি করেছে—কেউ তা বলতে পারে না। জনমুনিষ্যি ছিল না এ বাড়িতে, এ দ্বীপেই ছিল না—তা এ বাড়িতে! আমারাই প্রথম এসেছি এখানে। আমাদের মনিব উজির তাঁর মেয়েকে নিরাপদে স্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখবেন বলে কিছু বান্দা-বাঁদী আর আমাকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে এই বাড়িতে রেখে গেছেন।

এই কথা শুনে আনসল বুঝলে খোদা এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন, এ তার গুলাবকলি না হয়ে যায় না। অনেক দিন পরে সে পরম স্বস্তির সঙ্গে তৃপ্তির সঙ্গে, প্রহরীর দেওয়া খানা খেলে, সরবৎ পান করলে।

এদিকে নসিবের এমনি ফের যে যখন সে প্রহরীর ঘরে বসে নিশ্চিন্তে খানাপিনা করছিল তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেল—

আম্মা পাহাড়ের এই নিরালা বাড়িতে নির্বাসিতা হয়ে গুলাব-কলির মন জাহানখুশের জন্য এমন কাতর হয়ে পড়েছিল যে প্রতিদিনই তার মনে হত সে ঐ বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তা আর না করে অনেক ভেবে চিন্তে সেইদিনই সে এক কৌশল করলে: তার যত হীরে আর মণিরত্নের অলংকার ছিল, সে সব পরে, যত রেশমী জামা কাপড় ছিল তার একটা পোঁটলা বেঁধে সবার অলক্ষ্যে সে ঐ বাড়ির ছাদে গিয়ে হাজির হল। তারপর রেশমের পোশাকগুলির একটির সঙ্গে আর একটি পরপর গেরো দিয়ে মস্ত এক দড়ির মত করলে—এবং তারই এক প্রান্ত ছাদের আলসের গুলি চালানোর দুই ছেঁদার মাঝে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে তাই বেয়ে বেয়ে নেমে এল, তারপর অপরের অলক্ষ্যেই সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের তীরে এসে হাজির হল।

দুনিয়ায় সবই আল্লার মর্জি—আল্লার কুদরত: সেই সময় কোত্থেকে এক জেলে এসে ঐখানেই মাছ ধরছিল, চোখ ঝলসানো

রত্নালংকার পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে দেখে এ'কোন পরী-টরী হবে মনে করে ভয়ে পেয়ে সে তার নৌকা বার দরিয়ায় নিচ্ছিল, গুলাবকলি তাকে ডাকলেঃ ও ভালমানুষের বেটা তুমি পালিয়ে যেও না—আমি কোন ভূতপ্রেত জিনপরী নই—তোমাদেরই মত মানুষ, বড় কষ্টে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছি, তোমার নৌকোয় আমার একটু স্থান দাও, আমি এখান থেকে পালাতে চাই। আমার ভালবাসার জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে লোকে আমায় এখানে বন্দী করে রেখেছে। আল্লার দোহাই তুমি এখান থেকে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করো বাপু, আমি তোমায় অনেক দামী মণিরত্ন বকশিশ দেব।

শুধু বকশিশের লোভে নয়, জেলে মেয়েটির কথা শুনে যখন বুঝল সে ভূতপ্রেত, জিনপরী কিছু নয়—মানুষ, তার পেয়ারের জনকে হারিয়ে কষ্ট পাচ্ছে তখন তার মনে বিস্মৃতপ্রায় অবলুপ্তপ্রায় একটা সত্তা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলঃ নিজেরও একদিন যৌবন ছিল, এ বেদনা সে জানে, তাই ক্ষণ বিলম্ব না করে তখনই সে নৌকো কূলে এনে গুলাবকলিকে তাতে তুলে নিল। নৌকো তীর ছেড়ে কিছুদূর যেতেই এক পাগলা ঝড়ো হাওয়া উঠল সমুদ্রে। জেলে তার নৌকা আর নিজের খুশিমত চালাতে পারল না, নসিবে যা আছে, আল্লা যা করেন ভেবে জেলে তার নৌকার হাল ছেড়ে দিল। ঝড়ের খেয়াল খুশিমত তাড়িত হয়ে তিনদিন তিনরাত্রি পরে নৌকো এমন রাজ্যে গিয়ে হাজির হল যেখানে জেলে কোনদিন আসেনি। যাই হোক নৌকো তীরে নোঙর করল জেলে। তার ঠিক উপরেই ও রাজ্যের সুলতান দরবাসের প্রাসাদ। সুলতানের সিংহের মত বিক্রম, তাই তাঁর এই নাম। নৌকোটা যখন তীরে লাগে তিনি তখন সমুদ্রের দিকে মুখ করে জানলার ধারে বসেছিলেন, গুলাবকলিকে দেখেই তাঁর মনে হল—এ কোন সুলতানের বেটী না হয়ে যায় নাঃ এমন রূপ, এমন মণিরত্নের অলংকার গায়ে! জেলের নৌকোয় কি করে এল এ! কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তিনি তখনই তাঁর

প্রাসাদ থেকে নেমে নৌকোর কাছে এসে হাজির হলেন। গুলাবকলি ঘুমিয়েছিল, সুলতানকে জেলের সঙ্গে কথা বলতে শুনে চোখ মেললো। সুলতান অমনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি—এখানে কি করে এলে, কেন এলে ?

সুলতানের কথার সুরে দরদী মনের আভাস পেয়ে গুলাবকলির দুই চোখ জলে ভরে এল, সেই অবস্থায়ই সে সুলতান দরবাসকে বললে—জাহাঁপনা, আমার নাম গুলাবকলি। সুলতান সামিখের প্রধান উজির ইব্রাহিম সাহেবের বেটী আমি ; আমি কেন এখানে এসে পড়েছি সে বড় দুঃখের কাহিনী তা আর শুনতে চাইবেন না আপনি।

তা হোক, তুমি বলো, দেখি আমি যদি তোমার সে দুঃখ দূর করতে পারি।

সুলতানের হাবভাব ও কথা গুলাবকলির অন্তর স্পর্শ করল। সে তখন চোখের জলে ভেসে তার সমস্ত কাহিনী সুলতানের কাছে অকপটে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত করলে। শুনে দরবাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তুমি আমার সঙ্গে এস, আমার নিজের বেটীর মত থাকবে আমার বাড়ীতে, আমি তোমার জাহানখুশ আনসল অজুদকে আনতে এখনই লোক পাঠাচ্ছি সুলতান সামিখের কাছে, আশা করি তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না, তুমি চোখের জল মুছে আমার সঙ্গে এস, মা।

সুলতানের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে গুলাবকলি চোখের জল মুছে জেলেকে কয়েকটা মূল্যবান রত্ন উপহার দিলে। জেলে মহা খুশী হয়ে গুলাবের জন্য আল্লার অনেক দোয়া মেগে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল। সুলতান দরবাস সস্নেহে গুলাবের হাত ধরে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এসে গোসল করিয়ে দামী জামাকাপড় পরিয়ে তখনই তার ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তখনই তাঁর প্রধান উজিরকে ডেকে বললেন—শোন উজির, তুমি এখনই দশটা উটের পিঠে মণিরত্ন, রেশমী কাপড় ইত্যাদি করে

নানা উপহার সাজিয়ে বিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে সুলতান সামিখের রাজ্যে রওনা হয়ে যাও, সেখানে গিয়ে সামিখকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবে—তিমি তোমাদের সঙ্গেই যেন তাঁর সেনাবিভাগে কাজ করে আনসল অজুদ বলে যে তরুণটি তাকে পাঠিয়ে দেন, আমার বেটীদের মাঝে সবচেয়ে যে খুবসুরত তার সঙ্গে তার সাদি দেব।

যো হুকুম খোদাবন্দ—বলে উজির চলে যাচ্ছিলেন, দরবাস তাঁকে আবার ডেকে বললেন—শোন, এই আনসলকে তোমার আনা চাই-ই চাই, তাকে যদি না আনতে পার তুমি, তা হলে তোমার উজিরি আর থাকবে না, শুধু তাই নয়, দেশ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দেব।

আবার যো হুকুম—বলে উজির সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দশ উটের পিঠে বহু মূল্যবান উপহার সাজিয়ে বিশ অশ্বারোহী প্রহরী নিয়ে নিজে একটা তাজী ঘোড়ায় চড়ে সুলতান সামিখের রাজ্যে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে সুলতান সামিখকে উপহার গুলি দিয়ে সুলতান দরবাসের প্রস্তাবের কথা বললে সামিখ মাথায় হাত দিয়ে মুখ নীচু করে বললেন ঃ

মহাপরাক্রান্ত সুলতান দরবাসের হুকুম আমি এখনই তামিল করতাম, তাঁর বেটীর সঙ্গে আনসলের সাদি—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে, কিন্তু নসিব মন্দ। আনসল কয়েক মাস আগে যে কোথায় গেছে কেউ তা বলতে পারে না। আমি নানাদেশে লোক পাঠিয়ে তার কত খোঁজ করেছি, কেউ তার পাত্তা আনতে পারলে না।

সামিখের কথা শুনে উজির মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ঃ নসিব আমারই জবর মন্দ, জাহাঁপনা, তাকে না নিয়ে ত আমি দেশে ফিরতে পারব না, সুলতান দরবাস তা হলে আমায় আস্ত রাখবেন না। তাই আপনার এখান থেকে আমি আজই রওনা হচ্ছি, দেশে দেশে তাকে খুঁজে বেড়াব, দেখি আল্লা যদি একবার মুখ তুলে চান, কোথাও গিয়ে যদি তার পাত্তা পাই।

সামিখ বললেন, তাই যদি করতে চান আপনি, তা হলে আমার প্রধান উজির ইব্রাহিমকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, ইনি আপনাকে আনসল অজুদের খোঁজে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন।

তাই ঠিক হল—সেইদিনই কোন রকমে খানাপিনা সেরে ইব্রাহিম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে উজির সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

অনেক দেশ অনেক রাজ্য ঢুঁড়লেন তাঁরা, কোথাও আনসলের দেখা পেলেন না। অবশেষে ইব্রাহিম সদলবলে সুলতান দরবাসের উজিরকে নিয়ে এলেন আমৃমা পাহাড়ের দ্বীপেঃ এইখানে আমার মেয়ে গুলাবকলি থাকে, আনসলকে সে গোপনে সাদি করে পালিয়ে যাবে ভয়ে—তাকে দূরে এই নিরালা জায়গায় রেখেছি আমি। বেরিয়েছি যখন তখন তাকে একবার দেখে যাই, দিলটা আমার খুশী হবে, তা ছাড়া আনসলের খোঁজ করাও হবে।

এই বলে পাহাড়ে উঠে প্রাসাদের সদর দরজায় ঘা দিলেন ইব্রাহিম। প্রহরী দরজা খুলে উজির ইব্রাহিমকে দেখে তাঁর কর চুম্বন করে সবাইকেই ভিতরে আসতে দিল। ভিতরে ঢুকেই প্রথমে ইব্রাহিম আনসলকে দেখতে পেলেন। গুলাবকলি পালিয়েছে শুনে আনসল রুক্ষ কেশে মলিন বেশে মন খারাপ নিয়ে প্রাসাদের বার মহলের একটা গাছের নিচে বসেছিল, জীর্ণশীর্ণ আনসলের ফকিরের বেশ, সুতরাং চিনতে পারলেন না তাকে। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে বটে, আমি যাদের পাঠিয়েছি তাদের কেউ ত এ নয়!

না, হুজুর ইনি ইস্পাহানের একজন ফকির, খুব উঁচুদরের ফকির, কারো সঙ্গে কথা বড় বলেন না, সব সময় আল্লার চিন্তা নিয়েই আছেন।

এরপর ইব্রাহিম নিজের মেয়েকে দেখবেন বলে যখন কেল্লার ভিতরে ঢুকলেন, তখন বান্দা বাঁদীরা ছুটে এসে সেলাম করে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমাকে আমার বেটীর ঘরে নিয়ে চল।

ওরা নড়ে না, কথাও বলে না।

কি, কথা বলছ না যে,—নিয়ে চল।

গুলাবের খাস বাঁদী তখন বললে, হুজুর, কি বলব—আমাদের নসিব, গুলাবকলি বিবিসাহেবের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় যে তিনি গেলেন, কি করে গেলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।

দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইব্রাহিম সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—চলো আমি খুঁজে দেখব। এরপর ইব্রাহিম সাহেব অন্দর সদর সব মহলের প্রতি কামরা দুর্গের আনাচ-কানাচ সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। না, কোথাও গুলাব নেই। তখন তিনি সুলতান দরবাসের উজিরকে বললেন—ভাই সাহেব, এবার আপনি আনসলকে আর আর রাজ্যে খুঁজে দেখুন, আমি আর আপনার সঙ্গে থাকতে পারছি না—আমি একবার দেশে ফিরে গিয়ে দেখি, মেয়ে বাড়ি ফিরল কি না।

দরবাসের উজির বললেন—তাই ত, বড় মুশকিল হল ত! আনসলকে না নিয়ে সুলতানের কাছে গেলে ত আমার নিস্তার নেই। তারপর একটু কি ভেবে বললেন—আমি এই ইস্পাহানের ফকির সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে যাই, ইনি ধার্মিক লোক, ইনি বলে কয়ে যদি আমার উপর সুলতানের গোসা একটু কমাতে পারেন।

উজির আনসলের কাছে এ প্রস্তাব দিলে আনসল আর তাতে 'না' করল না। গুলাব যখন এখানে নেই, তখন দুনিয়ার সব দেশেই তার কাছে সমান।

দুই উজিরই তখন তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে দ্বীপ ছাড়বার জন্য একই জাহাজে রওনা হলেন, অপর তীরে এসে দুইজন নিজের নিজের দেশের পথ ধরলেন।

সুলতান দরবাসের উজির জানেন না যে—যে ফকিরকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন সেই আনসল। আনসলও জানে না—উজির তাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে—সেইখানেই তার গুলাব আছে। উজিরের মনে উদ্‌বেগের সীমা নেই। সে উদ্‌বেগ আর চেপে

রাখতে না পেরে ফকিরের কাছে বলে একটা যুক্তি নেওয়া সাব্যস্ত করলেন তিনি: ফকির ধার্মিক লোক, আল্লার দোয়ায় অনেক সময় ওঁরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। বলেই দেখা যাক না, কি বলেন উনি!

রাজধানীর প্রায় কাছাকাছি এসে গেছেন তখন ওঁরা। উজির বললেন—ফকির সাহেব, একটা পরামর্শ চাই আপনার কাছে।

কি?

ব্যাপারটা তুচ্ছ—আমার মনিব সুলতান একটা কাজের ভার দিয়েছিলেন আমার উপর, সে কাজটা যদি না করে আসতে পারি তা হলে আমায় শহরে ঢুকতে মানা করে দিয়েছেন তিনি। কাজটা আমি করে উঠতে পারিনি, কি করি বলুন ত?

কি কাজ?

উজির তখন সমস্ত ব্যাপার তাকে খুলে বললেন। শুনে আনন্দে আনসলের বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু বাইরে নিজেকে সে ঠিক রেখে বললে—আপনি ঘাবড়াবেন না, আমাকে সুলতানের সামনে নিয়ে চলুন, আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, আনসলকে আমি সুলতানের সামনে হাজির করতে পারব।

উজির আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলেন—সত্যি বলছেন আপনি?

খোদার কসম নিয়ে বলছি।

উজির তখন বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ফকিরকে নিয়ে সুলতানের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। সুলতান উজিরকে দেখেই বলে উঠলেন—কই জাহানখুশ কই, আনসল অজুদ?

উত্তর দিলেন ফকির: জাহাঁপনা, জাহানখুশ কোথায় লুকিয়ে আছে আমি তা জানি।

কোথায়?

খুবই কাছে, কিন্তু তাকে আপনার সামনে হাজির করবার আগে আমার জানা চাই—তাকে আপনার কি দরকার।

বেশ, বলছি আমি—বলে সুলতান দরবেশকে একটা নিরালা কামরায় নিয়ে গিয়ে আনসলকে তিনি কেন চান সে সব কথা খুলে বললেন। শুনে ফকির বললে বেশ, হাজির করছি আমি আনসল অজুদকে, কিন্তু তার আগে একটা কাজ করতে হবে আপনার?

কি?

আপনার নাপিতকে একবার পাঠিয়ে দেবেন এ ঘরে, তার সঙ্গে আপনার একটা ভালো পোশাক।

সুলতান গিয়েই তাঁর খাস নাপিত এবং তারই হাতে দামী একটা রত্নখচিত রেশমী পোশাক পাঠিয়ে দিলেন দরবেশের ঘরে। দরবেশ তার এতদিনের চুল-দাড়ি ছেঁটে গোসল করে যখন সেই দামী রেশমী পোশাকটা পরল তখন তার ভোল একেবারে পালটে গেল। আবার সে সুলতান সামিখের সাবেক সেনাধ্যক্ষ হয়ে গেল। এরপরেই নাপিতকে বিদায় দিয়ে সে সুলতান দরবাসের সামনে গিয়ে বললে—জাহাঁপনা, আপনার বান্দা আনসল অজুদ হাজির।

আনসলের চেহারা আর আদব কায়দা দেখে সুলতানের আর বুঝতে বাকী রহিল না—যে এই সত্যিকার আনসল, জাহানখুশ নাম এর ঠিকই রাখা হয়েছে। সুলতান খুশীমনে উঠে তখনই আনসলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গুলাবকলিকে খবর পাঠালে তখনই সে এসে হাজির হল। তারপর আনসলকে সুলতানের সামনে দেখেই সে একেবারে থ। এ কি হল, এ কি করে হল, বলে সে একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়েই যাচ্ছিল ভাগ্‌গিশ আনসল তখন তাকে ধরে ফেললে।

তারপর?

তারপর সুলতান দরবাস, ইস্পাহানের সুলতান সামিখ আর তাঁর উজির ইব্রাহিমকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন নিজের রাজধানীতেঃ আনসলকে খুঁজে পেয়েছেন তিনি, এবারে তাঁর মেয়ের বিয়ে।

নিমন্ত্রণ পেয়ে অনেক লোক আর উপহার নিয়ে সুলতান আর উজির হাজির হলেন। এতদিন পরে তাঁর প্রিয়পাত্র আনসলকে দেখে সুলতান সামিঁখ খুবই খুশী হলেন, আর উজির ইব্রাহিম ? ইব্রাহিম যখন দেখলেন সুলতান দরবাস যার বিয়েতে তাদের নিমন্ত্রণ করেছেন সে তাঁর নিজেরই মেয়ে গুলাব, তখন মেয়েকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে মাথায় অজস্র চুমু দিয়ে ঠিক পাগলের মত করতে লাগলেন।

তারপর ?

তারপর কাজী ডেকে সাক্ষী ডেকে সাদি হায় গেল দুজনের। এই উপলক্ষে দরবাসের প্রাসাদেই উৎসব চলল তিনদিন ধরে। তারপর উজির ইব্রাহিম তাঁর নিজের বাড়িতে জামাই মেয়ে এনে উৎসব চালালেন সাতদিন, আর সাতদিন চালালেন সুলতান সামিথ নিজে। কারণ, এযে তাঁর পেয়ারের সেনাধ্যক্ষ আনসলের বিয়ে।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বলে উঠল, খাসা তোর এ গল্পটা দিদি !

সুলতান শাহরিয়ারও মাথা দুলিয়ে দুনিয়ার কথায় সায় দিলেন।

ARABYA RAJANI (volume 10) by TARAPADA RAHA : Rs. 8·00

॥ আমাদের প্রকাশনার অন্যান্য কিশোর গ্রন্থ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
বাবুইয়ের অ্যাড্‌ভেঞ্চার
উপন্যাস। ৪·৫০

কারাজিন/
সরিৎশেখর মজুমদার
উড়ে চলি দক্ষিণে
সারসদের বিচিত্র অভিযান
কাহিনী। ৩·৭৫

জিলিয়াকাস/
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাকের কথা
ডাক-ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত। ৪·০০

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
অমর জহর
ছন্দে গাঁথা জহরলালের
জীবনী ১·০০

রসিক শাহ/
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
রক্তের রং লাল
রক্ত সংবহন। ১·৮০

রসিক শাহ/
যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বানর থেকে নর ?
বিবর্তনবাদ। ১·৮০

সোলি পাভরি,
রসিক শাহ/সন্ধ্যা দেবী
সত্যই, সব কিছুই
ভূ কেন্দ্রগামী
অভিকর্ষ। ১·৮০

সোলি পাভরি/
সন্ধ্যা দেবী
আমাদের
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধু
আর
শত্রুর দল
জীবাণুতত্ত্ব। ১·৮০

মিস বানু গোণ্ডা/
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
আমাদের
এশীয় প্রতিবেশী ঃ
ইরান
ইরান-পরিচিতি। ১·৮০

আরব্য রজনী

সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ঃ

...সুন্দর, স্বচ্ছন্দ।... [আনন্দবাজার]

...অভিনব, অনবদ্য।... [দৈনিক বসুমতী]

...সুন্দর ও সাবলীল।... [যুগান্তর]

...পড়তে পড়তে নেশা ধরে যায়।...[অমৃত]

...The stories are in clear and engaging Style... [Amrita Bazar Patrika]

আরব্য রজনী

আরবের বাদশাহী মহল থেকে ধূসর মরুপ্রান্তর পর্যন্ত একদিন যে গল্পের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার স্পর্শ আজও বিশ্বের রসিকচিত্তে অম্লান হয়ে আছে।

শাহরাজাদী বাদশার মুখোমুখি বসে শুরু করেছেন তাঁর গল্প। প্রাসাদ থেকে দেখা যাচ্ছে রহস্যময়ী রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশ। কিন্তু এই রাত্রির অবসানেই যে নেমে আসবে শাহরাজাদীর ওপর চির রাত্রির অন্ধকার! দিনের প্রথম আলোকে শাহরাজাদীকে বরণ করতে হবে মৃত্যু—এই হল বাদশাহী ফরমান।

ভোর হয়, তবু শেষ হয় না গল্প। বাদশাহের গল্প-পিপাসু মন বলে ওঠে—আরও আরও আরও। তাই সেদিনের মত রদ হয়ে যায় মৃত্যুর ফরমান।

এমনি করে গল্পের যাদুকরী শাহরাজাদী সৃষ্টি করে চলেন প্রতি রজনীতে এক একটি করে গল্পের যাদু-মহল। সে মহলের প্রতি কক্ষে অপেক্ষা করে থাকে অপার বিস্ময় আর রোমাঞ্চের শিহরণ। তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেন তাঁর শ্রোতাকে গল্পের সেই রহস্যপুরীর মধ্য দিয়ে।

তারপর যেদিন শেষ হল গল্প সেদিন কি নেমে এসেছিল শাহরাজাদীর ওপর মৃত্যুর খড়্গ, না অপেক্ষা করেছিল কোন অভাবনীয় পুরস্কার?

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার

বৈশাখ, ১৩৮৩ : এপ্রিল, ১৯৭৬

প্রকাশক :

ডি. মেহ্‌রা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০১২

৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১

১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪

৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :

সুধীন ভট্টাচার্য

মুদ্রক :

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী

ভারত মিহির প্রেস

৮৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : আট টাকা

॥ আদিকথা ॥

প্রতারণা আর বেইমানি জগতে কেউই বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেটা আসে প্রিয়জনের কাছ থেকে। জীবনে সবচেয়ে যাকে বেশি ভালবাসা গিয়েছিল তার দ্বারা যদি মানুষ প্রতারিত হয়, তা হলে তা হয়ে উঠে একেবারে অসহনীয়। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে মানুষের মন।

ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল একদিন ইরানের বাদশা-মহলে, অনেক—অনেক কাল আগে। বাদশা শাহরিয়ার তাঁর প্রিয়তমা বেগমের বেইমানিতে প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁকে হত্যা করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল সমস্ত নারীজাতির ওপর। হারেমের অন্যান্য বেগমের গর্দান নিয়েও তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না, উজিরকে ডেকে তিনি বললেন, শোনো উজির, রোজ সন্ধ্যায় আমীর ওমরাহদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কুমারী মেয়ে যোগাড় করে আনবে ; জাঁকজমকে বিয়ে করব তাকে। একটি রাত্রি শুধু বেগমের মর্যাদা পাবে সে আমার কাছ থেকে, পরদিন ভোরেই জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে, এ ভারও রইল তোমার ওপর।

শুনে তো উজিরের বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল, একি বিষম ফরমান বাদশার !—কিন্তু উপায় কি, বাদশার হুকুম তো তাঁকে তামিল করতেই হবে ; নইলে তাঁর নিজেরই গর্দান যাবে !

তারপর আমীর ওমরাহদের কোন না কোন এক বাড়ি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল ওঠে, বাদশার হুকুমে উজিরকে কোন না কোন বাড়ি থেকে বাপ-মায়ের কোল শূন্য করে তাদের নয়নের মণি সদ্যফোটা গোলাপের মত তরুণী মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে হয়, আর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে দিতে হয় জল্লাদের হাতে।

এমনি করে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; বছর ঘুরে এল। শেষে এমন দিন এসে গেল যখন উজির দেখলেন, নিজের দুই মেয়ে ছাড়া বাদশার যোগ্য আর কোন মেয়ে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিন বিষণ্ণ মুখে উজির সেই কথাই ভাবছেন, এমন সময় তাঁর বড় মেয়ে শাহরাজাদী কাছে এগিয়ে এল, মেয়েটি যেন হীরের টুকরো ; যেমন রূপ তেমনি বিদ্যা, আর তেমনি বুদ্ধি। এই বয়সেই যত রকমের কেতাব আছে, সবই সে পড়ে ফেলেছে। তা ছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গী এতই মধুর যে, যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

মেয়ে বাপের পাশে বসে বললে, কি ভাবছ আব্বা, এমনি মুখ ভার করে ?

ভাবছি—আজ সন্ধ্যায় বাদশার বিয়ের কনে জোটাব কোত্থেকে ? দেশে তো আর বিয়ের বয়সী মেয়ে নেই রে, মা।

মেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, কেন আব্বা, আমার কি বিয়ের বয়স হয়নি ?

শুনে চমকে উঠলেন উজির ঃ কি বলছিস তুই ! বাপ হয়ে জেনে-শুনে তোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো ?

যাদের এতদিন দিয়েছ, আব্বা, তাদেরও বাপ-মা ছিল।

সে বাদশার আদেশ পালন করেছি।

মেয়ে যখন আর দেশে নেই, তখন আমাকে পাঠানই তোমার কর্তব্য। তুমি যদি না নিয়ে যাও, তা হলে নিজেই গিয়ে আমি হাজির হব বাদশার কাছে।

শুনে তো উজিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে শাহরাজাদীর মায়া হল। স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, আব্বা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি এক ফন্দি এঁটেছি, যদি সেটা ঠিকমত খাটাতে পারি, তা হলে আমি তো বাঁচবই—তার সঙ্গে রক্ষা পাবে দেশের কুমারী মেয়েদের জান আর মান।

মেয়ের কথায় পুরো সান্ত্বনা পেলেন না উজির। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তিনি বাদশার দরবারে চলে গেলেন। এগিয়ে এল শাহরাজাদীর

ছোট বোন তুনিয়াজাদী তার দিদির কাছে। জিজ্ঞাসা করল, আব্বার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল রে দিদি তোর ?

দিদি হেসে বলল, আমি আজ বাদশার বেগম হতে যাচ্ছি রে, বোন।

তুই ?—বলতে গিয়েই তুনিয়ার তু'চোখ জলে ভরে এল।

ছিঃ, কাঁদিসনে, বোকা মেয়ে। শোন্, আমি এক ফন্দি এঁটেছি। বেগম হয়ে শেষ রাত্রে বাদশার কাছে বায়না ধরব, আমি আমার ছোট বোনকে জন্মের শোধ একবার দেখবার জন্যে। জানি অনুমতি মিলবে। তুই গিয়ে জন্মের শোধ একবার আমার কাছে গল্প শুনতে চাস্, ব্যস্।

তুনিয়াজাদী হয়ত বুঝল, হয়ত বুঝল না ; তখনকার মত চুপ করে রইল সে।

সন্ধ্যাকালে শাহরাজাদীকে বিয়ের কনে সাজিয়ে উজির বাদশার সামনে নিয়ে এলেন। বাদশা দেখে চমকে উঠে বললেন, একি করেছ উজির, তুমি—নিজের মেয়েকে···।

কি করব, জাহাঁপনা।—দেশে আর মেয়ে তো চোখে পড়ে না। তাছাড়া আমি না আনলে ও নিজেই আসত, ওর জিদ।

শাহরিয়ার একবার তাকিয়ে দেখলেন শাহরাজাদীর দিকে। যেন একটা সদ্যফোটা বসরাই গোলাপ, চোখে মুখে হীরের ঝলমলানি।

বললেন, তুমি নিজে এসেছ—ইচ্ছে করে—কাল সকালে তোমার কি দশা হবে তা জেনেও ?

জি, জাহাঁপনা—জেনেও। একরাত্রি আপনার বেগম হবার সৌভাগ্য লাভের জন্য শতবার মৃত্যুবরণ করতেও রাজী আমি।

উজিরের মেয়ের কথা শুনে বাদশা একেবারে থ।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল।

শাহরাজাদীকে খুব ভাল লাগল বাদশার। অনেক আদর পেলো বাদশার কাছ থেকে সে। সুযোগ বুঝে শাহরিয়ারকে বললে, অনেক পেয়ার পেলাম, জাহাঁপনা, আপনার কাছ থেকে, জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে।—একটা আরজি আছে আপনার কাছে আমার, রাখবেন কি?

বল বল, আজ রাতে কিছুই অদেয় নেই তোমায় আমার।

শাহরাজাদী বলল, জাহাঁপনা—আমার একটি ছোট বোন রয়েছে তাকে খুব ভালবাসি আমি। কাল সকালে তো দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে আমাকে, তার আগে—যতক্ষণ আছি, মানে আজকের বাকি রাতটুকু আমি তাকে কাছে রাখতে চাই।

বাদশা তখনই লোক পাঠিয়ে শাহরাজাদীর ছোট বোনকে নিয়ে এলেন নিজের শয়নকক্ষে। এনে পাশের একটা পালঙ্কে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রি তিন প্রহর কেটে গেছে, আর একটি প্রহর মাত্র বাকি। দুই বোনের কারো চোখেই ঘুম ছিল না, থাকবার কথাও নয়। দুনিয়াজাদী বললে, দিদি ঘুমোসনি?

কেন রে, দুনিয়া?

ওদের কথা শুনে শাহরিয়ারেরও ঘুম ভেঙে গেল। চুপ করে রইলেন তিনি দু'বোনের কথাবার্তা শোনবার জন্যে।

দুনিয়া বললে, দিদি—একটা গল্প শোনাবি? কি সুন্দর গল্প বলতিস তুই, আর তো শুনতে পাব না, জন্মের শোধ তাই—

শাহরাজাদী জবাব দিল, জাহাঁপনা জাগুন আগে, তাঁর অনুমতি পেলে তবে শোনাতে পারি।

শাহরিয়ার জেগেই ছিলেন। বললেন, আমি জেগেছি। বেশ তো, শোনাও না তোমার বোনকে গল্প—আমিও একটু শুনি।

বাদশার অনুমতি পেয়ে মনে মনে খোদাকে তসলিম করে ধীর মধুর কণ্ঠে শাহরাজাদী শুরু করলে তার গল্প: সে যেন এক অপূর্ব

সঙ্গীত। তাছাড়া যাত্নকরীর মত কথার ইন্দ্রজাল বুনে চলল সে। শাহরিয়ার আর ছুনিয়াজাদীর সামনে ভেসে উঠতে লাগল কত মরু প্রান্তর, খর্জুরবীথি, কত সরিৎসাগর পর্বত, কত দৈত্যদানাপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন হীরে জহরৎ কত রকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত বিপদ ঝঞ্ঝা, প্রমোদবিলাস, কত সুন্দরী বিলাসিনী নর্তকী, কত ছুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটীল চক্রান্ত, হিংসাদ্বেষ আর প্রণয়ের কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, গল্প কিন্তু শেষ হল না। শাহরিয়ার বললেন, বেশ—বাকিটুকু কাল আবার শুনব—

গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্যে বেগমের গর্দান নেওয়ার হুকুম দিতে পারলেন না বাদশা।

॥ সূচী ॥

বসোরার হাসানের কাহিনী

শাহরাজাদী সুলতান শাহরিয়ার নির্দেশে তার গল্প শুরু করল বটে কিন্তু সে রাত্রে কাহিনী আরম্ভ করবার আগেই ভূমিকা করে নিল,—জাহাঁপনা, আজ যে তাজ্জব গল্প আপনাকে শুনাতে যাচ্ছি দুনিয়ায় তার আর জুড়ি নেই। মুল কাহিনী শুরু করবার আগে এটা কেমন করে আমি জানলাম সেই কথাটাই বলে নিই—

বহু যুগ আগে খোরাশান আর পারস্যের এক সুলতান ছিলেন, নাম ছিল কিন্দামির। কিন্দামির শুধু ঐ দুই দেশেরই সুলতান ছিলেন না, তাঁর রাজ্য ভারত, চীন এমন কি অসভ্য পশ্চিম মুলুক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন সুলতান, যেমনি পাকা ঘোড়সোয়ার, তেমনি বর্শা ছুঁড়তে ওস্তাদ, লড়াইয়ে তাঁর সামনে থেকে কোন দুশমন তার জান নিয়ে ফিরে যেতে পারত না, এ ছাড়া তিনি ছিলেন একজন বড় শিকারী এবং খেলোয়াড়। কিন্তু এ সব গুণ ত অনেকেরই থাকে, তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে তিনি জ্ঞানীগুণিজনের ছিলেন মহা উৎসাহদাতা। তাঁদেরই সঙ্গে মিশে, কথা বলে তিনি সব চেয়ে বেশি আনন্দ পেতেন। উৎসব বা ভোজসভায় তিনি কবি, কথাশিল্পীদের নিজেরই পাশে বসাতেন। গল্প শুনতে তিনি এত ভালবাসতেন যে দূর দেশের কোন কথক এসেও যদি তাঁকে ভাল গল্প শোনাত তা হলে তাকে তিনি অনেক ধনরত্ন দামী পোশাক ত উপহার দিতেনই, তা ছাড়া তার নিজের দেশে ফিরবার সময় তার সঙ্গে দিতেন অনেক বাছাইকরা বান্দা আর ঘোড়সোয়ার। নিজের দরবারের কবি আর কথকদের তিনি তাঁর উজির-আমীরের সমান মর্যাদা দিতেন—ফলে তাঁর দরবার সব সময়ই—যাঁরা ভাল কবিতা লেখেন বা পুরনো কবিদের বয়েৎ

আওড়াতে পারেন,—যাঁরা ভাল গল্প বলতে বা ঐতিহাসিক কাহিনী শুনাতে পারেন—এমন সব লোকে গমগম করত।

সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তিনি গল্প শুনতে—নিত্য নতুন গল্প। আল্লা তাঁর স্মৃতিশক্তিও দিয়েছিলেন অদ্ভুত! বহুদিন আগে শোনা গল্পও তিনি একটুও ভুলতেন না। সুতরাং এমন দিন একদিন এসে গেল যে তাঁর দরবারে অনেক কথক থাকলেও—তাদের ঝুলিতে আরব, পারশ্য, ভারতের যত গল্প ছিল সব তাঁর শোনা হয়ে গেল। এখন?—এখন উপায়?—নতুন গল্প, ভাল গল্প না শুনতে পারলে যে তাঁর কোন কিছুই ভাল লাগে না, জীবন বিস্বাদ হয়ে যায়। অবসর সময় কাটাবেন কি করে তিনি? সুলতান ভাবতে বসলেন।

ভেবে ভেবে শেষে একদিন তিনি তাঁর প্রধান খোজাকে ডেকে বললেন—ওরে, তুই একবার আবু আলির বাড়ি যা ত, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।

এখন—এই আবু আলিই ছিল সুলতানের সবচেয়ে বেশি পেয়ারের, তাঁর দরবারের সেরা কথক। তাকে গল্পের যাতুকর বললেও হয়,—কারণ সে একটা গল্প শুরু করে শ্রোতাদের কৌতূহল জিইয়ে রেখে নিত্য নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করে রসপ্রবাহে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়তে না দিয়ে সেটা এক বছর টেনে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু হলে হবে কি—তারও গল্পের ঝুলি শূন্য হয়ে গেছে, গল্পের দিক দিয়ে একেবারে ফকির হয়ে গেছে সে, দেউলে।

খোজা তাকে ডেকে আনলে সে সুলতানের সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। সুলতান বললেন—শোন ওস্তাদ, কেন তোমায় আমি ডেকেছি: তুমি একদিন তোমার গল্পের যাতু দিয়ে আমায় মুগ্ধ করে রাখতে, কিন্তু এখন আর তা তুমি পার না—তোমার থলি শূন্য, তুমি দেউলে হয়ে গেছ। তা হোক—তুমি যেমন করে হোক, একটা নতুন গল্প, তাজ্জব গল্প যোগাড় করে আন। রোমাঞ্চকর কাহিনী না শুনে জীবনের দিনগুলি আর আমার কাটতে চাইছে না। তাই তোমার মুখে এখন আমি একটা নিখুঁত নিটোল গল্প শুনতে চাই।

যদি শোনাতে পার তা হলে—বলে রাখছি তোমায় আমি অনেক ধনদৌলত, জমিজমা, ইমারত, বান্দাবাঁদী দেব, তোমার সমস্ত সম্পত্তি করমুক্ত করে দেব, শুধু তাই নয় তোমাকে আমি আমার প্রধান উজির করে আমার ডাইনে বসাব, আমার অধীন রাজ্যগুলির উপর পূর্ণ আধিপত্য করতে পারবে তুমি। এমন কি ভাল গল্প বলে আমায় খুশী করতে পারলে আমার সিংহাসনটাও তোমায় দিয়ে দিতে পারি—তুমি শুধু আমার জীবনের বাকী দিনগুলি তোমার সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাবার সুযোগ দেবে, আর কিছু চাই না।

আর তোমার নসিব যদি মন্দ হয়, আমার এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা মেটাবার রসদ যদি তুমি না যোগাড় করতে পার তা হলে আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেও বলতে বাধ্য হচ্ছি—তোমার আপনজনের কাছ থেকে তোমায় বিদায় নিয়ে আসতে হবে, তোমায় শূলে চড়াব আমি।

সুলতানের কথা শুনে আবু আলির বুকে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, তবু সে কোন রকমে একটু সাহস সঞ্চয় করে হাত জোড় করে বললে—যো হুকুম, খোদাবন্দ, অনেক নিমক খেয়েছি আপনার। আপনার এ হুকুম তামিল করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্যই করব, শুধু একটি জিনিস ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

কি ?

একটি বছর সময় চাইছি, জাহাঁপনা, এই এক বছর পরে যদি আপনাকে নতুন গল্প শুনাতে না পারি, আর শুধু তাই নয়, সে গল্প যদি তাজ্জব না হয়, আপনার মনোরঞ্জন করতে না পারে—তা হলে আমায় যে শাস্তি হয় দেবেন।

সুলতান কিন্দামির মনে মনে ভাবলেন—তাই ত—এক বছর, সে যে অনেক দিন, ততদিন বেঁচে থাকব, না আল্লার কাছে চলে যাব, তার ঠিক কি—তবু চাইছে যখন! মুখে বললেন, বেশ তাই হবে, তবে একটি শর্ত আছে আমার, এই এক বছর তুমি বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না। আবু আলি শুনে সুলতানের দুই হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আবু আলি বাড়ি এসে ভাবতে বসলে। অনেক ভেবে ভেবে শেষে তার পাঁচটি গোরাবান্দাকে ডেকে পাঠালে। এই পাঁচ বান্দা শুধু যে খুব বিশ্বস্ত তাই নয়, তারা দস্তুরমত লেখাপড়া জানে, বুদ্ধিমান। তারা এলে তাদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচ হাজার দিনারের এক-একটা থলি দিয়ে আলি বললে, তোমাদের উপর একটা কাজের ভার দিচ্ছি। এতদিন তোমাদের আমি নিজের সন্তানের মত পালন করেছি, আজ আমার বড় দুর্দিন এসেছে জীবনে, তোমরা আমায় সুলতানের হাত থেকে রক্ষা কর।

হুকুম করুন, হুজুর, আমরা আপনারই, আমরা নিজেদের জান দিয়ে আপনার জান বাঁচাতে চেষ্টা করব, বলুন কি করতে হবে আমাদের।

আবু আলি বলেল—আল্লার সড়ক পড়ে রয়েছে, এর বিভিন্ন সড়ক ধরে তোমরা পাঁচ জন বেরিয়ে পড়—পড়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন মুলুকের জ্ঞানী, গুণী, কথকের কাছে খোঁজ করো কে বসোরার হাসানের কাহিনী জানেন। আল্লার দোয়ায় যদি এমন লোকের সন্ধান পাও যিনি এ গল্প জানেন, তবে তাঁর কাছ থেকে লিখে বা শুনে যেমন করে পার এ গল্পটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে, তাতে যত দিনার খরচ হয় হোক। এ গল্প না আনতে পারলে তোমাদের মনিবকে সুলতান শূলে চড়াবেন। এই বলে আবু আলি তার প্রথম চার বান্দাকে ভারত, পারশ্য, চীন ও খোরাসানের সড়ক ধরতে বললে, আর পঞ্চম বান্দা মোবারেককে বললে—তুমি মিশর আর সিরিয়ার সড়ক ধরো।

পাঁচ বান্দা তাদের মনিবের জান বাঁচাবার চেষ্টায় আল্লার পাঁচ সড়ক ধরে পাঁচ দিকে রওনা হয়ে গেল। কথক আবু আলি তাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগল। একদিন দু'দিন করে, একমাস দু'মাস করে এগার মাস কেটে গেল। তারপর একে একে তার চার বান্দা ফিরে এল, সবারই মুখে এক কথা: তামাম এলাকা চুঁড়ে দেখলাম, শহর, গ্রাম, তাঁবু কোথাও যেতে কসুর

করিনি, যেখানে যত কথক পেয়েছি, কবি পেয়েছি, জিজ্ঞাসা করেছি তাঁরা কেউ বসোরার হাসানের কাহিনী জানেন কি না, সকলেরই ঐ এক জবাব—'না'।

আবু আলি এক-এক জনের মুখে এই ব্যর্থতার কথা শোনে আর তার মুখের আঁধার ঘন হয়ে ওঠে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলে—আল্লা ছাড়া গতি নেই!—নসিবে দেখছি শূলই লেখা আছে। নিজের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে সে কাজী ডেকে, সাক্ষী ডেকে নিজের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে ফেললে। তখনও মনে একটু ক্ষীণ আশা: মোবারেক এখনও ফেরে নি।

এবার মোবারেক কতদূর কি করতে পারল দেখা যাক। মোবারেক গোটা মিশর এবং সিরিয়ার অধিকাংশ জায়গা ঘুরে ওখানকার কথকদের কাছ থেকেও কোন সুবিধা করতে পারলে না, ওখানকার সেরা শহর কায়রোর নামকরা গল্পবলিয়েদের কাছে গেলে তাঁরা বললেন, আমাদের বাপ ঠাকুর্দাদেরও ছিল এই নেশা ও পেশা, কই তাঁদের মুখেও ত আমরা এ গল্পের নাম শুনিনি। ওখানে নিরাশ হয়ে মোবারেক এল দামস্কসে। বড়ই ভাল লাগল তার শহরটা দেখে: যেমনি আবহাওয়া, তেমনি রাস্তাঘাট ঘর-বাড়ি, তেমনি ফুলফলের বাগিচা। রাত কাটানোর জন্যে একটা সরাইখানার খোঁজে সে একটা রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে দলে দলে লোক সব একই দিকে ছুটছে—তাদের মধ্যে ধনী বণিক থেকে শুরু করে কুলী, মজুর, মেথর, ফেরিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা সব রকমের লোকই আছে। কৌতূহলী হয়ে সে-ও তাদের সঙ্গে যাবে কিনা ভাবছে এমন সময় একটি লোক অনেক লোকের মাঝে তাড়াহুড়ো করে যেতে ওর গায়ে ধাক্কা লেগে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মোবারেক তার হাত ধরে তুলে জামার ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা ভাই, এত লোক সব যাচ্ছে কোথায়, তুমিই বা এমন করে ওদিকে ছুটছিলে কেন?

লোকটা এবার মোবারেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—

ও: আপনি বিদেশী, তাই জানা নেই আপনার: আমাদের শহরের গল্পদাদু শেখ ইশাক যে রোজ এই সময় তাঁর বাড়িতে গল্প বলেন। তাঁর গল্পগুলি এত সুন্দর আর এমন ভঙ্গীতে তিনি তা বলেন যে তা শুনবার লোভ কেউ সামলাতে পারে না। লোকে কাজকর্ম সেরে, কেউ বা কাজ ফেলেই ছোটে তাঁর বাড়িতে গল্প শুনতে। খুব ভিড় হয়, একটু আগে না গেলে জায়গা পাওয়া দায়, কাছে না বসতে পারলে ঠিক মত শোনাও যায় না, তাই ছুটছে সব তাঁর বাড়ির দিকে। আমার দেরি হয়ে গেছে, এবার চলি, জনাব, সেলাম।

মোবারেক তার জামার আস্তিন ধরে বললে, আমাকেও নিয়ে চলো না, ভাই; তোমার সঙ্গে আমিও গল্প শুনব। তোমাদের এই গল্পদাদু শেখ ইশাকের গল্প শুনবার জন্যে অনেক দূর দেশ থেকে আমি এসেছি।

বেশ, আসুন জনাব, কিন্তু বেশ পা চালিয়ে যেতে হবে, নইলে জায়গা পাওয়া যাবে না। শুনে মোবারেক প্রায় ছুটতে ছুটতে চলতে লাগল লোকটির সঙ্গে। পথে কত লোকের গায়ের সঙ্গে যে ধাক্কা লাগল তার ঠিক নেই।

শেখ ইশাকের বাড়িতে এসে মোবারেক দেখে তাঁর বাইরের যে মস্ত বড় ঘরটায় বসে তিনি গল্প বলেন সেটা লোকে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। দীপ্তচক্ষু সৌম্য মূর্তি শেখ ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা উঁচু বেদীতে বসে অনেক আগেই তাঁর কথকতা শুরু করে দিয়েছেন—এ গল্প অবশ্য আরম্ভ হয়েছে কয়েক মাস আগে। তার গুণমুগ্ধ ভক্ত শ্রোতারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এ গল্পের পরবর্তী অংশ শুনতে ছুটে আসে। মোবারেক এসেই লক্ষ্য করেছে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর অতীব মধুর, উদাত্ত, গম্ভীর—ভাবাবেশে পরিবর্তনশীলও বটে। মোবারেক যখন ঘরে ঢুকল তখন গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এক লড়াইয়ের বর্ণনা করছেন শেখ ইশাক। গল্পের নায়ক তাঁর মস্ত এক বীর, বেইমান নিমকহারামদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। নায়কের বীরত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর স্বভাবশান্ত

চোখ দুটি যেন দপ করে জ্বলে উঠল, কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ— উত্তেজনায় মঞ্চ থেকে নেমে পড়লেন তিনি—দ্রুতপদে শ্রোতাদের সামনে শত্রুনিধনে তলোয়ার উঁচিয়ে যেন ছুটে চলেছেন তিনি— এমনি ভঙ্গী : হাঁ এমনি করেই বেইমান নিমকহারামদের শেষ করে দোজকের আগুনে ফেলতে হয়। ইমানদার বীরের উপর আল্লার এই ফরমান। আমাদের নায়ক আল্লার সেই আদেশই পালন করে চলেছেন। কেউ কি বর্শা তলোয়ার হাতে তাঁকে শত্রুনিধনে সাহায্য করতে এগিয়ে এল?—না কেউ এল না। তিনি একাই একশো। ভয় কি তাঁর—আল্লা সহায়। সব শত্রুকে শেষ করলেন তিনি, দু' চারজন যারা বাঁচল তারা তাঁর সংহার-মূর্তি দেখে পালিয়ে জান বাঁচাল। এবার তিনি বিপন্মুক্ত, নিশ্চিন্ত। এবার কোথায় যাবেন তিনি—কি করবেন?

শেখের মুখ থেকে উত্তেজনার রেখা বিলকুল মিলিয়ে গেল, কণ্ঠ থেকে শান্ত মধুর স্বর ঝরে পড়তে লাগল : এবার তিনি শিবিরে যাবেন—গিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে মসলন্দে পা এলিয়ে দেবেন—বলতে বলতে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বেদীতে গিয়ে বসলেন : গল্প বলা আজ আমার এই খানেই শেষ হল—কাল আবার শিবির থেকে শুরু হবে—সেখানে নিঝুম রাতের আঁধারে রহস্যের জাল বোনা হচ্ছে—সে ত এ যুদ্ধের উন্মাদনার চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়!

এইখানে শেখের কণ্ঠ নীরব হল। শ্রোতারা সব উঠে শেখ ইশাককে সেলাম করে একে একে সরে পড়তে লাগল। আর সবাই চলে গেলে মোবারেক উঠে শেখের কাছে গিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর কর চুম্বন করে বললে, ওস্তাদ, আমি—বিদেশী, অনেক দূর দেশ থেকে আপনার কাছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

শেখ ইশাক অতি মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, বল কি তোমার উদ্দেশ্য—তুমি কি চাও? মোবারেক বললে, সুদূর খোরাসানের কথক আবু আলি আমার মনিব, তিনি আমার হাত দিয়ে এক হাজার দিনারের একটি থলি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন। তিনি

আপনাকে হাল ছুনিয়ার সেরা কথক বলে জানেন, তারই মান্য দিতে তাঁর এ প্রচেষ্টা।

প্রসন্নমুখে শেখ বললেন—আবু আলির গল্পবলার খ্যাতি আমারও কানে এসেছে—সুতরাং তাঁর এ উপহার বন্ধুর উপহার মনে করে আমি সাদরে গ্রহণ করলাম, কিন্তু প্রতিদানে আমিও যে তোমার হাতেই কিছু পাঠাতে চাই তাঁকে, বল ছুনিয়ার কোন জিনিস তোমার মনিবের বেশি পেয়ারের, কি পেলে তিনি খুশী হন, তাই বলো তুমি, আমি তাই পাঠাব।

শুনে মনে মনে খুশী হল মোবারেক, ঃ তার উদ্দেশ্য তা হলে সিদ্ধ হবে, মুখে বললে, হুজুর, খোদার দোয়া আসমানের পানির মত ঝরে পড়ুক আপনার শিরে। আমার মনিব আলির পার্থিব ধন দৌলতের কিছু কমতি নেই, এসব দিকে তাঁর কোন আকাজ্ক্ষা নেই, লোভ তাঁর অজানা জিনিসের দিকে। তিনি আপনার কাছ থেকে একটু নতুন গল্প পেলে সুলতানকে শুনিয়ে খুশী করতে পারেন। এই জন্যই তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। বসোরার হাসানের কাহিনীটা যদি আপনার জানা থাকে—তা হলে সেইটা পেলে তাঁর দিলটা জবর খুশী হয়।

শেখ প্রশান্ত প্রসন্নমুখে বললেন, বহুৎখুব, পাবে তুমি সে গল্প আমার কাছ থেকে। আমি ছাড়া ছুনিয়ায় আর কেউ সে গল্প জানে না। তোমার মনিব আবু আলি ওস্তাদ গল্পবলিয়ে তাই তিনি গল্পটার খবর জানেন। এমন তাজ্জব গল্প ছুনিয়ায় আর একটি নেই। গল্পটা পাই আমি এক পীর সাহেবের কাছ থেকে, তিনি আর বেঁচে নেই, তিনিও আবার শুনেছিলেন এটা আর এক পীরের মুখে—সে পীরও আল্লার কাছে চলে গেছেন। সুতরাং এ গল্প শুনতে হলে আমার কাছে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তোমার মনিবের সশ্রদ্ধ উপহারে আমি এত খুশী হয়েছি যে এ গল্প তোমায় আমি দেব—শুধু দেব না—এর ভাব ভঙ্গী ঘটনার প্রতিটি কথা যথাযথ ভাবে লিখিত অবস্থায় তোমায় দেব—কিন্তু একটি শর্তে ঃ সে শর্তটা হচ্ছে কোন অরসিক জনকে যেন এ গল্প শোনানো না হয়।

মোবারেক খোদার কসম নিয়ে শর্তটা মেনে নিলে শেখ ইশাক তাকে কালি কলম কাগজ দিয়ে বললেন, আমি বলে যাচ্ছি তুমি লেখ।

মোবারেক শেখের হুকুমে খুশীমনে লেখা শুরু করল। তার পুরো সাতদিন সাতরাত্রি লাগল বসোরার হাসানের কাহিনী লিখে নিতে। লেখা শেষ হলে শেখ একবার সেটা দেখতে চাইলেন। মোবারেক তাঁর হাতে দিলে তিনি নিজে পড়ে যেখানে যে ভুল ছিল সংশোধন করে আবার সেটা ফিরিয়ে দিলেন। মোবারেক মনে মনে আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ওস্তাদ শেখের কর চুম্বন করে সেলাম জানিয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে খোরাসানের দিকে ছুটল। মনের আনন্দে এত দ্রুত ঘোড়া ছুটাল সে যে দামস্কস থেকে খোরাসানে আসতে আর সবার যতদিন লাগে তার অর্ধেক সময়ে সে শহরের সীমানায় এসে গেল।

এদিকে সুলতানের দেওয়া এক বছর মেয়াদের দশদিন মাত্র বাকী আছে অথচ মোবারেক এখনও ফিরে এল না দেখে আবু আলি তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কানে যেতে সবাই তাকিয়ে দেখে পাণ্ডুলিপির খাতাটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে মোবারেক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। মোবারেক এসে ঘোড়া থেকে নেমে মনিবের করচুম্বন করে তার হাতে পাণ্ডুলিপির খাতাটা দিলে, ওর প্রথম পৃষ্ঠায়ই বড় বড় হরফে লেখা —বসোরার হাসানের কাহিনী।

এই অমূল্য সম্পদ হাতে পেয়ে আবু আলি তখনই উঠে মোবারেককে আলিঙ্গন করে তাঁর নিজের আচকান তার গায়ে পরিয়ে দিলেন, তা ছাড়া তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাকে বান্দাগিরি থেকে মুক্তি দিয়ে চমৎকার দশটি ঘোড়া, দশটা গাধা, দশটা উট, তিনটি নিগ্রো এবং দুটি গোরা বান্দা উপহার দিলেন। এরপর তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি নিজের হাতে সুন্দর করে স্পষ্ট করে নকল করতে

বসলেন, পড়বার সময় যাতে কোথাও বেধে না যায়। পুরো ন'দিন আহার নিদ্রা ভুলে তিনি এই কাজ করলেন। দশ দিনের দিন, বছর যেদিন শেষ হতে যাচ্ছে সেদিন তিনি পাণ্ডুলিপিটি এক সোনার পেটরায় পুরে নিয়ে সুলতানের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

আবু আলি গল্প এনেছে সুলতান তাঁর উজির আমীর ওমরাহ কঞ্চুকী আর শহরের সব কবি জ্ঞানীগুণিজনদের ডাকলেন। সভা জমজমাট হলে সুলতান আবু আলিকে বললেন, ওস্তাদ, সুলতানরা কখনও তাঁদের কথার খেলাপ করেন না, এক বছর আগে তোমার সঙ্গে যে কথা আমার হয়েছিল তা আমি ভুলি নি, সে কথা আমি রাখব, তুমি তোমার গল্প শুরু করো।

আবু আলি তখন তার সোনার পেটরা খুলে পাণ্ডুলিপি বের করে তার প্রথম পৃষ্ঠা পড়লে—দ্বিতীয়, তৃতীয়, সুলতান আর অন্যান্য শ্রোতাদের মাঝে তখন বিপুল হর্ষে জয়ধ্বনি শুরু হয়ে গেছে—আবু কাহিনী বর্ণনায় যত এগুচ্ছেন ততই তাঁদের আনন্দ ঘনীভূত হচ্ছে—নেশা—জবর নেশা লেগে গেছে তাঁদের। অনেকখানি পড়বার পর আবু সেদিনকার মত থামতে চাইলেন, তাঁরা থামতে দিলেন না। সুলতান বলে উঠলেন—চালাও, চালাও, যত রাত্রিই হোক—এমন কি ফজর হয়ে গেলেও এ গল্প শেষ করে তবে তুমি উঠবে, সবার খানাপিনার ব্যবস্থা আমি এখানেই করছি।

তাই হল, সুলতানের সঙ্গে শ্রোতারাও সব খেলেন তারপর আবার গল্প পড়া শুরু হল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়ার পর গল্প যখন শেষ হল তখন সুলতান আনন্দে একেবারে দিশেহারা : এমন গল্প হাতে থাকলে মনে আর তাঁর কোন ব্যাজার ভাব থাকবে না, মন মিইয়ে পড়লেই গল্পটা আবার পড়িয়ে শুনবেন, সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তাঁর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আবু আলির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি তখনই উঠে সকলের সামনে তাঁকে প্রধান উজির করে নিজের আচকান খুলে তাঁর গায়ে পরিয়ে দিলেন—শহর কেল্লা গ্রাম সমেত নিজের রাজ্যের একটা গোটা

প্রদেশ তাকে দান করলেন এবং এর পর থেকে সুলতান আবু আলিকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতে লাগলেন। আর এই গল্পের পাণ্ডুলিপিটা তিনি নিজের কেতাবখানায় বন্ধ করে রাখলেন। এটা হয়ে রইল তাঁর মন খারাপের মোক্ষম দাওয়াই। যখনই কোন কারণে মনটা ব্যাজার লাগত, কেতাব খানা থেকে পাণ্ডুলিপিটা আনিয়ে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শুনলে অমনি মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসত।

শাহরাজাদী বললে, জাহাঁপনা, বসোরার হাসানের এই তাজ্জব গল্পটাই যথাযথ আপনাকে আজ শোনাতে যাচ্ছি। যথাযথ বলছি এই জন্যে যে সুলতান কিন্দামিরের কেতাবখানায় রাখা সেই গল্পের হুবহু নকল আমার কাছে আছে।

এবার আরম্ভ করছি, জাহাঁপনা—শুনুন—ছুনিয়া শোন।

ছুনিয়ার বেহেস্ত বসোরা, গোলাপ বাগিচার শহর। সেই শহরে থাকে হাসান বলে একটি ছেলে। অপরূপ সুন্দর তার চেহারা,—যে দেখে সেই বলে সার্থক নাম রাখা হয়েছে এর। বাপমায়ের একেবারে বুড়ো বয়সের ছেলে হাসান তাই আদরটা একটু বেশিই পেয়েছিল সে তাঁদের কাছ থেকে। এর ফলে যা হবার, তাই হল: বাপ মারা গেলে পৈতৃক অনেক ধনসম্পদই তার হাতে এল—আর সে বন্ধুদের সঙ্গে খানাপিনা আর ফুর্তি করে ছু'দিনেই তা উড়িয়ে দিল। তারপরেই অভাবে পড়ে মুখ ভার। মা তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলেন সব, কিন্তু বকলেন না একটুও, শুধু বললেন—এখন কি করবি ঠিক করলি তুই?

বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, মা, ভুল করেছি আমি, এখন আর ভেবে লাভ নেই, কিছু কাজকর্ম করে খেটে খাব আমি, তোমাকে খাওয়াব।

শুনে—মায়ের হাতে কিছু পুঁজি ছিল তাই দিয়ে তিনি বাজারে হাসানের একটা সেকরার দোকান করে দিলেন।

দোকান হওয়ার পর হাসানের আর এক কৌটা আলিস্তি

নেই, কাজে গাফিলতি নেই। ভোর হলেই সে বাজারে এসে দোকান খুলে বসে। হাপরের আগুনে তার সুন্দর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, নেহাইয়ের উপর হাতুড়ি পেটাতে পেটাতে কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ে, দোকানের সামনে দিয়ে লোক যেতে তাকিয়ে দেখে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—আহা, আল্লা যা চেহারা দিয়েছেন তাতে ওর বাদশার তকতে বসবার কথা—আর সেই কিনা হাতুড়ি দিয়ে সোনা পেটাচ্ছে!

অনেক দিন দস্তুরমত ভিড় জমে যায় তার দোকানের সামনে। একদিন হাসান তার দোকানে বসে আগুন জ্বেলে সোনা পেটাচ্ছে, ভিড় সেদিন একটু কম ছিল, যা ছিল তা-ও কমতে শুরু করেছে এমন সময় এক পার্শী ওর দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। পার্শীর লম্বা সাদা দাড়ি, মাথায় বেশ উঁচু সাদা পাগড়ি, বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। হাতে তার একখানা পুরনো কেতাব। পার্শী হাসানকে দেখে যেন একেবারে মোহিত হয়ে গেল। নিজের মুখ থেকে বেশ জোর গলায়ই একবার বেরিয়ে গেল—খাসা সেকরা ত! তারপর নিজের মাথা চুলকাতে চুলকাতে একদৃষ্টে চেয়েই রইল হাসানের দিকে। তারপর দোকানের সামনের লোকজন দুপুরের নমাজের জন্যে যখন মসজিদে চলে গেল তখন পার্শী হাসানের দোকানের ভিতর ঢুকে হাসানকে সেলাম করলে, হাসান তাকে আলেকুয়াম সেলাম জানিয়ে বসতে বললে। পার্শী বসে মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ হাসানের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—বাবা, বড় প্রিয়দর্শন চেহারা তোমার, তোমায় দেখে আমার বড্ড ভাল লেগেছে, আমার কোন ছেলেপিলে নেই—তোমাকে আমি আমার ছেলে করে নিতে চাই। আমি এমন এক বিদ্যা জানি যা তোমায় শেখালে তুমি দারুণ বড় লোক হয়ে যেতে পারবে, জীবনে তোমার আর কোনদিন খেটে খেতে হবে না, এমন সুন্দর চেহারা তোমার একি এমন আগুনের আঁচ লাগিয়ে কালিঝুলি মেখে নষ্ট করতে আছে। দেখে বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার। আমার সে বিদ্যা শিখবার জন্য বহু লোকের

ঝুলোঝুলি, কিন্তু কাউকে তা আমি শেখাই নি, অনেককে শেখানোর বিদ্যাও সে নয়, মাত্র একজনকেই আমি শেখাব যে আমার মৃত্যুর পরে ঐ বিদ্যার উত্তরাধিকারী হতে পারে।

হাসান তার হাতুড়ি পেটানো থামিয়ে একমনে এই সৌম্যমূর্তি পার্শীর কথা শুনছিল, পার্শী থামলেই বলে উঠল, চাচা, আমি আপনার ছেলে হতে রাজী আছি, আপনি মেহেরবানি করে ঐ বিদ্যাটা আমায় শিখিয়ে দিন—কবে শেখাবেন ?—আজই শিখিয়ে দিন না !

পার্শী বললে—আজ নয়, বেটা, কাল—আজ উঠি—বলে ছুই হাতে হাসানের মাথাটা ধরে তাতে চুমু দিয়ে আর কোন কথা না বলে পার্শী সেদিনের মত চলে গেল।

হাসান মনের আনন্দে সেদিন আর কাজ করতে পারল না, তখনই উঠে দোকান বন্ধ করে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে সব কথা তাকে খুলে বলল। মা শুনে বললেন—এমন বোকা তুই তা আমি আগে জানতাম না ঃ তুই একটা বিধর্মী বিদেশী পার্শীর কথায় ভুলে গেলি ?

বিধর্মী তিনি ন'ন মা, তুমি ত তাকে দেখ নি !—ইয়া লম্বা তাঁর সাদা দাড়ি আর খাঁটি মুসলিমের মত ইয়া বড় আর উঁচু সাদা মসলিনের পাগড়ি।

না, বাবা, এসব তুমি করতে যেও না। পার্শীদের আমি চিনি, ওরা সবাই প্রতারক, আল্লাই জানেন—কোত্থেকে ওরা কি করে নানা যাদু, বুজরুকি শেখে আর তাই দিয়ে লোক ঠকিয়ে খায়।

মায়ের কথা শুনে হেসে উঠল হাসান ঃ মা, আমরা গরিব, কি এমন আমাদের ধনসম্পদ আছে যা ঠকিয়ে নেবেন তিনি ? তুমি যদি তাঁকে একবার দেখতে তা হলে এসব কথা আর মুখে আনতে না। সত্যিই বলছি মা, এমন সুন্দর চেহারা আমাদের এ বসোরা শহরে আমি কারো দেখি নি। দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা করে, মনে হয় উনি যেন এক পীর। খোদার অশেষ দোয়া যে উনি আমায় সুনজরে দেখেছেন।

মা ছেলের এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না, মনে তেমনি

স্বস্তিও পেলেন না। উত্তেজনায় হাসানের সারারাত্রি ঘুম হল না। পরদিন ভোরে উঠেই অন্য সবার আগে গিয়ে দোকান খুললো। একটু পরেই পার্শী এসে হাজির হল। হাসান তাঁকে সম্মান দেখাতে উঠে তাঁর করচুম্বন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পার্শী তাতে বাধা দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, সাদি হয়েছে তোমার ?

না, চাচা, সাদি হয়নি এখনও আমার, মা অবশ্য সাদির জন্যে খুবই পীড়াপীড়ি করছেন।

পার্শী বললে—তুমি সাদি না করায় খুব ভাল হয়েছে, কারণ তোমার সাদি হয়ে গেলে এ বিদ্যাটা আর আমি তোমায় শেখাতে পারতাম না।···যাক তামার কিছু আছে তোমার দোকানে ?

না, চাচা, তামার কিছু ত নেই—তবে আমার একখানা পেতলের ভাঙাচোরা রেকাব আছে।

বেশ, ঠিক আছে, ওতেই চলবে। তুমি এখন তোমার হাপরে আগুন দিয়ে তার উপর মুচি বসাও, জাঁতা লাগাও আর রেকাবখানা কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো। হাসান এই সব করলে পার্শী তখন বললে—এইবার ঐ কাটা টুকরোগুলো মুচির উপর দিয়ে জাঁতা চালিয়ে যাও—যে পর্যন্ত ওগুলো না গলে। হাসান পার্শীর কথা মত মুচির উপরকার পেতল যখন গলিয়ে ফেললে পার্শী তখন তার পুরনো কেতাবখানা খুলে হাসানের অবোধ্য ভাষায় কি সব মন্ত্র পড়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—হাক, মাক, বাক—হাক, মাক, বাক—হাক, মাক, বাক সূর্যকিরণের গুণে পেতল তুই সোনা হয়ে যা, সোনা হয়ে যা, সোনা হয়ে যা, সোনা হয়ে যা—এই বলে সে তার মসলিনের পাগড়ি খুলে তার ভাঁজের মাঝ থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করলে। ওর ভিতর হলুদ রঙের কি এক গুঁড়ো ছিল তার এক ছিটে মুচির গলন্ত পেতলের উপর দিতেই ওটা জমাট বেঁধে তখনই খাঁটি সোনা হয়ে গেল।

কাণ্ড দেখে হাসান ত একেবারে থ, কি বলতে যাচ্ছিল, পার্শী ইশারায় নিষেধ করে—ইশারায়ই তাকে জিনিসটা নিকষ পাষাণে

কষে দেখতে বললে। নিকষে কষে হাসান দেখে এ একেবারে অতি উঁচুদরের সোনা, বাজারে এ ধরনের জিনিসের ভীষণ চাহিদা। খুশীতে কি করবে দিশে না পেয়ে হাসান পার্শীর করচুম্বন করতে যাচ্ছিল পার্শী তাতে বাধা দিয়ে বললে—উঁহু, ওসব না, যা বলছি তোমায় তাই তুমি করো ঃ সোনার বাজারে গিয়ে এখনই তুমি ওটা বিক্রি করে যা পাও তা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তালা বন্ধ করে রাখ। আর যা সব দেখলে সে সব ব্যাপারের কথা কাউকে বলবে না। হাসান তখনই বাজারে গিয়ে সোনাটা দালালের কাছে দিলে দালাল সোনা পরীক্ষা করে তার ওজন নিয়ে সেটা বিক্রি করে হাসানকে ছ'হাজার দিনার দিল। হাসান তা হাতে পেয়ে আনন্দে যেন উড়ে চললো বাড়িতে। গিয়ে দিনারগুলি যখন তার মায়ের হাতে দিল তখন মা ব্যাপার কিন্তু বুঝতে না পেরে প্রথমে তিনি ছেলের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ছেলে মায়ের রকম দেখে হেসে উঠল ঃ কি হল তোমার? সেই পার্শী ভদ্রলোকের বিদ্যার জোরে পেয়ে গেলাম এগুলি।

মা শুনে ভয়ে আঁৎকে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে বলে উঠলেন—লয়লাহাইলাল্লা, সেই পার্শীর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে করছিস কি তুই, বেটা?

তাঁর সেই বিদ্যা শেখাতে শুরু করেছেন তিনি আমায়। প্রথমেই তিনি দেখালেন ওঁছা পেতলকে কি করে খাঁটি সোনা করে ফেলা যায়। মা শুনে ভয় পেয়ে কত কি বলতে লাগলেন, হাসান সে সব কথায় কান না দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে মা যে গামলাটায় পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি থেঁতো করে রাখতেন, ময়দা মাখতেন সেটা নিয়ে দৌড়াল সে নিজের দোকানে। গিয়েই সে সেটা মেঝেতে রেখে হাপরে আগুন দিয়ে জাঁতা চালাতে লাগল। হাসানের ব্যাপার দেখে পার্শী জিজ্ঞাসা করলে, এ করছ কেন তুমি?

মায়ের ঐ যে গামলাটা এনেছি, ওটা সোনা করব।

পার্শী শুনে হেসে উঠল—পাগল আর কাকে বলে, একই দিনে

বাজারে অতখানি করে সোনা বিক্রি করতে গেলে আর রক্ষা থাকবে না আমাদের, আমাদের তুইজনেরই হাজতে যেতে হবে।

হাসান অল্প একটু ভেবে মাথা তুলিয়ে বললে, ঠিকই বলেছেন চাচা, কিন্তু আমার যে ভারী শিখতে ইচ্ছে করছে, তর সইছে না আর।

পার্শী শুনে আরও জোরে হেসে উঠল, এই দেখ, পাগল আর কাকে বলে! তুমি কি মনে কর হাসান, এই রকম সদর রাস্তার বাজারের মধ্যিখানে কোতোয়ালদের সামনে এই গোপন যাতুবিদ্যা শেখানো যায়, না শেখা যায়? এখনই না শিখলে তোমার চলবে না বলে যদি মনে কর, তা হলে তোমার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল, সেখানে গেলে নিশ্চিন্তে শেখাতে পারব তোমায়। হাসানের আর বিলম্ব সইছিল না তাই সে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে তখনই পার্শীর সঙ্গে সঙ্গে চললো।

পথে বেরিয়েই কিন্তু হাসানের মনে হঠাৎ দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দিল। মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল, বিদেশী বিধর্মী পার্শীকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছিলেন তিনি। এক কথায় অমনি লোকটার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সে, এ কি ঠিক করছে সে! কথাটা ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে সে থেমেও যাচ্ছিল। পার্শী তার রকম সকম দেখে আবার হেসে উঠল—হাসান, ঠিক তুমি পাগল! আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের ভাব। তোমার চেহারাটার মত যদি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত তা হলে আর তোমায় এত ভাবতে হতো না। আরে পাগল, তোমায় দেখে যদি তোমার উপর আমার ছেলের মত মায়া না পড়ত,—তা হলে কি দায় পড়েছিল আমার তোমায় এ বিদ্যে শেখানোর জন্যে, কত হাজার জন ঝুলোঝুলি করলেও যখন কাউকে আমি শেখাই নি? বেশ, তোমার যখন সন্দেহই হয়েছে, তখন আমার আস্তানায় গিয়ে আর কাজ নেই, তোমার বাড়িতেই নিয়ে চল আমায়, সেখানে গিয়েই শেখাব আমি তোমায়, তা হলে ত তোমার কিছু ভয় করবার থাকবে না?

হাসান শুনে খুশী হয়ে বললে—সেই ভাল, মায়ের মনটা তা হলে ঠাণ্ডা থাকবে।

বেশ, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমায়।

বাড়িতে এসে হাসান পার্শীকে বাইরের ঘরে বসিয়ে পরম উৎফুল্ল হয়ে ভিতরে ছুটে গিয়ে মাকে বললে, মা, উনি এসেছেন, আমাদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করবেন, তা হলে ত তোমার আর ভয় থাকবে না,—মানে নুন খেয়ে ত আর—।

মা এ কথায় যে বড় স্বস্তি পেলেন তা নয়; বললেন—বাবা, ও সব বিধর্মী পার্শী যারা আগুনের পূজা করে মরে তারা কি আমাদের মত নিমকের কদর বোঝে। নিমক খেয়েও ওরা নিমকহারামি করতে পারে। ওতে তুমি ভুললেও আমি ভুলতে পারছি না—কেন জানি না —মনে হচ্ছে দারুণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের। যখন এনে ফেলেছ তুমি ওকে আমাদের বাড়িতে, তখন কিছু না খাইয়ে আমি ওকে আমাদের বাড়ি থেকে যেতে দেব না, তবে তোমাদের ঐ সব কাণ্ডকারখানার ভেতর আমি নেই—তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েই আমি বাড়ি থেকে প্রতিবেশীদের বাড়িতে চলে যাব, আর ও বাড়ি ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঘরে ফিরব না। বাড়ি এসে ঘরদোর সব ভাল করে ধোব আমি, তবেই আমার স্বস্তি, তা ছাড়া পুরো এক মাস তোমাকে আমি ছোঁব না, আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করবে। যাই হোক ও সব কথা এখন থাক—ও যখন আমাদের বাড়িতে এসেছে আর এতটা সোনা পেয়েছি যখন আমরা ওর কাছ থেকে তখন ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি—এই বলে মা রান্নাঘরে গেলেন, হাসান এসে পার্শীর কাছে বসে নানা কথাবার্তা বলতে লাগল।

খানা তৈরি হলে খাবার ঘরে চাদর পেতে মা যখন খবর দিলেন তখন হাসান পার্শীকে খাবার ঘরে ডেকে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মা প্রতিবেশীদের বাড়িতে পালিয়ে গেলেন। এরপর খেতে বসল দু'জনে, খেতে বসেই হাসান স্বস্তির একটু মৃদু হাসি হেসে বলল—

চাচা, আজ থেকে আপনার আর আমার মধ্যে একটা নিমকের সম্বন্ধ হয়ে গেল।

পার্শী বললে—বটেই ত, বড় জবর সম্বন্ধ এ, আমি এই নিমকের কসম নিয়ে বলছি—তোমাকে দেখামাত্র বড্ড বেশি স্নেহ করে ফেলেছি, নইলে এ বিছা আমি কাউকে শেখাই না। শেখাব কেন—এই বলেই মাথার পাগড়ির ভিতর থেকে সেই কাগজের পুরিয়াটা বের করে খুলে হাসানের হাতে দিয়ে বললে—এই যে হলদে গুঁড়ো দেখছ, এর এক ছিটে দিয়ে আট দশ সের পেতলকে তুমি দেখতে না দেখতে খাঁটি সোনা করে ফেলতে পার আর এটা আবিষ্কার করতে যে আমার কত পুরনো কেতাব ঘাঁটতে হয়েছে, কত হাজার রকম ধাতু নিয়ে কত হাজার দিন গবেষণা করতে হয়েছে কত ধকল যে পোহাতে হয়েছে আমার তা পরে একদিন তোমায় বলব। হাসান হলদে গুঁড়োর পুরিয়াটা হাতে পেয়ে মসগুল হয়ে তাই দেখছে এই ফাঁকে পার্শী তার মাথার পাগড়ি থেকে কি একটা ওষুধ বের করে হাসানের অলক্ষ্যে একটা মেঠাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে বললে, এই মেঠাইটা তোমার মা বড় ভাল করেছেন, একবার খেয়ে দেখ, আমি গোটা দুই খেলাম কি না! হাসান পার্শীর কথামত মেঠাইটা মুখে দিতেই সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। দেখে খুশীতে' চকচক করে উঠল পার্শীর দুই চোখঃ কতদিন ধরে এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছি রে বাচ্চা, আজ পেয়ে গেছি—আর আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই। পার্শী তখনই জামার আস্তিন গুটিয়ে কোমর বন্ধ এঁটে হাসানের মাথা তার হাঁটুর নীচে টেনে এক সঙ্গে করে বেঁধে পাশেই একটা সিন্দুক ছিল তার মধ্যে পুরল আর হাসানের দোকানে বসে যে সোনা করেছিল সে সোনাও তাতে ভরল। তারপর বাইরে গিয়ে একটা কুলি ডেকে এনে সিন্দুকটা তার পিঠে চাপিয়ে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল। সেখানে তারই এক জাহাজ অপেক্ষা করছিল, পার্শী তার মাল সমেত জাহাজে উঠতেই কাপ্তেন জাহাজ ছেড়ে দিল।

মা এদিকে কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে এসে দেখেন বাড়ির দরজা খোলা। তখনই তাঁর বুকটা ধড়াস করে উঠল, তারপর ঘরে গিয়ে যখন দেখলেন হাসানও নেই, পার্শীও নেই, ঘরের সিন্দুক আর সোনাও নেই তখন উনি বুক চাপড়ে মাথার চুল জামা কাপড় ছিঁড়ে কাঁদতে লাগলেনঃ হায় হায়—আল্লা আমায় এ কি করলে—আমার হাসান কোথায় গেল—কেন সে আমার কথা শুনল না, আমি আগেই বলেছিলাম গো, আগেই বলেছিলাম! ও হাসান, তুই কোথায় গেলি, কাফের পার্শী তোকে কোথায় নিয়ে গেল! হাসানের মায়ের কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এল, তাকে নানা রকমে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু মায়ের প্রাণ সান্ত্বনা কি মানে! একমাত্র ছেলে তাঁর নয়নের মণি। সারারাত তিনি কেঁদেই কাটালেন। তারপর ছেলের আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই বুঝে হাসানের একটা স্মৃতি সমাধি রচনা করিয়ে দিনরাত তার পাশে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

এবার হাসানের কি হল দেখা যাক। যে পার্শী হাসানকে অজ্ঞান করে সিন্দুকে পুরে নিয়ে এল—নাম হচ্ছে তার বাহরাম। মস্তবড় যাদুকর আর অগ্নির উপাসক সে। এই উপাসনার জন্য অগ্নির কাছে যে বলির প্রয়োজন হয় তার জন্য প্রতি বৎসরই সে বাইরে বেরিয়ে এক দেশ না এক দেশ থেকে সুন্দর দেখে মুসলমানের ছেলে ধরে নিয়ে আসে। হবেই ত—রক্তের ধর্ম যাবে কোথায়, ঐ যে কথায়ই বলে—যার বাপ কুত্তা, যার ঠাকুরদা কুত্তা, কুত্তার বংশে যার জন্ম সে কুত্তা না হয়ে যাবে কোথায়? পার্শী জাহাজে যতদিন ছিল ততদিন লুকিয়ে লুকিয়ে সিন্দুকের ডালা খুলে আচ্ছন্ন হাসানকে দানা পানি দিয়ে আবার ডালা বন্ধ করে রেখে আসত। জাহাজ যখন ডাঙ্গায় নোঙর করে সিন্দুক সমেত পার্শীকে নামিয়ে দিয়ে পাল খাটিয়ে আবার চলে গেল তখন পার্শী সিন্দুক খুলে হাসানকে বের করে তার বাঁধন কেটে অন্য কি একটা ওষুধ ওর নাকের কাছে ধরে ওর আচ্ছন্ন ভাব পুরো কাটিয়ে দিলে। হাসান সজাগ হয়েই দেখে এক সমুদ্রের

ধারে শুয়ে রয়েছে সে। তার আশপাশের বালু আর নুড়ি কোনটা লাল কোনটা সবুজ, কোনটা সাদা, কোনটা নীল, আবার কোনটা হলদে। দেখেই বুকটা ধড়াস করে উঠল তার; তার নিজের দেশের সমুদ্রের তীর ত এমন নয়! এদিকে ওদিক চাইতেই দেখে পার্শী তার পিছনে মস্ত বড় এক পাথরের উপর বসে তার দিকে এক চোখ বুজে আর এক চোখে চেয়ে আছে। বুঝতে আর বাকী রইল না হাসানের—তাকে বোকা বানিয়ে পার্শী এখানে এনে ফেলেছে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই কিছু ভাল নয়। মায়ের হুঁশিয়ারীর কথা বারবার মনে পড়তে লাগল তার। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। নসিব, সবই নসিব। এখন আল্লাই একমাত্র ভরসা।

হাসান উঠে মরিয়া হয়ে পার্শীর সামনে এগিয়ে গেল, পার্শী পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল। হাসান কম্পিত কণ্ঠে বললে, চাচা, এ সবের মানে কি, আপনার আমার মাঝে নিমকের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে না?

শুনে হো হো করে হেসে উঠল পার্শী—বাহরামের কাছে নিমক খাওয়ার কথা বলতে এসেছ তুমি? পাগল! আমি অগ্নির উপাসক। আমার কাছে নিমকের কোন কদর নেই। এ যাবত নশো নিরানব্বই মুসলিম তরুণকে আমি আমার খপ্‌পরে এনেছি—তোমাকে এনে হাজার পুরলো। আমি—আমার ইষ্ট আগুনের কসম নিয়ে বলছি—এদের মধ্যে তোমার মত এত সুন্দর আর কাউকে পাই নি। শোন হাসান, তুমি এখন আমার হাতের মুঠোর ভেতরে তাই তোমার ভালর জন্যেই বলছি—তুমি তোমার ঐ জঘন্য ধর্ম ছেড়ে আমার ধর্ম গ্রহণ করো। বহুৎ পেয়ার পাবে আমার কাছ থেকে।

শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাসান বলে উঠলে—বদ্‌খত বুড়ো, এ কি সব বলছ তুমি আমার কাছে, বলতে মুখে একটু আটকালো না তোমার?

পার্শী একটু হেসে বললে অত চটে উঠলে কেন, বাবা, আমি শুধু তোমায় একটু পরীক্ষা করছিলাম, দেখছিলাম তোমার নিজের

ধর্মের উপর কেমন তোমার টান আছে। তোমাকে যে এখানে এনেছি আমি তার কারণ একটা নির্জন নিরালা জায়গা না হলে তোমাকে যে বিদ্যা শেখাতে চাইছি আমি তা নিশ্চিন্তে ভাল করে শেখানো যেত না। সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে ঐ যে উঁচু খাড়া পাহাড়টা দেখছ ওর নাম মেঘ পাহাড়, ওরই ঠিক উপরে আমার এ বিদ্যা কার্যকরী করতে যে মালমসলার দরকার তা সব আছে। ওর উপরে একবার গেলেই তুমি বুঝবে তোমার যাওয়া বিফল হয় নি। আমি যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমায় ওখানে নিয়ে যেতে চাইতাম তা হলে তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখনই নিয়ে যেতাম। ঐ পাহাড়ের উপরে এমন সব দুষ্প্রাপ্য গাছপালা আছে যা না হলে আমার এ বিদ্যা কাউকে ভাল করে শেখানোই চলে না।

হাসান বেশ ভাল ভাবেই বুঝলে পার্শী মোলায়েম করেই কথা বলছে বটে তবে নিজের ইচ্ছায় যেতে না চাইলেও জবরদস্তি করেই নিয়ে যাবে সুতরাং যেতে গররাজী আর হল না, তবে মায়ের কথা শোনে নি বলে অনুতাপে দরদর করে তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

—দেখে পার্শী বললে—কেঁদ না, হাসান, কেঁদ না, ওখানে গেলেই তুমি বুঝবে তোমার ভালর জন্যেই আমি বলেছি।

কিন্তু অত উঁচু দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়ে আমরা উঠব কি করে?

ও সব নিয়ে ভাবতে হবে না, এখনই দেখবে পাখীর চেয়েও সহজে আমরা ওখানে উঠে যাব। এই বলেই পার্শী তার আচকানের জেবের ভিতর থেকে একটা তামার খুদে ঢাক বের করল, তার গায়ে সাধারণের অবোধ্য ভাষায় কি সব মন্ত্রতন্ত্র লেখা, কি সব নকসা আঁকা, ঢাকটা ছাওয়া মুরগীর চামড়া দিয়ে বেশ টানটান করে। পার্শী তার উপর আঙ্গুল দিয়ে পটাপট করে কয়েকবার বাজাতেই তাদের চারিদিক একটা ধুলোর মেঘে ছেয়ে গেল। সেই ধুলোর মাঝ থেকেই একটা ঘোড়ার হ্রেষারব কানে এল। পরক্ষণেই মেঘ সরে গেলে দেখা

গেল—দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে মস্ত এক কালো ঘোড়া—তুপাশে তার পাখীর মত ডানা। পার্শী আর দেরি না করে তখনই সেই ঘোড়ায় চড়ে বসল, হাসানকে তার পিছনে বসাল। চোখের পলক পড়তে না পড়তে ঘোড়া তাদের ঠিক সেই মেঘ পাহাড়ের চূড়ায় নামিয়ে দিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সামনেই অগ্নিদেবের মন্দির চত্বরে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে।

পার্শী এবার হাসানের দিকে তাকাল, চোখে তার ইবলিসের চোখের মত জেল্লা। একটু তাকিয়েই—হেসে উঠল সে ঃ তা হলে, হাসান, বুঝছ ত তুমি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, আমার হাত থেকে আর নিস্তার নেই তোমার। নশো নিরানব্বইটা আহুতি আমার আগেই হয়ে গেছে—তোমাকে দিলে আমার হাজার পূর্ণ হবে, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। দেহ আহুতি দিয়ে বেহেস্তে যাবে তুমি, তার আগে কসম নিয়ে বলো আলোর উৎস তেজের উৎস অগ্নিদেব ছাড়া জগতে আর কোন শক্তি নাই।

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে হাসানের দেহ মনে কিসে যেন ভর করল, জোর গলায় বলে উঠল—লয়লাহা ইলাল্লা, মহম্মদ রসুল আল্লা, বদখত বুড়ো শুয়োর যাতুকর, তুই আমায় পেয়েছিস কি—বলেই বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পার্শীর উপর, তারপর তামার খুদে ঢাকটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে তাকে নিয়ে গেল একেবারে পাহাড়ের কিনারায়, তারপর মোক্ষম জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে দিল একেবারে খাড়া পাহাড়ের নীচে। সমুদ্রের কিনারায় যেখানে গিয়ে বুড়ো পড়ল সেখানে ছিল একখানা মস্ত বড় পাথর, সুতরাং পার্শীর দেহ থেঁৎলে ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

আল্লার দোয়ায় তুশমন যাতুকরের হাত থেকে ত নিস্কৃতি পাওয়া গেল। এখন কি করবে হাসান? প্রথমে সে বুড়োর সেই ঢাকটা একটু নেড়েচেড়ে দেখল। একটু বাজিয়ে দেখবে না কি সে? না, এখন থাক—ভাবলে সে,—কি জানি কি করতে কি হয়ে যায়!

তার চেয়ে জায়গাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল মস্ত বড় এক উপত্যকা, জনহীন, নিঝুম, অনেক দূরে আগুনের মত কি জ্বলছে। আগুন যখন জ্বলছে তখন ওখানে মানুষ আছে নিশ্চয়—মনে করে সে সেইদিকে এগুতে লাগল। কাছে এসে দেখলে যা সে আগুন ভেবেছিল তা আগুন নয়—একটা সোনার ইমারৎ—তার উপর সূর্যের কিরণ পড়ে অমনি আগুনের মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু কার বাড়ি এ?—কোন সুলতানের না কোন জিন ইফরিতের। অনেক ধকলের পর অনেক পথ হেঁটে হাসান ক্লান্ত, তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব,—ভাবলে যাঁরই হোক, আল্লার নাম করে গিয়ে পড়ি ত ওখানে, তারপর দারোয়ানের কাছে চাইলে কিছু রুটি আর জল কি মিলবে না?—আর তার দিল্ বলে যদি কোন কিছু থাকে তা হলে একটু ঘুমাবার জায়গাও পাওয়া যাবে। এই ভেবে এগিয়ে চললো সে সেই প্রাসাদের দিকে। সদর খোলাই ছিল, দ্বাররক্ষী কেউ নেই—হাসান ঢুকে পড়ল প্রাসাদের ভিতরে। প্রথমেই চোখ পড়ল—ফুল বাগিচার ভেতর শ্বেত পাথরের মস্ত বড় এক বেদীতে বসে অপরূপ সুন্দরী দুটি তরুণী দাবা খেলছে। খেলায় এত মত্ত যে প্রথমে হাসানকে তারা দেখতেই পেলে না। হাসান এক রকম পাশে দাঁড়িয়েই দেখছে তাদের খেলা। একজনের বোড়ে অলক্ষ্যে এসে গেছে প্রতিপক্ষের এলাকায়—লক্ষ্য তার দাবার উপর, যার দাবা তার খেয়াল নেই সেদিকে, সে অন্য চাল দিতে উদ্যত। হাসান আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল—কি করছেন আপনি, এদিকে কিস্তি যে মাৎ হয়! পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে দুইজনই চমকে উঠে দেখে অদূরে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ সুন্দর তরুণ।

দুই তরুণীর মধ্যে যার একটু বয়স কম সে অমনি অপরকে বলে উঠল—দিদি, বুড়ো বাহরাম যে সব ছেলেদের মেঘ পাহাড়ে [illegible] কাছে উৎসর্গ করতে নিয়ে আসে এ নিশ্চয় তাদেরই একজন, নইলে এখানে কোন পুরুষ আসবে কি করে?—কিন্তু এ ঐ শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেল কি করে?

মেয়েটির কথায় দরদের সুর শুনে হাসান অমনি তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললে—বিবিসাব, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমি আজ খোদার দোয়ায় সে বদখত বুড়োকে শেষ করেছি—এখন আমার উপায় কি তাই বলুন।—বলতে গিয়ে হাসানের চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এমন সুদর্শন তরুণকে পায়ের উপর পড়ে এমনি চোখের জল ফেলতে দেখে তরুণীর মন একেবারে অনুকম্পায় ভরে গেল। সে তখনই হাসানের হাত ধরে তুলে তার বড় বোনকে বললে—দিদি, তোর সামনে আল্লার নাম নিয়ে বলছি, আজ থেকে একে আমি আমার ভাই করে নিলাম। এখন থেকে এ আমার জীবনের সুখদুঃখের সমান অংশীদার।—এই বলে মেয়েটি পরম স্নেহে হাসানের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তার হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তাকে হামামে গোসল করিয়ে পুরনো ময়লা জামা কাপড় পালটে ভাল দামী পোশাক পরিয়ে দিদিকে দিয়ে এক হাত ধরিয়ে নিজে এক হাত ধরে মেয়েটি হাসানকে নিজের ঘরে নিয়ে হাজির করল। সেখানে গালিচার উপর চাদর পেতে দুই বোন দুই পাশে বসে হাসানকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ালে। খাওয়া শেষ হলে ছোট বোন বললে—ভাই, সোনার ভাই আমার, তুমি আমাদের বাড়িতে আসাতে আমাদের মনে একেবারে আনন্দের তুফান বইছে। কি যে খুশী হয়েছি আমরা তা একমাত্র আল্লাই জানেন! কিন্তু তোমার নাম কি, কি করে আমাদের এখানে এসে পড়লে—সব যে শুনতে ইচ্ছে করছে।

হাসান পর পর দুইজনের দিকে তাকিয়ে বললে—বোন, দিদি, আমার নাম হাসান, বসোরায় বাড়ি ছিল আমার। অনেক বিপদ ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে আমার নসিবই তোমাদের এখানে এনে ফেলেছে। এরপর যাদুকর অগ্নি উপাসক বাহরামের সঙ্গে তার যে যে ব্যাপার ঘটেছিল সে সবই তাদের খুলে বললে। শুনে দুইবোনই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—ঠিক হয়েছে,—বেটা শয়তান, কুত্তার বাচ্চা কুত্তাটাকে শেষ করেছ তুমি—বেশ করেছ, ভবিষ্যতের বহু তরুণের জান বাঁচিয়েছ তুমি, আল্লা তোমার ভাল করবেন।

বড় বোন তখন ছোটকে বললে—গোলাপ, ভাইয়ের কথা ত শুনলি, এবার নিজেদের পরিচয়টাও ভাইকে শুনিয়ে দে।

গোলাপ তখন হাসানের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের কথাও তোমার জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়। বলছি শোনঃ আমরা দুইজনই রাজকন্যা, আমার নাম গোলাপ, আর আমার এই দিদির নাম হেনা, আমাদের আরও পাঁচ বোন আছে, তারা আমাদের চেয়েও দেখতে সুন্দর, তারা শিকারে গেছে—শীগগিরই ফিরে আসবে, নাম তাদের—শুকতারা, সাঁজের তারা, চুনী, পান্না, আনারকলি। আমরা সাত বোন এক বাপের বেটী হলেও মা আমাদের ভিন্ন। তবে এই দিদি আর আমি একই মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি বটে। আমাদের বাবা জিনদের এক রাজা, দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর, আর ভীষণ তাঁর গর্ব। তাঁর ধারণা—তাঁর মেয়েদের যোগ্য বর এ দুনিয়ায়ই নেই। তাই তিনি একদিন তাঁর উজিরকে ডেকে বললেন—শোন, উজির, আমি আমার মেয়েদের বিয়ে দেব না, ওরা নির্বিঘ্নে ওদের চিরকৌমার্য-ব্রত পালন করতে পারবে এমন কোন জায়গা জানা আছে তোমার, যেখানে মানুষ বা জিন—কেউ কোনদিন যেতে পারে না?

উজির বললেন—মালেক, মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে ঘর করবে, একটা সুখের নীড় রচনা করবে এই উদ্দেশ্যেই খোদা তাদের পয়দা করেছেন, আমাদের পয়গম্বরও বলেছেন কোন মুসলমানের বেটী যেন চিরকাল কৌমার্য-জীবন যাপন না করে। সুতরাং আমাদের মালেক যদি তাঁর মেয়েদের চিরকাল সাদি না দিয়ে রাখতে চান তা হলে সে বড় লজ্জার কথা হয়।

শুনে বাপজান ভীষণ রেগে গিয়ে উজিরকে বললেন—তোমার কাছে কোন উপদেশ চাইছি না আমি। যেমন জায়গার খোঁজ চাইছি আমি তাই বলো। এমন জায়গার খোঁজ না দিতে পারলে তোমার গর্দান নেব আমি।

উজির তখন মাথা চুলকে বললে—খোদাবন্দ, যেমন জায়গাটি চাইছেন আপনি তা আমার জানা আছে, সে হচ্ছে মেঘ পাহাড়।

ওখানে কোন মানুষ যেতে পারে না। সুলেমানের বিরুদ্ধে যে সব ইফরিদরা বিদ্রোহ করেছিল, নিরাপদে থাকবার জন্যে তারাই ঐ জায়গা বেছে নিয়েছিল, তারা ওখানে একটা সোনার ইমারতও তৈরী করেছিল। সে ইমারত এখন খালিই পড়ে আছে। তা ছাড়া এখানকার জলহাওয়া খুবই ভাল, নানা ফুল আর ফলের গাছে ভরা জায়গাটা—টলটলে ঠাণ্ডা জলের ঝরনা, খেতে মধুর মত মিঠে। শুনে বাপজান তখনই অনেক মরদ জিন আর মারিদ প্রহরী দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিলেন। ওরা আমাদের পৌঁছে দিয়েই আবার বাপজানের রাজ্যে ফিরে গেল।

এখানে এসে দেখলাম উজির বাপজানকে ঠিক কথাই বলেছিলেন। রঙ বেরঙের সুগন্ধি ফুলের গাছ এখানে, নানা সুস্বাদু ফলের বাগান, ঝরনার জল দেখে মনে হয়—যেন মুক্তোর মালা বা রুপোর পাত বয়ে যাচ্ছে, আর কি মিষ্টি তাদের জল! গাছের ডালে কত রকমের সব পাখি, বাতাস এখানকার তাদের রব আর ফুলের গন্ধে ভরা। সব কিছু দেখে শুনে মনে হতো আমরা বেহেস্তেই এসে গেছি বুঝি! একটা শুধু ক্ষোভ ছিল কোন প্রিয়দর্শন পুরুষের মুখ দেখতে পেতাম না এখানে, আল্লা তাই বুঝেই, ভাই, তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন এখানে। ভাই হাসান, তুমি শীগগির আমাদের ছেড়ে যাবে না, অনেক দিন আমাদের এখানে থাকবে বল,—আমরা সাত বোন এক ভাইকে নিয়ে বেশ কিছুদিন তা হলে আনন্দে দিন কাটাতে পারি। এত স্নেহ এত আদর কি কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে? হাসান সহজেই রাজী হয়ে গেল, মৃদু হেসে সে জানাল—সে থাকবে। একটু পরেই আর পাঁচ বোন শিকার থেকে ফিরে এল, তারা—হাসানকে দেখে ভাইয়ের মত পেয়ে মহা খুশী, বললে—তোমাকে এখান থেকে আমরা কিছুতেই যেতে দেব না।

একসঙ্গে এতগুলি বোনের স্নেহ পেয়ে হাসান যেন ধন্য হয়ে গেল, সে বলল—তোমাদের অনুমতি না নিয়ে আমি এক পা-ও এখান থেকে নড়ব না।

এরপর সাত বোনের প্রাসাদে পরম আনন্দেই সে বাস করতে লাগল। এক সঙ্গে তারা খায় দায় ফুলফলের বাগিচায় আর ঝরনার ধারে বেড়ায়, শিকারে যায়। হাসানকে পেয়ে সাত বোন বেশি খুশী—না সাত বোনের স্নেহ পেয়ে হাসান বেশি খুশি বলা মুশকিল। রাত্রে ওরা একসঙ্গে বসে গল্প করে ঃ হাসান বলে তার নিজের দেশের নানা হালচাল রীতিনীতি, ঘটনা, আর বোনেরা বলে জিন মুলুকের কাহিনী। বোনেদের সেবা যত্ন ভালবাসা পেয়ে হাসানের চেহারা আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে—সব বোনকেই সে ভালবাসে—বিশেষ করে গোলাপকে। এদের পরস্পরের প্রতি টান দেখে যে কেউই মনে করবে এরা এক মায়ের পেটের ভাইবোন।

একদিন ওরা সবাই মিলে একটা ঝোপের ধারে বসে গান গাইছে এমন সময় আকাশে মস্ত বড় একটা ধুলোর ঘুর্ণি দেখা গেল, ঘুর্ণিটা সূর্যকে আড়াল করে বজ্রনাদে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সাত বোন অমনি আঁৎকে উঠে হাসানকে বললে, ভাই, তুমি পালাও, বাগিচার ঐ পটমণ্ডপের ভেতর ঢুকে পড়। শঙ্কিত হাসানের হাত ধরে গোলাপ পটমণ্ডপের এক কোণে লুকিয়ে রেখে এল। এদিকে ধুলোর ঝড় বোনেদের সামনে এসে মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল একদল জিন সৈন্য—জিনস্তান থেকে জিনরাজ পাঠিয়েছেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে যেতে। খবরটা শুনেই গোলাপ আবার ফিরে গেল হাসানের কাছে, চোখে তার জল, বুকটা তার ওঠানামা করছে আবেগে। হাসানের কপালে চুমু দিয়ে সে বললে, ভাই, কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে তোমার সঙ্গে। বাপজান সৈন্য পাঠিয়েছেন আমাদের নিয়ে যেতে ঃ অনেকদিন তিনি আমাদের দেখেন না—তা ছাড়া বাড়িতে কি এক উৎসব। বাবার অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসবেন বাড়িতে। আমরা কিছুদিন পরেই আবার ফিরে আসব। তুমি যেও না, ভাই—তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। তুমি এখানেই থাক—সমস্ত ঘরের চাবি দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। এই বলে এক গোছা চাবি দিল গোলাপ হাসানের হাতে, ঃ বললে, আর সব

ঘরই খুলতে পার তুমি, কিন্তু এই যে সোনার চাবিটার গোড়ায় পোকরাজ বসানো এটা যে ঘরের তালায় লাগে সে ঘর খুলবে না কখনও। বল—কথা দাও আমায় তুমি এখানে থাকবে আর সে ঘর খুলবে না, তা হলেই নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারি আমি।

হাসান চাবির গোছা হাতে নিয়ে বললে—তুমি যা বললে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমি।

এরপর আর ছয় বোনও একে একে এসে হাসানের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। হাসানকে ছেড়ে যেতে সবারই কষ্ট, সবারই চোখ ছলছল।

বোনেরা, চলে গেলে অতবড় বাড়িতে একা থাকতে হাসানের মোটেই ভাল লাগে না। সাত বোনের সঙ্গে সে দিনরাত হৈ হৈ করে বেড়াত, ওরা না থাকায় দমটা যেন তার একেবারে বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কি করবে সে এখন, একা একা কি করা যায়?—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল বোনেদের ঘরগুলি ত দেখা হয় নি—তাই দেখা যাক না—চাবি ত আমার কাছেই আছে! এই ভেবে তখনই উঠে বোনেদের ঘরগুলি সে একে একে খুলে দেখতে লাগল। দেখে আর আশ্চর্য হয়, প্রত্যেকটিতেই কত সব সুন্দর আশ্চর্য জিনিস কেমন পরিপাটি করে সাজানো। সাতটা চাবি দিয়ে সাত ঘরের দরজা খুলে দেখবার পর বাকী রইল শুধু একটি দরজা যেটি খুলতে হয় সেই পোকরাজ বসানো সোনার চাবি দিয়ে। তার আদরের বোন গোলাপ বার বার নিষেধ করে গেছে ঐ দরজাটা খুলতে। কেন—কি আছে ওখানে, অত্যাশ্চর্য রহস্যময় কিছু নিশ্চয়ই। খুলে দেখতে বড় ইচ্ছা করতে লাগল হাসানের—হাতটা নিশপিশ করতে লাগল। অনেক কষ্টে নিরস্ত করলে সে নিজেকে, ফিরে এল নিজের ঘরে। ক্রমে রাত্রি এল, রাত্রে নিঃসঙ্গতা যেন তার বুক আরও চেপে ধরল। ঘুমও ত কিছুতে আসে না, কি করবে সে? বড় মুশকিল হল ত! সময় যে আর কাটতে চায় না। সেই নিষিদ্ধ দরজাটা খুলে দেখবে না কি? এই রাত্রেই?—না রাত্রে না—ভোর হোক আগে, দিনের আলো আসুক,

তারপর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে। এই ভেবে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল—কিন্তু কোথায় ঘুম, মনে নিঃসঙ্গতার জ্বালা, কৌতূহল আর অস্বস্তি। হঠাৎ তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল হাসান; দূর হোক ছাই, মঁরি ত মরব—খুলে দেখবই আমি দরজা—এই রাত্রেই। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে হাসান একটা মশাল জ্বেলে নিষিদ্ধ ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে কুলুপে চাবি লাগাল। অনায়াসে নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল, হাসান ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকলেও প্রথমে হাসানের সেখানে কিছুই নজরে পড়ল না। না আছে কোন বিছানা, আসবাব পত্র, না আছে কোন মাদুর বা গালিচা, না কিছু। চারিদিকে বেশ ভাল করে তাকাতে শেষে দেখে ঘরের এক কোণের দেয়ালের গা ঘেঁষে রয়েছে একটা কালো কাঠের মই—মইটার উপরের দিকটা একটা ফোকর দিয়ে ছাদের উপরে উঠে গেছে। কি ব্যাপার উপরে তাজ্জব কিছু আছে না কি? দেখাই যাক না! হাসান মশালটা ঘরের মেঝের উপর রেখে মই বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। মাথাটা ফোকরের উপরে তুলতেই দেখে উপরে সুন্দর একটা ফুল আর ফলের বাগিচা। আচ্ছা মজা ত! এবার মইয়ের শেষ ধাপে পা দিয়ে সোজা উপরে উঠে এল হাসান। চারিদিক জোছনায় ছেয়ে এমন এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে যা মানুষে কোনদিন কল্পনা করতে পারে না। আরে—এ কি—সামনেই যে রয়েছে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের এক হ্রদ। তীরের ফুল আর ফলগাছের ডালপালার ছায়া পড়েছে তাতে—মৃদু মৃদু দুলছে,—মনে হচ্ছে এই বুঝি পাপিয়া বুলবুলও ডেকে উঠল। পূর্ণিমার চাঁদ আর তারা-ভরা নীল আসমানের ছায়া পড়েছে জলের আয়নায়, ঝলমল করছে। হ্রদের অপর প্রান্তে দুগ্ধফেননিভ এক মর্মর প্রাসাদ, তার মোজাইক সিঁড়ি হ্রদের জলে নেমে এসেছে, তার সামনে জলের উপর চুনী পান্না আর সোনা রূপোর ইঁটে তৈরি এক পাটাতন, পাটাতনের উপর য়্যালাবাসটারের চারটে হালকা থামে বাঁধা একটা চাঁদোয়া তার নীচে চন্দনকাঠ আর সোনা দিয়ে তৈরি একটা

সিংহাসন। সিংহাসনের দুই পাশে দুটো সবুজ সতেজ দ্রাক্ষালতা উঠে গেছে। ঐ পুরো জায়গাটা আবার সরু সোনা আর রূপোর জালতি দিয়ে ঘেরা। দুনিয়ার কোন সুলতানই বুঝি এমন একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টির কথা ভাবতেও পারেন না।

একটু নড়লে বুঝি এই রূপলোকের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে—হাসান এক রকম নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে—এমন সময় দেখে দস্তুর মত বড় কয়েকটা পাখী আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে। পাখীগুলো হ্রদের তীরে নেমে মাটিতে ওদের দুধের ফেনার মত সাদা পাখা ঝাপটাতে লাগল, হাসান গুণে দেখে—দশটা। পাখীগুলো এদিক ওদিক একটু ঘুরবার পর ওদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় আর বেশি সুন্দর সেটা পাটাতনের উপর এগিয়ে গিয়ে বসেই কি ইঙ্গিত করতেই ওদের সাদা পালকের পাখাগুলো খসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে হাসান দেখে তার সামনে বেহেস্তের হুরীর মত অপরূপ সুন্দরী দশটি তরুণী মূর্তি—মেঘের আড়াল থেকে এক সঙ্গে যেন দশটি চাঁদ বেরিয়ে এল। হাসতে হাসতে তারা হ্রদের জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল, তা ছাড়া পরস্পরের গায়ে মুখ দিয়ে জল ছুঁড়ে হাত দিয়ে জল ছিটিয়ে খেলা। সবার চেয়ে সুন্দর যে মেয়েটি সে অপর কয়টিকে একে একে ধরে কাতুকুতু দিয়ে চিমটি কেটে নানা রকম আদরের চাপড় মেরে ডুব দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল—সবাই হেসে লুটোপুটি।

অনেকক্ষণ ধরে জলে এই রকম খেলা করবার পর তারা জলের থেকে উঠে এল ডাঙ্গায়—সবার চেয়ে সুন্দরী যেটি সেটি গিয়ে পাটাতনের উপর সেই সিংহাসনে বসলে। হাসান তার দিকে একবার ভাল করে চাইতেই তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। মনে ভাবলে সে, বুঝেছি—এই জন্যই বোন গোলাপ আমার ঐ চাবি দিয়ে দরজা খুলতে নিষেধ করে দিয়েছিল, নিষেধ না শোনার এই ফল: এবার চিরকালের মত হয়ে গেল আমার!

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছুটে যায়—

মেয়েটি হাসানের জীবনে মহা বিপর্যয় ডেকে আনছে জেনেও সে গাছের আড়ালে থেকে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে পারলে না। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, গা কাঁপতে লাগল—তবুও। এই অবস্থাতেই হাসান মেয়েটিকে দেখে আর মনে মনে বলে—খোদা কেরামতি দেখিয়েছেন বটে!

এদিকে মেয়েটি সিংহাসনে বসেই তার সহচরীদের কি ইঙ্গিত করতে তারা নানা দামী জমকালো পোশাক এনে তাকে সাজালে দেখে হাসানের মনে হল তার সামনে সিংহাসনে বসে কনে বেশে এক বেহেস্তের হুরী। দেখে হাসান নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছিল না—মনে হচ্ছিল তখনই ছুটে গিয়ে ওর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য যে আবেগ তাকে এই রকম প্রেরণা দিচ্ছিল সেই আবেগই আবার তার সেখান থেকে নড়বার কথা বলবার সমস্ত শক্তি তখনকার মত কেড়ে নিয়েছিল। হারায় নি সে শুধু চোখের দৃষ্টি এবং মনের চেতনা। এদিকে মেয়েটি তখন একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেই তার সহচরীদের বলে উঠল, তোরা আর দেরি করছিস কেন, রাত যে ভোর হয়ে এল—অনেক দূর যে যেতে হবে আমাদের।

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে সহচরীরা পালকের পোশাক এনে তাকে পরিয়ে দিল, নিজেরা নিজেদেরগুলি পরলে তারপর দশটি মেয়ে দশটা শ্বেতকপোতীর মত ডানা মেলে আকাশে উঠে কোথায় উড়ে চললো—হাসান হাঁ করে তাকিয়ে রইল। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ততক্ষণ হাসানের চোখদুটো যেন আটকে রইল আকাশের গায়ে। যখন ওরা সুদূরে মিলিয়ে গেল তখনও হাসান একটা নিষ্ফল আশা নিয়ে—মেয়েগুলি আকাশের যেদিকে মিলিয়ে গেল সেই দিকই অর্ধ মূর্ছিতের মত তাকিয়ে রইল। তারপর যখন তার পূর্ণ সংবিৎ ফিরে এল, যখন বুঝলে যাকে সে দেখতে চায় তাকে এখন আর দেখার চেষ্টা বৃথা, তখন সে মাটিতে বসে পড়ল, দুই চোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, গালে হাত দিয়ে সে নিজের মনে

বলতে লাগল—আরে বসোরার হাসান, শেষে তোর এই হল, তোর যে বড় গুমোর ছিল কোন মেয়েকে দেখে তুই ভুলবি না—কারো রূপের ফাঁদে ধরা পড়বি না, সে অহংকার তোর কোথায় গেল, শেষে কি না মানুষের ধরাছোঁওয়ার বাইরে এক জিন-কন্যা তোর দিল্‌কে একেবারে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? এখন তুই কি করবি? লোকে বলে প্রেম নাকি বড় মধুর, কিন্তু আমি যে দেখছি এর চেয়ে জহর ভাল ছিল। সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত হাসান গালে হাত দিয়ে বসে এই রকম সব ভাবলে, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে মেয়েটি যে সিংহাসনে বসেছিল সেখানে এবং তার আশেপাশে ঘুরতে লাগল—যদি তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল যদি তার গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। এমনি করে কিছুক্ষণ পাগলের মত ঘুরে সে নীচে তার শোবার ঘরে ফিরে এল বটে, কিন্তু মনটা তার একটুও শান্ত হল না, কখন রাত্রি আসবে, আবার সে সেই মেয়েটির দেখা পাবে এই চিন্তা নিয়ে সারাদিনটা সে ছটফট করে কাটিয়ে দিলে। রাত্রি হলে আবার সে নিষিদ্ধ দরজা খুলে ছাদে উঠল, সারারাত জেগে আকাশের দিকে চেয়ে রইল—কোন পাখী এল না, শুধু সে রাতের কথা নয়, পরপর কত রাত হাসানের এমনি করে কেটে গেল, কোন পাখীর দেখা মিলল না। ফলে হাসানের অবস্থা হয়ে উঠল অতীব শোচনীয়, আহার নিদ্রা স্নান সব তার ঘুচে গেল, শরীর শুকিয়ে হল আমসি।

এই সময় জিনস্তানে বাপের বাড়ির উৎসব থেকে জিনরাজের সাত মেয়েই ফিরে এল। ছোট বোন গোলাপ পথের পোশাক না ছেড়েই হাসানের ঘরে ছুটে এসে দেখে হাসানের শরীরটা যেন বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে, আধ বোজা দুই চোখ দিয়ে কেবল জল গড়িয়ে পড়ছে। হাসানের এই অবস্থা দেখে কেমন এক করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল গোলাপের কণ্ঠ থেকে, সে তখনই হাসানের বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে তার মুখ ধরে কপালে আর মাথায় চুমু দিয়ে বললে—ও ভাই, এ তোমার কি হাল

হয়েছে—কি দুঃখ তোমার মনে আমায় খুলে বল, দেখি আমি যদি তা দূর করতে পারি, তোমার এ অবস্থা দেখে বুকটা আমার একেবারে ফেটে যাচ্ছে—ভাই, বলো। আল্লা জানেন তোমার জানের জন্য হাজার বার আমি নিজের জান কোরবানি দিতে পারি, আমার কাছে কোন কিছু লুকিও না তুমি—আল্লা রাগ করবেন, তুমি বলো। হাসান তাতেও বলে না দেখে গোলাপ তার সামনে জানু পেতে বসে তার দুটো হাত ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের জলে ভেসে আরও কত কি বলতে লাগল, তা ছাড়া একেবারে পাগলের মত করতে লাগল। গোলাপকে এমনি করতে দেখে হাসানের দুই চোখ দিয়ে আবার নতুন করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তারই মাঝে ম্লান হেসে সে বললে—বোন, আমার কথা শুনে কি করবে তুমি, এ ব্যামো আমার কেউ সারাতে পারবে না, নিজের দোষে ভুগছি আমি, তুমি কি করবে, তার চেয়ে কোন পীড়াপীড়ি না করে আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

গোলাপ হাসানের মুখ চাপা দিয়ে বললে—ছি ভাই, ও কথা বলতে নেই, আল্লা তোমায় ভাল করুন, সুস্থ করে তুলুন। তোমাকে সুস্থ করে না তুলতে পারলে আমি নিজেই মারা যাব—বলতে গিয়ে গোলাপের দুই চোখ জলে ভরে এল।

হাসান তখন আর নিজের কথা চেপে রাখতে না পেরে গোলাপ চলে যাবার পরে তার যা যা ঘটেছিল সে সব তাকে খুলে বললে: এর পর এই দশদিন আমার চোখে ঘুম নেই—বোন, পেটে কোন দানাপানি পড়ে নি।

হাসান গোলাপের অবাধ্য হয়ে নিজের খেয়ালখুশিমত কাজ করেছে এতে গোলাপের রাগ করবারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য সে একটুও রাগ না করে বরং ভাইয়ের দুঃখে রীতিমত কাতর হয়ে বললে—তুমি শান্ত হও, ভাই, চোখের জল মোছ, আমি খোদার কসম নিয়ে বলছি আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তাতে আমার জান যায় তা-ও স্বীকার। কিন্তু খবরদার—এ সব

কথা যেন আমার বোনেরা ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, তা হলে আমরা দু'জনেই মারা পড়ব। তোমার এ হাল হয়েছে কেন ওরা যদি জিজ্ঞাসা করে বলো—এতদিন বোনেদের না দেখে তোমার এ দশা হয়েছে।

ঠিক আছে, এই যুক্তিই ভাল, তোমার কোন কথার আর আমি অবাধ্য হব না।

এর পর হাসানের মনটা একটু হালকা হল: তার অবাধ্যতায় রাগ করেনি গোলাপ। এবার নিজে থেকেই বোনের কাছে সে খাবারও চাইল।

গোলাপ হাসানের কপালে চুমু দিয়ে ছুটল তার বোনেদের কাছে। চোখ দুটো তার তখনও ভিজে। সে বোনেদের কাছে গিয়ে বললে— বেচারা হাসানের কি দশা হয়েছে একবার দেখবে এস, আমরা এখানে ছিলাম না বলে সে দশদিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে একেবারে মরার সামিল হয়েছে, কেউ কাছে না থাকায়—বুঝছি তার দেশের কথা মায়ের কথা ভেবেও সে কাতর হয়ে পড়েছে। গোলাপের দিদিদের মন বড় নরম, বড় স্নেহপ্রবণ, তারা এই কথা শুনেই ভালভাল খানাপিনা নিয়ে ছুটে এল হাসানের কাছে, তারপর অনেক সান্ত্বনা দিয়ে মিষ্টি কথা বলে তাকে আদর করে খাওয়ালে, তার মনে ফুর্তি আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে জিনস্তানে বাপের বাড়ির উৎসবে যে সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে এসেছে সে সবের গল্প করতে লাগল। এমনি করে একমাস ধরে যত্নআত্তি করে তার সাবেক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু তবু হাসানের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারল না।

এরপর বোনেরা আবার শিকারে বেরুল, গোলাপ শুধু রয়ে গেল হাসানকে দেখাশুনা করবে বলে। হাসানকে দেখবার জন্য গোলাপ রইল দেখে ওরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে শিকারে যেতে পারল। এদিকে হাসানকে একা পেয়ে গোলাপ সস্নেহে তার হাত ধরে সেই

নিষিদ্ধ ঘরের তালা খুলে তাকে ছাদের উপরে নিয়ে এল, তারপর একটা গাছের নীচে বসিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, এবার বলত ভাই, এই যে সায়রের কিনারায় এত মণ্ডপ রয়েছে—এর কোনটায় তুমি তাকে দেখেছিলে ?

হাসান বললে—কোন মণ্ডপে নয়, জলের ধারের পাটাতনের উপর যে সিংহাসন রয়েছে ঐ সিংহাসনে সে বসেছিল।

শুনবামাত্র গোলাপের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে—সর্বনাশ, বলছ কি, এ যে জাহানারা, জিনসুলতানের ছোট মেয়ে এ, অপূর্ব সুন্দরী। বাপের আমীর ওমরাহদের মেয়েরা তার সখী, তাদের নিয়ে প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে সে এই হ্রদে জলকেলি করতে আসে, যাতুকরা পালকের পোশাক পরে উড়ে আসে। বাপ ওর তামাম জিনমুলুকের মালেক, আমার বাপজান ত তারই এক এলাকার সামন্তরাজ মাত্র। যে পালকের পোশাক পরে পাখী হয়ে ওরা এ হ্রদে গোসল করতে আসে সে সব যাতুকরা। জাহানারাকে পেতে হলে তোমাকে তার ঐ পোশাক চুরি করতে হবে। এটা পরতে না পারলে সে আর এখান থেকে উড়ে নিজের বাপের মুলুকে যেতে পারবে না। আগামী পূর্ণিমাতে এখানে এসে যখন সে হ্রদের জলে নেমে সখীদের সঙ্গে নানা রকম জলক্রীড়া করতে থাকবে তখন তুমি তার এই পোশাক চুরি করে কোন ঝোপের মাঝে লুকিয়ে রাখবে। জলক্রীড়ার পর ওর সখীরা নিজের নিজের পালকের পোশাক পরে জিনস্তানে উড়ে চলে যাবে, ও পারবে না। যখন ও বুঝতে পারবে তুমিই ওর পোশাক লুকিয়েছ তখন ও নানা অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতি করে কান্নাকাটি করে পোশাকটা ফেরত চাইবে তোমার কাছে, দেবে না তুমি, কিছুতে না, যদি দাও তা হলে তুমি আমাদের বাপজান সমেত আমরা সবাই গেছি। তুমি, ওর পোশাক না দিয়ে বরং ওর চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে টানতে থাকবে, তা হলেই ও বশ মানবে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

গোলাপের কথা শুনে হাসানের দুঃখ নৈরাশ্য অবসাদ যেন এক নিমেষে উবে গেল, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হল যেন তার। আনন্দের উচ্ছ্বাসে গোলাপের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে তাতে চুমু দিয়ে সে তার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

কয়েকদিন পরেই যখন পূর্ণিমা এল তখন হাসান সেই নিষিদ্ধ ঘর দিয়ে ছাদে উঠে পাটাতনের পাশে একটা ঘন ঝোপের মাঝে লুকিয়ে রইল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না তারঃ একটু পরেই জোছনাভরা আকাশে ডানা মেলে দশটা বড় বড় পাখীকে সে হ্রদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। তারা এসে হ্রদের তীরে নামল। দেখে দুর দুর করে হাসানের বুক কাঁপতে লাগল। হাসান একদৃষ্টে চেয়েই রইল তাদের দিকে; দশটি মেয়েই তাদের পালকের পোশাক ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জিনসুলতানের মেয়ে জাহানারাকে যেন আগের চেয়ে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে এবার। তার পোশাকটার দিকে হাসান বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। ওরা জলক্রীড়ায় মাতামাতি শুরু করলেই হাসান চুপিচুপি ঝোপ থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে ওর পোশাকটি হাতে নিয়ে ওদের অলক্ষ্যেই আবার ঝোপের মাঝে লুকাল।

এদিকে জলক্রীড়া শেষ হলে শাহাজাদী জাহানারা পোশাকের কাছে এসে দেখে, পোশাক তচনচ। ওর মাঝে নিজের পোশাকটা খুঁজতে গেল সেঃ এ আল্লা, পোশাক ত নেই! নিজের যাদু-পোশাক খুঁজে না পেয়ে জাহানারা বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার কান্না শুনে সহচরীরা ছুটে এসে ব্যাপার বুঝে ভিজে গা না মুছেই নিজের নিজের যাদু পোশাক পরে আকাশে উঠে নিজেদের দেশে রওনা হয়ে গেল, শাহাজাদী জাহানারার ক্রোধ বিরক্তি কান্নার কথা ভাববারও তারা ফুরসত পেল না।

এদিকে হাসান জাহানারাকে একা পেয়ে এক লাফে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে তাকে ধরতে ছুটল। হঠাৎ এক তরুণকে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে তার দিকে ছুটতে দেখে জাহানারাও

ভয়ে দিশেহারা হয়ে হ্রদের চারিদিকে ছুটতে আরম্ভ করল। অতি দ্রুত ছোটার দরুন জাহানারার চুল বাতাসে নিশানের মত হয়ে উঠল। হাসান প্রাণপণ ছুটে হঠাৎ সেই চুল নিজের হাতের মুঠোয় ধরে ফেলল, তারপরই সেই চুল ধরে টান। জাহানারা কত কাঁদতে লাগল, কত কাকুতি মিনতি করতে লাগল, হাসান কিছুতেই ছাড়ে না—সে নানা মিষ্টি কথা বলে আদরের ডাক ডেকে বললে—কোন ভয় নেই, কিছ্ছু ক্ষতি করব না তোমার, তুমি আমার সঙ্গে এস। জাহানারা হাসানের সঙ্গে কিছুতেই না পেরে অবশেষে বাধ্য হয়ে চোখ বন্ধ করে বন্দী অবস্থায় হাসানের পিছু পিছু আসতে লাগল। হাসান তাকে নিজের ঘরে রেখে দরজা বন্ধ করে তখনই ছুটল তার বোন গোলাপের কাছে শুভ খবরটি দিতে।

খবর পেয়ে গোলাপ তখনই ছুটে এল হাসানের ঘরে, এসে দেখে জাহানারা হাপুস নয়নে কাঁদছে আর রাগে ক্ষোভে নিজের হাত কামড়াচ্ছে। গোলাপ অমনি জাহানারার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে তার সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে বলে উঠল—আল্লা আপনার ভাল করুন, সুখে রাখুন, শাহাজাদীর পায়ের ধুলোয় আজ আমাদের বাড়ি ধন্য হল, পবিত্র হল। গোলাপকে দেখেই জাহানারা কান্না থামিয়ে ফোঁস করে উঠল: গোলাপ, তুমি, তুমিই তা হলে মানুষের বেটা এনে তোমাদের সুলতানের বেটীকে এমন হেনস্থা করতে সাহস পাও! ধন্যি সাহস তোমার, জব্বর সাহস, তা না হলে আমার বাপের হিম্মৎ জানা সত্ত্বেও তুমি এমন ষড়যন্ত্র করতে পারতে না। দুনিয়ার তামাম জিনরাজা আমার বাপের তাঁবেদার, সমুদ্রের তীরের অসংখ্য বালুর মত ইফরিদ আর মারিদ আমার বাপের আজ্ঞাবহ, এ সব জেনেও তুমি একটা মানুষের বেটাকে দিয়ে আমার এমন দশা করতে পারলে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি আমি! তুমি ছাড়া কে আর তাকে—আমি যে সায়রে এসে সাঁতার কাটি সেখানে যাবার পথ দেখাবে।

গোলাপ হাত জোড় করে বললে—শাহাজাদী, হুজুরাইন, আপনি আমার উপর গোসা করবেন না, মন খারাপ করবেন না। যে ছেলেটি আপনাকে এখানে এনেছে, তার তুলনা মেলে না। কোন অসৎ অভিসন্ধি তার নেই, নসিবে যা লেখা আছে তা হবেই। তা নিয়ে অযথা মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। ছেলেটি আপনাকে দেখামাত্র ভালবেসে একেবারে পাগল হয়ে গেছে। আর যে ভালবাসে তার হাজার কসুর মাফ করতে হয়, আর এমন স্বভাবের এক তরুণের ভালবাসা পেয়ে আপনার নিজের জীবনও সার্থক হবে। এ কথাটা আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আর ভেবে দেখুন আল্লা মেয়েদের পয়দা করেছেন কেন? পুরুষের সঙ্গে নীড় রচনা করাবেন বলেই ত—আপনি মেয়ে হয়ে জন্মেছেন, জীবনে আপনারও একটি পুরুষ সঙ্গী চাই, আর এ-ও বলছি আমি দুনিয়ায় এমন সুন্দর তরুণ আর একটিও খুঁজে পাবেন না আপনি, সুতরাং—আর আপনাকে দেখার পর ওর কি হাল হয়েছিল তা যদি একবার আপনি দেখতেন, তা হলে আপনারও চোখে জল এসে যেত, বিশ্বাস করুন সে একেবারে মরার সামিল হয়েছিল। গোলাপ এরপর জাহানারাকে দেখার পর হাসানের অবস্থা যা হয়েছিল সব তাকে খুলে বললে। শুনে জাহানারার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, বুঝলো নসিবে তার এই লেখা ছিল, এ ছাড়া তার গতি নেই।

গোলাপ এরপর জাহানারাকে ভাল জামা কাপড় এনে পরালে, ভাল খানা খাওয়ালে। জাহানারা একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললে, বুঝলাম আমার বাপ-মা আমার দেশ সব কিছু ছেড়ে থাকাই আমার নসিবে লেখা। খোদার লিখন উল্টানো কারো সাধ্য নেই। গোলাপও তখন ঐ রকম কথাই তাকে বলতে লাগল। জাহানারার চোখের জল যখন ধীরে ধীরে শুকিয়ে এল তখন ছুটল গোলাপ হাসানের কাছে। গিয়ে বললে—ভাই, হয়েছে এবার যাও, জলদি। গিয়ে কি করবে তা-ও তোমায় বলে দিচ্ছি:

গিয়ে প্রথমেই ওর পায়ে চুমু দেবে, তারপর হাতে। এ সব না করে একটিও কথা বলবে না তুমি, আর কথা যখন বলবে তখন তার ভাষা যেন সুন্দর হয়, কণ্ঠে যেন মধু থাকে।

এই কথা শুনবার পর হাসান আবেগকম্পিত বক্ষে ছুটে গেল তার ঘরে জাহানারার সামনে। জাহানারা এই প্রথম হাসানের দিকে চেয়ে দেখলে। হাসানের সুন্দর চেহারা দেখে তার মন নরম হল, কিন্তু হাসান যখন তার পায়ে এবং হাতে চুমু দিল তখন সে দুই চোখ নীচু করে রইল। ভালবাসার আবেগে যত রকম মিষ্টি ডাক প্রেমিকের মুখে আসে সেই সব নামে জাহানারাকে ডেকে হাসান বললে—ফিরে চাও, দয়া করো আমায়; আমার বোন গোলাপ যেমন তোমার বাঁদী, আমিও তেমনি তোমার এক গোলাম জেনো, চিরকাল গোলামই থাকব। কোন রকম অসম্মান অমর্যাদার ভয় করো না আমার কাছ থেকে। আল্লা এবং তাঁর রসুল মহম্মদের ফরমান মত তোমাকে সাদি করে তোমাকে আমার জন্মস্থান বসোরায় নিয়ে যাব, সেখানে তোমার সুখশান্তি বিধান আর ফাইফরমাস খাটার জন্য অনেক বান্দা বাঁদী রেখে দেব। শান্তির শহর বসোরায় বাস করে তুমি আনন্দ পাবে, দেখবে সেখানকার লোকজন কত শিক্ষিত, ভদ্র, অমায়িক, তাদের কথাবার্তা কত মার্জিত, মধুর। বাড়িতে আমার এক মা আছেন, দুনিয়ায় এমন জেনানা তুমি আর একটিও খুঁজে পাবে না। তিনি তোমায় আপন মেয়ের মত যত্ন আত্তি করবেন, ভালবাসবেন। তাঁরই হাতের রান্না খাবে তুমি, আর কি সে খানা—যেন অমৃত। তামাম ইরাকে তাঁর মত পাকা রাঁধুনী আর আছে বলে আমার মনে হয় না।

হাসান জিনভাদের সুলতানের বেটী জাহানারার মন জয় করবার জন্য এই রকম সব কথা বলতে লাগল বটে, কিন্তু জাহানারা এর উত্তরে একটি কথাও বলল না, চোখ তুলে চাইল না, এমন কি নিজের দুঃখের আভাস দিতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলল না।

হাসান যখন এই রকম সব বলে চলেছে ঠিক সেই সময়

প্রাসাদের বাইরের দরজায় কে বা কারা করাঘাত করছে তার আওয়াজ কানে যেতে হাসান তখনকার মত জাহানারার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দরজা খুলতে ছুটল। এ বাড়িতে আসার পর এ কাজের ভারটা তার উপরই পড়েছে। হাসান গিয়ে সদর দরজা খুলেই দেখে ছয় বোন শিকার থেকে ফিরল। বোনেরা যখন দেখল হাসান সাবেক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, মুখে গোলাপী আভা তখন তাদের দিলটা বড় খুশীই হল। হাসান কিন্তু জাহানারা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে পরপর ছয় বোনের কপালে চুমু দিয়ে তারা শিকার করে যে সব হরিণ, খরগোশ, খেঁকশেয়াল ইত্যাদি এনেছে সেই সব বাড়ির ভিতর নিতে লেগে গেল। বেশ হাসিখুশি হাসান, তার হাবভাব দেখেই মনে হয় বোনেরা ফিরে আসতে সে জবর খুশী হয়েছে। বোনেদের কিন্তু বেশ একটু তাজ্জব লাগছে, ছোটবোন গোলাপ কেবল যা পেত হাসানের কাছ থেকে তারা সবাই যে আজ সেই আদরই পাচ্ছে তার কাছ থেকে, ব্যাপার কি? বড়বোন সব চেয়ে সেয়ানা, সে আন্দাজ করে নিলে হাসানের—এ খোশ মেজাজের নিশ্চিয়ই অন্য কোন কারণ আছে—তাদের ফিরে আসা নয়—তাই সে চোখ মিটমিট করে বললে, ভাই হাসান, এতদিন আমরা তোমায় আদর করলেও এমনি আদর আমরা—পাইনি তোমার কাছ থেকে, আজ যে বড়—ব্যাপার কি বলত? শিকারীর পোশাকে তুমি কি আমাকে বেশি সুন্দর দেখছ না হঠাৎ বোনেদের উপর ভালবাসা তোমার অনেক বেড়ে গেল,—না দুই-ই?

শুনে হাসান মুখ নত করল, একটা গভীর দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে।

সে কি, ভাই, তুমি এমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে কেন, তোমার মায়ের জন্যে কি মন কেমন করছে, তুমি কি তোমার দেশে ফিরে যেতে চাও? মনের কথা খুলে বলো আমাদের কাছে, ভাই লক্ষ্মীটি।

এই সময় গোলাপ সেখানে এসে পড়ায় হাসান লজ্জায় মুখ রাঙা করে তার দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাকেই বোনেদের কথার জবাব দিতে অনুরোধ করলে।

গোলাপ মৃদু হেসে বললে—উঁহু, ওসব কিছু নয়, ভাই আমাদের সুন্দর একটা পাখী ধরেছে, ও চায় তোমরা তাকে পোষ মানাতে সাহায্য কর।

এ আর তেমন কি কথা, কিন্তু এতে লজ্জায় মুখ রাঙা করবার কি আছে ?

পাখীটাকে ও বড্ড বেশি ভালবেসে ফেলেছে—দারুণ।

বোনেরা বিস্মিত হয়ে বললে—ও হাসান ভাই, একটা পাখীর উপর এমন জবর পেয়ার পড়তে গেল কেন তোমার ?

হাসান কোন জবাব না দিয়ে মাটির দিকেই তাকিয়ে রইল। মুখ তার তখনও রাঙা। উত্তর দিলে গোলাপ—পেয়ার হল ওর—তার অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখে, বুলি শুনে, তারপরের কাণ্ড কারখানা ভাবভঙ্গী দেখে।

পাখীটা বোধ হয় তা হলে বেশ বড় !

হ্যাঁ, প্রায় আমারই মত।

বোনেরা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকাল গোলাপের দিকে। গোলাপ তখন বোনেদের আর ধাঁধায় না ফেলে বললে—দিদিভাইয়েরা, শোন—খোলসা করেই বলছি তোমাদের। ভাই আমাদের মানুষ আর মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধিও সীমাবদ্ধ। আমরা যখন ওকে একা ফেলে বাপজানের কাছে চলে যাই, তখন ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় ও বাড়ির এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে ভুলে নিষিদ্ধ দরজার তালা খুলে উপরের ছাদে চলে যায়। সেখানে এই এই ব্যাপার ঘটে—বলে গোলাপ সমস্ত ঘটনা বোনেদের খুলে বললে। সমস্ত ব্যাপারটা গোলাপ এমন করে বিন্যাস করলে যাতে হাসানের উপর বিন্দুমাত্র দোষ আরোপ করা না চলে। সর্বশেষে গোলাপ জোর গলায় এক রকম স্পষ্ট করেই বললে, সত্যি দিদিভাইয়েরা—

ভাইয়ের আমাদের দোষ দেওয়া যায় না—শাহাজাদী জাহানারার—এমনি রূপ যে তাকে দেখলে যে কোন মানুষের মাথা ঘুরে যাবার কথা, ভাই আমাদের শুধু শুধু মরতে বসেনি তার জন্যে।

বোনেরা বললে—আমরা দেখিনি জাহানারাকে, তুই ত দেখেছিস—একটু বল না আমাদের কাছে কেমন সে দেখতে।

গোলাপ বললে—সে যে কত সুন্দর চোখে না দেখলে তোমরা তা ধারণা করতে পারবে না, তবু তোমরা যখন বলছ তখন তার রূপের একটা আভাস দিতে চেষ্টা করছি আমি, তবে এ কথাও বলে রাখছি—দেখলে তোমাদের সবারই জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা হবে—এই বলে গোলাপ জাহানারার চোখ মুখ, মাথার চুল, দেহের গঠন, বর্ণ এবং ভাবভঙ্গীর যে বর্ণনা দিলে তাতে ছয় বোন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে হাসানকে বললে—ভাই, এ যে শুনলাম তাতে তোমার কেন আমাদেরও মাথা খারাপ হওয়ার কথা, তা, ভাই, আমাদের একবার নিয়ে চলো না তার সামনে, দেখে আমাদের নয়ন সার্থক করি।

শুনে হাসান বুঝলে শুধু গোলাপ নয়, তার ছয় দিদিকেও সে এবার তার পক্ষে পেলে। সে তখন সানন্দে বোনেদের যে ঘরে জাহানারা রয়েছে সেই ঘরে নিয়ে এল। বোনেরা হাসানের সঙ্গে এসে জাহানারার দুই হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে বললে, শাহাজাদী, হুজুরাইন, খোদার অশেষ দোয়া যে এমন এক তরুণকে আপনার সামনে পাঠিয়েছেন, আপনার নসিবে সুখশান্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা। বাড়িয়ে বলছি না, ঝুটাও কিছু বলছি না, আল্লার নাম নিয়ে বলছি আমাদের এই ভাইয়ের চেহারাই শুধু সুন্দর নয়, এর অন্তর সুন্দর, অতি সুন্দর, জ্ঞান বুদ্ধি রুচি, দয়ামায়া দরদ দিয়ে খোদা এর প্রাণটা এমন করে গড়েছেন যে—আমাদেরও ত বয়স হল—কই এমনটি ত আর কোথাও আমাদের চোখে পড়ে নি। আর একটা কথা ভেবে দেখুন হুজুরাইন, এ আপনাকে তার প্রাণের আবেগ জানাতে অপর কারো সাহায্য নেয় নি, অথচ আপনার অসম্মানকর [illegible]

কোন কিছু সে করে নি, করতে পারে না। ধর্মানুমোদিত পথেই সে আপনাকে পেতে চায়। মেয়েদের জীবনে পুরুষের প্রয়োজন আছে এ কথা আমাদের মত আপনিও জানেন, তাই আমাদের এই ভাইজানের সঙ্গে আপনাকে আমরা সাদি দিতে চাই—এতে সুখী হবেন আপনি এ কথা আমরা জোর করে বলতে পারি।

উত্তর শুনবার জন্য বোনেরা সব উৎকর্ণ হয়ে রইল—জাহানারা কিন্তু হাঁ, না—কিছুই বললে না। গোলাপ তখন জাহানারার কাছে এগিয়ে এসে তার একটি হাত সন্তর্পণে সাদরে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে—হুজুরাইন, আপনার অনুমতি ভিক্ষা চাইছি—তারপরেই হাসানের দিকে চেয়ে বললে—ভাই, তোমার হাতটা, এগিয়ে দাও ত। হাসান গোলাপের কথামত হাত এগিয়ে দিলে গোলাপ দুটি হাত একত্র করে বললে—আল্লার নাম করে, আর তাঁর রসুল মহম্মদকে সাক্ষী মেনে এই আমি তোমাদের দুইজনের জীবন এক সুতায় গেঁথে দিচ্ছি—আজ থেকে তোমরা—স্বামী স্ত্রী।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাসে—হাসান জাহানারার মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে তখনই মুখেমুখে ছড়া কেটে বলে উঠল—

লাবণ্যের সায়রে স্নান করে এলে তুমি আমার জীবনে।
দেহার্ধ তোমার পদ্মরাগে গড়া,
বাকী অর্ধেক দেখি মুকতো, তৈলস্ফটিক আর কস্তুরী।
খোদার বাগিচায়—তুমি—অনন্যা অনুপমা—
তাই তোমার—কাছে জান কবুল করছি আমি।

শুনে সাত বোন একেবারে এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল ; সাবাস, ভাই, সাবাস, বলিহারি! ঠিক বলেছ তুমি, খাসা—তারপর জাহানারার দিকে ফিরে বললে—কি, হুজুরাইন, ঠকেছেন আপনি?—এমন করে যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তাকে জীবন-সঙ্গী পেয়ে ঠকেন নি আপনি নিশ্চয়! আমরা আপনাকে ঠকাই নি।

জাহানারা বললে—তোমাদের ভাই কবি না কি?

কবি না? মস্ত বড় কবি—ভাই আমাদের সুন্দর কিছু দেখলেই মুখে মুখে তখনই কবিতা রচনা করে বলে—আর সে কবিতার ভাবই বা কি সুন্দর।

শুনে জাহানারার মনটা বুঝি সত্যি এবার গলল, আড় চোখে হাসানের দিকে চেয়ে সে মিষ্টি একটু হাসলো: তারিফের হাসি। এইবার সাহস পেল হাসান। সে তখনই জাহানারার হাত ধরে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল।

যাকে দেখার পর হাসান আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিল, তাকে আপন করে পেয়ে তার দিল খুশীতে কানায় কানায় ভরা; জাহানারাও হাসানের রূপ, রুচি, ব্যবহার আর প্রগাঢ় প্রেমে মুগ্ধ, বিগলিত আত্মহারা। একটি একটি করে চল্লিশটি দিন যেন তাদের একটি মধুর স্বপ্নের মত কেটে গেল। চল্লিশ দিনের দিন রাত্রে হাসান তার মায়ের স্বপ্ন দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। স্বপ্নে দেখল—মা বাড়িতে তার এক স্মৃতি-সমাধি রচনা করে তার উপর অবিরাম চোখের জল ফেলছেন আর বলছেন—ও হাসান, তুই এত নিষ্ঠুর রে, এতদিন তুই আমাকে ভুলে রইলি, একবার তোর দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়ল না রে, আমি কার মুখ চেয়ে দিন কাটাই রে, তুই ফিরে আয়। এই স্বপ্ন দেখেই হাসানের ঘুম ভেঙে গেল, তারপরই শুরু হল বুক-ফাটা কান্না। কান্না শুনে সাত বোন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। গোলাপ সবার চেয়ে বেশি উদ্‌বিগ্ন হয়ে জাহানারাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল আমাদের ভাইয়ের?

জানি না ত, বুঝতে পারছি না!

আচ্ছা আমিই জানতে চেষ্টা করছি—বলে হাসানের একেবারে কাছে গিয়ে গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললে—ভাই, সোনা ভাই, কি হয়েছে তোমার, কি কষ্ট হচ্ছে আমায় বলো। গোলাপের

স্নেহের স্পর্শে সে আরও ভেঙে পড়ল, আরও বেশি জল পড়তে লাগল—তার চোখ দিয়ে।

গোলাপ পরম স্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললে। একটু স্থির হও, বলো—বলো লক্ষ্মীটি।

হাসান শেষে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে অতি কাতর কণ্ঠে নিজের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বোনকে খুলে বললে।

শুনে—এবার গোলাপের কান্নার পালা। আবেগে সে আর কোন কথা বলতে পারল না, বুকটা তার কামারের হাপরের মত উঠানামা করতে লাগল, দুই চোখে অশ্রুর বন্যা। কথা বলল বড় ছয় বোন। তারা বললে—ভাই হাসান, তোমাকে স্বার্থপরের মত আমরা আর আটকে রাখতে চাই না, তুমি বাড়ি যাও, কিন্তু ভাই, একটি শুধু আমাদের অনুরোধঃ বছরে একবার করে অন্তত আমাদের দেখা দিয়ে যেও। এই কথা শুনে ছোট বোন গোলাপ ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাসানের গলার কাছে মুখ রাখতে গিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। জ্ঞান হবার পরও বিদায়ের কথা মনে করে নিজের জানুর উপর মুখ রেখে সে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। কারও কোন সান্ত্বনাই সে মানতে পারল না। শেষে ছয় বোন যখন হাসানের যাত্রার আয়োজনের কাজে আত্মনিয়োগ করলে তখন হাসান গোলাপের কান্না আর সহ্য করতে না পেরে নিজের কান্না ভুলে তার চোখে কপালে চুমু দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলে, আর কাঁদে না, বোন, কাঁদে না, লক্ষ্মী বোন আমার, সোনা বোন, আর কেঁদো না তুমি—আল্লার কসম নিয়ে বলছি প্রতি বৎসর আমি একবার করে এখানে এসে তোমায় দেখে যাব।

এদিকে যাত্রার আয়োজন শেষ হলে বোনেরা হাসানকে জিজ্ঞাসা করলে—ভাই, তুমি কি করে কোন পথে দেশে ফিরবে ঠিক করলে? উত্তরে হাসান সবে বলতে যাচ্ছে—কিছুই জানি না ত, কিছুই ঠিক করিনি, তখন হঠাৎ বাহ্‌রামের যাদু নাকাড়াটার কথা তার

মনে পড়ে যেতেই সে বলে উঠল—উপায় ত এই হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কি করে কি করতে হবে তা ত আমার জানা নেই। কথাটা শুনে গোলাপ তখন চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ভাই, আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি—এই যে এমনি করে। এই বলে নাকাড়াটা সে নিজের উরতের উপর রেখে নিজে আঙ্গুল দিয়ে ওর চামড়ার উপর পটাপট আওয়াজ তুললে। বুঝেছি, আমি বুঝেছি—বলে হাসান তখনই সেটা হাতে নিয়ে বাজাতে শুরু করলে। সে অবশ্য একটু জোরে জোরেই বাজাল। অমনি কোথা থেকে অনেক বড় উট, দৌড়ের উট, গাধা আর ঘোড়া ছুটে এসে সারিবদ্ধ হয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

সাত বোন তাদের দরকার মত ভালগুলি বেছে নিয়ে বাকীগুলিকে ছুটি করে দিল। এরপর উট আর গাধার পিঠে তারা গাঁট বেঁধে তাদের উপহারের জিনিস সাজালো, কত মণি রত্ন, দামী জমকালো পোশাক, কত রকমারী সুস্বাদু খাবার। একটা দ্রুতগামী উটের পিঠে তারা দুজন আরামে যাবার মত একটা তাঞ্জাম্‌ বসালে। হাসান আর জাহানারা—বসবে এতে। এরপর বিদায়ের পালা। হাসান চলে যাচ্ছে এতে আর ছয় বোনেরও চোখে জল, কিন্তু গোলাপের দশা আর চোখে দেখা যায় না, দুই চোখে তার অশ্রুর বান ডেকেছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। বেচারা গোলাপ! মানিক জোড়ের একটিকে ছাড়িয়ে নিলে আর একটির যে দশা হয় তার চেয়েও বুঝি কষ্টকর দশা হল গোলাপের। গোলাপ, বেচারা গোলাপ, এত দুঃখ তোমার পেতে হতো না যদি আপন ভুলে ভাইয়ের সুখের জন্য তুমি উঠে পড়ে না লাগতে, তা হলে ভাইয়ের সঙ্গে এত শীগ্‌গির আর তোমার বিচ্ছেদ হতো না। আর কেঁদ না গোলাপ, আর কেঁদ না, তোমার গোলাপফুলের মত মুখখানা কেঁদে কেঁদে আনারগুলের মত হয়ে গেছে। চোখ মোছ। হাসানকে আবার দেখতে পাবে তুমি, সে আবার আসবে তোমার কাছে। এ-ও তোমার নসিবে লেখা আছে।

বুকফাটা কান্নার মাঝে হাসান জাহানারা আর ভারবাহী উট গাধা নিয়ে যাত্রা করল। ওরা চোখের আড়াল হলেই গোলাপ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। বোনেরা অনেক শুশ্রূষায় তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলে। এদিকে হাসান যাদুবলে আনা উটের পিঠে চড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বসোরায় এসে হাজির হল। বাড়ির দরজার সামনে এসে শোনে মা বিনিয়ে বিনিয়ে তার জন্যে কাঁদছেন। শুনে তারও চোখে জল এসে গেল। এরপর দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা দিলে মা ভাঙ্গা গলায় প্রশ্ন করলে—কে? তারপর কাঁপতে কাঁপতে এসে দরজা খুলে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে চোখ তাঁর ঝাপসা হয়ে গেলেও হাসানকে চিনতে তাঁর ভুল হল না। হারানিধিকে ফিরে পেয়ে কি রকম একটা অদ্ভুত আওয়াজ আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে তার পরই তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাসান আর জাহানারার শুশ্রূষায় শীঘ্রই অবশ্য তাঁর সংবিৎ ফিরে এল। হাসান অমনি মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্না আর চুমু। মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর হাসান তার মাকে বললে—মা, তোমাকে সেবা করবার জন্য কাকে এনেছি একবার তাকিয়ে দেখ, আমি সাদি করেছি একে। এতদিন পরে হাসানকে পেয়ে মা এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে জাহানারার দিকে আর তিনি চেয়ে দেখবার ফুরসত পান নি, এবার ছেলের কথায় তার দিকে চেয়ে তার অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখে একেবারে আনন্দে গলে গিয়ে বলে উঠলেন—বাঃ খাসা! এই খুবসুরত মেয়ে তুই কোত্থেকে যোগাড় করলি, হাসান? জাহানারার দিকে চেয়ে বললেন—এস মা, এস, আমার বুকে এস—বলে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এতদিন ঘর আমার আঁধার হয়ে ছিল—আজ তাতে তুমি রোসনাই আনলে।

এরপর তিনি হাসানের দিকে চেয়ে বললেন—আমার এ সোনা মায়ের নাম কি রে বেটা?

ওর নাম জাহানারা, মা।

বহুৎ খুব, ঠিক নাম রাখা হয়েছে আমার মায়ের। যিনি নাম রেখেছিলেন তাঁর বহুৎ এলেম আছে বলতে হবে।

এরপর তিনি জাহানারাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরেই ঘরের পুরনো গালিচার উপর বসলেন। হাসান তাঁর সামনে বসল। এর পর হাসান তার অন্তর্ধান থেকে যে যে ব্যাপার ঘটেছে তার আদ্যো-পান্ত মাকে খুলে বললে। পুত্রবধূ তাঁর জিনসুলতানের মেয়ে শুনে তাঁর যেমন বিস্ময়ের অন্ত রইল না, তেমনি তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন শাহাজাদী পুত্রবধূকে কি করে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া যায় আদর যত্ন করা যায়—তাই ভেবে।

এরপর হাসান উট-গাধার পিঠ থেকে বোনেদের দেওয়া ধনরত্ন আর মূল্যবান উপহারগুলি এনে ঘরে তুলতে লাগল, আর মা ছুটলেন বাজারে, বেটার বউয়ের যাতে যোগ্য সমাদর করা যায় এমন সব জিনিস কিনতে। বাজারে খাবার যোগ্য রাঁধবার যোগ্য সেরা জিনিস যা যা ছিল তা ত কিনলেনই, তা ছাড়া বড় বড় সদাগরের দোকানে গিয়ে বেটার বউকে সাজানোর জন্যে বিভিন্ন রকমের দশটি জমকালো পোশাক কিনলেন। এ সব কিনে বাড়িতে এসে তাঁর আর তর সইল না, একে একে দশটি পোশাকই বউকে পরালেন। এক একটি পরান, আর দেখে খুশী হয়ে বউকে মেয়ের মত কপালে চুমু দিয়ে বলেন—বাঃ, বাঃ, বাঃ। এরপর রান্নাঘরে ঢুকলেন মা, সেখানে গিয়ে যত রকম ভাল ভাল রান্না তাঁর জানা ছিল সব রাঁধলেন, নানা রকমের মেঠাই করলেন, তারপর নিজে পরিবেশন করে হাসান আর বেটার বউকে পরিতোষ করে খাওয়ালেন, বেটার বউকে খাওয়ালেন সেধে সেধে।

খাওয়ার পাট মিটে গেলে মা হাসানকে বললেন—বাবা, তোর বউকে নিয়ে এখানে থাকা আর উচিত হবে না, শান্তির শহর বাগদাদে উঠে যাওয়াই আমাদের ভাল, সেখানে খলিফা হারুন-অল-রসিদের রক্ষণাবেক্ষণে আমরা নিরাপদে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। এখানে সবাই আমাদের গরিব বলেই জানে, আমাদের হঠাৎ এত ধনসম্পদ

দেখলে লোকে ভাববে যাদুবিদ্যার চর্চা করছি আমরা। মুশকিলে পড়তে হবে। তাই যত শীগগির হয় আমাদের বাগদাদে উঠে যাওয়াই ভাল। সেখানে প্রথম থেকেই আমাদের ভালভাবে থাকতে দেখলে লোকে মনে করবে দূর দেশ থেকে কোন রাজপুত্তুর বা আমীর এসেছে।

ঠিকই বলছে মা, সেই ভাল—বলেই হাসান তার বাড়ি এবং আসবাব পত্র বিক্রি করবার কাজে লেগে গেল। সব যখন বিক্রি হয়ে গেল তখন সে তার সেই যাদু নাকাড়াটা কোলের উপর রেখে তার উপর আঙুল দিয়ে বাজাতে শুরু করল অমনি হাওয়ার ভিতর থেকে দ্রুতগামী উটের দল এসে বাড়ির সামনে সার বেঁধে দাঁড়াল, তখনি হাসান তার মা আর বউ গাঁট বাঁধা ধনরত্ন আর নিয়ে যাবার মত মুল্যবান যত কিছু সব তাদের পিঠের উপর সাজিয়ে ফেলে তাদের উপর চড়ে যাত্রা করলে। যাদুকরা বাহন জিনিস পত্র সমেত মুহূর্তের মধ্যে তাইগ্রীসের তীরে বাগদাদ শহরের ফটকের সামনে এনে হাজির করলে। হাসান বাজারে গিয়ে এক দালালের সাহায্যে এক লাখ দিনার দিয়ে অতি চমৎকার একটা বাড়ি কিনলো, ইমারতটা আগে এক সৌখিন উজিরের ছিল। হাসান মা আর বউকে এই বাড়িতে উঠিয়ে এর প্রত্যেক কামরা সুন্দর দামী আসবাবপত্রে সাজালো, অনেকগুলি বান্দা বাঁদী কিনলো; লোকে দেখল কোথাকার মস্ত বড় এক আমীর এসে বাগদাদের বাসিন্দা হল।

হাসান এবং জাহানারা এখানে পরম সুখেই বাস করতে লাগল। মা ছেলে বউকে খুশী করতে নিত্য নতুন স্বাদের রান্না করে খাওয়ান, নিত্য নতুন মেঠাই। এ সব বসোরার খাবার নয়, বাগদাদে এসে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে ভাব করে তিনি এ সব শিখে নিয়েছেন। এখানকার মেয়েরা সুস্বাদু মুখরোচক এমন সব খাবার তৈরি করতে পারে যা দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এখানে আসার ন'মাস পরে জাহানারার যমজ দুটি ছেলে হল—

এক সঙ্গে যেন ছুটি তৃতীয়ার চাঁদ। নাম রাখা হল তাদের নাশির আর মনস্থর।

সাত বোনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল হাসান বছরে একবার করে সে তাদের সঙ্গে দেখা করে যাবে। বছর পূর্ণ হয়ে এল, এবার একবার যেতে হয়, বিশেষ করে গোলাপকে এতদিন না দেখে তার মনে বেশ একটু কষ্টও হচ্ছিল। যাওয়ার প্রারম্ভিক আয়োজন করতে বাগদাদের বাজার থেকে বোনেদের জন্য ভাল ভাল দামী উপহারের জিনিস সে কিনলে, তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বললে—মা, তোমার কাছে আমার সাতবোনের কথা ত আমি এসেই বলেছি, তাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাচ্ছি আমি, যাবার আগে তোমাকে কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ সাবধান করে দিতে চাই, বেশ মন দিয়ে শোন ঃ জাহানারার যাত্নকরা পালকের পোশাকটা বাড়ির এক গোপন জায়গায় আমি লুকিয়ে রেখেছি, ওটা তুমি তোমার জান দিয়ে আগলাবে। জাহানারা জিনসুলতানের মেয়ে, ওর পাখীর মত স্বভাব, ওটা হাতে পেলে ও না উড়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না। তোমার আমার উপর টান থাকা সত্ত্বেও ওটা দেখলেই ওর পাখীর প্রবৃত্তি ও কিছুতেই রুখতে পারবে না, আকাশে ডানা মেলে পাখীর মতই এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে। আর তাই যদি হয় তা হলে আগে থাকতেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু মারা যাব।···আরও কিছু বলে যেতে চাই তোমায় ঃ ওকে তুমি নিজে একটু আদর যত্ন করো মিষ্টি কথা বলো ঃ সুলতানের মেয়ে, আলালের ঘরের তুলালী। খাবার দেবার ভার বান্দা বাঁদীদের উপর ছেড়ে দিও না, কোন্ খাবার ওর পছন্দ, কোন্টা অপছন্দ সে বোধ তাদের নেই, তুমি নিজে পরিবেশন করো ওকে।··· হাঁ, আর বাড়ির বাইরে যেন ও কোনদিন না বেরোয়, খোলা জানলার ধারে না দাঁড়ায়, ছাদে না ওঠে—মানে পাখীর মত প্রকৃতি ত ওর, খোলা জায়গা বা আকাশ দেখলেই মাথায় আবার উড়বার নেশা চাপবে। আর কিছু বলবার নেই আমার, তুমি

যদি আমার মরণ দেখতে না চাও তা হলে যা যা তোমায় বললাম ঠিক ঠিক মনে রেখো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করো।

মা বললেন—হয়েছে, বাবা, হয়েছে, বুড়ো হয়েছি বলে বুদ্ধিশুদ্ধি আমার লোপ পায় নি, তুই ফিরে এসে জাহানারার কাছে শুনিস তুই যা যা বলে গেলি তার এক চুল এদিক ওদিক করি নি আমি।…হাঁ, তুই ত তোর কথা বললি এখন আমারও কিছু বলবার আছে ; বোনেদের দেখতে যাচ্ছিস, যা, বারণ করি না আমি যাওয়াই উচিত, কিন্তু ফিরতে দেরি করবি না তুই, যেতে আসতে যা সময় লাগে, তা ছাড়া অল্প কয়েকদিন ওদের কাছে থেকেই চলে আসবি।

সাত বোনের কাছে যাওয়ার আগে হাসানের আর তার মায়ের মধ্যে এই রকম সব কথা হল। তারা কি জানে নসিবে কি লেখা আছে? আর জাহানারা যে পাশে লুকিয়ে মায়ে পোয়ের সমস্ত কথা শুনে নিলে তা-ও তারা জানতে পারলে না।

এরপর হাসান মা আর জাহানারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেদুটিকে চুমু দিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলে। যাদু নাকাড়ায় আঙ্গুলের ঘা দিতেই বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী উটের দল তার সামনে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। হাসান তাদের কয়েকটা বেছে নিয়ে কয়েকটার পিঠে জিনিসপত্র সাজিয়ে একটার পিঠে নিজে উঠে বোনদের কাছে রওনা হল। চোখের পলক পড়তে না পড়তে হাসানের উটগুলি দূরে কয়েকটা বিন্দুর মত দেখাতে দেখাতে শেষে দিক চক্রবালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক বছর পরে হাসানকে নিজেদের মাঝে পেয়ে সাত বোনের যে কি আনন্দ হল তা বর্ণনা করা যায় না, বিশেষ করে গোলাপের, গোটা বাড়িটা তারা ফুলের মালা দিয়ে সাজালো রঙিন আলো ঝুলালো, তারপর হাসানকে নিয়ে কত আনন্দ কত কথা, এক বছরের জমা কথা তাঁরা বলাবলি করতে লাগল।

হাসানের যে ছুটো ছেলে হয়েছে তা-ও সে বোনেদের বললে। শুনে তারা জবর খুশী। এরপর হাসান রোজ বোনেদের নিয়ে শিকারে যেতে লাগল, খেলাধূলা করতে লাগল তা ছাড়া কত হাসি গল্প। হাসানকে নিয়ে বোনেদের দিন বেশ সুখেই কাটতে লাগল। ওরা ভাই বোনে আনন্দে দিন কাটাক, এদিকে আমরা জাহানারা আর হাসানের মা কি করছে তাই দেখি।

হাসান চলে যাবার পর ছু'দিন জাহানারা শাশুড়ীর কাছ ছাড়া নড়ল না, তিন দিনের দিন সে বুড়ীর হাতে চুমু দিয়ে বললে— মা-মণি, আমার বড় হামামে যেতে ইচ্ছে করছে। নাশির আর মনস্থর হবার পর আমার একদিনও গোসল করা হয় নি।

শাশুড়ী বউয়ের কথা শুনে ছুই চোখ কপালে তুলে বললেন, সে কি কথা, মা, হামামে যাবে তুমি? তা কি করে হয়? এখানে নতুন এসেছি আমরা, এখানকার হালচাল, কোথায় হামাম কি বিত্তান্ত কিছুই জানিনে আমরা। আর হাসান নেই এখানে, কে-ই বা তোমায় নিয়ে যাবে। যে কামরায় গোসল করবে তুমি সেটাও ত একবার পরখ করে নেওয়া দরকার: উপরে কালিঝুল, মাকড়সা আরসোলা কত কি থাকতে পারে, গোসলের সময় পড়বে তোমার গায়ে। তোমার স্বামী নেই এখানে, এমন কোন লোকও আমার জানা নেই, যাকে বিশ্বাস করে তোমার সঙ্গে দিতে পারি। আর আমি এখন বুড়ো হয়ে গেছি, দেহটা আমার এত নড়বড়ে যে আমিও সঙ্গে যেতে পারি না তোমার। তার চেয়ে আমি বাড়িতেই জল গরম করছি, আমাদের নিজেদের গোসলঘরেই আমি নিজে তোমার মাথা ঘষে গা পরিষ্কার করে দেব। আর গোসলের জন্য যা যা লাগবে তা-ও আমার ঘরে আছে: কালই আমি আলেপ্পোর খোশবুওয়ালা মাটি, হলুদ, ক্ষার, হেনা ইত্যাদি কিনেছি, সুতরাং তোমার মনের মত করে গোসল করিয়ে দিতে পারব আমি।

শুনে জাহানারা বেশ একটু রুষ্টস্বরে বললে—ঘরের বউদের হামামে যেতে কবে থেকে মানা হয়েছে জানতে পারি কি?

—যাক কোন বাঁদীকেও যদি আপনি এমন সব কথা বলতেন তা হলে সে দাবি তুলত তাকে অন্য কোথাও বিক্রি করে দিন। পুরুষগুলো সব বুদ্ধু ; তারা ভাবে সব জেনানাই সমান, তাই তাদের অবিশ্বস্ততার ভয়ে এ-নিষেধ ও-নিষেধের বেড়া। আর এ কথাও আপনি মনে রাখবেন কোন জেনানা যখন কিছু করব বলে মনস্থ করে তখন যেমন করেই হোক তা করবার উপায়ও সে খুঁজে বের করে, কেউ ঠেকাতে পারে না তাকে। এ কি বুঝতে পারছি না আমি যে আমাকে আমার সতীত্বকে বিশ্বাস করতে পারছেন না আপনি। এখন দেখছি আমার মরণই ভাল—এই বলে জাহানারা চোখের জলে ভিজে নিজেকেই শাপশাপান্ত করতে লাগল।

জাহানারাকে এই রকম কান্নাকাটি করতে দেখে মায়ের বড় কষ্ট হল, তা ছাড়া তার কথাবার্তা শুনে বুঝলেন, ওকে হামাম-গোসল যাওয়া থেকে ঠেকানো যাবে না, তাই তাঁর বার্ধক্যে অপটু শরীর এবং হাসানের সতর্ক বাণীর কথা ভুলে খোশবু আর পরিষ্কার জামা-কাপড় হাতে করে জাহানারাকে বললেন—এস, বাছা, এস, তোমার সাধই মিটুক, আল্লাই ভরসা আমার—এই বলে মা খোঁজ করে শহরের সেরা হামামে জাহানারাকে নিয়ে চললেন।

চললেন বটে, কিন্তু, আঃ—দিলটা যদি তাঁর একটু কড়া হত, বউয়ের জিদের কাছে হার মেনে তিনি যদি তাকে হামামে সেদিন না নিয়ে যেতেন তা হলে কত ভালই না হত! কিন্তু ভবিষ্যতের কথা পীর পয়গম্বর ছাড়া কেউ কি আর জানতে পারে! আর জেনেই বা কি হবে, সবই খোদার মর্জি।

জাহানারা যখন তার শাশুড়ীর শহরের বড় হামামটায় ঢুকল তখন সেখানে যেসব মেয়েরা গোসল করতে এসেছিল তারা ত তার দিকে চেয়ে একেবারে 'হাঁ'। বিস্ময়ের একটা অস্ফুট শব্দও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল তাদের মুখ দিয়ে। কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না তার দিক থেকে। রাস্তা দিয়ে আসবার উপযোগী জামা-কাপড় পরা অবস্থায় দেখেই তাদের এই অবস্থা, এরপর গোসল

করবার সময় তাকে যখন আরও ভাল করে দেখতে পেল তখন তারা ভাবলে—ইয়া আল্লা এ কি রে! পশুরাজ সলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল ডেভিডের যে বীণা ঝঙ্কার, যে তম্বঙ্গী কুমারী অবলাদের জন্য আরবের বিভিন্ন শাখার লোকজন লড়াই করে মরেছিল, সুলতান যয়ুরের বেটী যে বুত্বুর জিনের চোখে নেশা লাগিয়ে দিয়েছিল তারাও যে এর কাছে তুচ্ছ, তুচ্ছ এর কাছে ঝরনার কলতান, বসন্তের বিহগগীতি। চুণী কস্তুরী মুক্তো আর তৈলস্ফটিক দিয়ে যিনি এমন সোনার পুতুল তৈরি করেছেন তাঁর কি কেরামতি!

গোসল করছিল যে সব মেয়েরা তারা গোসল ফেলে জাহানারাকে দেখতে লাগল, যারা বিশ্রাম করছিল তারা উঠে এসে ওর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। হামাম থেকে তার আশেপাশে জাহানারার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় চারিদিক থেকে এত মেয়ে এসে হামামে ভিড় করল যে শেষে কেউ দাঁড়াবার জায়গা পায় না। সবারই চোখে মুখে তারিফ যেন উপছে পড়ছে। জাহানারা ফোয়ারায় স্নান করবার সময় তাকে দেখে সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছিল যে মেয়েটি নাম তার তুহফাহ। তুহফাহ খলিফা হারুন-অল-রসিদের বেগম জোবেদার এক অল্পবয়সী বাঁদী। জাহানারা যতক্ষণ গোসল করলে ততক্ষণ সে ত তাকে এক রকম চোখ দিয়ে গিলে খেতে লাগল। এরপর গোসল সেরে জামা কাপড় পরে জাহানারা যখন তার শাশুড়ীর সঙ্গে বাড়ির দিকে চলতে লাগল, সে তখন চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত তার পিছু পিছু যেতে লাগল। বাড়ির ফটকে এসে খোজা প্রহরী থাকায় সে আর ভিতরে ঢুকতে পারল না তখন সে একটা গোলাপ ফুল আর আদরের শব্দ ছুড়ে ফেলে দিল জাহানারার দিকে। খোজা প্রহরী তার কাণ্ড দেখে চোখ পাকিয়ে তাড়া করলে সে ফিরে গেল খলিফার হারেমে। সেখানে গিয়ে সে তার মালকিন জোবেদার সামনে এমন চোখমুখ নিয়ে দাঁড়াল যে তা দেখে জোবেদা চমকে উঠে বললেন—কি রে কি হল তোর, কোথায় গেছলি, এমন হাল হল কেন তোর?

তুহফাহ কোন রকমে উত্তর দিলে—আমি হামামে গেছলাম সেখান থেকেই আসছি।

তা তোর চোখ মুখের এমন অবস্থা হয়েছে কেন ?

হবে না ? —যা দেখে এলাম তাতে মাথা আমার একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে, বুকের মাঝে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে জবর ব্যথা করছে বুকটা—বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললে তুহফাহ ঃ সে আমার বিচার বুদ্ধি চুরি করে নিয়ে গেছে।

শুনে হেসে ফেললেন জোবেদা ঃ কে সে খোলসা করে বলবি ত !

কি বলব, হুজুরাইন, আমি কি চিনি তাকে, আর কোন দিন দেখেছি ? —শুধু এইটুকু জানি, এইটুকু বলতে পারি দুনিয়ার কারো সঙ্গে তার উপমা দেওয়া যায় না, বেহেস্তের হুরীর সঙ্গেও না। থাকে সে তাইগ্রীসের ধারে মস্ত এক ইমারতে, এক দরজা তার শহর মুখো, আর এক দরজা নদীর দিকে। হামামে মেয়েদের মুখে শুনলাম—ও নাকি—বসোরা থেকে হাসান বলে কোন এক ধনী সদাগর এসেছে—তার বিবি। তুহফাহ একটুখানি থেমে ছল-ছল চোখে বললে—মালকিন, আমার এ অবস্থা হয়েছে শুধু তার সৌন্দর্য দেখে নয়, কিছুটা ভয়েও বটে। তাকে দেখা অবধি আমার কেবলি মনে হচ্ছে মেয়েটির রূপের কথা যদি কোন রকমে আমাদের মালেক খলিফা হারুন-অল-রসিদের কানে যায়—তা হলে তিনি ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে ওর স্বামীকে মেরে ওকে সাদি করে হারেমে তুলবেন। এ করবেনই তিনি, নির্ঘাত করবেন তাই আমার ভয়।

তুহফাহ জোবেদার অনেক দিনের বাঁদী, মিছে কথা—বাজে কথা বলবার মেয়ে সে নয়, তবুও আরও নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে তিনি বললেন—ভাল করে বুঝে দেখ—খোয়াব দেখিস নি তুই ?

না, হুজুরাইন, আল্লার কসম নিয়ে সাচ্ বলছি আমি, আমি সজ্ঞানে খোদার দেওয়া এই দুটো চোখ দিয়ে দেখে এলাম তাকে, সে ঘরে ঢুকবার সময় তার দিকে একটা গোলাপ ফুল আর—কথাটা

আর শেষ করতে পারলে না সে, লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। এরপর একটু থেমে সে বললে—বিশ্বাস করুন মালকিন, তামাম আরব পারশ্য আর তুরস্কে এমন একটি রত্ন আপনি খুঁজে পাবেন না, বেহেস্তেও কোনদিন—বেহেস্তের কথা অবশ্য বলতে পারব না।

শুনে জোবেদারও যেন নেশা লেগে গেল, তিনি বলে উঠলেন—এ রত্ন আমারও ত তা হলে না দেখলে চলবে না—এই বলেই তিনি মসরুরকে ডেকে পাঠালেন। মসরুর খবর পেয়ে ছুটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে জোবেদা বললেন—মসরুর, একটা কাজের ভার দিচ্ছি তোমাকে ঃ তাইগ্রীসের তীরে একটা ইমারত—একটা দরজা তার শহরের দিকে আর একটা নদীমুখো—বসোরার সদাগর হাসান সাহেবের ইমারত এটা, খুঁজে বের করো, আর এতে আছে বেহেস্তের হুরীর মত এক খুবসুরত মেয়ে, তাকে এখনই এনে আমার সামনে হাজির করবে। না পারলে গর্দান নেব তোমার আমি। যাও জলদি।

মালকিন জোবেদা বেগমের হুকুম তামিল করতে মসরুর তখনই ছুটল, খুঁজে বের করল হাসান সাহেবের বাড়ি, ফটকে খোজা প্রহরী তাকে দেখে সেলাম করে সরে দাঁড়াল, মসরুর এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হল একেবারে তেতলায়। সেখানে দরজায় ধাক্কা দিতেই হাসানের মা দরজা খুলে দিলেন। মসরুর তার সামনে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন—কি চাই ?

মসরুর বিনীত ভাবে বললে—বিবিসাব, আমি মসরুর, খালিফার দেহরক্ষী, আমাদের পয়গম্বরের চাচা অল-আব্বাসের বংশধর খালিফার বেগম অলকাসিমের বেটী জোবেদা পাঠিয়েছেন আমাকে এ বাড়িতে যে খুবসুরত মেয়েটি আছে তাকে নিয়ে তার সামনে হাজির করতে।

শুনে মা ত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—ও মসরুর, সে কি করে হয়, আমরা এখানে আগন্তুক, কিছুই চিনি শুনি না, জানি না

ছেলে আমার বিদেশে, যাবার সময় সে আমায় পই পই করে বারণ করে গেছে, বলে গেছে—তার বউ যেন আমার সঙ্গেই হোক বা কারো সঙ্গেই হোক বাইরে না বেরোয়, বেরুলে যে আগুনের খাপরা বউ তার, বিপদ একটা কিছু ঘটবেই—আর তা হলে ছেলে আমার আত্মঘাতী হবে। ও মসরুর ভাল মানষের বেটা, তুমি আমাদের দয়া করো—এমন বিপদে ফেলো না আমাদের।

মসরুর বললে—বিবিসাব, কিছ্‌ছু ভয় করবেন না আপনি, আপনার বেটার বউয়ের কোন ক্ষতি হবে না, আমার মালকিন তার রূপের কথা শুনে তাকে শুধু একবার দেখতে চান। মসরুর এ রকম কাজ এই নতুন করছে না, মাজী, আমি আল্লার কসম নিয়ে বলছি—আমার সঙ্গে গেলে আপনার কি আপনার বউয়ের আপসোস করবার কিছু থাকবে না। আমি নিরাপদে তাকে নিয়ে নিরাপদেই তাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব।

মা বুঝলেন খলিফার দেহরক্ষী এসেছে তাঁর বেগমের হুকুমে, এখানে কোন ওজর আপত্তি তার টিকবে না—সুতরাং তিনি কম্পিত বক্ষে জাহানারার সামনে গিয়ে তাকে একটু ভাল জামা কাপড় পরিয়ে দিলেন, দুই নাতি নাশির আর মনসুরকে ভাল পোশাক পরালেন তারপর দুই নাতিকে দুই কোলে নিয়ে জাহানারাকে মসরুরের সামনে হাজির করলেন। এরপর মসরুর তাদের নিয়ে খলিফার বাড়ির দিকে রওনা হল। খলিফার প্রাসাদে এসে সে এদের হারেমে জোবেদার—সামনে হাজির করলে। জোবেদা তখন চারিদিকে তাঁর বাঁদীদের নিয়ে একটা নীচু পালঙ্কে বসে ছিলেন পেয়ারের বাঁদী তুহফাহ তাঁর সামনেই বসে ছিল।

মা তার নাতি দুটোকে জাহানারাকে কাছে নিয়ে জোবেদার পালঙ্কের সামনের মেঝেতে চুমু দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন। জোবেদা তখনই নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে মা তাতে চুমু দিলেন। এবার বুড়ীকে উঠতে বলে জোবেদা—জাহানারার দিকে

চেয়ে বললেন, তোমাকে আমার বাড়িতে পেয়ে আমি বড় খুশী হয়েছি। তা তুমি তোমার মুখখানা অমন ঢেকে রেখেছ কেন, এখানে কোন পুরুষ নেই। এরপর তুহফাহকে কি একটা ইঙ্গিত করতেই সে তখনই গিয়ে জাহানারার মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করলে—সঙ্গে সঙ্গে জোবেদা—দেখলেন—

কি দেখলেন জোবেদা—? দেখলেন সাদা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা চাঁদ, সূর্যের মধ্যাহ্ন দীপ্তি, বসন্তের তরু হিল্লোল, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণ, ঝরনার কলতান—এমন কি মানুষ এ পর্যন্ত যা কিছু দেখে বা মুখে শুনে বিস্মিত হয়েছে, মুগ্ধ আত্মহারা হয়েছে তার কোন কিছুর সঙ্গেই এ মুখের তুলনা করা যায় না। এর রূপের কিরণ প্রাসাদের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছে। যারা দেখছে বিস্ময়ে তারা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। আর দেহের গঠনেরই বা কি ভঙ্গী। খোদ আল্লা ছাড়া কোন মানুষের সাধ্য নাই—এমন একটা মুখ এমন একটা মূর্তি গড়ে।

জোবেদার ঘরটা—একটা সুঁচ পড়লে বুঝি তার শব্দ শোনা যায়—এমন নিস্তব্ধ।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটলেই জোবেদা তাঁর পালঙ্ক থেকে উঠে দুই হাতে জাহানারার গলা ধরে নিজের বুকে টেনে নিলেন, চুমু দিলেন তার কপালে, তার পর পরম স্নেহে তার হাত ধরে এনে পালঙ্কে নিজের পাশে বসিয়ে—হারুন-অল-রসিদের সঙ্গে বিয়ের সময় যে দশনরী নিটোল বড় মুক্তোর মালাটা পেয়েছিলেন সেটা খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—জাহানারা সত্যি তুমি জাহানারা—খোদার বাগিচায় বুঝি এমন একটি ফুল আর কোন দিন ফোটেনি! এমন যখন চেহারা তোমার তখন নাচ, গান, বাজনা তুমি জানো নিশ্চয়।

জাহানারা বললে—না হুজুরাইন, তরুণী মেয়েদের অনেকেই ওসব কিছু জানলেও, আমার ওর কিছু জানা নেই—তবে আমার

এমন একটা কিছু জানা আছে যার পরিচয় পেলে আপনি তাজ্জব না হয়ে পারবেন না ।

সেটা কি—বটে ?

আমি—পাখীর মত আকাশে উড়তে পারি।

বেগমের আশে পাশে যে সব মেয়েরা বসে ছিল তারা বিস্ময়ে এক রকম চীৎকার করে উঠল। জোবেদা শুধু স্থির কণ্ঠে বললেন—তা যে তুমি পার তা তোমার রাজহংসীর মত গতিভঙ্গী দেখেই বুঝছি—তা বাছা তোমার পাখীর মত ডানা না থাকলেও তুমি এমনিতেই উড়ে একবার দেখাও না আমাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর, আমাদের দিলটা খুশী কর।

জাহানারা বললে—হুজুরাইন ডানা আমার আছে—কিন্তু সেটা এখন আমার কাছে নেই। আপনি আমার শাশুড়ীকে বলুন, উনি আমার পালকের পোশাকটা যদি এনে দেন, তা হলে আমি উড়ে দেখাতে পারি।

বেগম জোবেদা তখন হাসানের মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—ও চাচী, তুমি একটু মেহেরবানি করে জাহানারার ওড়ার পোশাকটা এনে দাও না, আমরা ওর ওড়া দেখি।

শুনেই বুড়ি মনে মনে বললে—এ আল্লা গেছি! পালকের পোশাকটা দেখলেই—হাতে পেলেই ওকে আবার আগেকার মত ওড়ার নেশায় পাবে, তখন যে আমাদের দশা কি হবে তা তুমিই জানো।

হাসানের মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোবেদাকে বললে—হুজুরাইন, আপনার এখানে এসে আপনার জাঁকজমক আর ঠাট দেখে আমার বেটার বউয়ের মতিভ্রম হয়েছে, কি বলতে কি বলছে ওর নিজেরই ঠিক নেই—নইলে কারো আবার—ডানাওয়ালা পালকের পোশাক থাকে, তা পরে সে উড়তে পারে ?—ও যার কথা বলছে তা থাকে শুধু পাখীদের। জাহানারা অমনি বাধা দিয়ে বলে উঠল—হুজুরাইন, আমি আল্লার কসম নিয়ে বলছি,

আছে আমার ডানাওয়ালা পালকের পোশাক, সেটা আমাদের বাড়িতে কোথাও কোন সিন্দুকে লুকনো আছে। শুনে জোবেদা সুলতানদের পরবার উপযোগী অতি মূল্যবান—একটা রত্নহার বুড়ীর হাতে দিয়ে বললেন—চাচী, এটা ধরো, তুমি মেহেরবানি করে ঐ পোশাকটা একবার এনে আমায় দেখাও—আমি দেখেই আবার ফেরত দেব, কিছু চিন্তা নেই তোমার। শুনে বুড়ী আরও শপথ করে বললে—সত্যিই এ রকম কোন পোশাক তার ঘরে নেই। জোবেদা তখন মসরুরকে ডেকে এনে বললেন—তুমি যাও ত আর একবার এদের বাড়ি, গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে যদি একটা ডানাওয়ালা পালকের পোশাক পাও ত সেটা নিয়ে আসবে। চাবি চাইলে হাসানের মা তা দিতে চায় না, মসরুর এক রকম জোর করেই তাঁর কাছ থেকে চাবির ছড়া নিয়ে ছুটল হাসানের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষে মাটির তলার একটা ঘরের সিন্দুকের মধ্যে পালকের পোশাকটা পেয়ে সেটা নিয়ে গিয়ে বেগম জোবেদার হাতে দিলে তিনি তা তৈরির ওস্তাদি দেখে বেশ কিছুটা তাজ্জব বনে গেলেন। কিছুক্ষণ সেটা নেড়ে চেড়ে ভাল করে দেখার পর তিনি সেটা জাহানারার হাতে দিয়ে বললেন—নাও, বাছা ধরো, এবার তোমার খেল দেখাও আমাদের।

জাহানারা সেটা হাতে পেয়ে প্রথমে বেশ ভাল করে পরখ করে দেখলে ঠিক আছে কিনা ! —হ্যাঁ, বিলকুল ঠিক আছেঃ হাসান তার কাছ থেকে নেবার সময় যেমন ছিল তেমনটিই আছে। তখন সে পোশাকটা খুলে তার মাঝে ঢুকে ভাঁজ করা ডানাদুটি বুকের ওখান থেকে মেলে ধরল। দেখাতে লাগল তখন তাকে ঠিক যেন একটা বড় সাদা পাখী—। এরপর জাহানারা সেই দুটো পাখা ভর করে বড় হল ঘরটাই মেঝে থেকে কিছু উঁচুতে এ কোণ থেকে ও কোণে একবার উড়ে নিলে তারপর উড়ে ছাদের কাছাকাছি এসে দুই ডানায় ভর দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়েই রইল।

ঘরের সব মেয়েরাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার দিকে। এরপর পেঁজা তুলো যেমন ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসে তেমনি করে জাহানারা—মেঝেতে নেমে জোবেদার দিকে চেয়ে বললে—আমার ওড়া দেখে বুঝেছি আপনাদের দিলটা খুশী হচ্ছে, আচ্ছা দাঁড়ান আপনাদের আরও খুশী করে দিচ্ছি এই বলে সে তার দুই ছেলে দুই কাঁধের উপর নিয়ে উড়ে ঘরের সব চেয়ে উঁচুতে বড় একটা জানালার তাকে গিয়ে বসল, তারপর সেখান থেকেই নীচের সবার দিকে চেয়ে বলে উঠল—আমি এবার চলে যাচ্ছি। শুনে জোবেদা নিতান্ত কাতর হয়ে বলে উঠলেন—সে কি! তোমার মনে কি এই ছিল, তোমায় দেখে যে আমাদের এখনও আশ মেটেনি, যেও না তুমি যেও না, মিনতি করি যেও না।

জাহানারা বললে—সে আর হয় না যেতে আমাকে হবেই।

তা হলে কবে আবার আসবে তুমি?

আর আসব না, দুনিয়ায় যা যায় তা আর ফেরে না।

জাহানারার এই সব কথা শুনেই হাসানের বুড়ী মা মাটিতে আছাড় পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন—জাহানারা এবার তাঁকে উদ্দেশ করে বললে—মা, তোমাকে এবং তোমার ছেলেকে ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, জানি আমি না থাকায় ঘর তোমাদের আঁধার হয়ে যাবে, কিন্তু কি করব—আমার উপায় নেই—ডানা হাতে পেয়ে আসমান আমায় পাগল করে তুলেছে, দূর পাল্লায় উড়তে না পারলে আমার রেহাই নেই—মন আমার বশে নেই, সুতরাং তুমি আমায় মাফ করো। ফিরে এসে আমাকে না দেখে তোমার ছেলের অবস্থা কি হবে তা-ও আমি বুঝতে পারছি—কিন্তু উড়ে যাবার নেশা আমি কিছুতেই কাটাতে পারছি না। সে যদি আমায় আবার ফিরিয়ে আনতে চায়, তবে আমার খোঁজে তাকে ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে যেতে বলো। চাচী—সেলাম, আল্লা তোমাদের কুশলে রাখুন—এই বলেই জাহানারা খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সুলতান মহলের

গম্বুজের উপর ডানায় ভর দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পালক-গুলি ঠিক করে নিল তারপর হঠাৎ শাঁ করে উপরে উঠে মেঘের মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসানের মা বেচারা তখন সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন। জোবেদা উঠে নিজে হাতে তাঁকে শুশ্রূষা করে চেতনা ফিরিয়ে এনে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন—ও চাচী, তুমি আগে বলো নি কেন? পোশাকের কথা অস্বীকার না করে যদি তুমি খুলে বলতে জাহানারা যাত্ন পোশাকটি হাতে পেলে এই রকমটি করতে পারে—তা হলে ওটা আর আমি তার হাতে দিতাম না। আমি ত জানতাম না, চাচী, বেটা তোমার উড়তে পারে এমন এক জিনের মেয়ে সাদি করে ঘরে এনেছে। তুমি গোসা করো না, বেশি দোষ দিও না আমায়। অজান্তে যেটুকু হয়ে গেছে তার জন্যে মাফ চাইছি আমি।

হাসানের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—দোষ আপনার নয়, দোষ আমার নসিবের। খোদা যার নসিবে যা লিখে দিয়েছেন তা কেউ খণ্ডাতে পারে না—এখন আমার আর ছেলের কাঁদতে কাঁদতেই জানটা দিতে হবে—এই বলে বুড়ী কোন রকমে বেগমকে একটা সেলাম জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে টলতে টলতে নিজেদের বাড়ি ফিরে এলেন। মানুষের এমনি অবুঝ মন যে বাড়ি এসেও তাঁর চোখ ত্নটো বউ জাহানারা আর নাতিত্নটোকে খুঁজে ফেরে। তাদের দেখতে না পেয়ে বুড়ী নতুন করে আবার কেঁদে ফেটে পড়লেন। কান্না আর থামে না। সান্ত্বনার আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে হাসানের মা শেষে বাড়িতে একটি ত্নটি ছোট স্মৃতি সমাধি করে নিয়ে তার উপর চোখের জল ফেলে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এদিকে হাসান তিন মাস সাত বোনের সঙ্গে কাটিয়ে—মা এবং জাহানারা—আর দেরি করলে অস্থির হয়ে উঠবে ভেবে বাড়ি ফেরা সাব্যস্ত করে যখন বোনেদের বললে তখন তারা—সে বৎসর শেষে আবার এসে তাদের দেখা দিয়ে যাবে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে

সম্মতি দিল। বোনেদের অনুমতি পেয়ে হাসান তার যাদু নাকাড়ায় আঙ্গুলের ঘা দিলেই নানা দিক থেকে উট এসে হাজির হল। হাসান তা থেকে দশটা বেছে নিয়ে বাকীগুলিকে বিদায় করে দিল। বোনেরা পাঁচটা উটের পিঠে সোনার তাল, অপর পাঁচটার পিঠে নানা মণিরত্ন বোঝাই করে একে একে এগিয়ে এসে হাসানের কপালে মাথায় চুমু দিয়ে গেল। বোনেদের হাসানের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ স্নেহসম্ভাষণ চলবার পর হাসান উটের পিঠে বোনেদের উপহার নিয়ে বাগদাদে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

পথে বাধাবিঘ্ন অবশ্য আর কিছু হয় নি, কিন্তু বাড়িতে এসে মায়ের দিকে চেয়ে প্রথমে সে আর তাঁকে চিনতে পারে না : না খেয়ে না ঘুমিয়ে অনবরত কেঁদে কেঁদে এমন হাল হয়েছে বুড়ীর। তারপর চিনতে পেরেই বলে উঠল, মা, এ কি হাল হয়েছে তোমার! আমার জন্যে—এই ত আমি এলাম, কিন্তু আমার বউ কই, ছেলে দুটো কই?

মা এ কথার আর কোন উত্তর দিতে পারলেন না, শুধু মাটির দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। হাসান তখন পাগলের মত ছুটে গিয়ে হাজির হল মাটির তলার ঘরে সেই সিন্ধুকের কাছে, গিয়ে দেখে তার ডালা খোলা, তা ছাড়া তার ভিতর সেই যাদু পোশাকও নেই। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল ছোট বড় তিনটি স্মৃতি সমাধি। সঙ্গে সঙ্গে হাসান হতচেতন হয়ে সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, মাথাটা ঠন করে লাগল গিয়ে মেঝের কঠিন পাষাণে। মায়ের অনেক চেষ্টা সেবা শুশ্রূষা সত্ত্বেও রাত্রির আগে তার জ্ঞান হল না। অনেক রাত্রে চেতনা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়ে সারা গায়ে ধুলো মেখে যা তা করতে লাগল। এরপর ছুটে গিয়ে তার তলোয়ার খানা নিয়ে এসে বুকে বসাতে যাবে এমন সময় মা এসে সেটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার মাথাটা

নিজের বুকে টেনে নিলেন ও জোরে চেপে ধরে রাখলেন তাকে নইলে সে তখন যে সাপের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিত।

মা অনেক চেষ্টায় ছেলেকে একটু শান্ত করে ধীরে ধীরে তার অনুপস্থিতিতে যা যা ঘটেছে সে সব একে একে খুলে বললেন : এমন নিদারুণ দুঃখের মাঝেও একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, বাবা, জাহানারা যাবার সময় বলে গেছে—ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে গেলে তুই তার দেখা পাবি।

শুনেই হাসান তড়াক করে লাফিয়ে উঠল—মা, আমি এখনই সেই ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে যাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল বললাম ত যাব, কিন্তু কোথায় কোন দরিয়ায় সে ওয়াক-ওয়াক দ্বীপ, ভারত, সিন্ধু, ইরান না চীনের দরিয়ায় কিছুই জানা নেই ত আমার। আচ্ছা দেখি খোঁজ করে দেখা যাক—এই ভেবে তখনই সে বাড়ি ছেড়ে খলিফার দরবারে গিয়ে সেখানে যে সব জ্ঞানী গুণী লোক আছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে ঐ দ্বীপের পাত্তা, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেরই ঐ এক উত্তর : জানি না—এই প্রথম শুনছি ঐ দ্বীপের নাম।

শুনে দমটা তার একেবারে বন্ধ হবার যোগাড়, সে তখনই বাড়ি এসে মাথায় হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়ল। মা ছুটে এসে ছেলের মুখের দিকে চাইলে সে বললে—মা, ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে আর যাচ্ছি না আমি, যাচ্ছি—তোমার চেয়েও স্নেহময়ী মা মৃত্যুর কোলে। —এই বলে কিছুক্ষণ গালিচার উপর উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপরই হঠাৎ উঠে বসে বলে উঠল—হাঁ, হয়েছে আল্লা আমায় উপায় বাৎলে দিয়েছেন : যাচ্ছি আমি যে সাত বোন আমাকে ভাই করে নিয়েছে তাদের কাছে, তারা হয়ত আমায় ওয়াক-ওয়াক দ্বীপের পাত্তা বলে দিতে পারবে। এই বলার পর আর একটুও দেরি না করে মায়ের চোখের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উটের পিঠে চড়ে রওনা হল সাত বোনের বাড়ির দিকে। নিজের বাড়িতে আসার পর উটগুলিকে আর বিদায় দেয় নি হাসান।

হাসান যাত্নউটের পিঠে চড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বোনেদের বাড়িতে এসে হাজির হল। বোনেরা এত শীগগির আবার হাসানকে দেখতে পেয়ে জবর খুশী হয়ে ছুটে এসে তার কপালে চুমু দিলে। সব শেষে এল গোলাপ, ভাইয়ের প্রতি গভীর স্নেহই তার অন্তর্দৃষ্টি প্রখর করে তুলেছিল, সে হাসানের মুখের দিকে চেয়েই বুঝলে কি এক গভীর বেদনার ভারে কাতর হয়ে ছুটে এসেছে এখানে হাসান। হাসানের মুখে স্বল্পত্নঃখের ছায়া দেখলেই গোলাপের চোখে তুনিয়ার আলো নিবে যায়, তাই হাসানকে আদর করতে এসে তার মুখের দিকে চেয়েই তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। দরদী মনের ছোঁয়া লাগায় হাসানও নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না, আবেগভরা আর্তকণ্ঠে সে বলে উঠল, ও বোন, সোনা বোন, মর্মান্তিক ত্নঃখের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই আমি আজ তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি—বড়, বড় কষ্ট, বোন, বুক আমার ফেটে গেল—বলতে গিয়েই কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল, তুই চোখে অশ্রুর বান ডাকল—কাঁদতে কাঁদতে হাসান শেষে মাটিতে মূর্ছিত হয়েই পড়ল।

বোনেরা ভয় পেয়ে অমনি তার কাছে ছুটে এল—গোলাপ হাসানের চোখে মুখে ঠাণ্ডা গোলাপজল ছিটাতে লাগল, আর ছয় বোনের কেউ বা তার মাথায় বাতাস দিতে লাগল—কেউ বা মাথায় কেউ বা হাতে, কেউ বা পায়ে হাত বুলায়। বোনেদের শুশ্রূষায় যতবার হাসান উঠতে চেষ্টা করল, প্রতিবারেই পড়ে গেল। অবশেষে সে যখন একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলে উঠে বসতে পারল তখন সে ধীরে ধীর তার তুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে বললে—তাই আমি তোমাদের কাছে ওয়াক-ওয়াক দ্বীপের সন্ধান নিতেই এসেছি, বোনেরা, কারণ জাহানারা যাবার সময় মায়ের কাছে বলে গেছে—আমি যদি আবার তাকে ফিরে পেতে চাই, তা হলে যেতে হবে আমায় সেই ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে।

কথাটা শোনবামাত্র বোনেরা যেন কেমনই হয়ে গেল, কথা

বলে না কেউ, সবারই মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে—মাঝে মাঝে শুধু এ ওর দিকে তাকায়।

কি, কোন কথা বলছ না যে তোমরা কেউ?

বোনেরা তখন একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, ভাই, তুমি যদি হাত তুলে আসমানের গম্বুজের নীচেটায় হাত লাগাতে চেষ্টা করো, সেটাও বুঝি সহজ হবে এই ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে যাওয়ার চেয়ে। শুনে হাসানের দুই চোখে আবার নতুন করে অশ্রুর বন্যা নামল, তাতে তার জামাকাপড় ভিজে যেতে লাগল। বোনেরা তখন নানা কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতে লাগল। গোলাপ তার গলা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে—ভাই, সোনা ভাই আমার, এমনি করে কাঁদে না, একটু ঠাণ্ডা হও, ধৈর্য ধরো, লোকে ঐ ত কথায়ই বলে—যে সয়, সে রয়। বাঁচতে হলে, অভীষ্টলাভ করতে হলে ধৈর্য ছাড়া পথ নেই। নসিবে থাকলে যেমন করেই হোক তুমি তাকে পাবেই, দশ বছর যার আয়ু আছে, সে কখনও ন' বছরে মরবে না। সুতরাং কান্না থামাও তুমি, সাহসে ভরসায় বুক বাঁধো, তুমি যাতে তোমার ছেলেবউ ফিরে পাও তার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। আল্লার মর্জি হলে তুমি তাদের ফিরে পাবেই। সুতরাং কেঁদো না। যত সর্বনাশের মূল ছিল ওর ঐ যাদুকরা পালকের পোশাকটা, কতবার মনে হয়েছে তোমায় আমি ঐ পোশাকটা পুড়িয়ে ফেলতে বলি, তুমি শুনে চটে যাবে ভেবে বলি বলি করেও বলা হয় নি। যাক, ও নিয়ে এখন আর কথা বলে লাভ নেই, যা নসিবে ছিল ঘটেছে, এখন দেখতে হবে তোমার এ নিদারুণ দুঃখ আমরা কি করে দূর করতে পারি। এই বলে গোলাপ তখনই তার ছয় বোনেদের কাছে গিয়ে তাদের পা ধরে বললে—দিদি ভাইয়েরা, তোমরা কথা দাও তোমরা সবাই আমাকে ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে যাবার পথের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে।

বোনেরা সবাই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, ভাই হাসানকে আমরাও কম ভালবাসি না।

এখন এই সাতবোনের এক বুড়ো চাচা ছিলেন, সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তিনি বড় ভাইঝিটিকে। প্রতি বছর একবার করে নিয়মিত তিনি বড় শাহাজাদীকে দেখতে আসতেন। এই চাচার নাম হচ্ছে আবদল কদ্দুস। গেল বছর এসে যাবার সময় তিনি বড়কে একটা থলিতে বহুৎ খুশবুওয়ালা খানিকটা ধূপ দিয়ে বলে গেছেন—বেটী, আমার কোন সাহায্য দরকার হলে তুই এই থলি থেকে কিছুটা ধূপ নিয়ে পোড়াবি তা হলেই আমি এসে যাব। সেই কথা মনে হতেই বড়বোন গোলাপকে বললে—তুই দৌড়ে গিয়ে চাচার দেওয়া আমার সেই ধূপের থলিটা নিয়ে আয় ত। গোলাপ তখনই সেটা এনে দিলে বড় একটা সোনার ধুনুচিতে কয়লা জ্বালিয়ে সেই ধূপের একটুখানি ছেড়ে দিলে তাতে। সঙ্গে সঙ্গে ধুনুচি থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগল, সেই ধোঁয়া ক্রমে বেড়ে শেষে একটা ধোঁয়ার ঘূর্ণির সৃষ্টি করল। একটু পরেই ঘূর্ণির মাঝ থেকে আবদল কদ্দুস একটা সাদা হাতীতে চড়ে সামনে এসে হাজির ঃ ধূপের গন্ধ পেয়েই এই গ্যাখ আমি হাজির। কি করতে হবে বল, কি চাস তুই ?

বড় অমনি আবদল কদ্দুসের গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—চাচা, কতদিন তোমায় দেখি নে, এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল, তাই তোমার দেখা পাওয়ার জন্যে ধূপ পুড়িয়েছি আমি।

বৃদ্ধ কদ্দুস চোখ মিটমিট করে বললেন—ভাইঝিদের মাঝে তুই-ই আমার সবচেয়ে বেশি পেয়ারের, তোকে দেখতে কালই আমি আসব ঠিক করেছিলাম, তোকে ভুলি নি আমি। সে ত হল, কিন্তু সত্যি করে বল ত, ব্যাপার কি, আমার মনে হচ্ছে কি যেন চাস তুই আমার কাছে। ঠিক করে বল, লুকাস নে কিছু আমার কাছে।

চাচা, তুমি একটা পীর, কিছু লুকানো থাকে না তোমার কাছে,

আল্লা তোমার ভাল করুন, কুশলে রাখুন। তুমি যখন বলছ তখন সত্যি কথাই বলব, কিছু একটা চাওয়ারও কারণ ঘটেছে। বড় তখন হাসানের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করে বললে, চাচা, আমাদের সাতবোনের প্রিয় এই ভাইকে ওয়াক-ওয়াক দ্বীপের পথের সন্ধানটা বলে দিতে হচ্ছে যে!

শুনে আবদল কদ্দুস একেবারে চুপ করে গেলেন, মাথাটা তাঁর নুয়ে পড়ল মাটির দিকে, একটা আঙুল উঠে এল মুখে। দেখে কারোই বুঝতে বাকী রইল না রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ এই রকম কাটবার পর মাথা তুললেন তিনি, আঙুল সরিয়ে নিলেন মুখ থেকে, কিন্তু কথা বললেন না কিছু, শুধু সামনের বালিতে কতকগুলি দুর্বোধ্য জটিল ছবি আঁকলেন। তারপর এক সময় মাথা তুলে বড় ভাইঝির দিকে চেয়ে বললেন—উঁহু, হবে না, তোমাদের ভাইকে অযথা কষ্ট করতে মানা করো ঃ ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

শুনে বোনেরা হাসানের দিকে চেয়ে ছলছল চোখে বললে—ভাই, শুনলে ত, হল না। আল্লার দোয়া মেঙে দুঃখ সইবার ক্ষমতা চেয়ে বুক বাঁধো। গোলাপ শুধু এতে ঘাবড়ে না গিয়ে হাসানের হাত ধরে নিজেই আবদল কদ্দুসের সামনে গিয়ে হাজির হল।

চাচা, এর মুখপানে একবার চেয়ে দেখ।

হাসান বৃদ্ধের কর চুম্বন করতে গেলে তিনি তাতে বাধা দিলেন না। গোলাপ বললে—চাচা, এ কেন পারবে না বলছ তুমি, তা একে একটু বুঝিয়ে বলো। কদ্দুস হাসানের দিকে চেয়ে বললেন—বেটা, বৃথাই তুমি ওয়াক-ওয়াক যাওয়ার মতলব করে কষ্ট পাচ্ছ। ও মতলব ছাড়। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া জিনরাজের সৈন্যদলের সাহায্য পেলেও, এমন কি আকাশের ধূমকেতুতে চড়তে সুযোগ পেলেও ও দ্বীপে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না তুমি। কুমারী বীরাঙ্গনাদের দ্বারা রক্ষিত ও দ্বীপ, তোমার শ্বশুর জিনরাজ

তাদেরই সাহায্যে নির্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করেন সেখানে। তোমাদের মানুষের এলাকা আর ঐ এলাকার মাঝে পড়ে সাতটি বড় সমুদ্র, সাতটি অতল গর্ভ উপত্যকা আর সাতটি অভ্রলেহী পর্বতমালা, জায়গাটা দুনিয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে, ওর পরে আর কিছু নেই। ওখানে তুমি কিছুতেই যেয়ে উঠতে 'পারবে না, সুতরাং আমি বলি কি—তুমি ওখানে যাওয়ার মতলব ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাও, না হয় তোমার এই বোনেদের কাছেই থাক।

এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে হাসানের মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল, আহত জীবের মত কেমন এক আর্তনাদ করে সে তখনই মূৰ্ছিত হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বোনেরা হাসানের এই অবস্থা দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, গোলাপ নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে কপাল ধরে নীচের দিকে মুখ করে কাঁদতে লাগল। হাসানের চেতনা ফিরে এলে কোন কথা না বলে বোন গোলাপের জানুর উপর মাথা রেখে কেবলি চোখের জল ফেলতে লাগল। দেখে বৃদ্ধ জিন আবদল কদ্দুসের মনে বেচারার জন্য একটু অনুকম্পা জাগল। তাঁর সাত ভাইঝি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি প্রথমেই তাদের একটা ধমক দিলেন, কান্নাটা একবার থামাবি ?

চাচার ধমকে তারা কান্না থামিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল তিনি কি বলেন তাই শুনবার জন্যে। আবদল কদ্দুস তাদের আর কিছু না বলে হাসানের কাঁধের উপর হাত রেখে সস্নেহে বললেন—কান্না থামিয়ে সাহসে বুক বাঁধ, বেটা, আয়, চল দেখি আমার সঙ্গে, দেখি, কতটা কি করতে পারি তোর, আল্লার দোয়ায় হয়ত কিছু পারব, আয়।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাসান যেন মরা দেহে প্রাণ পেল, সে তড়াক করে উঠে বোনেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাসে গোলাপের কপালে মাথায় অজস্র চুমু দিয়ে আবদল কদ্দুসকে

বললে—চাচা, আমি আপনার গোলাম। কদ্দুস হাসানের হাত ধরে নিজের শ্বেতহস্তীর উপরে তুলে নিয়ে নিজের পিছনে বসালেন, এরপর হাতীর কানে কানে তিনি কি বলবার পরই গজরাজ বজ্রনাদের মত ভয়ংকর এক আওয়াজ করে বিদ্যুৎ গতিতে আসমানে উধাও হয়ে গেল। তিন দিন তিন রাত্রি চলে সাত বছরের পথ অতিক্রম করে হাতীটা যেখানে এসে থামলো, তার সামনেই পড়ল নীল রঙের পেল্লায় এক পাহাড়, তার সামনে এক গুহাকক্ষ, তার লোহকপাটও নীল। বৃদ্ধ জিন তাতে ধাক্কা দিতেই বেরিয়ে এল নীল নিগ্রো, হাতে তার নীলরঙের ঢাল তলোয়ার। কদ্দুস অতি ক্ষিপ্র হস্তে তার কাছ থেকে সে দুটো কেড়ে নিতেই সে সরে দাঁড়িয়ে তাঁদের যাবার পথ করে দিল, এবং ওঁরা গুহায় প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে লোহকপাট আবার বন্ধ করে দিল।

নীলপাথর খোদাইকরা সুড়ঙ্গ পথ, নীল আলো, তারই মাঝ দিয়ে মাইল খানেক চলার পর তাঁরা দুটো বিরাট সোনার ফটকের সামনে এসে হাজির হলেন। আবদল কদ্দুস ওর একটা ফটক খুলে হাসানকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঘণ্টা খানেক পরে তিনি নীল জিন নীল লাগাম দেওয়া একটা নীল ঘোড়া নিয়ে এসে তার উপর হাসানকে চড়ালেন। এর পর তিনি দ্বিতীয় সোনার ফটকটা খুলে দিলেই দেখা গেল অনন্ত নীলাকাশ নির্বাধে চক্রবাল রেখায় গিয়ে মিশেছে, নীচে তার সীমাহীন জনহীন ধূ ধূ প্রান্তর। কদ্দুস এবার হাসানকে সম্বোধন করে বললেন—বেটা, এবার ভেবে দেখ তুই যাবি কি না, ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে যেতে হলে পথে তোর সাত হাজার বিপদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে, তুই যাবি, না তোর সাত শাহাজাদী বোনের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের স্নেহে সান্ত্বনা খুঁজবি ?

হাসান বললে—চাচা, আমি হাজার বার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে রাজী, যেতে আমার হবেই।

শেখ আবার বললেন—বেটা, বাড়িতে তোর মা আছেন না? তিনি যে তোকে কাছে না পেয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, ফিরে গিয়ে তুই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাস না?

হাসান দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে—আমি আমার ছেলেবউ না নিয়ে আমার মায়ের কাছে ফিরব না।

এরপর আবদল কদ্দুস হাসানকে আর প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা না করে তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন, উপরে তার নীল কালিতে লেখা— শেখদেরও যিনি মাথার মণি, বাপজানদের কাছেও যিনি বাপজানের সামিল—সেই মহামহিমের কাছে—। চিঠি দিয়ে বললেন—তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আল্লা তোমায় রক্ষা করুন। তোমার গন্তব্য স্থানে এই ঘোড়াই তোমাকে নিয়ে যাবে। কালোচূড়া-ওয়ালা এক পাহাড়ের এক গুহার সামনে এ তোমাকে নিয়ে—হাজির করবে। সেখানে গেলেই তুমি এর উপর থেকে নেমে এর লাগামটা জিনের সঙ্গে বেঁধে একে ঐ গুহার মাঝে একাই যেতে দেবে অপেক্ষা করবে তুমি। একটু পরেই দেখবে কালো পোশাক পরা কৃষ্ণকায় এক বৃদ্ধ এসে হাজির হয়েছেন তোমার সামনে, তাঁর দাড়িটা কিন্তু সাদা আর এত লম্বা যে তার প্রান্তদেশ তাঁর জানু স্পর্শ করেছে। তাঁকে দেখামাত্র তাঁর কর-চুম্বন করে তাঁর আচকানের একপ্রান্ত দিয়ে তোমার নিজের মাথা ঢেকে তাঁর হাতে এই চিঠি খানা দিও ঃ তোমার পরিচয় পত্র। ইনিই আমাদের সকলের উপরে, আমাদের বাপের বাপ, মাথার মণি। যে কঠিন দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী হয়েছ তুমি, তার সিদ্ধি নির্ভর করছে এঁরই কৃপার উপর, সুতরাং সব রকমে এঁকে তোয়াজ করতে চেষ্টা করবে, আর যখনই ইনি যা হুকুম করবেন তা তামিল করো। এখন এস, আল্লা তোমার সহায় হোন।

এরপর হাসান শেখ আবদল কদ্দুসের কাছ থেকে বিদায় নিলে নীল ঘোড়া হাসানকে পিঠে নিয়ে একবার হ্রেষা রব করেই ছুটলে, আর কি তার গতিবেগ! সে বেগ ঝড়, তীর এমন কি বিদ্যুৎকেও

বুঝি হার মানিয়ে দেয়! এই বেগে সোজা সামনের দিকে সরল রেখায় চলে দশ দিনে দশ বছরের পথ অতিক্রম করে ঘোড়াটা পূর্ব পশ্চিমে টানা এক কালো পর্বত মালার সামনে এসে একটা স্বস্তির, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে হাজার হাজার কালো ঘোড়া ছুটে এসে নীল ঘোড়াটাকে শুঁকতে লাগল, তার গায়ে গা ঘষতে লাগল। দেখে হাসান রীতিমত ভয় পেয়ে গেল: এরা বুঝি তার ঘোড়ার যাবার পথ আটকেই দেয়। সে সব কিছু অবশ্য আর হল না, নীল ঘোড়া তাকে পিঠে নিয়ে ঐ কালো পর্বতশ্রেণীর একটা গুহা—সেটা আরও কালো, [illegible] পাখার চেয়েও কালো—তার সামনে এসে থামল। হাসান অমনি তা থেকে নেমে ওর লাগামটা জিনের সঙ্গে বেঁধে ছেড়ে দিল, নিজে গুহাটার সামনেই বসে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পরই কালো আচকান পরা কৃষ্ণকায় সৌম্য দর্শন এক বৃদ্ধ—সাদা লম্বা দাড়ি তাঁর হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে —এসে হাজির হলেন হাসানের সামনে। আবদল কদ্দুস যে মহামান্য মহামহিম শেখেদের মাথার মণি বাপের বাপের কথা বলেছিলেন ইনিই তিনি, নাম এঁর আলি—সুলেমানের বেগম বিলকিসের বেটা ইনি। হাসান শেখ আলিকে দেখামাত্র তাঁর সামনে জানু পেতে বসে তাঁর হাতে পায়ে সসম্ভ্রমে চুমু দিয়ে তাঁর আচকানের প্রান্ত দিয়ে নিজের মাথাটা ঢেকে আবদল কদ্দুসের চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলে। আলি কোন কথা না বলে চিঠিখানা হাতে নিয়ে গুহার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, হাসান দুরুদুরু বুকে ওখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর হাসান সবে নিরাশ হয়ে ভাবতে শুরু করেছে শেখ বুঝি আর এলেন না, এমন সময় আলি আবার এসে হাজির হলেন। এবার তাঁর গায়ে আর কালো পোশাক নেই, সব সাদা। শেখ আলি এসেই হাসানকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে গুহার ভিতরে চলতে শুরু করলেন। এমনি করে হাসানকে তিনি যেখানে এনে হাজির করলেন

সেটা মস্ত বড় একটা চৌকো কামরা, মেঝে তার হীরে দিয়ে তৈরি। কামরার চার কোণে গালিচার উপর বসে কালো পোশাক পরা চার বৃদ্ধ শেখ। তাঁদের প্রত্যেকের সামনে সোনার ধুনুচিতে সুগন্ধি ধূপ পুড়ছে, প্রত্যেকের চারধারে আরও সাতজন করে শেখ, তাঁরা ওঁদের চেলা, তাঁরা কেউ বা চামড়ার উপর লিখছেন, কেউ বা কেতাব পড়ছেন। হাসানকে নিয়ে শেখ আলি যখন কামরাটায় এলেন তখন চেলা শেখেরা সব উঠে দাঁড়ালেন, আর প্রবীণ চারজন তাঁদের কোণের আসন ছেড়ে ঘরের মধ্যিখানে তাঁদের মাথার মণি শেখ আলির পাশে এসে বসলেন। শেখ আলি তখন হাসানকে তার কাহিনী এই শেখদের শোনাতে বললেন।

নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে গিয়ে প্রথমে হাসানের এমন কান্না পেয়ে গেল যে চোখ দিয়ে অবিরাম জল পড়া এবং গলা দিয়ে ফোঁপানির আওয়াজ ছাড়া কোন কথা বেরুল না। অবশেষে কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অগ্নি উপাসক বাহরম যখন তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে সাত বোনের চাচা আবদল কদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত হাসান তাঁদের কাছে খুলে বললে। চার শেখই কোন বাধা না দিয়ে হাসানের সমস্ত কথা বিশেষ মনো-যোগের সঙ্গে শুনলেন। শোনা শেষ হলে তাঁরা প্রায় এক সঙ্গেই তাঁদের ওস্তাদ, শেখদের মাথার মণি আলির কাছে বলে উঠলেন—ওস্তাদ, এ আমাদের অনুকম্পার যোগ্য পাত্র, বউ আর ছেলে দুটিকে হারিয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে বেচারা। একে সাহায্য করা আমাদের উচিত।

শুনে শেখ আলি বললেন—ভাই সাহেবরা, তোমরা যা বললে তা বিলকুল ঠিক, কিন্তু কাজটা কত কঠিন তা একবার ভেবে দেখ। প্রথমে ধরো ওয়াক-ওয়াক দ্বীপে হাজির হওয়াই কত কঠিন, তারপর সেখান থেকে ফিরে আসা এক রকম অসম্ভব

বললেই হয়। তা ছাড়া সেখানে যে সব দুর্ধর্ষ কুমারী বীরাঙ্গনা ওখানকার রাজা এবং তাঁর মেয়েদের পাহারা দিচ্ছে তাদের সামনে এ হাজির হবেই বা কেমন করে? সুতরাং আমার মনে হয় হাসানের জাহানারার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। শুনে চারজন শেখই বললেন—বাপুজী, আপনি যা বললেন তা সবই ঠিক, কিন্তু ভেবে দেখুন একে পাঠিয়েছেন আমাদের সবারই প্রিয় ভাই সায়েব মাননীয় আবদল কদ্দুস, সুতরাং একে সাহায্য করতে আমরা বাধ্য।

এই সব শুনবার পর হাসান মহামান্য বৃদ্ধ শেখ শিরোমণির পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তাঁর সাদা আচকানের প্রান্ত দিয়ে মাথা ঢেকে নিজের স্ত্রীপুত্র ফিরে পাবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগল এবং অন্য চারজন শেখও হাসানের পক্ষ হয়ে তাঁকে অনুনয় করতে লাগলেন। এতে বৃদ্ধের মন একটু নরম হল, তিনি বলে উঠলেন—ইয়া আল্লা, আমি জীবনে এমন নাছোড়-বান্দা ছেলে দেখিনি ঃ এ এর প্রিয়জনদের ফিরে পেতে মৃত্যুর ভয় করে না। বেশ, আমি আমার যথাসাধ্য এর অভীষ্ট লাভে সাহায্য করছি।

এই কথা বলবার পর শেখ আলি তাঁর চেলা শেখদের মাঝে বসে চোখ বুজে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কি চিন্তা করে নিলেন, তারপর হাসানকে বললেন—শোন, প্রথমে তোমাকে এমন একটা জিনিস দিচ্ছি যা তোমায় সকল বিপদে রক্ষা করবে—এই বলে তিনি তাঁর দাড়ির যেখানটা সব চেয়ে বেশি লম্বা সেখান থেকে এক গোছা উপড়ে তার হাতে দিয়ে বললেন—ধরো, এগুলি বেশ যত্ন করে রাখ, যখনই তুমি কোন বিপদ আপদে পড়বে তখন এর একটা পোড়ালেই আমি তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব।

এরপর আলি কামরার উপরের দিকে চেয়ে যেন কাকে ডাকবার জন্যে বেশ জোরে একটা হাততালি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে

উপর থেকেই এক বিরাটকায় ইফরিদ এসে বৃদ্ধকে সেলাম করে দাঁড়াল।

কে তুমি?

আমি আপনার—গোলাম দাহনাশ ইবন ফকতাশ, বাপুজী।

আলি তখন ঐ দৈত্যের কানে কানে কি বলবার পরই হাসানের দিকে ফিরে বললেন—নে বেটা, তুই এখন এর পিঠে চড়, এ তোকে মেঘের উপর দিয়ে কর্পূরের দেশে নিয়ে ছেড়ে দেবে। এর পর আর ওর যাবার এক্তিয়ার নেই। ওখানে মাটি পাবি না তুই, মাটির বদলে পাবি শুধুই কর্পূর। কর্পূরের মাঠের উপর দিয়ে একাই এগিয়ে যাবি তুই, ঐ মাঠ যেখানে শেষ হয়েছে তার সামনেই পড়বে ওয়াক-ওয়াক। এরপর যা করবার আল্লাই ব্যবস্থা করে দেবেন।

হাসান তখনই শেখশিরোমণি আলির করচুম্বন করে অপর শেখদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইফরিদের কাঁধে চড়ে রওনা হয়ে গেল। ইফরিদ তাকে মেঘের রাজ্যের ভিতর দিয়ে কর্পূরের দেশে নামিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। এখানে হাসানের একা চলবার কথা।

কর্পূরের উপত্যকায় নেমে অবশ্য একাই চলতে লাগল হাসান—সোজা নাক বরাবর চলতে লাগল। কর্পূরের সুবাসে চারিদিক ভরে গেছে—পায়ের নীচে পড়ছে বালুর মত কর্পূরের দানা। কিছুদূর যাবার পরই দেখে তাঁবুর মত একটা কি। তাকে ঐ দিকে যেতে হবে বলেই হয়ত আল্লা একটা নিশানা রেখে দিয়েছেন। হাসান ঐ দিকেই ছুটে চলল। তাঁবুটার কাছে একটা লম্বা টিবির মত জায়গায় পা দিতেই সেখানে কি নড়ে উঠল, নড়তেই কর্পূরের দানা এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়াতে দেখে ইরামের স্তম্ভের মত বিশাল-কায় এক দৈত্যের গায়ে তার পা পড়েছে—দৈত্যের গায়ের রঙ কর্পূরের মতই সাদা আর দূর থেকে তাঁবু বলে সে যা ভুল করেছিল সে ঐ দৈত্যেরই একটা কান, সূর্যের তাপ থেকে মাথাটা রক্ষা করবার

জন্য কানটা ও অমনি উপরে রেখেছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে দৈত্য যখন দেখলে একটা ক্ষুদে জীবই তার এমন মজার ঘুমটা অকালে ভেঙ্গে দিয়েছে তখন সে মহাক্রুদ্ধ হয়ে বাজপাখী যেমন করে চড়াই ধরে তেমনি করে হাসানের গলা ধরে উপরে তুলে আছড়ে শেষ করবে বলে মাথার উপরে কয়েকবার ঘুরপাক দিয়ে নিচ্ছিল, হাসান সে সময়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে—এ আল্লা গেছি, কে আছ রক্ষা করো রক্ষা করো—বীরের বেটা, আমায় ছেড়ে দাও বলে—এক সঙ্গে কত কি কাতরোক্তি করে উঠল। দৈত্য মানুষ হাসানের কথা কিছু না বুঝলেও তার গলার আওয়াজ শুনে হেসে ফেললে: বাঃ, বাঃ, খাসা বুলি বলে ত পাখীটা, তোফা! একে আমি আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাই—খুশী হবেন তিনি—একে দেখে আর এর বুলি শুনে। দৈত্য তখন সন্তর্পণে হাসানের একটা পা ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় যেখানে তাদের রাজা পঞ্চাশ হাত উঁচু পঞ্চাশজন দেহরক্ষী নিয়ে একটা বড় পাথরের উপর বসে ছিলেন সেখানে তাঁর সামনে গিয়ে বললে—দেখুন খোদাবন্দ, আমি কেমন সুন্দর একটা পাখী ধরে এনেছি, দিব্যি গান গায় এ, খাসা! এই বলেই সে হাসানের নাকটা বেশ জোরে মলে দিয়ে বললে—গা, পাখী, গা, এবার ফুর্তিসে তোর গান শুরু কর, আমাদের মালিককে শোনা। হাসান দৈত্যদের ভাষা কিছু বোঝে না, ভাবলে তার অন্তিম সময় এসে হাজির হয়েছে, সে তখন রীতিমত ভয় পেয়ে বলে উঠল—এ আল্লা, গেছি, এবার আর রক্ষে নেই, কে আমায় এদের হাত থেকে বাঁচাবে—এ আল্লা তুমিই ভরসা।

দৈত্যরাজ, হাসানের কথা ছাই কিছুই বুঝল না, তার কাছে এটা পাখীর কিচির মিচিরের সামিল, শুনে সে জব্বর খুশী: বাঃ বাঃ—খাসা ত গান গায় এটা! তা তুমি এটা একটা খাঁচায় পুরে আমার মেয়ের ঘরে নিয়ে তার বিছানার কাছে ঝুলিয়ে রাখ, সে এটা দেখে আর এর গান শুনে বড় মজা পাবে।

দৈত্যটা তখন হাসানকে একটা খাঁচায় পুরে তার ভেতরে তার

খাবার এবং জলপানের জন্য ছুটো কাঁচের পাত্র রেখে, ঝাঁপ দিয়ে, বসে গান গাইতে পারে এর জন্য ছুটো দাঁড় বসিয়ে, দৈত্য রাজকন্যার ঘরে গিয়ে তার বিছানার ধারে টাঙিয়ে দিল।

দৈত্যরাজকন্যা হাসানের সুন্দর মুখ এবং অঙ্গের গঠন দেখে জব্বর খুশী হয়ে তখনই তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে এবং নানা মিষ্টি কথা বলে আদর করতে লাগল। হাসান দৈত্যরাজকন্যার কোন কথা না বুঝলেও এটুকু বুঝলে যে সে তার কোন ক্ষতি করতে চায় না। তখন সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং নানা রকম করুণ আর্তনাদ করে তার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতে লাগল। এতে যে হাসানের তেমন কিছু লাভ হল তা নয়ঃ হাসানের মুখ থেকে যে আওয়াজই বেরোয় দৈত্যরাজকন্যার মনে হয় সে দিব্যি মধুর সঙ্গীত, অমনি খুশীতে দিলটা তার ভরে ওঠে। এমনি করে হাসান রাজকন্যার এত প্রিয় হয়ে উঠল যে এক মুহূর্ত সে তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। খাবার সময় হাসানের খাঁচাটা তার পাশে থাকা চাই, শোবার সময় থাকা চাই। বাইরে যেতে হলে খাঁচাটা সে হাতে করে বেরোয়। মাঝে মাঝে হাসানকে খাঁচা থেকে বের করে নানা রকম আদর করে, গান অর্থাৎ কথা শুনবার জন্য নানা রকম প্রশ্ন করে, কাতুকুতু দেয়। দৈত্যরাজের ঘরে বন্দী হয়ে তার কন্যার আদরে আদরে হাসানের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলঃ এখান থেকে কি করে সে মুক্তি পাবে, জাহানারার খোঁজে কি করে আবার সে বেরুবে? শেখ আলির দাড়ি বা বাহরামের যাদু নাকাড়াটাও আর তার কাছে নেই, হাসানের গা পরিষ্কার করে আবার পোশাক পরাবার সময় রাজকন্যা সেটা নিয়ে একটা সিন্দুকে তুলে রেখেছে। হাসান কি করে এখান থেকে মুক্তি পাবে ভেবে উপায় খুঁজে পায় না। মনে মনে শুধু আল্লার সহায় মাগে। হঠাৎ একদিন আল্লা মুখ তুলে চাইলেনঃ দৈত্যরাজকন্যা হাসানকে গোসল করিয়ে খাইয়ে আদর করে খাঁচায় তুলে খাঁচার দরজা বন্ধ না করেই ঘুমিয়ে পড়ল। হয়ত মনে করেছিল এতদিনে পাখী পোষ মেনে

গেছে, আর পালাবে না। হাসান সেই ফাঁকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে সিন্দুক খুলে তার যাত্থ নাকাড়া আর আলিসাহেবের দাড়ির গোছা বের করে একটাতে আগুন দিয়ে মনে মনে শেখ আলিকে ধ্যান করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যরাজের বাড়িতে যেন একটা ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল আর তখনই মাটি ফুঁড়ে শেখ আলি হাসানের সামনে এসে হাজির হলেন ঃ

কি হ'ল হাসান, কি চাই?

হাসান ভয়ে শেখের হাঁটু হুটো জড়িয়ে ধরে বললে, বেশি জোরে কথা বলবেন না জনাব, ও জেগে যাবে, আবার আমায় খাঁচায় বন্দী হতে হবে।

শেখ তখন হাসানের হাত ধরে যাত্থবলে তাকে অদৃশ্য করে রাজবাড়ীর বাইরে নিয়ে গেলেন ঃ কি হয়েছে এবার বলো।

হাসান তখন কর্পূর উপত্যকায় এসে সে যে মুশকিল আর ফ্যাসাদে পড়েছে তা শেখকে খুলে বললে। শুনে শেখ বললেন— আমি ত তোমায় তখনই বারণ করেছিলাম। আর এখনই কি হয়েছে—এ-ই ত সবে শুরু! আমি এখনও তোমায় বলছি তুমি ফিরে চল, গিয়ে মা বা বোনেদের কাছে নিরাপদে থাক। এখানে আমার দাড়ি পুড়িয়ে তুমি নিস্তার পেলে, কিন্তু ওয়াক-ওয়াক দ্বীপ-পুঞ্জে গেলে আমার দাড়ি পুড়িয়ে তোমার কোন ফয়দা হবে না, ওখানে গিয়ে তোমার নিজের শক্তিতে কেবল তোমায় নির্ভর করতে হবে, তাই বলছি এখনও বুঝে দেখ।

হাসান বললে, আমার স্ত্রীকে না নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। এতে আমার নসিবে যা ঘটে ঘটুক। আপনার দাড়িতে সেখানে কোন কাজ না হয়, বাহরামের যাত্থ নাকাড়াটা ত আমার আছে!

শেখ নাকাড়াটার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, বাহরাম আমারই শিষ্য ছিল, আমার কাছেই তার সব কিছু শেখা, কিন্তু সে আল্লাকে ছেড়ে অগ্নির উপাসনা ধরল বলে আমি তাকে

বরবাদ করে দিয়েছিলাম। ওর ও নাকাড়াটা অন্য সব জায়গায় তোমার কাজে লাগলেও ওয়াক-ওয়াক দ্বীপপুঞ্জে ওতে তোমার কোন কাজ হবে না, সেখানে কাজ করে একমাত্র ওখানকার রাজার শক্তি।

হাসান এ কথা শুনেও কিছু মাত্র পিছপা না হয়ে বললে—জনাব, যার দশ বছর বাঁচবার কথা সে কখনও ন'বছরে মরে না। সেখানে গিয়ে মরা যদি আমার নসিবে লেখা থাকে ত তাই হোক। আপনি শুধু মেহেরবানি করে সেখানে যাবার পথটা আমায় বাৎলে দিন।

হাসানের কথা শুনে শেখ আলি তার হাত ধরে বললেন—চোখ বোজো। হাসান চোখ বুজলে পরক্ষণেই বললেন—মেলো। হাসান চোখ মেলেই অবাকঃ কোথায় বা কর্পূর উপত্যকা, কোথায় বা দৈত্যরাজের প্রাসাদ, কোথায় বা মহামান্য শেখ আলি, সমুদ্রের ধারে একটা দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, তটের আশে-পাশে বালু আর নুড়ির বদলে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের জহরত।

হাসান দ্বীপটার আশে-পাশে একবার ভাল করে চেয়ে দেখবার উদ্যোগ করছে এমন সময় কাছেরই কোন পাহাড় থেকে হাজার হাজার হয়ত বা কয়েক লক্ষ বড় বড় সাদা ধবধবে পাখী সূর্যকে একেবারে আড়াল করে তার দিকে ছুটে এল। তাদের ডানার ঝাপট হাসানের চারিদিকে যেন একটা বিরাট ঘূর্ণির সৃষ্টি করলে, আর তাদের ওয়াক-ওয়াক আওয়াজে যেন কানে তালা লেগে যায়। হাসানের আর বুঝতে বাকী রইল না—সে এবার সেই নিষিদ্ধ দ্বীপপুঞ্জে এসে গেছে। অত পাখী তাকে ঠুকরে পাছে সমুদ্রের জলেই ফেলে দেয়—এই ভয়ে সে কাছেই একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে ছুটল।

সেখানে আশ্রয় নিয়ে সবে নিজের অবস্থার কথাটা ভেবে নিতে যাচ্ছে এমন সময় দেখে একটা ধুলোর মেঘ তার দিকে ছুটে আসছে, ওটা কাছাকাছি এলেই হাসান দেখে ওর মাঝে বহু বর্শাফলক, শিরস্ত্রাণ আর বর্ম ঝক ঝক করছে।

হাসান বুঝলে—এই সেই বীরাঙ্গনার দল। আত্মরক্ষা করতে এখন কোথায় পালাবে সে? ভাবতে আর সময় পেল কোথায় হাসান, পড়ন্ত শিলার মত দ্রুত গতিতে এসে পড়ল ওরা হাসানের সামনে, ঘিরে ফেলল তার চারিদিক। যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ওরা রঙ তাদের সোনালী, বুনো ঘোড়ার মত চঞ্চল দুর্ধর্ষ তারা, লম্বা লেজে মস্ত এক গোছা চুল, দস্তুর মত মজবুত গড়ন, সমুদ্রের বুকে শীতের উত্তরে হাওয়ার মত তাদের মাথায় দমক। আরোহী বীরাঙ্গনাদের প্রত্যেকেরই কোমরের পাশে একখানা করে তরোয়াল ঝুলানো, এক হাতে সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ বর্শা আর এক হাতে অন্য মারাত্মক অস্ত্র।

বীরাঙ্গনারা হাসানের কুটীরের সামনে এসে যখন তাদের ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো, তখন হঠাৎ থামাতে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের ঘায়ে সমুদ্রতটের নুড়িগুলি এত জোরে এত উপর ছুটল যে নেমে এসে সেগুলি আবার নীচের বালুতে ডুবে গেল! ঘোড়াগুলির এবং তাদের সওয়ার বীরাঙ্গনার দল সবই যেন বাতাসে একটা অচেনা অজানা নতুন কিছুর গন্ধ পাচ্ছে। হাসান ভয়েভয়েই একবার বীরাঙ্গনাদের দিকে চেয়ে দেখল, শিরস্ত্রাণের নীচে মুখগুলি যেন তাদের আসমানের এক একটি চাঁদ, মাথার বাতামী, সোনালী, আগুনে, কালো চুলের গোছা সব ঘোড়ার লেজের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে—লোহার মসৃণ শিরস্ত্রাণ আর পান্নাখচিত সোনার বক্ষত্রাণের উপর সূর্য কিরণ পড়ে চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিচ্ছে।

এরপর বীরাঙ্গনাদের মধ্যে সবচেয়ে যে দীর্ঘাঙ্গী সে তার ঘোড়াটা চালিয়ে নিয়ে এল একেবারে হাসানের কাছাকাছি। শিরস্ত্রাণের সামনের প্রসৃত অংশে মুখ তার ঢাকা পড়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসায় সোনার বক্ষত্রাণের নীচে বুক তার দুলে দুলে উঠছে। সে সামনে আসতেই হাসান তার সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে বললে—হুজুরাইন, আমি বিদেশী, নসিবই আমাকে এখানে এনে ফেলেছে, আল্লা এবং আপনি আমায় রক্ষা করুন। বড় দুঃখী

আমি, আমার ছেলে বউ হারিয়ে তাদের খোঁজে এখানে এসে পড়েছি, আমায় দোয়া করুন, তাড়িয়ে দেবেন না।

দীর্ঘাঙ্গী বীরাঙ্গনা তখন এক লাফে তার ঘোড়া থেকে নেমে ইশারায় অন্যান্য বীরাঙ্গনাদের সেখান থেকে চলে যেতে বললে। নেত্রীর নির্দেশে তারা সেখান থেকে চলে গেলেই হাসান এগিয়ে গিয়ে তার হাতে পায়ে চুমু দিয়ে তার পোশাকের এক প্রান্ত নিজের মাথায় ধরলে। শিরস্ত্রাণের সামনের যে অংশটা বীরাঙ্গনার মুখ ঢেকে রেখেছিল, হাসানকে ভাল করে দেখবে বলে সে অংশটা তুলে ধরতেই হাসান দেখলে—এ বৃদ্ধা, মুখে বলিরেখার পাশে পাশে রয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা আর বিপদঝঞ্ঝা কাটানোর স্বাক্ষর। হাসানের করুণ মুখের দিকে চেয়ে তার বড় মায়া পড়ে গেল, সে হাসানকে বললে—ভয় নেই, বাছা, আমি তোমায় রক্ষা করব, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে এ বেশে তোমায় আর কেউ দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। তোমার সব কথা শুনবার আগে তোমার এ বেশ ছাড়িয়ে আমার দলের বীরাঙ্গনাদের মত করে তোমায় সাজাব, তা হলে কেউ আর তোমায় চিনতে পারবে না, সন্দেহও করবে না। এই বলে বুড়ী হাসানকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে তখনই গিয়ে তার দলের বীরাঙ্গনাদের মত পোশাক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে হাসানকে বীরাঙ্গনা বেশে সাজালে, তারপর তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা বড় পাথরের ধারে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে বললে—এখন খুলে বলো ত তুমি, তোমার নাম ধাম, এখানে আসবার কারণ। যে দ্বীপে কখনও কোন মানুষের ছায়া পড়েনি, সেখানে আসবার দুঃসাহস তোমার কি করে হল, আর এখানে এলেই বা তুমি কি করে?

শুনে হাসানের দুই চোখ জলে ভরে এল। সে বললে—চাচী, জীবনে যে আমার সর্বস্ব ছিল তাকে হারিয়ে পাগল হয়ে এখানে এসে

পড়েছি। এই বলে হাসান তার জীবনের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী ঐ বৃদ্ধার কাছে খুলে বললে।

কি নাম তোমার বউ আর ছেলে দুটির ?

হাসান বললে, আমাদের দেশে থাকবার সময় বউয়ের নাম ছিল জাহানারা আর ছেলে দুটিকে নাসির আর মনসুর বলে ডাকা হোত, জানি না এখানে জিনের দেশে তাদের কি নামে ডাকা হয়। এই বলবার সময় আবার নতুন করে ছেলে বউয়ের মুখ মনে পড়ায় হাসান অঝোরে কাঁদতে লাগল।

দেখে বুড়ীর মন একেবারে অনুকম্পায় ভরে গেল, সে হাসানের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—বেটা, তুই কাঁদিস নে। তোর নিজের মা কাছে থাকলে তিনি তোর জন্যে যা করতেন, আমি তোর জন্যে তার চেয়ে কিছু কম করব না জানিস। কি জানি—আমার অধীনে যে সব বীরাঙ্গনা রয়েছে তাদের কেউ-ও তোর বিবি হতে পারে, তা যদি হয় তা হলে সহজেই কাজ মিটে যাবে। কাল যখন ওরা যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে সমুদ্রে গোসল করতে যাবে তখন তোকে আমি ওদের বেশ ভাল করে দেখাব। এখন চল, এখানে এ দ্বীপে যে সব তাজ্জব জিনিস দেখবার আছে তা সব দেখাই। এই বলে বুড়ী সস্নেহে হাত ধরে উঠিয়ে ওখানকার তামাম তাজ্জব জিনিস সব দেখালে, বুঝালে, রাত্রে ভাল খানা খাইয়ে ভাল বিছানায় শুইয়ে বললে—তুই মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমো, তোর উপর আমার বড্ড মায়া পড়ে গেছে, আমার বেটা নেই, তুই আমার বেটা হয়ে গেছিস, এখন তুই যদি আমার সমস্ত বীরাঙ্গনাকে চাস তা-ও আমি তোকে দিয়ে দিতে পারি, তুই এখন শান্ত হয়ে ঘুমো। বুড়ীর স্নেহের কথা শুনে হাসানের চোখে জল এসে গেল, সে উঠে তার হাতে চুমু দিয়ে বললে, চাচী, তোমার এ স্নেহের ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারব না।

পরদিন ভোরে হাসানকে সমুদ্রের ধারে একটা বড় পাথরের ধারে বসিয়ে বুড়ী তার বীরাঙ্গনাদের সমুদ্রে স্নান করাতে নিয়ে এল।

অজাতশ্মশ্রু হাসানকে বুড়ী মেয়ের ছদ্মবেশে এমন করে সাজিয়েছিল যে দুনিয়ার কেউ তাকে পুরুষ বলে ঠাওরাতে পারবে না। হাসান পাথরের আড়ালে বসে দেখল নেত্রীর ইঙ্গিতে বীরাঙ্গনাদল তাদের ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে তাদের যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বুড়ী এসে হাসানের পাশে বসে বলল—দেখ, বেটা দেখ ভাল করে তাকিয়ে দেখ, এদের মাঝে কেউ তোর বিবি কিঁনা।

হাসান বুড়ীর কথায় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এই স্নানরতা বীরাঙ্গনাদের দিকেঃ হাঁ এরা সবাই সুন্দরী তরুণী, পালিশ করা রুপোর মত এদের গায়ের রঙ, সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখগুলি যেন সব চতুর্দশীর চাঁদ, চোখে অমানিশার ছায়া। এ সবই ঠিক কিন্তু জাহানারার সৌন্দর্য এরা কোথায় পাবে? হাসান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বুড়ীকে বললে, না চাচী, আমি যার খোঁজে এখানে এসেছি, সে নেই এদের মাঝে, জাহানারা নেই।

বেটা, অনেক দূর থেকে তুই ওদের ভাল দেখতে পাচ্ছিস না, কাছ দিয়ে যাবার সময় ভাল করে তাকিয়ে দেখ—এই বলে বুড়ী একটা হাততালি দিলেই ওরা সব জল থেকে উঠে সার বেঁধে একে একে তাদের নেত্রী এবং হাসানের সামনে দিয়ে তাদের যুদ্ধের পোশাক পরতে গেল। হাসান এবার তাদের সকলকেই বেশ ভাল করে নিরিখ করে দেখবার সুযোগ পেল, দেখলও সে তা-ই, এরা কেউই ফেলনা নয়, কিন্তু তার জাহানারা এর মাঝে নেই। সে নিরাশ হয়ে বুড়ীকে বললে, না চাচী, আমার জাহানারা এর মাঝে নেই।

নেই!

হাসানের কথায় বুড়ী তখন যেন বেশ একটু ভাবনায় পড়ে গিয়েই বলে উঠল—এরপর বাকী রইল ত জিনরাজের সাত বেটী। আচ্ছা, তুই একটু খোলসা করে তোর বউয়ের চেহারার বর্ণনা দে ত! তা হলে আমি হয়ত তাকে খুঁজে বের করতে পারব।

শুনে হাসান বললে, তার রূপের স্পষ্ট বর্ণনা আমি দিতে পারব

পারতাম, কিন্তু তা-ও ত নিবি না তুই! তা হলে? …বেশ এখানে অনেক অনেক অমূল্য ধনরত্ন আছে, যা তোরা কোনদিন চোখেও দেখিসনি, তাই দরাজ হাতে দিয়ে দিচ্ছি আমি তোকে, তাই নিয়ে ঘরে যা, সেখানে বাকী জীবন তুই রাজার হালে থাকতে পারবি, কেমন রাজী?

শুনে হাসান বুড়ীর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে বললে—ও চাচী, এত বয়স হয়েছে তোমার, এত বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি এ কথা কি করে বলতে পারলে, ধনরত্নের লোভে এত বিপদ ঝঞ্ঝা পুহিয়ে এত কষ্ট করে আমি এই দুর্গম দেশে এসেছি, ভালবাসার জন সে যে সাতরাজার ধনের চেয়ে কত বেশি দামী, তাকে না নিয়ে প্রাণ গেলেও আমি দেশে ফিরব না। আমার নসিব যখন আমায় এত দূরে এনে ফেলেছে তখন আমার মন বলছে আমার নসিবেই আছে আমি তাকে পাব, তুমি একটু দোয়া কর, চাচী, একটু মেহেরবানি করে উপায় করে দাও। নইলে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

হাসানের কথা শুনে তার রকমসকম দেখে বুড়ীর মনে হল একে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিলে দারুণ নির্বুদ্ধিতা হবে। বুড়ী তখন বললে—আচ্ছা বেটা, তুই শান্ত হ, দেখি আমার জান কবুল করেও যদি তোর মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারি। সাতটা দ্বীপ নিয়ে এই ওয়াক-ওয়াক দ্বীপপুঞ্জ। জিনরাজের সাত মেয়ে সাত দ্বীপের শাসনকর্ত্রী। এ দ্বীপ শাসনের ভার রাজার বড় মেয়ে হুরল হুডার হাতে। দেখি আমি তাঁর কাছেই যাই, দেখি তোর পক্ষ হয়ে ওকালতি করে যদি কোন ফয়সালা হয়। আর কাঁদিস-না তুই, চুপ করে বস, আমি এক্ষুনি আসছি।

এই বলে বুড়ী তখনই দ্বীপের শাসনকর্ত্রী হুরল হুডার কাছে গিয়ে তার দুই হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে দাঁড়াল। হুরল হুডা বুড়ীকে সম্মান দেখিয়ে কুর্সিতে বসিয়ে হেসে বললে—চাচী, তুমি নিশ্চয়ই কোন খোশ খবর এনেছ, বলো আর যদি কোন আরজি

নিয়ে এসে থাক, তা ত মঞ্জুর হয়েই আছে, বলো, কি শোনাবে আমায় বলো।

বুড়ী যেন একটু আশ্বাস পেলে, বললে—হুজুরাইন, এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে এখানে, শুনে আপনার দিলটা নিশ্চয়ই খুশী হবে: দেখলাম অপরূপ সুন্দর এক তরুণ কি করে সমুদ্রের ধাক্কায় তীরে এসে পড়ায় সেখানে বসে কাঁদছে। সে কি করে—কেন এল এখানে জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিলে—তার নসিবই তাকে এখানে এনে ফেলেছে। তার ছেলে বউয়ের খোঁজে বেরিয়েছে সে। তার বিবির চেহারা কেমন জিজ্ঞাসা করলে সে যা বললে তাতে ত আমার চোখে আপনি বা আপনার বোনেদের ছবিই ভেসে ওঠে, কিন্তু কি বলব, হুজুরাইন, এমন খুবসুরৎ চেহারা—এত বয়স হল আমার জিন বা মানুষ কারো মাঝেই আমি দেখিনি।

বুড়ীর কথা শুনে দপ করে জ্বলে উঠল নুরল হুডার দুটো চোখ, রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, হতচ্ছাড়ী শয়তানী বুড়ী, একটা মানুষকে আসতে দেখেছিস তুই আমার দ্বীপে, একটু ভয়ডর নেই তোর প্রাণে, এখনই তোর গর্দান নেওয়া হবে না কেন তাই বল?

শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নুরল হুডার সামনে হাত জোড় করে জানু পেতে বসল, আর নুরল তখন বলে চলেছে—তোকে কেটে টুকরো টুকরো করে শেয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা এখনই করছি, কিন্তু তার আগে সেই মানুষটাকে আমি দেখতে চাই, তুই এখনই আমার সামনে হাজির কর, তার মুখে শুনব আমি—মানুষ হয়ে কি করে সে তাদের নিষিদ্ধ এলাকায় আসতে সাহস পেল!

বুড়ী ভয়ে আধমরা হয়ে ছুটল হাসানকে আনতে, মনে মনে সে তখন বলতে বলতে চলেছে, হায় আল্লা এই খুবসুরৎ ছেলেটার মায়ায় পড়ে আমি মারা গেলাম, কেন আমি তাকে দেখামাত্র তাড়িয়ে দিলাম না। এরপর হাসানকে যেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সেখানে এসে জোর গলায় তাকে বলে উঠল—এবার হল ত! মরতে চেয়েছিলে, এবার গিয়ে মরো, চলো আমাদের মালকিন

নুরল হুডা তোমায় তলব করেছেন। শুনে হাসানও মনে মনে এ আল্লা, এ কি করলে—বলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ীর সঙ্গে দ্বীপের শাসনকর্ত্রীর কাছে চলল।

নুরল হুডা একটা ওড়নায় মুখ ঢেকে তার সিংহাসনে বসে ছিল, হাসান বুড়ীর সঙ্গে এসে তার তুই হাতের সামনে মাটিতে চুমু দিয়ে উঠে তখনই মুখে মুখে একটা কবিতা বানিয়ে তার প্রশস্তি গাইলে। হাসানের কবিতা বলা শেষ হলে নুরল হুডা বুড়ীকে তার তরফ থেকে হাসানকে সওয়াল করতে ইঙ্গিত করলে। বুড়ী হাসানের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের মহামান্যা সুলতানা, আলেকুয়াম সেলাম জানিয়ে তোমার নাম ধাম, তোমার বিবি ও তুই বেটার নাম জানতে চাইছেন।

হাসান তখন তার কপাল ভাবনা করে বললে—দিনতুনিয়ার মালকিন, আপনার এ বান্দার নাম হাসান, ইরাকের বসোরায় আমার বাড়ি, আমার স্ত্রীকে এখানে কি নামে ডাকা হয় তা আমি জানি নে, আমার ছেলে তুটির নাম নাসির আর মনসুর।

বুড়ীর মারফতই নুরল হাসানকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বিবি তোমায় ছেড়ে এসেছে কেন?

হুজুরাইন, তা আমি জানি নে, তবে একথা ঠিক নিতান্ত দায়ে পড়েই তাকে আসতে হয়েছে।

পরের সওয়াল হল—কোথা থেকে কি করে এসেছে?

হাসান জবাবে বললে—বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রসিদের মহল থেকে, এসেছে সে একটা যাতু করা পালকের পোশাক পরে উড়ে। আসবার সময় সে আমার মাকে বলে এসেছে—বলে জাহানারা যা যা বলে এসেছিল সব সুলতানাকে খুলে বললে: এরপর হুজুরাইন, তামাম তুনিয়া আমার চোখে আঁধার হয়ে গিয়েছে।

নুরল হুডা এবার নিজেই মাথা তুলিয়ে বললে—বুঝলাম, তোমার বিবি যদি তোমার সঙ্গে আবার মোলাকাৎ না চাইত, তা হলে

সে আর তার ঠিকানা বলে আসতো না, কিন্তু এ কথাও ত বলতে পারি সে যদি তোমায় সত্যি পেয়ার করত তা হলে তোমায় ছেড়ে আসত না! শুনে হাসান আল্লার কসম নিয়ে জোরের সঙ্গে বললে—যে তার বিবি সত্যিই তাকে ভালবাসত, সে ভালবাসা যে ঝুটা নয় তার হাজার প্রমাণ সে পেয়েছে; তবে সে যে হাসানকে ছেড়ে এসেছে তার কারণ অন্য: উড়বার সহজাত প্রবৃত্তিতে আসমানের ডাকে সে সাড়া না দিয়ে পারে নি। এরপর হাসান নুরল হুডার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললে, হুজুরাইন, আমার দুঃখের সব কাহিনীই আপনাকে খুলে বললাম, এখন আমি আল্লার দোহাই দিয়ে আরজি জানাচ্ছি আমার সকল গোস্তাকি মাফ করে আমার ছেলে বউকে ফিরে পেতে আপনি সাহায্য করুন, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

নুরল হুডা কোন জবাব না দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে মুখ নীচু করে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে তারপর এক সময় মাথা তুলে বললে—তোমার গুরুতর অপরাধের কি উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায় ভেবে এখনও আমি কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি।

বুড়ী—এ কথা শুনবার পরই নুরল হুডার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে তার পোশাকের প্রান্ত মাথায় টেনে নিয়ে বললে—দিনদুনিয়ার মালকিন, হুজুরাইন, এই বেচারাকে রেহাই দিন, দোয়া করুন একে। আপনি ত নিজের কানেই শুনলেন কি নিদারুণ দুঃখ পেয়ে কত বিপদঝঞ্ঝা পুহিয়ে ও এখানে এসেছে। আল্লার বিধানে ওর নসিবে যদি বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাঁচবার কথা না লেখা থাকত তা হলে ও এতদিন মাটির তলে যেত। আপনি আল্লার প্রতিনিধি, আল্লার মর্জিমত কাজ করুন, ওকে বাঁচতে দিন। ওর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে আর ওর দুঃখের কথা স্মরণ করেই আমি আপনার কাছে ওর জীবন ভিক্ষা করতাম না—যদি না আর একটা বিশেষ গুণে আমায় মুগ্ধ করত: তারিফ করবার মত কিছু দেখলেই ও মুখে মুখে এমন সুন্দর কবিতা রচনা করে, ছড়া কাটে

যে শুনলে তাক লেগে যায়। যদি পরখ করতে চান ত আপনি একবার আপনার মুখের ওড়নাটা খুলে ফেলুন, তখন দেখবেন—বুঝবেন ওর কেরামতি।

নুরল হুডা এতক্ষণ কঠোর হয়ে বসে থাকলেও বুড়ীর এই কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেললে ঃ বড় চালাক তুমি, বুড়ি, জব্বর দাওয়াই ছেড়েছ। আসলে নুরল হুডা হাসানের দেবদূতের মত চেহারা দেখে ভিতরে ভিতরে নিজেই কিছু দুর্বলতা বোধ করছিল তা ছাড়া নিজের রূপের প্রশস্তি শুনতে দুনিয়ার কোন মেয়ের না লোভ.। সেই লোভের কাছেই হার মানল তার সুলতানী চাল ঃ হাসানের মুখে নিজের স্তব শুনতে খুলে ফেললে সে মুখের আবরণ, মুখে বললে, বেশ শোনাই যাক দেখি ওর কবিতা।

কিন্তু কবিতা শোনাবে কে ?—নুরল হুডার খোলা মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাসান হতচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বুড়ী অনেক চেষ্টায় তার চেতনা ফিরিয়ে এনে যখন বললে—কি হল, তুমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে কেন ?

ইয়া আল্লা, সুলতানা নিজেই হয়ত আমার সেই হারানো বিবি—নয় ত, একটা মটর দানার দুটো দলের মাঝে যেমন মিল তেমনি মিল এঁর তার সঙ্গে। শুনে সুলতানা হেসে একেবারে চিৎপাৎ হবার যোগাড়। হাসিটা একটু থামলে বললে, এ একটা পাগল !

হাসানের চেহারা দেখে নিজেও একটু আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল নুরল হুডা, তাই তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বিবির মত কিসে দেখলে আমায়, কোথায় তার সঙ্গে আমার মিল ?

এক রকম সব কিছুতে হুজুরাইন, সেই কাজল চোখ, সেই ভুরু, সেই মুখ, সেই মাথার চুল—সেই গায়ের রঙ—এক রকম সব কিছুতে, তবে হ্যাঁ ফারাকও একটু আছে, সে ফারাক যে ভালবেসেছে সে-ই বোঝে !

কথাটা শুনবামাত্র বুদ্ধিমতী নুরল বুঝে ফেললে এর মন সে পাবে না, সুতরাং ভীষণ রাগ আর ঘৃণা গিয়ে পড়ল হাসান এবং যে বোন

তাকে সাদি করেছে তার উপর। মনে মনে সে তখন গজরাতে লাগল: আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা, বাপের অনুমতি না নিয়ে একজন মানুষকে সাদি করা—দু'জনকেই আমি শেষ করব। মুখে শান্ত কণ্ঠে বুড়ীকে বললে, চাচী, তোমায় একটা কাজ করতে হচ্ছে: ছয় দ্বীপে আমার ছয় বোনের কাছেই তুমি একবার যাও, গিয়ে বলো পুরো দু'বছর আমি তাদের দেখি না, তাদের দেখবার জন্য মন আমার বড় ব্যাকুল হয়েছে। এই বলে তুমি নিজেই তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবে—কিন্তু খবরদার এখানে কি ব্যাপার ঘটেছে তার বিন্দুবিসর্গ যেন তারা ঘুণাক্ষরে জানতে না পায়।

বুড়ী অবশ্য নুরল হুডার মতলব কিছু না বুঝেই তার বোনেদের আনতে গেল। বড়র কথা বলে পরের পাঁচজনকে আনতে কোন অসুবিধা হল না—মুশকিল বাধল সপ্তম দ্বীপের ছোট বোনের কাছে গিয়ে: ছোট তার বাপজান জিনরাজের কাছে থাকে, সে বড়র কাছে যাবার জন্যে বাপের অনুমতি চাইলেই তিনি বলে উঠলেন—না রে বেটী, না, তোকে আমি যেতে দিতে পারি না, আমার দিল থেকে কে যেন বলছে, তুই একবার—এ দ্বীপ ছেড়ে গেলে আর আমি তোকে দেখতে পাব না। তুই আমার নয়নের মণি তোকে না দেখলে আমি মরে যাব। কাল রাত্রে আমি অদ্ভুত এক খোয়াব দেখেছি। খোয়াবে দেখলাম—আমি যেন এক গুপ্ত ধনরত্নের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তাদের জৌলুস দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। সব চেয়ে ছোট একটা দেখে বড়ই ভাল লাগল আমার, তাই সেটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে বুকে করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাইরে এসে সূর্য কিরণে সেটা চোখের সামনে ধরে কেবল ভাল করে দেখতে গেছি এমন সময় কোত্থেকে অদ্ভুত একটা পাখী—তেমন পাখী এ দ্বীপে আগে আর কখনও দেখিনি—এসে ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে নিয়ে আসমানে উধাও হয়ে গেল, এতে মনটা আমার দস্তুর-মত খারাপ হয়ে গেল। ঘুম ভাঙবার পর আমি শেখদের ডেকে এনে তাঁদের কাছে আমার খোয়াবের কথা বললে তাঁরা এর ব্যাখ্যা করে বললেন—এই সাত রত্ন হচ্ছে আপনার সাত বেটী, আপনার পেয়ারের

ছোট রত্নটি হচ্ছে আপনার ছোট বেটী, একে কেউ জবরদস্তি করে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। এই শুনবার পর মনটা আমার একেবারে ভাল নেই, তাই তোমার দিদির কাছে যেতে অনুমতি দিতে আমার মন সরছে না।

উত্তরে জিনরাজের ছোট মেয়ে জাহানারা বললে—বাপজান, অনেকদিন আমি আমার বড়দিদি নুরলকে দেখি না, কতবার তার কাছে যাব যাব করেও আমার যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এখন সব বোনেদের নিয়ে তার বাড়িতে সে একটা উৎসব করবে বলে যখন আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে, তখন আমি না গেলে বড় দুঃখ পাবে সে মনে, গোসা করবে। আর আপনার ভয়ই বা অত কিসের? মনে আছে না—একবার আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে দূরে চলে গিয়েছিলাম আমাকে কিছুকাল না দেখে আপনি ভেবেছিলেন আমি বুঝি হারিয়ে গেলাম! কিন্তু ফিরে এলাম ত আপনার কাছে। এবারও দেখবেন বড়দির ওখানে মাসখানেক কাটিয়েই আমি আবার আপনার কাছে ফিরে আসব। আমি আপনাকে ছেড়ে দূরে গেলে আপনার একটু ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিতে কে আসবে এই মহা দুর্গম ওয়াক-ওয়াক দ্বীপপুঞ্জে— মেঘপাহাড়, নীলপাহাড়, কালোপাহাড়, সাত সমুদ্দুর আর কর্পূর উপত্যকা পার হয়ে? জান নিয়ে আসতে পারে কেউ এখানে? মিছিমিছি ছাইপাঁশ ভাববেন না আপনি, খুশ দিলে আমায় দিদির কাছে যেতে অনুমতি দিন।

মেয়ের এই সব যুক্তির কথায় জিনরাজের উদ্‌বেগটা যেন একটু কমল, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েকে নুরল হুডার দ্বীপে যাবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু সাবধানের মার নেই ভেবে তার সঙ্গে দিলেন দেহরক্ষী হাজার কুমারী বীরাঙ্গনা। বাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল সে একবার সেই গোপন জায়গায় যেখানে দুই বিশ্বস্ত বাঁদীর তত্ত্বাবধানে তার দুই ছেলে নাসির আর মনসুরকে লুকিয়ে রেখেছিল। ছেলে দুটিকে কোলে নিয়ে আদর করে, চুমু দিয়ে

ফিরে এল সে বুড়ীর কাছে, তারপর তার রক্ষী বীরাঙ্গনাদের নিয়ে আর পাঁচ বোনের সঙ্গে সে বড়বোন নুরল হুডার দ্বীপে এসে হাজির হল।

এদিকে ওরা আসবে বলে বড় বোন নুরল হুডা তখন সোনা আর পান্নার কাজ করা জমকালো এক পোশাক পরে সিংহাসনে বসে রয়েছে আর তার সামনে হাসানকে ঘিরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে খোলা তলোয়ার আর বর্শা হাতে কয়েকটি বীরাঙ্গনা।

বুড়ী এসে নুরল হুডাকে কুর্নিশ করে বললে—হুজুরাইন, আপনার ছয় বোনকেই নিয়ে এসেছি আমি, এ দ্বীপে তারা সব আপনার সামনে আসবার অনুমতি চাইছেন।

নুরল হুডা বললে—আমার ছয়বোনের মাঝে আমার পরেই যে বয়েসে বড় তাকে প্রথমে নিয়ে এস।

বুড়ী নুরলের হুকুমে হাজির করল জিনরাজের মেজো মেয়েকে তার সামনে, নাম তার লতিফা, রেশমী নীল পোশাক পরে নীল ওড়নায় মুখ ঢেকে এসেছে সে, নুরলের করচুম্বন করতে নুরল উঠে তাকে পাশে বসিয়ে তার মুখের আবরণ খুলে দিয়ে হাসানকে বললে—চেয়ে দেখ, এ তোমার বিবি কিনা।

হাসান তাকে দেখে বলে উঠল—
ইয়া আল্লা, এ যে দেখছি আসমানে চাঁদ উঠল!
কোন রূপকার গড়েছে এর দেহ
বাগিচার জুঁই, বেল আর গোলাপ দিয়ে?
দূরে থেকেও তার সুবাস পাচ্ছি যেন।
চুলেতে এর হাজার অমানিশা,
কোমরে দোলে তরুণ কোমল শর
চাকের মধু আটকে আছে ঠোঁটে
দুনিয়া ঢুঁড়ে কেউ পাবে না হেন,॥

আমার বিবির সঙ্গে মিল আছে এঁর হুজুরাইন, কিন্তু ফারাকও কিছু আছে, যে ভালবেসেছে তার চোখেই তা ধরা পড়ে।

এরপর নুরল হুডার নির্দেশে বুড়ী হাজির করলে সেজো বোনকে। এ বোন পরে এসেছিল বাদামী রঙের পোশাক। মুখের ওড়না সরিয়ে মুখ দেখিয়ে নুরল হুডা হাসানকে বললে—চেয়ে দেখ ত, এ তোমার বিবি কিনা!

সেজো বোন মেজোবোনের চেয়েও সুন্দর, হাসান তাকে দেখে বলে উঠল—হুজুরাইন, এঁকে দেখলে লোকের মাথা বিগড়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে—

শীতের রাত্রে গ্রীষ্মের চাঁদ উঠলে আসমানে
কতই না সুন্দর দেখায়,
কিন্তু এ যে দেখছি তার চেয়েও সুন্দর!
মাথায় এর ঘন এলো চুল দেখে মনে হয়
রাত্রি তার কালো পাখা মেলে দিনকে ঢেকে ফেলেছে;
অথবা এ মেঘ?—না, না, ঐ যে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।

হুজুরাইন, এঁকে দেখে যা আমার মনে হল, তা ত বললাম কিন্তু আমার বিবির চেহারার সাথে এঁর চেহারার বেশ ফারাকও আছে।

শুনে নুরল হুডা এ বোনকে পাশে বসিয়ে বুড়ীকে হুকুম দিলে পরের বোনকে আনতে। বুড়ী নিয়ে এল তাকে, নাম তার সাঁজের তারা। তাকে দেখিয়ে নুরল হাসানকে বললে—একে দেখে কি মনে হয় তোমার, এ কি তোমার বিবি?

হাসান একে নিয়েও একটা কবিতা রচনা করে বললে—মালকিন, একে দেখলে বুঝি শেখ আর পীরদের মাথা ঠিক থাকে না, এর রূপের জেল্লা সূর্যের আলোকে ম্লান করে দেয়, ইনি চলে গেলে রাত্রি নামে চোখে, কিন্তু হুজুরাইন ইনি ত আমার বিবি নন।

নুরল হুডার ইশারায় বুড়ী নিয়ে এল এর পরের বোনকে, নাম তার আসমানী। মিহি জড়োয়ার কাজ করা জাফরান রঙের পোশাক পরে সে এল, তাকে দেখেই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে হাসান মুখে মুখে একটা কবিতা রচনা করে বলে উঠল—প্রিয়ার খোঁজে

পথে বেরিয়ে তার মুখ মনে করে রাত্রে বারবার যে আসমানের চাঁদের দিকে চেয়েছি, তুমি কি সেই চাঁদ? না না, তুমি তার চেয়েও সুন্দর, কিন্তু হায় নসিব, তুমি ত আমার বিবি নও।

এরপর বুড়ী নুরলের যে বোনকে নিয়ে এল নাম তার আনারকলি, সোনার কাজ করা সবুজ রেশমী পোশাক পরে এসেছে সে ঃ ঘন সবুজ পাতার আড়ালে যেন একটি আনার গুল। তাকে দেখামাত্র হাসান মুখেমুখে এমন সুন্দর কবিতা রচনা করে তার প্রশস্তি গাইলে যে তা শুনে নুরল হুডা তার এতক্ষণের গোসা ভুলে বলে উঠল, তোফা, তোফা!

হাসান নুরল হুডার দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু হুজুরাইন, ইনি আমার বিবি নন।

বুড়ী এদিকে সুলতানার মুখে হাসানের কবিতার তারিফ শোনা মাত্র সুযোগ পেয়ে বলে উঠল—মালকিন, দেখলেন ত এ বিদেশী তরুণের এলেম? এমন মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে দুনিয়ার ক'জন পারে? আমার আরজি আপনার এলাকায় এসে পড়ায় এর যে কসুর হয়েছে, আপনি তা মাফ করে আপনি একে আপনার দরবারের কবি করে নেন।

নুরল হুডা তখন আবার গম্ভীর মূর্তি ধরে বললে—থামো, আমার পরীক্ষা আগে শেষ করতে দাও। জলদি গিয়ে আমার ছোটবোনকে এবার নিয়ে এস।

বুড়ী ছোটবোনকে আনলে নুরল তার মুখের ওড়না যখন খুলে দিল তখন হাসান তার মুখ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত করুণ চীৎকার করেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। এদিকে জাহানারাও হাসানকে দেখে তার গলার আওয়াজ শুনে নুরল হুডার সিংহাসনের সামনে হতচেতন হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ব্যাপার দেখে নুরল হুডার বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না, ঈর্ষা আর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সে তখনই হাসানকে দেখিয়ে সে তার প্রহরী বীরাঙ্গনাদের হুকুম দিল—এই মানুষটাকে এখনই তোমরা

শহরের বাইরে ফেলে এস। নুরলের হুকুমে বীরাঙ্গনারা হাসানকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে রেখে এল। এরপর—জাহানারার চেতনা ফিরে এলেই বড়বোন নুরল তার দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—হতচ্ছাড়ী শয়তানী,—কি, ব্যাপার কি,—এই মানুষটাকে—বাপজানের অনুমতি না নিয়ে—এই মানুষটাকে তুই সাদি করেছিলি—তারপর তোর স্বামীকে ফেলে তুই পালিয়ে এসেছিস, আমাদের কুলের কলঙ্ক তুই! ছাখ না, তোর রক্তে এ কলঙ্ক আমি ধুয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করছি। এরপর নুরল হুডা তার প্রহরী বীরাঙ্গনাদের বললে—এই বেইমানের চুলের গোছা ধরে একটা মইয়ের সঙ্গে বাঁধো—তারপর একে এমন পেটানো পেটাবে যে গা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়, তারপর আমি দেখছি। —এই বলে নুরল হুডা তখনই তার বাপজান জিনরাজের কাছে হাসান আর জাহানারার সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে এক চিঠি লিখল। ঐ চিঠিতেই সে জিনরাজকে অনুরোধ করে পাঠাল তিনি যেন পত্রপাঠ জানান এর জন্য কি শাস্তি তিনি নির্দেশ করেন। এক বীরাঙ্গনা নুরল হুডার পত্র নিয়ে তখনই জিনরাজের কাছে ছুটল। জিনরাজ নুরলের পত্র পড়ে চোখে সরষের ফুল দেখলেন, সারা গা তাঁর থর থর করে কাঁপতে লাগল। একটু সামলে নিয়েই তিনি মেয়ের চিঠির জবাবে লিখলেন—এ অপরাধের শাস্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, যে কোন শাস্তি এ অপরাধের তুলনায় তুচ্ছ, নুরল যে শাস্তি দিয়ে তাকে খতম করতে চায়, তা যেন করে।

এদিকে জাহানারা যখন মইয়ে চুলবাঁধা অবস্থায় থেকে কাতরাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে—এরপর আর কি শাস্তি তার নসিবে আছে, ঠিক সেই সময় সমুদ্রতীরে হাসানের চেতনা ফিরে এল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নসিবের কথা ভেবে সে বিলাপ করতে শুরু করল: হায় আল্লা, কত বিপদ ঝঞ্ঝা পার হয়ে কত কষ্ট করে—কি আশা নিয়ে আমি এখানে এলাম, আর কি হল আমার! —এখন এই সর্বনেশে দ্বীপ থেকে আমি পালাব কি করে?—এই রকম সব ভাবতে ভাবতে পাগলের মত সে ঘুরে বেড়াতে লাগল সমুদ্র তীরে।

হঠাৎ এক নামকরা কবির একটা কবিতার কয়েকটা লাইন তার মনে পড়ে গেল :

> যখন তুমি তোমার মায়ের মনে স্বপ্ন হয়ে ছিলে
> তখনই ধরা পড়েছ আমার চোখে—
> তোমার নসিব লিখে রেখেছি আমি।
> আমার সেই লেখার কথাই ভাবো
> আর কিছু খুঁজতে যেও না।

এই বয়েৎটা যেন হাসানের মনে বেশ একটু বল সঞ্চার করল, কিছুটা আশার আলো দেখতে পেল সে যেন : খোদার মর্জিতে এত বিপদ কাটিয়ে উঠেছি যখন, তখন—। সমুদ্রের বালুতটে ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবতে লাগল—কিন্তু এখানে এই সমুদ্রতীরে এলাম আমি কি করে ? আর আমার জাহানারাই বা কোথায় গেল ? সেই বুড়ী চাচী ? আমি খোয়াব দেখি নি ত ! হাসান এমনি সব ভাবছে এমন সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ল—দশ এগারো বছরের দুটি মেয়ে সমুদ্রতীরে তার সামনেই একটু দূরে ভীষণ মারামারি করছে। হাসান তাদের থামাতে এগিয়ে গিয়ে দেখে তাদের সামনেই একটা চামড়ার টুপি পড়ে রয়েছে, তার গায়ে কি রকম সব নক্সা আঁকা, আর হাসানের অজানা হরফে কি সব লেখা। হাসান তাদের ছাড়াতে চেষ্টা করতে করতে বললে—ছি, এমন করতে নেই, কি নিয়ে তোমাদের বিবাদ, বল ত আমায়, দেখি আমি একটা ফয়সালা করে দিতে পারি কি না।

বিবাদ ? ওরা তখন বললে, বিবাদ আমাদের ঐ টুপি নিয়ে।

হাসান বললে—তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তা হলে এখনই আমি এর মীমাংসা করে দিচ্ছি।

বেশ শুনব আমরা আপনার কথা, আপনি এর একটা ফয়সালা করে দিন।

হাসান তখন সমুদ্রের তীরে থেকে বেশ একটা পাথরের নুড়ি হাতে নিয়ে বললে—আমি এই পাথরটা দূরে ছুড়ে দিচ্ছি, যে

দৌড়ে গিয়ে আগে এই পাথরটা কুড়িয়ে আমার কাছে আনতে পারবে, টুপিটা হবে তার।

দুটি মেয়েই হাসানের বিচার শুনে খুশী হয়ে বললে—বেশ বেশ, এই ভালো।

হাসান তখন নুড়িটা বেশ জোরে অনেক দূরে ছুড়ে দিল, আর দুটি মেয়েই ছুটল সেটা আনতে, সেই ফাঁকে হাসান টুপিটা ভাল করে দেখবার জন্য হাতে তুলে নিল। হাসান তন্ময় হয়ে টুপিটা দেখছে এমন সময় দুটি মেয়েই ছুটতে ছুটতে তার কাছে এল, যে নুড়িটা আগে গিয়ে ধরেছে সে বলতে বলতে এল, আমি জিতেছি, আমি জিতেছি।···কিন্তু কই, আপনি কই, কোথায় গেলেন আপনি, শীগগির এসে আমায় টুপি দিন। মেয়েটা বার বার এই বলে চীৎকার করতে লাগল। মেয়ে দুটি হাসানের কাছে এসে গেছে, একেবারে কাছে, অথচ দেখতে পাচ্ছে না তাকে? তা হলে? হাসান তখনই বুঝে ফেললে তা হলে এ নিশ্চয়ই যাদুকরা টুপি: এ টুপি যে পরে কেউ তাকে দেখতে পায় না। খোদার অশেষ দোয়ার কথা মনে করে বুক তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, দুই চোখ জলে ভরে এল, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে বারবার প্রণাম জানিয়ে উঠে সে বেশ চাঙ্গা মন নিয়ে জাহানারার খোঁজে শহরের দিকে চলল: কেউ ত তাকে দেখতে পাবে না, সে নিরাপদেই তাকে খুঁজে বের করতে পারবে। একটু যেতেই মনে হল—প্রথমে একেবারে জাহানারার কাছে না গিয়ে যে বুড়ী চাচী আমায় সাহায্য করেছিল তার কাছে গিয়ে দেখা যাক সে আমায় দেখতে পায় কি না। বেশি খুঁজতে হল না, সুলতানা মহলে এসে দেখে একটা কামরায় একটা আংটার সঙ্গে বুড়ীকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বেচারা বুড়ী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। বুড়ী অবশ্য তাকে দেখতে পেল না, তবু টুপির যাদুশক্তি ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্য হাসান ঐ ঘরের তাকের উপর যে সব চীনামাটির

বাসন সাজানো ছিল তার মাঝ থেকে সবচেয়ে বড়টা নিয়ে এক আছাড়ে বুড়ীর সামনে মেঝের উপর ভেঙে ফেলল। ভাঙার আওয়াজে চমকে উঠে বুড়ী এদিক ওদিক চেয়েও যখন কাউকে দেখতে পেল না তখন তার মনে হল নুরলহুডা নিশ্চয়ই কোন বদখত ইফরিদকে পাঠিয়েছে। বুড়ী তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—আমি সুলেমানের দোহাই দিয়ে বলছি, বলো কে তুমি বাবা ইফরিদ, কেন এসেছ তুমি ?

জবাব দিল হাসান ঃ চাচী ভয় নেই, আমি কোন ইফরিদ নই, আমি বসোরার হাসান—যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে, যার জন্যে তোমার আজ এই দুর্গতি—এই বলেই হাসান তার মাথা থেকে টুপিটা সরিয়ে ফেললে। বুড়ী তখন তাকে দেখতে পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে—বাবা, এক্ষুনি তুই এখান থেকে পালা, সুলতানা নুরলহুডার ক্ষোভ—আগেই কেন তিনি তোকে মেরে ফেলবার হুকুম দেন নি। তিনি তার বাঁদীদের তোর খোঁজে পাঠিয়েছেন—যে তোকে জ্যান্ত অথবা মরা অবস্থায় তাঁর সামনে হাজির করতে পারবে তিনি তাকে একটা বড় সোনার তাল বকশিশ দেবেন, সুতরাং এখান থেকে তুই এক্ষুনি পালা। এরপর জাহানারা কি অবস্থায় আছে এবং সুলতানা কি শাস্তি তাকে দিতে যাচ্ছেন তা-ও বুড়ী হাসানকে খুলে বললে।

হাসান অমনি বলে উঠল—কিছছু ভয় নেই, চাচী, আল্লা আমার সহায়, তাঁর অশেষ দোয়া আমার উপর, তিনিই এই নিষ্ঠুর সুলতানার হাত থেকে তোমার আমার এবং জাহানারার মুক্তির উপায় করে দিয়েছেন, তাঁরই মেহেরবানিতে এই টুপিটা হাতে এসেছে আমার। এটা যাদুটুপি, এটা যে পরে কেউ আর তাকে দেখতে পায় না। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী সোল্লাসে বলে উঠল—আলাহমদুলিল্লা, (আল্লার জয় হোক) তিনি বোবাকে কথা বলাতে পারেন, খোঁড়াকে দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গাতে পারেন। তুই, বাবা, তা হলে আমার বাঁধন

আগে খুলে দে, আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে দেখাই কোথায় তোর জাহানারাকে কয়েদ করে রেখেছে।

হাসান তখনই বুড়ীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে টুপি পরে তার হাত ধরে নিয়ে চলল। যাদুটুপির গুণে তারা দুজনেই অদৃশ্য হয়ে চলতে লাগল। একটা জঘন্য কয়েদখানায় জাহানারাকে রাখা হয়েছে, বুড়ী হাসানকে সেখানে এনে হাজির করলে সে দেখে জাহানারাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে একটা মইয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আর বেচারা অতি করুণ স্বরে নিজের, স্বামীর এবং দুই পুত্রের জন্য বিলাপ করে কাঁদছে। হাসান বুঝলে এ অবস্থায় হঠাৎ ওর কাছে আত্মপ্রকাশ করা ঠিক হবে না, কিন্তু ওর ঐ অবস্থা দেখে ঐ কান্না শুনে সে নিজেই স্থির থাকতে না পেরে ঝপ করে টুপিটা খুলে ফেলে ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। জাহানারা যেই বুঝলে এ হাসান অমনি সে স্বামীর বুকে মাথা রেখে অজ্ঞান হয়ে গেল। হাসান তাকে বন্ধনমুক্ত করে তার মাথাটা নিজের জানুর উপর টেনে নিয়ে নিজের হাত দিয়েই বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ এমনি শুশ্রূষা করবার পর জাহানারা চোখ মেলে হাসানকে দেখেই বলে উঠল—কি করে এলে তুমি এখানে—আসমান থেকে নেমে, না পাতাল ফুঁড়ে! মালেক, নসিবকে কেউ এড়াতে পারে না, আমার নসিবে যা ঘটে ঘটুক তুমি যে পথে এসেছ সেই পথে আবার ফিরে যাও, আমার বোন নৃশংসের মত তোমাকেও নির্যাতন করবে এ আমি চাই না।

হাসান জাহানারার চোখে মুখে হাত বুলিয়ে বললে—সোনা, তুমি ভেবো না—তোমাকে বাগদাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।

জাহানারা ম্লান হাসি হেসে বললে—তুমি একটা আস্ত পাগল। আমার মাথা খাও—যা বলছি আমি তাই করো : এখান থেকে জলদি পালাও, পাগলামি করে আমার যন্ত্রণা বাড়িও না।

পাগলামি করছি না আমি, আমি যা বলছি তা বেশ বহাল তবিয়তে

সাফ মাথায়ই বলছি : তোমাকে, তুই ছেলেকে আর এখানে আমার এই পরমাত্মীয়া বুড়ী চাচীকে নিয়েই আমি বাগদাদে ফিরব। কি করে তা-ও এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি তোমায়। —এই বলে হাসান সেই টুপিটা পরে তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর আবার টুপিটা খুলে কি করে এই অদ্ভুত যাতুটুপিটা তার হাতে এল সে সব বৃত্তান্ত তাকে খুলে বলল : আল্লাই মেহেরবানি করে এই টুপিটা পাইয়ে দিলেন আমায়, আল্লাই আমার বল, আল্লাই ভরসা।

শুনে জাহানারার তুই চোখ জলে ভরে এল, কিছুটা আনন্দে, কিছুটা অনুশোচনায়। সে হাসানের হাত ধরে বললে—মালেক, এই সব অনর্থ আমার দোষেই ঘটেছে : আমি তোমার অনুমতি না নিয়ে আমাদের বাগদাদের বাড়ি ছেড়ে এসেছিলাম, আমায় তুমি বকো না, আমি এখন বুঝতে পারছি স্বামী কি বস্তু, আমার কসুরের জন্য আল্লার কাছে এবং তোমার কাছে মাফ চাইছি আমি। আসলে কি হয়েছিল জানো? ঐ পালকের পোশাকটা দেখা মাত্র মনটা আমার আর বশে ছিল না, আসমানে উড়বার জন্য আমি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।, তুমি আমার সকল কসুর মাফ করো মালেক, আল্লা মাফ করুন—এই বলে জাহানারা কাঁদতেই লাগল। হাসান পরম স্নেহে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে—তুমি কেঁদো না, জাহানারা কসুর তোমার নয়, কসুর আমার : তোমাকে বাগদাদে রেখে বোনেদের ওখানে আমার একা যাওয়া ঠিক হয় নি, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখন থেকে এ ভুল আর আমি করব না, কোথাও যেতে হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব—এই বলে হাসান জাহানারাকে পিঠে তুলে নিয়ে টুপিটা মাথায় পরলে তারপর বুড়ীর হাত ধরলে। এতে তিনজনই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর নুরলহুডার রাজ্য ছেড়ে এসে হাজির হল তারা সপ্তম দ্বীপে যেখানে জাহানারা তার তুটি ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছে। অনেক দিন পর নাসির আর মনসুরকে দেখে হাসানের পিতৃস্থানটা উদ্‌বেল হয়ে উঠলেও তাদের

সুলতানের কথা শুনে জহ্লাদ তাঁর পোশাকের প্রান্ত চুম্বন করে খুশী মনে তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

সুলতান মহম্মদের এই রকম ছিল বিচার।

সকলের কাজের হিসাব নিয়ে সুলতান তাঁর দরবার ভেঙে দিতে যাচ্ছেন এমন সময় তাঁর নজরে পড়ল অদূরে এক পলিত কেশ বৃদ্ধ বসে রয়েছে, তার কাজের হিসাব নেওয়া হয় নি। সুলতান তখন হাতের ইশারায় তাকে ডাকলেন। বৃদ্ধ সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে সুলতান তাকে—সে কি কাজ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

বৃদ্ধ বললে—জাহাঁপনা, আপনার বাপজান আমাকে একটা পেটরা রক্ষা করার ভার দিয়েছিলেন, আমি সেইটা রক্ষণা-বেক্ষণ করি, বেতন আমার মাসিক পাঁচ মোহর।

এই সামান্য কাজের জন্য ত এত বেতন হওয়া উচিত নয়। কি আছে তাতে?

তা ত, জাহাঁপনা আমি বলতে পারব না, চল্লিশ বছর ধরে আমি ওটা রক্ষণা-বেক্ষণ করছি, কিন্তু ওর মাঝে কি আছে তা আমি বলতে পারব না।

যাও, জলদি নিয়ে এস সেটা আমার কাছে, দেখি তার মধ্যে কি আছে।

বৃদ্ধ তখনই গিয়ে একটা নিরেট সোনার অপূর্ব কারুকার্য করা পেটরা নিয়ে হাজির হল সুলতানের সামনে, তারপর তাঁরই আদেশে সেটা খুললো। খুললে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে শুধু লালমাটির মত কি একটা জিনিস, আর একটা হরিণের চামড়া—তার উপরে জ্বলজ্বলে অক্ষরে কি সব লেখা। সুলতান তখনই পাণ্ডুলিপিটি হাতে তুলে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অনেক ভাষায় দখল তাঁর, তবু এ যে কি ভাষায় লেখা তা তিনি কিছু বুঝতেই পারলেন না। দরবারে উজির উলেমা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবারেই দেখালেন, তাঁদের কেউ-ই ওর পাঠ উদ্ধার করতে পারলেন না। সুলতান তখন মিশর, ইরান, সিরিয়া এমন কি হিন্দুস্থানের যত

বিখ্যাত শেখ আছেন সবাইকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন নিজের দরবারে, কেউই কিছু করে উঠতে পারলেন না। সুলতান শেষে দেশ বিদেশে প্রচার করে দিলেন—এই লেখা পড়তে পারে এমন একটা লোকের খবর যে এনে দিতে পারবে তিনি তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন।

এই ঘোষণার কয়েক দিন পর সাদা পাগড়ি পরা এক বৃদ্ধ সুলতানের সামনে হাজির হয়ে বললেন—জাহাঁপনা এই বান্দা আপনার বাপজান সুলতান থৈলুনের কর্মচারী ছিল, আপনার বাবার দেওয়া দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের নির্বাসনের মেয়াদ আজই তার শেষ হবার কথা। আপনার ঘোষণা শুনে আমি আপনাকে বলতে এলাম—এই হরিণের চামড়ার উপরকার পাণ্ডুলিপির যে মালিক অল্ আশারের বেটা—সেই শেখ হাসান আবহুল্লাই শুধু ওটা পড়তে পারে। আপনার বাপজানই তাকে এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন, জানি না সে এতদিন বেঁচে আছে, না আল্লার ডাকে তার কাছে চলে গিয়েছে।

সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—তাকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল কেন?

আপনার বাবা জোর করে ওটা তার কাছ থেকে নিয়ে জবরদস্তি করে ওটা পড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন, সে রাজী হয়নি—তাই।

সুলতান তখনই তাঁর দেহরক্ষীদলের নেতাকে হুকুম দিলেন শহরে যত কারাগার আছে তার সবগুলিতে খুঁজে দেখতে শেখ হাসান আবহুল্লা বেঁচে আছে কি না। আল্লার মর্জিতে কয়েকটায় খুঁজতেই আবহুল্লাকে জীবিতাবস্থায়ই পাওয়া গেল। রক্ষীদলের নেতা তখনই তাকে সম্মানের পোশাক পরিয়ে সুলতানের সামনে হাজির করলো। সুলতান দেখলেন লোকটা রীতিমত বুড়ো হয়ে গেছে, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কারাগারে থেকে শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে, সহৃদয় সজ্জন সুলতান নিজের আসন থেকে তাকে সম্মান দেখিয়ে বাপের অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে নিজের

পাশে বসিয়ে পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে দিয়ে বললেন—জনাব, যে জিনিস আমার নিজের নয়, তা আমি কোন কারণেই নিজের কাছে রাখতে চাই না, তুনিয়ার তামাম ধনরত্ন সম্পদের চাবিকাঠিও যদি তার ভেতরে থাকে, তবুও না।

শুনে হাসান আবহুল্লার তুই চোখ জলে ভরে এল, সে তুই হাত তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগল —সকল জ্ঞানের মূলাধার আল্লা, একই জমিনে তুমি বিষ আর ফুলের মধু ফলাও, তুমি ধন্য। যে সুলতান আমাকে বিনা দোষে চল্লিশ বছর ধরে কারাগারে পাঠিয়েছেন তাঁরই বেটা আজ আমাকে সসম্মানে কারামুক্ত করে সূর্যালোকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার সুযোগ দিচ্ছেন। তোমার মর্জি বুঝা ভার, লীলাখেলা বুঝা ভার!

এরপর বৃদ্ধ সুলতানের দিকে চেয়ে বললে, মালেক, আপনার বাপজানের জবরদস্তির কাছে নতি স্বীকার করিনি আমি, আপনার দরদের কাছে হার মানলাম। এখন থেকে এ পাণ্ডু-লিপি, এ পেটরা আপনার। এরজন্যে আমি বিশবার মরণের যন্ত্রণা সহ্য করেছি। তুনিয়ার সকল জ্ঞানের আদ্যন্ত রয়েছে এর মাঝে। তুনিয়ার আর কেউ কোনদিন পদার্পণ করতে পারেনি যেখানে সেই বহু স্তম্ভে গড়া ইরাম, সেই রহস্যময় নগর সাদ্দাদ্ ইবন্ আদ থেকে এনেছি এটা আমি।

শুনে খলিফা বৃদ্ধের কর চুম্বন করে বললেন—চাচা, এই পাণ্ডু-লিপি, বহু স্তম্ভেগড়া ইরাম আর সাদ্দাদ্ ইবন্ আদ—নগরের কথা, শুনতে যে আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে, মেহেরবানি করে একটু শুনান না! বৃদ্ধ তার উত্তরে বললে—মালেক, এই পাণ্ডুলিপির কাহিনী আমার নিজের জীবনেরই কাহিনী, চোখের নিভৃত কোণে সূঁচ দিয়ে লেখা থাকলেও হুঁসিয়ার লোকের শিক্ষা হবে। আচ্ছা সে কাহিনী বলছি আমি শুনুন—

আমার বাবা কায়রোর এক মান্যগণ্য ধনী বণিক ছিলেন। আমিই তাঁর একমাত্র ছেলে। আমার শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়

করতে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি, মিশরের সব নামকরা মৌলভী আর শেখকে তিনি আমার গৃহশিক্ষক করে দিয়েছিলেন, তাই বয়স যখন আমার মাত্র বিশ বছর তখনই আমার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি উলামার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় আমার বাপ মা তাঁদের নিজের সাধ মিটাতে অনেক দেখে শুনে পরমা সুন্দরী এক কুমারী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। বাড়িতে ঘটা করে খানা পিনা হল।

আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পেয়ারও হল খুব, সুতরাং বিয়ের পর খুব সুখেই দিন কাটতে লাগল আমাদের, কাটলো শুধু দু'চার দশ দিন নয়, পুরো দশ বছর।

নসিবের কথা কেউ বলতে পারে না, খোদাবন্দ, এরপর দুঃখ দুর্দশা যেন দল বেঁধে হুড়মুড় করে এসে পড়ল আমার ঘাড়ের উপর: বাপজান প্লেগে মারা গেলেন, আমাদের বড় বাড়িঘর গুদাম সব আগুন লেগে পুড়ে গেল, যে জাহাজগুলি আমাদের বিদেশে বাণিজ্যে বেরুত সেগুলি গেল ঝড়ে ডুবে। আমার অবস্থা হল মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে ফেলে দেওয়া শিশুর মত অসহায় নিরুপায়। একমাত্র আল্লা ছাড়া আশ্রয় অবলম্বন আর কিছু রইল না আমার। তাই আমি প্রায়ই মসজিদের চত্বরে গিয়ে বসে থাকতে লাগলাম—যদি কিছু ভিক্ষা মেলে। সেখানকার সাধুসন্তদের কথা শুনে তবু কিছু শান্তি পেতাম, তাঁরাই হয়ে উঠলেন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ভিক্ষা সব দিনই যে মিলত তা নয়। এমন দিনও গেছে যে কিছুই জোটে নি, সারাদিন না খেয়ে রাত্রে বিছানায় শুয়ে খিদের জ্বালায় ছটফট করেছি। এ সব দিনে নিজের কষ্ট যে কম হত তা নয় কিন্তু বেশি কষ্ট পেতাম আমি আমার বেচারা মা, স্ত্রী এবং বাচ্চাকাচ্চার দুর্দশার কথা ভেবে।

একদিন এমনি যখন কিছুই জোটাতে পারিনি, আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের কষ্ট দেখে আর থাকতে না পেরে চোখের জল

ফেলতে ফেলতে তার শেষ পোশাকটা এনে আমার হাতে দিয়ে বললে—এটা নিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করে বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যে কিছু আনো, ওদের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। সেটা হাতে করে বাজারের দিকে কিছুটা যেতেই দেখি লাল উটে চড়ে এক বেদুইন আসছে আমার দিকে।

আমাকে দেখেই বেদুইন তার উটকে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—সেলাম ভাই, ধনী বণিক আবদুল্লার বাড়িটা কোন দিকে আমায় একটু দেখিয়ে দিতে পার, বণিক অল্ আশারের বেটা তিনি। শুনে আমার দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে লজ্জায় মাথাটা নীচু হয়ে পড়ল, বললাম—না সাহেব, কায়রোয় এমন কোন লোকের নাম ত আমি শুনি নি! বলেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু পালানো আর আমার হল না, লোকটা তখনই তড়াক করে তার উট থেকে পথে নেমে আমার দুটি হাত ধরে তিরস্কারের সুরে বলে উঠল—ছি, ভাই, এটা কি উচিত হল তোমার? তুমি না বণিক অল্ আশারের বেটা শেখ হাসান আবদুল্লা? আল্লা তোমার বাড়িতে অতিথি পাঠিয়েছেন আর তাকে তুমি এমনি করে ফিরিয়ে দিতে চাও?

শুনে চোখে জল এসে গেল আমার। আমি মাফ চেয়ে তার করচুম্বন করতে যাচ্ছিলাম, সে তাতে বাধা দিয়ে আপন ভাইয়ের মত আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল। এরপর আমি তাকে নিজের বাড়ির দিকে নিয়ে চললাম।

বেদুইন উটটা হাঁটিয়ে নিয়ে আমার পাশে পাশে চলল, আমার বুকটা তখন খাক হয়ে যাচ্ছিল: নিয়ে ত যাচ্ছি, একে খেতে দেব কি। বাড়ি গিয়ে অতিথিকে বারান্দায় বসিয়ে ভিতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে সমস্ত ব্যাপার জানালে সে বললে—কি আর করা যায়, অতিথি এলেই বুঝতে হবে আল্লা পাঠিয়েছেন, যাও আমার এই পোশাকটা বিক্রি করেই যা পাও তাই দিয়ে ওর খাবার দাবার ব্যবস্থা কর, ওর খানাপিনার পর যদি কিছু বাঁচে তাই আমরা মুখে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনে আবার আমি বাজারে বেরুচ্ছিলাম, অতিথিকে বারান্দায় বসিয়ে রেখেছিলাম, তার পাশ দিয়ে যেতে গেলেই সে অমনি বলে উঠল—ও কি ভায়া, তোমার আচকানের আড়ালে কি লুকিয়ে নিয়ে চলেছ তুমি? হকচকিয়ে উঠে বললাম—ও কিছু না।

না, না, বলতেই হবে তোমায়, আল্লার দোহাই, বলো। দেখাও আমায়—ওটা কি।

দেখাতে গিয়ে মুখ রাঙা হয়ে উঠলো আমার, বললাম—আমার স্ত্রীর পোশাক এটা, আমার এক প্রতিবেশীর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, ভালো রিপু করতে পারে সে।

বেদুইন বললেন—আল্লা আমার আঁখ দিয়েছেন, ঘটে কিছু বুদ্ধিও দিয়েছেন: অতিথি সৎকারের তাগিদে তুমি ওটা বিক্রী করতে যাচ্ছ। না, না, তা হতে দেব না আমি। এই, এই দশটি দিনার দিচ্ছি তোমায় এই দিয়ে বাজারে গিয়ে তোমাদের সকলের জন্য যা কিছু দরকার কিনে নিয়ে এস। আমার হাত ধরে এমন করে বললে বেদুইন যে আমি আর তার এ দান প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।। খোদার দোওয়ায় অনেক দিন পর সেদিন আমরা একটু ভালো করে খাওয়া দাওয়া করলাম।

এরপর দু'হপ্তা ধরে প্রতিদিনই বেদুইন আমার হাতে দশ দিনার করে গুঁজে দিতে লাগল, মনে মনে আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমিও তা সকলের ভাল খানাপিনার জন্য ব্যয় করতে লাগলাম।

ষোল দিনের দিন সকালে বেদুইন আমায় হঠাৎ বলে বসলো—হাসান, তুমি নিজেকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও না!

আমি বললাম—আপনি ত আমায় কিনে নিয়েছেন, আপনার বান্দাই ত আমি হয়ে গেছি, আমি নিজে এবং আমার যা কিছু আছে সবই আপনার।

ও সব বাজে কথা রাখো, সত্যিই আমি বলছি, নিজেকে তুমি বিক্রি করতে রাজী আছ? কোন দাঁও মারতে চাই না আমি, তোমার দাম তুমি নিজেই ঠিক করে দেবে—ইমানসে।

বেদুইন তামাসা করছে মনে করে মৃদুহেসে বললাম—বেশ, পনের শো দিনারই দেবেন আপনি।

আমার কথা শুনে বেদুইনকে একটুও হাসতে দেখলাম না, সে অমনি বলে উঠলো—বেশ, অসুবিধা হবে না আমার, আমার অমত নেই।…তা হলে তুমি রাজী—বলো, আমি দেড় হাজার দিনার গুনে দি।

এবার ওর কথা শুনে বুঝলাম ও ঠাট্টা করছে না, সত্যিই বলছে। মনটা বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল: আল্লা আমার বাচ্চাকাচ্চাদের বাঁচানোর জন্যেই এই বেদুইনকে আমার ঘরে পাঠিয়েছেন, ওকে বললাম—হ্যাঁ, আমি রাজী, কিন্তু আপনাকে পুরো কথা দেবার আগে আমার বাড়ীর লোকদের সঙ্গে একবার আলোচনা করে নেবার জন্যে কিছু সময় চাই।

বেশ, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যখন খুশী আমায় বলো—এই বলে বেদুইন তার নিজের কাজে চলে গেল।

আমি বাড়ির ভিতরে এসে কথাটা মা-বউকে বললে তারা বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করল: এ আল্লা, এ কি কথা শোনায় এ, দুশমন এই বেদুইনটা, ও একে মেরে ফেলতে চায়! আমার ছেলে পিলে সব ব্যাপারটা পুরো না বুঝেও আমার জামাকাপড় ধরে কাঁদতে শুরু করলে। বউটার ঘটে আল্লা কিছু বুদ্ধি দিয়েছেন। একটু পরে সে কান্না থামিয়ে এসে বললে—আমার মনে হচ্ছে তুমি যদি রাজী না হও, তা হলে ও এ কয়দিন যত দিনার খরচ করেছে তা ফেরত চাইবে, তুমি এক কাজ করো যে বাড়িটায় আমরা এখন আছি ওটা বিক্রি করে ওর দেনা শোধ দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হও। তারপরেই তার মনে হল—ছেলেপিলেগুলি তা হলে তার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে, তাই তাদের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে লাগল। দেখেই আমি আরও দিশেহারা হয়ে পড়লাম। তারপরেই আমার মনে হতে লাগল, আল্লা যখন আমায় সুযোগ দিচ্ছেন তখন তা আমার প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, ছেলেপিলেগুলি অন্তত কিছু খেতে পাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এই বা কিনতে চায় কেন, কি করবে সে আমায় দিয়ে?

এমন কোন কাজ করাতে চায় কি—যাতে তখনই না হলেও ধীরে ধীরে আমার মৃত্যু এগিয়ে আসে ?

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে নিজেকে আমি বিক্রি করে দেওয়াই সাব্যস্ত করলাম। সন্ধ্যাকালে বেদুইন ফিরে এলে হাসিমুখে আমি তাকে বললাম—জনাব আমি রাজী।

বেদুইন শুনে খুশী হয়ে তখনই তার জেব থেকে দেড় হাজার দিনার আমার হাতে গুনে দিয়ে বললে—আল্লাকে ধন্যবাদ দাও, এতে তোমার ভালই হল। ভয় পাবার কিছু তোমার নেই, তোমাকে কিনে নিলাম বটে, কিন্তু এতে তোমার জীবনহানিও হবে না, স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হবে না, তুমি যেমন মুক্ত ছিলে তেমনি মুক্তই রয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিনলাম তার কারণ, দীর্ঘদিন ধরে অনেক দূর দেশ সফর করতে চাই আমি, তাই আমি একজন বিশ্বস্ত এবং মনের মত সঙ্গী চাই। আমাদের পয়গম্বর ত বলেছেনই—সঙ্গীই হচ্ছে পথের বল ভরসা।

আমি খুশী মনে পনের শো দিনার হাতে নিয়ে আমার মা আর বউ যে মাদুরটার উপর বসে ছিল তার উপর রাখলাম। তারা ওগুলি দেখেই মাথার চুল ছিঁড়ে বুক চাপড়ে এমন কান্না শুরু করে দিল যেন আমায় কবর দেওয়া হয়ে গেল। ঐ অবস্থায়ই তারা বলতে লাগল—তোমার জীবন বিক্রি-করা ও দিনার ছোঁব না আমরা, কিছুতেই না, আমরা না খেয়ে মরে যাই, তবুও না। মানুষ বিক্রি করা দিনার, ও ত দিনার নয়, ও খুন।

তখন আর কোন কথায় কাজ হবে না বুঝে আমি ওদের সামনে থেকে চলে গেলাম, একটু শান্ত হলে ফিরে এসে বললাম—বড্ড ভুল বুঝেছ তোমরা, বেদুইন অতি মহান, তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম—খারাপ অভিসন্ধি একটুও তার নেই, আমার দুঃখ দুর্দশা দেখে ও টাকা এক রকম খয়রাত করল তোমরা বলতে পার।

আমার এ কথায় অনেকটা কাজ হল, মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হয়েছে দেখলাম। সেই সুযোগে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলে-

মেয়েদের চুমু দিয়ে ভারাক্রান্ত দিল নিয়ে বেছুইনের কাছে এসে হাজির হলাম।

বেছুইন আমাকে নিয়ে বাজারে এসে প্রথমেই আমার জন্যে খুব দ্রুত ছুটতে পারে এমন একটা উট কিনলে, তারপর দীর্ঘ সফরের উপযোগী খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে থলেয় ভরলে। কেনাকাটা গোছানো শেষ হলে আমি বেছুইনকে উটে উঠতে সাহায্য করবার পর নিজের উটে চড়ে তুইজনে এক সঙ্গে আল্লার নাম করে যাত্রা করলাম।

কিছুক্ষণ পরই আমরা এমন এক মরুভূমির মাঝে এসে পড়লাম যেখানে জনমুনিষ্যির চিহ্ন ত নেইই—এমন কি একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কোন কিছু নেই! যে দিকেই চোখে পড়ে কেবল বালু আর বালু। আমার বেছুইন মনিব এরই মাঝ দিয়ে আমায় নিয়ে চললো কোথায় সেই জানে। অগ্নিবর্ষী সূর্যকিরণ সয়ে দশ দিন চলার পর আমরা সবুজ গাছপালা আর তৃণশস্যে ভরা এক বিশাল সমতলে এসে হাজির হলাম। ঐ সমতলের ঠিক মধ্যি-খানে মস্ত উঁচু এক গ্রানিটের স্তম্ভ, স্তম্ভের উপরে তামা দিয়ে তৈরি এক যুবকের মূর্তি, মূর্তির দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত, এবং ঐ প্রসারিত হাতের প্রতি আঙুলে একটি করে চাবি ঝুলছে, প্রথম চাবিটি সোনার দ্বিতীয়টি রূপোর, তৃতীয়টি চীনে তামা দিয়ে তৈরি, চতুর্থটি লোহার এবং পঞ্চমটি হচ্ছে সীসের। মালেক, এর একটি চাবিও সাধারণ চাবি নয়, প্রত্যেকটারই যাতুগুণ আছে। এগুলিকে নসিবের চাবিও বলা যায়, কারণ এর প্রত্যেকটা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে ঃ সোনারটা যে নেবে তার কপালে কেবলি তুঃখ, রূপোরটা কাছে থাকলে ভোগ করবে নানা যন্ত্রণা, চীনে তামারটা দেবে মৃত্যু, লোহার চাবি দেবে বিজয় আর গৌরব, আর সীসেরটা যার কাছে থাকবে সে সুখ শান্তি আর জ্ঞানের অধিকারী হবে। খোদাবন্দ, এ সব কিছুই আমার আগে জানা ছিল না, তাই জীবনে আমার এত তুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হল। এখন আর অবশ্য এ নিয়ে আমার

কোন আফসোস নেই, ভাবি—জীবনের সুখ দুঃখ সবই খোদার দান, যা দেন তিনি তাই মাথা পেতে নেওয়া উচিত।

এখন এই স্তম্ভের সামনে এসে বেদুইন তার উট থেকে নামলে, তার দেখাদেখি আমিও নামলাম। এরপর ও ওর আনা জিনিসপত্রের ভিতর থেকে একটা ধনুক আর কয়েকটা তীর বের করে, একটা তীর ধনুকের ছিলাতে লাগিয়ে স্তম্ভের উপরকার ঐ তামার মূর্তিটির দিকে ছুড়লে। তীরটা কিন্তু মূর্তিটার অতদূর উঠতে পারল না। ওর হাতেই অত জোর ছিল না—না, ও ইচ্ছে করেই না পারার ভান করলে তা খোদারই মালুম। ও তখন আমার দিকে ফিরে বললে—হাসান, তুমি আমার একটা উপকার করে তার মূল্যে তোমার মুক্তি কিনে নাও ঃ এই ধনু আর তীরগুলো নিয়ে একে একে তুমি আমায় ঐ মূর্তির হাতের চাবিগুলি পেড়ে দাও।

মুক্তি পাবার আশায় সানন্দে সেই ধনুক আর তীরগুলো হাতে তুলে নিলাম। ধনুকটা দেখলাম বেশ জোরালো, হিন্দুস্থানে তৈরি। ছেলেবেলায় তীরের হাত আমার বেশ ভালই ছিল, তা ছাড়া আমার তখন যৌবনকাল, আর মনে বেদুইনের কাছে তারিফ পাবার আকাঙ্ক্ষা, তাই একটা লক্ষ্যও আমার ভ্রষ্ট হল না, ধনুকে তীর লাগিয়ে প্রথমেই পেড়ে ফেললাম আমি সোনার চাবিটা। কৃতিত্বের গর্বে স্ফীত হয়ে আমি তখনই ওটা মাটি থেকে কুড়িয়ে বেদুইনের হাতে দিতে গেলাম। সে ওটা না নিয়ে বললে—না, ওটা তুমিই রাখো, তোমার ওস্তাদির বকশিশ। তার কথামত আমি ওটা নিয়ে জামার জেবের ভেতর রাখলাম। তখন আমার জানা ছিল না যে এটা নসিবে দুঃখ আনার চাবি।

দ্বিতীয় বার তীর ছুড়ে পাড়লাম আমি রূপোর চাবিটা। সেটাও বেদুইন মিষ্টি কথা বলে আমায় দিয়ে দিলে, আমি সযত্নে সেটা আচকানের জেবে সোনার চাবিটার পাশে রেখে দিলাম। জানলাম না আমার নসিবে যন্ত্রণার ব্যবস্থা করে রাখলাম আমি।

এর পরের দুটো তীর ছুড়ে পাড়লাম আমি লোহা আর সীসের

চাবি। চাবি দুটো মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেদুইন বাচ্চা ছেলের মত সে দুটো লুফে নিয়ে আমায় বললে—ধন্যি মায়ের পেটে জন্মেছিলে তুমি হাসান, ধন্যি ওস্তাদের কাছে শেখা তোমার তীর ছোড়া। এখন থেকেই মুক্তি দিলাম তোমায় আমি। অপ্রত্যাশিত ভাবে মুক্তি পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে আমি ওর কর চুম্বন করতে যাচ্ছিলাম, ও তাতে বাধা দিয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল।

ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আর একটা তীর ধনুকে জুড়ে যেই আমি চীনে তামার চাবিটার দিকে ছুড়তে যাব অমনি আমার ধনুক ধরা হাতে জব্বর এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল—আরে, আরে, করো কি, থামো ওটা আর পাড়তে হবে না। ওর ঐ মোক্ষম ঝাঁকুনিতে তীরটা আমার হাত থেকে ফসকে আমার বাঁ পায়ে পড়ায় পা'টা বেশ খানিকটা জখম হয়ে গেল। এই আমার দুর্গতির শুরু।

বেদুইন আমার আহত স্থানটায় কোন রকমে একটা কাপড়ের পটি বেঁধে আমাকে উটের পিঠে চড়িয়ে দিলে, নিজে চড়লে তার উটটায়, তারপর আবার যাত্রা শুরু হল। তিন দিন পথ চলার পর আমরা এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলাম যেখানে লোক নেই বটে তবে অনেক গাছ—ফলের গাছ আর কি অপরূপ সে সব গাছের ফল, যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি তাদের ঘ্রাণ। সামনে পড়লে নির্লোভ পীরেরও খাবার দরকার না থাকলেও একবার খেতে ইচ্ছে করবে! পায়ের যন্ত্রণায় আমি কাতর, তাতে খিদে তেষ্টা পেয়েছিল খুব, সামনেই এমন এমন লোভনীয় ফল দেখতে পেয়ে কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি গাছের কাছে গিয়ে ওর সোনালি লালচে একটা ফল পেড়ে মুখে দিয়ে যেই তাতে কামড় বসিয়েছি অমনি দাঁতগুলি আমার তাতে আটকে গেল, ওগুলি উঠিয়ে যে আর একটা কামড় দেব—সে সাধ্য আর আমার রইল না। দারুণ মুশকিলে পড়ে গেলাম আমি, মনে হতে লাগল কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছে, এখনি মরে যাব আমি। সাহায্যের জন্য বেদুইনকে ডাকতে গেলাম আমি, কিন্তু অস্পষ্ট ফিসফিসানির মত

এক আওয়াজ ছাড়া কোন কথা বেরোয় না আমার মুখ থেকে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পাগলের মত আমার হাত আর খোঁড়া পা ছুড়তে লাগলাম। চোখদুটো যেন আমার ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। এই অবস্থায়ই মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম আমি।

বেদুইন একটু দূরে ছিল, আমায় ঐ রকম করতে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে কাছে এসে যখন যন্ত্রণার কারণটা ধরতে পারল তখন সে নিজেই আমার মুখের ভেতর হাত দিয়ে ফলটা ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এতে ফল ত কিছু হলই না, বরং দাঁতগুলি ফলের উপর আরও কিছুটা বসে গিয়ে আমার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে তুললো। সে তখন অবস্থা বুঝে আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি যে ধরনের ফল মুখে পুরেছিলাম গাছের নীচে মাটিতে পড়ে থাকা সেই ধরনের ফল কিছু কুড়ুতে শুরু করল।

অনেকগুলো কুড়ানো হলে, সেগুলি বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে মাত্র একটি রেখে আর সবগুলো ছুড়ে ফেলে দিল। এরপর আমার কাছে এসে ঐ ফলটা আমার চোখের সামনে ধরে বললে—হাসান আবদুল্লা, ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত এই ফলটা। এর মাঝে অসংখ্য যে খুদে খুদে পোকা দেখছ—একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে থাকলে এরাই তোমার এ দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারে। এগুলি তোমার মুখের ভিতরকার ঐ ফলের উপর ছেড়ে দিলে ওরা ওটা খেয়ে দিন তিনেকের মধ্যেই তোমায় যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দেবে। এ ছাড়া আর এ রোগের ওষুধ নেই। অভিজ্ঞ লোক বেদুইন, সুতরাং হক কথাই বলছে সে, এই ভেবে তাকে বললাম—তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। কথা স্পষ্ট বেরুচ্ছিল না মুখ দিয়ে সুতরাং কিছুটা আকার ইঙ্গিতেই বলতে হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার এ-ও মনে হতে লাগল, তিনদিন ধরে এ যন্ত্রণা সহার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

বেদুইন একটা গাছের ছায়ায় আমার পাশে বসে দেখতে লাগল পোকাগুলো তাদের কাজ শুরু করেছে কি না, যখন

বুঝলে যে করেছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে তার খাবার থলির ভিতর থেকে খেজুর আর রুটি বের করে খেতে লাগল। খেতে খেতেই সে আমাকে বললে—দেখ ত হাসান, তোমার লোভের জন্যে কি কাণ্ডটা না হল, কাজ কত পিছিয়ে গেল আমার, তা ছাড়া তুমিও যন্ত্রণা পেলে। যাক এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই, বড় কাজে একটু আধটু বাধা অমন এসেই থাকে। তুমিও ভেবো না, একটু ধৈর্য ধরে থাকো সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর সে আমাকে ঘুমাতে বলে সে-ও ঘুমের উদ্যোগ করলে।

সেদিন এবং তারপরের দিন দারুণ কষ্টে কাটল আমার, একে পায়ের যন্ত্রণা, তার উপর আবার মাড়ির। এ ছাড়া খিদেয় নাড়ি জ্বলে যাচ্ছিল, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। আমার মনিব আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল—এই ত হয়ে গেল পোকা গুলো ত প্রায় সাবাড় করে এনেছে ফলটা। ওর এই সান্ত্বনার জন্যেই মাথাটা কোন রকমে ঠিক রাখতে পেরেছিলাম আমি, নইলে ঠিক বিগড়ে যেত।

তিনদিনের দিন ভোরে উঠেই দেখি মাড়িটা অনেকটা ছেড়েছে, আমি তখন ঐ উদ্ভট ফলটার অবশিষ্ট অংশ থুঃ করে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলাম। এর পরেই কিছু খেতে গিয়েই দেখি আমার খাবার থলি এবং জলের পাত্র একেবারে ঢু ঢু। বুঝলাম আমার এই দুইদিন উপোসের সময় বেদুইন সব সাবাড় করে দিয়েছে। ভীষণ রাগ হল আমার, বেদুইনকে যা তা বলে গালাগালি দিলাম, কিন্তু ও একটুও না রেগে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে—তুমি এমন কেন বলো ত, তুমি কি চাও আমি না খেয়ে মারা যাই—আল্লা ভরসা করে খাবার দাবার কিছু খোঁজ—দেখবে ঠিক মিলে যাবে।

জান বাঁচানোর তাগিদে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই বেরুলাম খাবারের খোঁজেঃ ফল আর জল যদি কিছু মেলে। ফল যা মিলল সে সবই ঐ ধরনের সুতরাং তা আর মুখে দেওয়া চলল

না, একটা পাহাড়ের ফাটল থেকে চুইয়ে-পড়া একটা শীর্ণ জলের ধারা পেয়ে অতি কষ্টে তা থেকে কিছু জল সংগ্রহ করে আকণ্ঠ পান করলাম।

তেষ্টা মিটল, পেটটাও ভারী হল জলে, এরপর আমি আবার আমার উটের পিঠে চড়লাম। বেদুইন তখন তার লাল উটে চড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। আমার উট ওকে ধরবে বলে বেশ একটু জোরে চলতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটে আরম্ভ হল অসহ্য যন্ত্রণা। সে বেদনা সহ্য করতে না পেরে আমি—ও আল্লা, ও মা আমি গেছি, বলে চীৎকার করতে লাগলাম। এদিকে উটের গতিবেগ একটু শ্লথ করতে চেষ্টা করেও পেরে উঠলাম না, সে লম্বা লম্বা পা ফেলে তার সাথীকে ধরবেই। এতে পেটের ব্যথা আমার এত বেড়ে গেল যে আমি চীৎকার করে শুধু উটকে নয়, আমার নিজেকেও নয়, সারা ছুনিয়াকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। আমার চীৎকার শুনে বেদুইন তার উট ফিরিয়ে নিয়ে এল আমার কাছে। ও আমাকে হাত ধরে উট থেকে নামাতেই আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লাম।

সারা দিনমান আমার এই অবস্থায়ই কাটলো, সন্ধ্যার সময় সংজ্ঞা ফেরে আমার—তৎক্ষণাৎ উটে চড়ে আবার আমি আমার মনিবের সঙ্গে মরুপথে যাত্রা করলাম। পরদিন সূর্যাস্তের সময় একটা উঁচু পাহাড়ের সামনে এসে আমরা থামলাম। আমার মনিব বললে—আল্লার দোয়ায় আজ আর আমাদের অনাহারে থাকতে হবে না। নানা দেশ ভ্রমণ করে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে স্বাদু বলকারক খাদ্য আমি এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারব অথচ তোমাকে খাবার মত কিছু আনতে বললে—নিয়ে আসবে নিশ্চয়ই কোন বিষাক্ত লতাপাতা বা ফল।

এই বলেই বেদুইন একখানা ছুরি হাতে একটা ঝোপের কাছে গেল। ওখানকার গাছগুলির যে পাতা তা বেশ চওড়া এবং

দস্তুর মত শাঁসালো, ঐ শাঁসালো পাতার গায়ে আবার শাঁসালো ডাঁটার মত বেশ বড় বড় কাঁটা। বেদুইন তার ছুরি দিয়ে ঐ ডাঁটার মত কাঁটা কেটে এক চুপড়ি ভরতি করে নিয়ে এল। তারপর সেগুলির বাকল ছাড়ালে বেরুল হলদে রঙের শাঁস। সবগুলি ছাড়ানো হয়ে গেলে, সে বললে—নাও, এখন যত ইচ্ছে খাও, কোনও অসুখ করবে না, খেতেও ভালো।

খিদে পেয়েছিল খুব সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করে ঐ শাঁসের যতটা পারলাম খেয়ে ফেললাম, খাবার সময় মনে হতে লাগল যেন আপেল খাচ্ছি।

পথশ্রমে যে কষ্ট পেয়েছি, অনাহারে যে কষ্ট পেয়েছি, আজ ভরপেট খেয়ে প্রাণভরে ঘুমুতে পারব—এই আশায় বিগত সকল কষ্টের কথা ভুলে গেলাম। কতকাল যে একটু আরামে ঘুমুতে পাই না!

আমি যখন মনে মনে এই রকম ভাবছি ঠিক সেই সময় আমার মনিব বেদুইন বলে উঠল—আবদুল্লা তুমি কেমন কৃতজ্ঞ তার পরিচয় পাব আজ। একটা কাজের ভার দিচ্ছি তোমায়- এই পাহাড়টার চূড়ায় উঠবে তুমি, উঠে পরের দিন সুর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওখানে। সূর্যের কিনারা দেখা দিলেই পূর্বের দিকে চেয়ে ভোরের নমাজ পড়েই তোমার নেমে আসা চলবে। সাবধান রাত্রে যেন ঘুমিয়ে পড়ো না, ঘুমিয়ে পড়লেই ওখানকার বিষাক্ত হাওয়া তোমার শরীরটাকে চিরকালের মত জখম করে দেবে।

ক্লান্তি এবং শারীরিক যন্ত্রণার জন্য তখন আমার নড়ে বসবার শক্তি ছিল না, আর বেদুইনের এ অদ্ভুত খেয়াল মেটানো বা আবদার রাখার কোন মানে হয় না তা-ও বুঝছিলাম তবু সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল এই বেদুইনের অযাচিত দানেই আমি আমার মা-বউ বাচ্চাকাচ্চার প্রাণরক্ষা করতে পেরেছি, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহত পা নিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে অতি

কষ্টে আমি সেই পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। উপরে উঠে দেখি পাহাড়ের চূড়া একবারে নেড়া, সামান্য আশ্রয় দেবার মতও গাছপালা কি কোন কিছু নেই। তা ছাড়া শোঁ শোঁ করে ভীষণ বাতাস বইছে সেখানে। ওখানে উঠে ক্লান্ত দেহ আমার আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সুতরাং হাজার চেষ্টা করেও বসে থাকতে পারলাম না, নেড়া পাহাড়ের উপরেই বাহুতে মাথা রেখে আমি শুয়ে পড়লাম, এবং শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। সে ঘুম ভাঙলো আমার একেবারে ভোরে সূর্য যখন উঠব উঠব করছে। মনিবের কথামত নমাজের জন্য উঠে দাঁড়াতে গেলাম আমি, কিন্তু দাঁড়াব কি, উঠে বসতেই আমি পারলাম না। পা দুটি ফুলে হয়েছে তখন হাতীর পায়ের মত, হাতদুটি কলা গাছ, পেট হয়েছে একটা জলভরা মশকের মত, মাথাটা যেন একটা সীসের নিরেট গোলক, আমার দুই কাঁধ তার ভার সইতে পারছে না। তা ছাড়া সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। মনিবের কথা রাখতে প্রবল ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় কোন রকমে দেহটা আমি খাড়া করে তুলে পুবের দিকে চেয়ে ভোরের নমাজটা সেরে নিলাম। ঐ সময় আমার বিকৃত দেহের ছায়া পড়ল পশ্চিমে। এরপর পাহাড় থেকে নামবার পালা।

নামতে গেলাম কিন্তু শরীরটা এত দুর্বল আর পাহাড়টা এত ঢালু যে আমার সেই গোদার মত পায়ে এক কদম চলতে গিয়েই হড়কে দু'কদম হয়ে গেল, তারপর নিজেকে আর সামলে রাখতে না পারায় দেহটা আমার সেই ঢালু পাহাড়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। গতিবেগ সামলানোর জন্যে সামনে যা পাচ্ছিলাম তাই ধরতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেহের গুরু ভারে আমি পেরে উঠছিলাম না, পাথর আর কাঁটা ঝোপে আমার পোশাকের সঙ্গে দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল, আমার নামবার পথ আমার দেহের রক্তে রাঙা হয়ে উঠতে লাগল।

এমনি করেই এক সময় আমি আমার মনিবের পায়ের কাছে কাতর আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়লাম।

বেদুইন কিন্তু আমাকে দেখতেই পেলে না। দেখবে কি, সে তখন অতি নিবিষ্ট মনে বালুর উপর দাগ কেটে কি গণনা করছে! সে এতে এতই মশগুল হয়ে ছিল যে আমার বিলম্বিত আর্তনাদে যখন সে আমার উপস্থিতি বুঝতে পারল তখনও সে আমার দিকে না চেয়েই বলে উঠল—আল্লার জয়ধ্বনি করো, শুভক্ষণে তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। তোমার নসিবেই আমাদের সকল প্রয়াস সার্থক হবে। নমাজ করবার সময় তোমার যে ছায়া পড়েছিল সেটা আমার মাপা হয়ে গেছে। বহু বছর ধরে যা আমি খুঁজে ফিরছি তার আমি হদিস পেয়ে গেছি।

গণনা করতে মাথা নীচু করে ছিল সে, সে মাথা না তুলেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে যেতে লাগল—এস, আর দেরি নয়, আমার সঙ্গে মাটি খুঁড়তে লেগে যাও, এই যে এই জায়গাটা, আমি আমার বর্শা পুঁতে নিশানা করে রেখেছি।

এরপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমি যখন তার কথার জবাব দিলাম তখন তার টনক নড়ল। সে যখন দেখলে একটা শোচনীয় মাংস পিণ্ডের মত বালুর উপর পড়ে থেকে কাতরাচ্ছি আমি তখন সে আমার কাছে ছুটে এসে বললে—এ হাসান আবদুল্লা, তুমি করেছ কি! আমার কথা না শুনে নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছিলে তুমি, ওখানকার বিষাক্ত বাতাসে তাই তোমার এই দশা হয়েছে, ছি, ছি, ছি।

এই বলবার সময় বেদুইনের মুখের ভঙ্গী এবং গলার সুর শুনে বুঝলাম, আমার উপর বেশ রাগ হয়েছে তার, কিন্তু যখন সে দেখল যন্ত্রণায় আমার দাঁতে দাঁত লেগে খটাখট শব্দ হচ্ছে, তখন মনটা তার একটু নরম হল। সে তখন আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি এ ব্যথার আরাম করে দিচ্ছি। এই বলেই সে তার কোমরবন্ধ থেকে সুতীক্ষ্ণ ফলা-

ওয়ালা একখানা ছুরি বের করে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমার অক্ষম হাতের সকল বাধা অগ্রাহ্য করে আমার পেট, বাহু, উরু এবং পায়ের অনেক জায়গা আচ্ছা করে চিরে দিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জল বেরিয়ে গেল আমার দেহ থেকে এবং আমার শরীরটা দেখাতে লাগল যেন একটা জলশূন্য মশক। একটা মোটা মানুষের জামা একটা রোগা লোকে পরলে যেমন হয় আমার হাড়ের উপর আমার গায়ের চামড়া তেমনি ঢলঢল করতে লাগল। আমার যন্ত্রণার কিন্তু অনেক উপশম হল এতে। আমি উঠে দাঁড়াতে পারলাম, শুধু তাই নয়, আমার মনিবের সেই জায়গাটা খোঁড়ার কাজেও আমি তাকে সাহায্য করতে পারলাম।

বর্শার ফলা দিয়ে নিশানা-করা জায়গাটা আমরা দুইজনে মিলে খুঁড়তে থাকলে কিছুক্ষণ পরেই আমরা একটা শ্বেতপাথরে গাঁথা সমাধি দেখতে পেলাম। বেতুইন ওটা দেখামাত্র ওর ঢাকনা তুলে ফেললে, ভিতরে মানুষের হাড়গোড়ের পাশে রয়েছে দেখলাম হরিণের চামড়ার উপর উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি। মালেক, আপনি যেটা এখন হাতে ধরে রয়েছেন।

পাণ্ডুলিপিটা নজরে পড়বামাত্র বেতুইন কম্পিত হস্তে সেটা তুলে নিয়ে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল। ওটা যে কি ভাষায় লেখা তা সে ছাড়া আমাদের আর কারো বুঝবার সাধ্য নেই। ঐ পাণ্ডুলিপির পাতার পর পাতা যখন সে উল্টে যেতে লাগল তখন দেখি তার ফ্যাকাশে মুখ আনন্দে রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখ করছে জ্বলজ্বল। মনের আবেগ আর চেপে রাখতে না পেরে শেষে সে আমার উদ্দেশ্যেই বলে উঠল—ও হাসান আবদুল্লা, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি আমি সেই রহস্য নগরীর সন্ধান, শীগগিরই আমরা সেই বহু স্তম্ভে গড়া ইরামে হাজির হতে পারব, এর আগে কোন মানুষ সেখানে যেতে পারেনি। সেখানে গেলেই দুনিয়ার তামাম সোনাদানা জহরের মূলবীজ যে লোহিত

চূর্ণ তার সন্ধান পেয়ে যাব আমরা, কি আনন্দ, কি আনন্দ, আবদুল্লা, তুমি আমার সঙ্গে আনন্দ করো!

ও বললে বটে আনন্দ করো, কিন্তু ওখান থেকে আবারও কোথায় যেতে হবে শুনে আমি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—জনাব, এবার তোমার বান্দাকে মাফ করতে হবে, সোনাদানা ধনরত্নের আর কোন স্বাদ নেই তার কাছে, পথের এই সব কষ্ট সহ্য করে বহুস্তম্ভে গড়া ইরামে যাওয়ার চেয়ে কায়রোয় নিজের বাড়িতে গরিব হয়ে স্বস্তিতে থাকতেই সে ভালবাসে।

আমার কথা শুনে বেদুইন আমার দিকে কৃপার চক্ষে চেয়ে বললে—আরে বুদ্ধু, আমি যে এত সব করতে বেরিয়েছি, সে কি শুধু আমার জন্যে, তোমার জন্যে কিছু নয়?

সে কথা ঠিকই জনাব, কিন্তু সে সবের যত দুঃখ কষ্ট দুর্গতি, তা ত দেখছি আমারই ভোগ করতে হচ্ছে।

বেদুইন আমার এ সব কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে যে গাছের পাতার কাঁটার স্বাদ সেই আপেলের মত, প্রচুর পরিমাণে তাই সংগ্রহ করে খাবারের থলিতে পুরে তার উটের পিঠে উঠল, বাধ্য হয়ে আমাকেও তাই করতে হল।

পাহাড়টার কিনারা ঘুরে আমরা পশ্চিম দিকে আমাদের উট চালালাম। তিন দিন তিন রাত্রি চলবার পর চার দিনের দিন ভোরে নজরে পড়ল আমাদের সামনে সুদূর চক্রবাল রেখায় কি যেন ঝকমক করছে, প্রতিফলিত সূর্য কিরণকে ফিরিয়ে দেবার মত ওখানে যেন একটা বিরাট আয়না রয়েছে। আর একটু এগিয়ে যাবার পর দেখি একটা পারার নদী আমাদের গতিপথ রুদ্ধ করে বয়ে চলেছে! ঐ নদীর উপরে একটা স্ফটিকে তৈরি সেতু, কিন্তু সেটা এত সংকীর্ণ, পালিশের জন্য এত পেছল, এত খাড়া যে একমাত্র পাগল ছাড়া আর কেউ এর উপর দিয়ে ঐ নদী পার হতে সাহস করবে না, তবুও যদি দু'ধারের এক ধারে হাতে ধরবার মত কিছু থাকত!

কিন্তু আমার মনিবের এখানে এসেও কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব করতে দেখলাম না, সে নিজে উট থেকে নেমে আমাকেও নামতে বললে, তারপর উটের সাজ খুলে ফেলে তাদের স্বেচ্ছামত চরতে দিয়ে একটা থলির ভিতর থেকে দু'জোড়া পশমের জুতো বের করলে, তার একজোড়া নিজে পরে আর এক জোড়া আমাকে পরতে বললে। জুতো পরা হয়ে গেলে সে আমাকে বললে—ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে আমার ঠিক পিছু পিছু আসবে, এই বলেই সে পা টিপে টিপে সেই স্ফটিকের সেতুর উপর দিয়ে চলতে শুরু করলে। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক রকম নিশিতে পাওয়ার মত তার পিছু চলতে লাগলাম, কি করে যে কি হল তা এখনও বুঝতে পারি না, এক সময় দেখি আমরা নদীর অপর পারে এসে গেছি। নিতান্ত আল্লার দোয়া ছাড়া আর কি!

এরপর কয়েক ঘণ্টা নীরবে সামনে এগিয়ে চলে আমরা যে জায়গাটায় এসে হাজির হলাম, তার সবই কালো: আশেপাশে এখানে ওখানে ছড়ানো ইয়া ইয়া সব পেল্লায় কালো পাথর, তার মাঝে মাঝে কালো কালো গাছ, তার পাতার মাঝে চলা ফেরা করছে মস্ত বড় বড় সব সাপ। এই সব দেখেই ভয়ে আমার আক্কেল গুড়ুম। তখনই ছুটে পালাতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ঐ কালো পাথরগুলো যেন কুয়োর পাড়ের মত আমার চারিদিক আটকে রেখেছে।

দারুণ ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার মনিবকে বললাম—ভাল মানষের বেটা, পথে এত যন্ত্রণা দিয়ে শেষে এখানে আমায় মেরে ফেলতে আনলে তুমি? মরার আগে আমার বাচ্চা-কাচ্চার মুখও যে একবার দেখতে পাব না আমি। গরিব ছিলাম আমি বেশ ছিলাম, পথে পথে ভিক্ষা করে জুটতো কিছু খেতাম, না জুটলে না খেতাম, মসজিদের সাধুসন্তদের পাশে বসে ধম্ম কথা শুনে তবু শান্তি পেতাম, এ তুমি কি করলে, কোথায় আনলে?

আমার এ সব কথায় একটুও রাগ না করে বেদুইন আমাকে স্নিগ্ধ

তিরস্কার করে বললে—ছি, হাসান আবদুল্লা, মরদ না তুমি, একটু সাহস আনো, বুক বাঁধো, আমার কাজে এসে মারা যাবে না তুমি, তা ছাড়া আবার যখন কায়রোয় যাবে তুমি তখন আর তুমি গরিব নেই, যে কোন রাজার চেয়ে ধনী।

এই কথা বলে বেদুইন বেশ আরাম করে মাটিতে বসে নিশ্চিন্তে পাণ্ডুলিপির পাতার পর পাতা উল্টাতে লাগল, দেখে মনে হতে লাগল যেন সে নিজের হারেমে বসে কেতাব পড়ছে। ঘণ্টাখানেক এই রকম পড়বার পর সেটা বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, হাসান আবদুল্লা, তুমি যত শীগগির পার এই জায়গাটা থেকে সরে পড়তে চাও, তাই না ?

জি, বিলকুল। এর জন্য যে কোন পুণ্য কাজ করতে আমি রাজী। পুরোপুরি কোরানের বয়েৎ সব আবৃত্তি করা, আল্লার যত নাম আর গুণ আছে আর সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা, পর পর দশ বছর ধরে মক্কা মদিনায় হজ করতে যাওয়া, এর সব কিছু, এবং এর চাইতেও আরো বেশি কিছু থাকে ত তা-ও করতে রাজী আছি আমি।

বেদুইন আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হেসে বললে—না, হাসান আবদুল্লা, এ সব কিছু করতে হবে না তোমার, তোমার যা করতে হবে, তা এ সবের চেয়ে অনেক বেশি সহজ : এই ধনুক আর তীর দিচ্ছি তোমায়, এই নিয়ে তুমি এই জায়গাটায় একটু ঘোরো, ঘুরতে ঘুরতে মস্ত বড় একটা সাপ দেখতে পাবে, মাথায় তার দুটো শিং, ওটা দেখলেই তুমি তীর ছুড়ে ওটাকে মেরে ফেলবে, তোমার যা ধনুকের হাত, অনায়াসে পারবে তুমি। তারপর ওর মাথা আর কলজেটা নিয়ে আসবে আমার কাছে, বাস্—আর কিছু করতে হবে না তোমার।

কাজটা খুব সহজ হল,—না ?—সহজ যদি তবে নিজে করছেন না কেন ?—না এ আমি কিছুতেই পারব না, এইখানে পড়ে থেকে আমি মারা যাই, সে-ও ভালো, তবুও না।

বেতুইন তখন আমার কাঁধের উপর হাত রেখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললে—হাসান আবতুল্লা, তুমি তোমার বউয়ের জামা আর ছেলেমেয়ের রুটির কথা এর মধ্যেই ভুলে গেলে ?

এই কথা শুনবামাত্র আমার তুই চোখ জলে ভরে এল। আর কোন কথা না বলে বেতুইনের হাত থেকে তীর ধনুক নিয়ে আমি সেই সাপের খোঁজে বেরুলাম। কালো কালো পাথরের মাঝের গাছগুলিতে অসংখ্য সাপ ডালে ডালে জড়িয়ে বা ঝুলে রয়েছে। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে একটু পরেই পেয়ে গেলাম সেই শিং ওয়ালা মস্ত বড় সাপটা। মোক্ষম জোরে একটা তীর ছুড়তেই ও গাছ থেকে মাটিতে পড়ে মোচড় খেতে লাগল, তারপর একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। আমি তখন আমার আচকানের জেব থেকে একখানা ছুরি বের করে ওর মাথাটা কেটে, ওর পেট ফেড়ে ওর কলজেটা বের করে নিয়ে এলাম বেতুইনের কাছে।

বেতুইন ও তুটো পেয়ে বড় খুশী, বললে—বেশ, বেশ, তা এখন আর একটা কাজ করতে হবে যে! একটু আগুন জ্বালব আমি, তুমি কিছু শুকনো কাঠকুটোর যোগাড় করো। তার কথামত এদিক ওদিক ঘুরে আমি অনেক শুকনো পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি এনে তার সামনে স্তূপ করে রাখলাম। বেতুইন তার জামার জেব থেকে মস্ত বড় একটা হীরে বের করে সূর্যের দিকে ধরে প্রতিফলিত রশ্মির সাহায্যে সেই শুকনো জ্বালানিতে আগুন ধরিয়ে দিলে। এর পর বের করলে সে একটা লোহার কড়া আর একটা গোটা চুনী কেটে তৈরি একটা শিশি। শিশিটা আমাকে দেখিয়ে বললে—এটা কিসে তৈরি তা ত তুমি দেখতেই পাচ্ছ কিন্তু এর ভেতর কি আছে তা তুমি জান না, এতে আছে ফিনিক্সের রক্ত।

আগুন তখন বেশ জ্বলে উঠেছিল। বেতুইন সেই শিশির ছিপি খুলে সেই রক্ত কড়াতে ঢাললে, তার মধ্যে দিলে সাপের মাথা আর কলজেটা, তার পর সেই কড়া আগুনে চাপিয়ে

দিয়ে ঐ পাণ্ডুলিপি থেকে আমার অবোধ্য ভাষায় লেখা কি সব পড়তে থাকলে।

এমনি পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময়ে উঠে মক্কা থেকে ফিরবার সময় হাজিরা যেমন করে, ঠিক তেমনি করে নিজের দুই কাঁধ থেকে জামা কাপড় সরিয়ে ফেললে, তারপর কোমরবন্ধের এক প্রান্ত আগুনের উপর ফুটন্ত তরল মিশ্রণে ডুবিয়ে নিয়ে আমাকে হুকুম করলে— এই দিয়ে আমার কাঁধ দুটো আচ্ছা করে ঘষে দাও। আমি তার হুকুম মত তার কোমরবন্ধের ভিজে কিনারা দিয়ে তার কাঁধ দুটি আচ্ছা করে ঘষে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ঘষতেই জায়গা দুটো ফুলে উঠল, বেশ ফুলে উঠল, তারপর ঘষতেই জায়গা দুটো ফেটে গেল, ফেড়ে গেল, আর ঐ ফাড়া জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়ল পাখীর মত দুটো ডানা, সেই ডানা বড় হতে হতে শেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর বেদুইন সেই ডানা দুটো ঝাপটাতে শুরু করলে, জোরে, ক্রমেই জোরে। আমি বুঝতে পারছিলাম এবার যে কোন মুহূর্তে ও আমাকে এই ভয়ংকর জায়গায় ফেলে উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে, সুতরাং আমিও তাকে তাকে রইলাম। শেষবার বেশ একটা জোর ঝাপট মেরে যেই ও আকাশে উঠতে যাবে সেই আমি ওর আচকানের প্রান্ত ভাগ মোক্ষম জোরে চেপে ধরলাম। পরক্ষণেই ও আমাকে নিয়ে আকাশে উঠল। তারপর মেঘের উপর দিয়ে আমরা উড়ে চললাম। কতক্ষণ যে আমরা এমনি উড়ে চলেছিলাম, জাঁহাপনা, তা আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু এটা বেশ আমার মনে আছে, শেষে যে জায়গাটার উপরে এসে আমরা হাজির হলাম সেটা বেশ সমতল, চারিদিকে তার নীল স্ফটিকের পাঁচিল, ওখানকার বালু হচ্ছে সোনার দানা, আর নুড়ি হচ্ছে সব উজ্জ্বল মণিরত্ন। মাঝখানে এর অতি সুন্দর এক শহর, সেখানে বড় বড় সুন্দর সব প্রাসাদ আর উদ্যান।

ও হাসান আবদুল্লা, নীচে চেয়ে দেখ সেই বহু স্তম্ভে গড়া ইরাম; আদের বেটা সাদ্দাদের শহরে নামা যাক এবার—বলেই

বেছুইন তার পক্ষচালনা বন্ধ করে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে তার ডানা দুটি ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল।

যে শহরে নামলাম আমরা, পাঁচিল তার পর্যায়ক্রমে সোনার আর রূপোর ইট দিয়ে গাঁথা। বেহেস্তের দরজার মত সাতটি দরজা শহরের। প্রথমটা তৈরি চুনী দিয়ে, দ্বিতীয়টা পান্না, অন্যগুলি সব পর পর পোকরাজ, প্রবাল, পদ্মরাগ, রূপো এবং সোনা দিয়ে তৈরি। আল্লার নাম নিয়ে আমরা সোনার দরজা দিয়ে শহরে ঢুকলাম। যে পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম দুধারে তার সমদূরত্ব রেখে য়্যালাবাস্টারের স্তম্ভ আর বাগিচাওয়ালা প্রাসাদ। ওখানকার বাতাসে দুধের গন্ধ আর জলে গন্ধ ফুলের। এই রাস্তা ধরে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত যে প্রাসাদটায় এসে আমরা হাজির হলাম তার আয়তন আর স্থাপত্যের বর্ণনা দেওয়া যায় না। হাজার স্বর্ণস্তম্ভের উপর গড়া এই প্রাসাদ, সিঁড়ির পার্শ্বস্তম্ভ রঙিন স্ফটিকে তৈরি, দেয়ালগুলি নানা রত্নে খচিত। প্রাসাদের মাঝখানে নন্দনকাননের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে, এমন এক বাগান, মাটিতে তার কস্তুরী বাস, এবং তাতে জলসেচন করছে তিন তিনটি নদী, একটিতে তার গোলাপনির্যাসের ধারা, একটিতে মধুর আর একটিতে সিরাজ্জির। বাগানের ঠিক মধ্যিখানে পাতা রয়েছে সোনা আর চুনী দিয়ে তৈরি এক সিংহাসন—উপরে তার গোটা পান্না কেটে তৈরি এক ছত্র, ঐ ছত্রের নীচে রয়েছে ছোট্ট একটা সোনার পেটরা, জাহাঁপনা এখন যেটা হাতে ধরে রয়েছেন।

বেদুইন ওটা দেখামাত্র হাতে তুলে নিয়ে ওর ডালা খুলে ফেললে। ওটা এক রকম লাল গুঁড়ায় ভরতি দেখেই বেদুইন আনন্দে চীৎকার করে উঠল: পেয়েছি রে পেয়েছি, হাসান আবদুল্লা, এই দেখ কি পেয়েছি, সেই লাল গন্ধক, পীর শেখেরা যে 'কিমিয়া'র খোঁজে তাঁদের জীবন পাত করে গেছেন, সেই দুর্লভ বস্তুটি পেয়ে গেছি আমি।

আমি বললাম—কি হবে ছাই—ও লাল গন্ধক দিয়ে, ও ফেলে দিয়ে আশে পাশে যে সব মণিরত্ন ছড়ানো রয়েছে, তাই দিয়ে আসুন আমরাও পেটরাটা ভরে নি।

শুনে বেদুইন আমার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আরে বোকাটা, ঘটে তোমার কিছ্ছু বুদ্ধি নেই, এই লাল গন্ধক যে কি চীজ তা ত তুমি জানো না! এর একটা দানা দিয়ে রাশীকৃত বাজে ধাতুকে সোনা করে ফেলা যায়। তুমি ভাবছ—এ শুধু লাল রঙের সাধারণ গন্ধকের গুঁড়ো, তা নয় রে পাগলা, এর নাম কিমিয়া। এই গুঁড়ো দিয়ে আমি এর চেয়েও সুন্দর আর বড় বাড়ি, আর এর চেয়েও তাজ্জব শহর তৈরি করে ফেলতে পারি। এ দিয়ে আমি বড় বড় ইমানদার লোকের ইমান ঘুচিয়ে দিতে পারি, নিজে হতে পারি শাহান শা—বাদশা।

আমি হেসে বললাম—জনাব এ দিয়ে আপনার খোদার দেওয়া আয়ুর এক দিন বাড়াতে পারেন? অতীতের একটি পৃষ্ঠা মুছে ফেলতে পারেন?

বেদুইন ম্লান মুখে বললে—সে পারেন কেবল আল্লা।

লাল গন্ধকের অত সব গুণে আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না; আমার বিশ্বাস প্রত্যক্ষে, সুতরাং আশে পাশে যে সব বড় বড় হীরে মুক্তো, চুনীপান্নানীলার ডেলা পাচ্ছিলাম সেই সব কুড়িয়ে আমি আমার আচকানের জেব ভরতি করছিলাম, পাগড়িতে বাঁধছিলাম। দেখে বেদুইন আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল—বে-আক্কেল, বেকুব, কি করছ কি তুমি? ওর একটাও এখান থেকে নেওয়া চলবে না, নিতে গেলেই—নির্ঘাত মৃত্যু।—বলেই সোনার পেটরাটা হাতে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে সামনে এগিয়ে চললো, আমি তার কথায় বাধ্য হয়ে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আমার জেব পাগড়ি থেকে রত্নগুলি ঢেলে ফেলে দিয়ে ওদের দিকেই ফিরে ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে চাইতে চাইতে বেদুইনের অনুসরণ করলাম। ওর কাছাকাছি গেলে ও আমার হাতটা ধরে ফেললে, পাছে আমি লোভে পড়ে ওখান থেকে কোন কিছু নিতে চেষ্টা করি। অমনি হাত ধরেই সে আমায় চুনীর দরজা দিয়ে ঐ আজব শহর থেকে বের করে আনলে। ওর তাজ্জব পাঁচিলটা ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম

আমরা নীল স্ফটিকের বেষ্টনীর দিকে। ওর কাছাকাছি যেতেই ওটা আপনা থেকে খুলে গেল, আমরা অনায়াসে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ইরাম শহরটা শেষ বারের মত একবার দেখে নিতে তাকালাম আমরা ঐ দিকে, কিন্তু কই, কিছুই ত আর নেই। আমরা এসে গেছি পারা নদীর তীরে। আবার পার হতে হবে সেই ভয়ংকর সাঁকো। আগেকার মতই পশমী জুতো পরে পা টিপে টিপে বেদুইনের পিছু পিছু থেকে ভয়ে ভয়ে পার হয়ে এলাম সেতু। আমাদের উট দুটো দেখি নিশ্চিন্তে সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। আমারটার কাছে এগিয়ে যাবার সময় আমার মনে হতে লাগল আমার যৌবনের পুরনো এক বন্ধুর কাছে আমি যাচ্ছি। পিঠে যথারীতি সাজ পরিয়ে আমরা যে যার জিনিস পত্র নিয়ে নিজের নিজের উটের পিঠে চড়ে বসলাম। উট চালানোর আগে বেদুইন বলে উঠল—এবার মিশরে ফেরা যাক—কি বলো? শুনে মনে মনে আমি আল্লার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম।

জাহাঁপনা, সেই সোনার আর রূপোর চাবিদুটো তখনও আমার ট্যাঁকে, ওরা যে দুঃখ যন্ত্রণার বাহক, তা আমার জানাই ছিল না।

কায়রো ফিরবার পথে নানা রকম অসুখবিসুখ দুঃখ যন্ত্রণায় আমি ক্রমেই কাতর হয়ে পড়ছিলাম, অথচ আমার সঙ্গী বহাল তবিয়তে মহা ফুর্তিতে চলেছিল, বৃষ্টিধোয়া ফুলের মত তার চেকনাই যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল জীবনের পথে সে যেন রেশমী গালিচার উপর দিয়ে চলেছে।

কায়রোয় এসে প্রথমেই গেলাম আমি আমার নিজের বাড়িতে, মনে কত আনন্দ আর আশা নিয়ে গেছি—কতদিন পরে আমার প্রিয়জন, নিজের জনদের দেখা পাব।—কিন্তু কই, কেউ ত ছুটে এল না আমায় দেখে! শুধু তাই নয়, ঘরের দরজা দেখলাম ভাঙা, খোলা। পথের কুকুরগুলি সব ঘরের মাঝে আস্তানা নিয়েছে। ব্যাপার দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম আমি। আমার কান্না শুনে প্রতিবেশী একজন এগিয়ে

এসে বললে—ও হাসান আবছুল্লা, তুমি এসেছ, ওদের পরমায়ুর যে দিনগুলি বাকী ছিল, সেগুলি তোমার আয়ুর সঙ্গে যুক্ত হক। ওরা কেউ আর—

কথা আর শেষ অবধি শুনবার দরকার হল না, আমি তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। যখন জ্ঞান হল—দেখি আমার মনিব বেছুইন আমার পাশে বসে চোখেমুখে গোলাপ জলের ছাট দিচ্ছে। ওকে দেখার পর আমার আর কান্না এল না, রাগে ফেটে পড়লাম আমিঃ মুখে যা এল তাই বলে গালাগালি দিলাম, অভিশাপ দিলাম, আর কি করলাম মনে নেই, তখন আমার উন্মত্তের মত অবস্থা। ও কিন্তু আমার এত গালাগালি শাপ মুন্যি শুনে একটুও বিচলিত, উত্তেজিত হল না, আমার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললে—ছুনিয়ার সবাই আল্লার কাছ থেকে আসে, আল্লার কাছেই ফিরে যায়, তুমি এসো আমার সঙ্গে। এখানে আর থাকে না—বলে আমার হাত ধরে সেই শূন্য পুরী থেকে নিয়ে চললো।

সে যেখানে আমায় নিয়ে এল সে এক বিরাট প্রাসাদ। নীল নদের ধারে। বিলাস দ্রব্য, বান্দা বাঁদী, কোন কিছুর অভাব নেই সেখানে। আমার মন না চাইলেও—এখানেই তার সঙ্গে থাকতে সে আমায় বাধ্য করলো। এখানে সে আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগল। আমার মনের ছুঃখ ঘুচাতে সে তার তামাম ধনরত্নের অর্ধেক আমাকে দিতে চাইল, সবার চেয়ে বড় কথা যে যাছুবিদ্যার বলে সে এত কিছু লাভ করেছে, সেই বিদ্যার তুক তাক, মন্ত্র তন্ত্র, ঔষধ তৈয়ারি ইত্যাদি আমাকে শেখাতে লাগল। এই বিদ্যার দিকে যাতে আমার মনের টান যায় সে জন্যে সে অনেক সময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সীসের পিণ্ড নিয়ে এসে আমার সামনেই সেই লাল গুড়ো ছুঁইয়ে সে সব সোনা করে দিত।

বেছুইনের সেই প্রাসাদে এত ধনরত্ন বিলাসের প্রাচুর্যের মাঝে থেকে রোজ বাদশাহী খানা খেয়েও কিন্তু আমার দেহমন কিছুই

ভালো যাচ্ছিল না। দেহটা শুকিয়ে যাচ্ছিল আমার, জোর করে বহু দামী দামী পোশাক আমাকে পরিয়ে দিলেও তার ভারই আমি বইতে পারছিলাম না। আমাকে খুশী করবার জন্য নিত্য নতুন খানাপিনা আমায় পরিবেশন করা হত, কিন্তু তাতে আমার রুচি ছিল না। সুগন্ধি কাঠের পালঙ্কে সুকোমল শয্যায় শুয়েও আমার চোখে ঘুম ছিল না। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে ইরান তুরান চীন ভারতবর্ষ এবং নানা দ্বীপ থেকে অদ্ভুত সুন্দর সব ফুল ফলের গাছ এনে লাগানো হয়েছিল, তার মাঝে বয়ে আসত নীলনদের ঝিরঝিরে হাওয়া, সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রযোগে নীলনদ থেকে জল এনে মর্মর আর পোরফিরি-র আধারের উপরে ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু এ বাগানে বসেও আমি বিন্দুমাত্র শান্তি পেতাম না, পাব কি, দুঃখশোক তখন যে আমার দেহমন কুরে কুরে খাচ্ছে।

আর এদিকে বেদুইন তখন পরমানন্দে তার জীবনের দিন কাটাচ্ছে, রাত্রিটা ত করে তুলেছে—সে জমিনেই একটা বেহেস্ত, প্রাসাদের আপেল কমলা জুঁই বেল গোলাপের বাগানে সোনার কাজ করা নীল রেশমী কাপড়ের মস্ত বড় মণ্ডপ, চাঁদোয়ায় তার চাঁদের মত স্নিগ্ধ আলোর ঝাড়। নিচে পাতা পারশ্যের সেরা গালিচা। তারই উপরে নানা দেশ থেকে নানা খাদ্য পানীয় দিয়ে ভোজ, গান বাজনা নাচ। প্রতি রাত্রেই নিমন্ত্রিত বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে, নিত্য নতুন বন্ধু। এই সব বন্ধুদের শুধু খানাপিনা দিয়ে, গান শুনিয়ে, নাচ দেখিয়েই আপ্যায়ন করে না সে। প্রতিদিন মিশর, সিরিয়া, পারশ্য থেকে নৃত্যগীত পটীয়সী যে সব তরুণী সুন্দরী বাঁদী কিনে আনা হয়, যারা ভোজের মণ্ডপে নাচে গায়, নিমন্ত্রিত বন্ধুদের মাঝে যে তাদের যেটা পছন্দ করে সেইটাই তাকে উপহার দেয় বেদুইন। এমনি প্রতিদিন, তাই শহরে তার নাম ছড়িয়েছে দিলদরিয়া।

বেদুইন এমনি আনন্দে মত্ত হয়ে দিন কাটালেও আমি যে নিরালা ঘরটায় নিজের দুঃখ নিয়ে কালযাপন করতাম সেখানে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। একদিন এমনি একটি নতুন

মেয়েকে সঙ্গে করে সে হঠাৎ আমার ঘরে হাজির হল। তার রকম দেখেই বুঝলাম সেদিন সে একটু বেশি মাত্রায় সিরাজি পান করেছে, চোখে মুখে আনন্দ যেন একেবারে উপচে পড়ছে। তরুণী মেয়েটিকে নিজের সামনে পায়ের কাছে বসিয়ে ও আমার একেবারে পাশ ঘেঁষে বসল, তারপরই আমাকে বললে—হাসান আবছুল্লা, তুমি আমায় কোনদিন গান গাইতে শোন নি,—না? আচ্ছা, আজ আমি গান গাইছি, শোনো।—এই বলে আমার হাত ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগে মাথা নেড়ে নেড়ে গান গাইতে শুরু করল, অনেক চেষ্টা করে শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম—যে সে সিরাজির প্রশস্তি গাইছে: গোলাপ লাল, সিরাজিও লাল, সিরাজি গোলাপের চাইতেও ভালো, এই ত কমলাবন রয়েছে, এর পাতাগুলি পবন-মদিরা পান করে আমারই মত আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে, আর বুলবুল ঐ মদিরা পান করে আমারই মত গান গাইছে—

এই রকম অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়ে একটা পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেছুইন চোখ বুজে হাসি মুখে নিজের মাথাটা নুইয়ে দিল নিজের বুকের উপর। দেখে মনে হল বড্ড ঘুম পেয়ে গেছে ওর, এবার ঘুমুবে। যে মেয়েটা ওর পায়ের কাছে বসে ছিল, সে ওকে স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে দেবার জন্য ওর সামনে থেকে উঠে গেল। আমি ওর ভালো করে ঘুমানোর ব্যবস্থা করবার জন্য একটা চাদর আর বালিশ নিয়ে এলাম। কিন্তু শোওয়াতে গিয়েই দেখি—ওর হয়ে গেছে। মুখে যেন বলতে চায়—জীবনে যা আমি পেতে চেয়েছিলাম, তা আমি পেয়েছি, আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মানুষের মন এমনি, জাহাঁপনা,—ওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর থেকে জীবনে যে ছুঃখ কষ্ট শোক আমি পেয়েছি সে সব তখন আর আমার মনে পড়ল না, মনে পড়তে লাগল ওর কাছ থেকে আমি যে সব ভাল ব্যবহার পেয়েছি। সেই সব মনে করে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম আমি, তারপর একটু সামলে নিয়ে ওর যোগ্য সৎ-কারের ব্যবস্থার দিকে মন দিলাম। আমি নিজে হাতে গোলাপ

জলে ওর দেহ ধুয়ে সুগন্ধি তুলোয় ওর নাক কান ইত্যাদি বন্ধ করে, চুল দাড়ি আঁচড়ে, পারশ্যের সুলতানের জন্য বোনা কাপড়ে ওর দেহ মুড়ে, সোনার কাজ করা চন্দন কাঠের শবাধারে শুইয়ে দিলাম।

ওর যত বন্ধু-বান্ধব সবাইকে খবর দিয়ে এনে পঞ্চাশটা বান্দাকে পালা করে শবাধার বহন করতে হুকুম দিলাম। শোক প্রকাশের জন্য ভাড়া-করা লোকগুলো করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে চলল, মৌলভীরা কোরানের বয়েৎ আওড়াতে আওড়াতে চললেন।—এমনি মহা সমারোহে আমরা তার কবর দিয়ে এলাম।

এরপর যথা সময়ে তার অন্ত্যেষ্টি ভোজ সমাধা করে আমি তার প্রাসাদে বসে তার অন্য সব কিছু নিয়ে পড়লাম। প্রথমেই খুললাম আমি সোনার পেটরাটা, যেটা এখন আপনার হাতে রয়েছে। কিন্তু ওর ভেতরে কই সে লাল গন্ধকের গুঁড়ো, আর বড় বেশি নেই, অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। নিজের বিলাস ব্যসনের ব্যয় বহন করবার জন্যে অধিকাংশই সে সোনা তৈরিতে খরচ করে ফেলেছে। কিন্তু ও নিয়ে আমি আর একটুও মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করলাম না, কারণ যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার সাহায্যেই দশটা সুলতানের রাজ্য কিনে ফেলা যায়, তা ছাড়া ধনলোভও আমার ছিল না। আমি কৌতূহলী হয়ে শুধু ঐ পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসলাম। ওটা যে ভাষায় লেখা সে ভাষাটা যদিও বেহুইন আমাকে তার প্রাসাদে এনে শিখিয়েছিল, কিন্তু কখনও আমাকে ওটা পড়তে সুযোগ দিত না। তার মৃত্যুর পর ওটা আমার হাতে আসায় ওতে কি লেখা আছে জানবার জন্য আমার আর তর সইল না, আমি তখনই ঐ রহস্যময় পাণ্ডুলিপিটা খুলে বসলাম। অন্যান্য অনেক তাজ্জব ব্যাপার জানার সঙ্গে সেই-দিনই আমি প্রথম জানলাম মূর্তির হাত থেকে সেই চাবি পাড়ার রহস্য, ও কটা চাবিই ছিল নসিবের চাবি: সোনা রূপোর চাবি আমাকে গছিয়ে নিজে সে দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবে, এই জন্যই সে দেড় হাজার দিনার দিয়ে আমায় কিনে নিয়েছিল। এটা জানবার

পর নিজেকে আর আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না, ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে যা তা বলে অভিশাপ দিই, ওর কবরের গায়ে থুথু ফেলি, আমাদের পয়গম্বর আত্মসংযমের যে সব শিক্ষা দিয়েছেন, সেই সব জোর করে মনে এনেই শুধু আমি আত্মসংবরণ করতে সমর্থ হলাম।

সোনা-রূপোর ঐ দুর্লক্ষুণে চাবি দুটোর প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি একটা মাটির মুচির উপর রেখে গনগনে আগুনের উপর বসিয়ে দিয়ে জ্ঞান আর সুখের বাহক যে দুটো চাবি বেদুইন নিজের কাছে রেখেছিল তার খোঁজ করতে লাগলাম, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান পেলাম না আমি। ফিরে এসে দেখি, আমার সোনা-রূপোর চাবি দুটি আগুনে গলে উবে যাচ্ছে, অমনি সুলতানের লোকজন এসে মণ্ডপটা ভেঙে আমাকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

এই অবস্থায় আপনার বাপের সামনে আমাকে হাজির করলে আপনার বাপ সুলতান থৈলুন আমাকে ধমক দিয়ে বললেন—তিনি খবর পেয়েছেন যে কিমিয়া অর্থাৎ নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনা করার বিদ্যা আমি আয়ত্ত করেছি। কি কৌশলে সেটা আমি করি তা এখনই বলতে হবে তাঁকে। আমি জানতাম তিনি প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, অবিবেচক, ওটা তাঁকে জানালে রাজ্যের অনেক অকল্যাণ হবে, সুতরাং রাজী হলাম না। আপনার বাবা তখন আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে—তাঁর সব চেয়ে যে কদর্য কারাগার তাতে আমাকে আবদ্ধ করে রাখলেন। এরপর আমাদের প্রাসাদের সব কিছু তচনচ করে ঐ সোনার পেটরা এবং পাণ্ডুলিপিটা হস্তগত করলেন। সোনা করার কৌশলটা জানবার জন্য প্রতিদিন অমানুষিক নির্যাতন করতেন তিনি আমার উপর, কিন্তু আল্লা আমায় দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করবার শক্তি দিয়েছিলেন, আমি মুখ খুলিনি, তারই ফলে এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর জঘন্য কারাগারে পচে মরতে মরতে অপেক্ষা করছিলাম, কবে মৃত্যু এসে আমায় এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে।

জাহাঁপনা, এখন আমার সে নির্যাতক সুলতান আল্লার কাছে গিয়ে তাঁর কৃতকার্যের হিসাব দাখিল করছেন, তাঁর বদলে সামনে

এসেছি আমি আজ এক ন্যায়নিষ্ঠ দরদী সুলতানের তাই স্বস্তিতে আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারব।

হাসান আবহুল্লার কথা শুনে সুলতান মামুদ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন—আল্লা মেহেরবান, অশেষ তাঁর দোয়া, তাই [illegible] আপনার উপর যে অবিচার করা হয়েছে, যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে, এই বান্দাকে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করবার সুযোগ দিলেন তিনি আজ।

তখনই নিজের রাজ পোশাকটা বৃদ্ধ আবহুল্লাকে পরিয়ে দিয়ে সুলতান তাঁকে নিজের প্রধান উজির করে নিলেন, রাজ্যের সেরা হাকিমদের ডেকে তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাজে নিয়োগ করলেন। এরপর তাঁর লিখিয়েদের ডেকে বৃদ্ধের মুখে শোনা তাজ্জব কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে বললেন।

সুলতান মামুদ হাসান আবহুল্লার কাছে সব কিছু শুনে নিয়ে হাজার হাজার মন সীসে আনিয়ে বিরাট বড় বড় সব মেটে মুচিতে বসিয়ে জ্বাল দেওয়াতে লাগলেন, আর হাসান আবহুল্লা সেই তাজ্জব পাণ্ডুলিপি থেকে মন্ত্র পড়তে থাকলে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি পেটরার সেই লাল গুঁড়ো মুচিতে ফেলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুচির সীসে সব বিশুদ্ধ সোনা হয়ে উঠতে লাগল।

সুলতান মামুদ—এ সোনা পার্থিব কোন সুখসম্ভোগ বিলাসে খরচ না করে আল্লার কাজে ব্যয় করবার জন্য রেখে দিলেন। তাঁর অনেক দিনের সাধ ছিল এমনি একটা মসজিদ তিনি নির্মাণ করান, হুনিয়ায় যার জুড়ি মেলে না। এবার সেই সাধ মেটাবার তিনি সুযোগ পেলেন। ডেকে পাঠালেন রাজ্যের যত বিখ্যাত স্থপতিদের। তারা সুলতানের অভিলাষ বুঝে তিন মাস ধরে নানা রকম নক্‌সা করে দেখালেন। সুলতানের মনঃপূত আর হতে চায় না। শেষে শহর প্রান্তে পাহাড়ের গা ঘেঁষে বিরাট এলাকা জুড়ে নানা সুখ-সুবিধা সৌন্দর্যের নিকেতন করে মসজিদের যে নকসাটা তাঁকে দেখানো হল সেটা অনুমোদন করলেন তিনি। সেই নকসা অনুযায়ী মসজিদ

তৈরি করতে সাতহাজার লোক সাত বছর ধরে খেটেছিল। ব্যয় করা হয়েছিল ওজন করা এখানকার হিসাবে সাত হাজার কুইণ্টাল দিনার। দাহ্য দ্রব্য অর্থাৎ কাঠের নামগন্ধ ছিল না তাতে, যে দিকে চোখ ফিরান যায়, মার্বেল, জেসপার, পোরফিরি আর য্যাজেট। শুধু তাই নয়, ওই মসজিদের হাজার হাজার স্তম্ভে লেখা হল পবিত্র কোরানের সবগুলি বয়েৎ। এখনও লোকে বহু দেশ থেকে সুলতান মহম্মদ ইবন থৈলুনের এই তাজ্জব মসজিদ দেখতে আসে।

বৃদ্ধ উজির হাসান আবহুল্লা হাকিমদের সু-চিকিৎসায় শীগগিরই তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন, শুধু তাই নয়, রাজা প্রজা সবার কাছে সম্মান মর্যাদা ভালবাসা পেয়ে তিনি একশো কুড়ি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এই তাঁর নসিবে লেখা ছিল। সবই আল্লার হাত, তিনিই নিত্য, সনাতন, শাশ্বত, অজর অমর অক্ষয়।

গল্প শুনে শাহরিয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—তোমার এ গল্প শুনে মনটা আমার বড় খারাপই হয়ে গেল, শাহরাজাদী।

তা হতে পারে, আপনি হুকুম করলে কাল একটা মজাদার গল্প আপনাকে শোনাতে পারি।

বেশ কালই শুনিয়ো তোমার সে গল্প।

ARABYA RAJANI (volume II) by TARAPADA RAHA : Rs. 8·00

আরব্য রজনী

আরবের বাদশাহী মহল থেকে ধূসর মরুপ্রান্তর পর্যন্ত একদিন যে গল্পের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তার স্পর্শ আজও বিশ্বের রসিকচিত্তে অম্লান হয়ে আছে।

শাহরাজাদী বাদশার মুখোমুখি বসে শুরু করেছেন তাঁর গল্প। প্রাসাদ থেকে দেখা যাচ্ছে রহস্যময়ী রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশ। কিন্তু এই রাত্রির অবসানেই যে নেমে আসবে শাহরাজাদীর ওপর চির রাত্রির অন্ধকার! দিনের প্রথম আলোকে শাহরাজাদীকে বরণ করতে হবে মৃত্যু—এই হল বাদশাহী ফরমান।

ভোর হয়, তবু শেষ হয় না গল্প। বাদশাহের গল্প-পিপাসু মন বলে ওঠে—আরও আরও আরও। তাই সেদিনের মত রদ হয়ে যায় মৃত্যুর ফরমান।

এমনি করে গল্পের যাদুকরী শাহরাজাদী সৃষ্টি করে চলেন প্রতি রজনীতে এক একটি করে গল্পের যাদু-মহল। সে মহলের প্রতি কক্ষে অপেক্ষা করে থাকে অপার বিস্ময় আর রোমাঞ্চের শিহরণ। তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেন তাঁর শ্রোতাকে গল্পের সেই রহস্যপুরীর মধ্য দিয়ে।

তারপর যেদিন শেষ হল গল্প সেদিন কি নেমে এসেছিল শাহরাজাদীর ওপর মৃত্যুর খড়্গ, না অপেক্ষা করেছিল কোন অভাবনীয় পুরস্কার?

আমাদের প্রকাশনায়

'আরব্য রজনী'র

অন্যান্য খণ্ড :

১ম খণ্ড/২য় মুদ্রণ	দাম ৬.০০
৩য়—৮ম খণ্ড	দাম প্রতি খণ্ড ৫.০০
৯ম খণ্ড	দাম ৬.০০
১০ম—১৩শ খণ্ড	দাম প্রতি খণ্ড ৮.০০

[২য় খণ্ডের ২য় মুদ্রণ এবং ১৪শ ও খণ্ডসমূহ পরবর্তী যন্ত্রস্থ]

দ্বাদশ খণ্ড

তারাপদ রাহা

১৩৮৩

প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
াদ্র, ১৩৮৩ : আগষ্ট, ১৯৭৬

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০১২
৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :
সুধীন ভট্টাচার্য

মুদ্রক :
শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৪

দাম : আট টাকা

॥ আদিকথা ॥

প্রতারণা আর বেইমানি জগতে কেউ বরদাস্ত করতে পারেন না, বিশেষ করে যখন সেটা আসে প্রিয়জনের কাছ থেকে। জীবনে সবচেয়ে যাকে বেশি ভালবাসা গিয়েছিল তার দ্বারা যদি মানুষ প্রতারিত হয়, তা হলে তা হয়ে ওঠে একেবারে অসহনীয়। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে মানুষের মন।

ঠিক এই রকমটিই ঘটেছিল একদিন ইরানের বাদশা-মহলে, অনেক—অনেক কাল আগে। বাদশা শাহরিয়ার তাঁর প্রিয়তমা বেগমের বেইমানিতে প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁকে হত্যা করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল সমস্ত নারীজাতির ওপর। হারেমের অন্যান্য বেগমের গর্দান নিয়েও তাঁর ক্রোধ শান্ত হল না, উজিরকে ডেকে তিনি বললেন, শোনো উজির, রোজ সন্ধ্যায় আমীর ওমরাহদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কুমারী মেয়ে যোগাড় করে আনবে ; জাঁকজমকে বিয়ে করব তাকে। একটি রাত্রি শুধু বেগমের মর্যাদা পাবে সে আমার কাছ থেকে, পরদিন ভোরেই জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে, এ ভারও রইল তোমার ওপর।

শুনে তো উজিরের বুক থরথর করে কাঁপতে লাগল, একি বিষম ফরমান বাদশার !—কিন্তু উপায় কি, বাদশার হুকুম তো তাঁকে তামিল করতেই হবে ; নইলে তাঁর নিজেরই গর্দান যাবে !

তারপর আমীর ওমরাহদের কোন না কোন এক বাড়ি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল ওঠে, বাদশার হুকুমে উজিরকে কোন না কোন বাড়ি থেকে বাপ-মায়ের কোল শূন্য করে তাদের নয়নের মণি সদ্যফোটা গোলাপের মত তরুণী মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে হয়, আর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে দিতে হয় জল্লাদের হাতে।

এমনি করে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; বছর ঘুরে এল। শেষে এমন দিন এসে গেল যখন উজির দেখলেন, নিজের দুই মেয়ে ছাড়া বাদশার যোগ্য আর কোন মেয়ে দেখা যাচ্ছে না।

সেদিন বিষণ্ণ মুখে উজির সেই কথাই ভাবছেন, এমন সময় তাঁর বড় মেয়ে শাহরাজাদী কাছে এগিয়ে এল, মেয়েটি যেন হীরের টুকরো ; যেমন রূপ তেমনি বিদ্যা, আর তেমনি বুদ্ধি। এই বয়সেই যত রকমের কেতাব আছে, সবই সে পড়ে ফেলেছে। তা ছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গী এতই মধুর যে, যে শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

মেয়ে বাপের পাশে বসে বললে, কি ভাবছ আব্বা, এমনি মুখ ভার করে ?

ভাবছি—আজ সন্ধ্যায় বাদশার বিয়ের কনে জোটাব কোত্থেকে ? দেশে তো আর বিয়ের বয়সী মেয়ে নেই রে, মা।

মেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, কেন আব্বা, আমার কি বিয়ের বয়স হয়নি ?

শুনে চমকে উঠলেন উজির : কি বলছিস তুই! বাপ হয়ে জেনেশুনে তোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো ?

যাদের এতদিন দিয়েছ, আব্বা, তাদেরও বাপ-মা ছিল।

সে বাদশার আদেশ পালন করেছি।

মেয়ে যখন আর দেশে নেই, তখন আমাকে পাঠানই তোমার কর্তব্য। তুমি যদি না নিয়ে যাও, তা হলে নিজেই গিয়ে আমি হাজির হব বাদশার কাছে।

শুনে তো উজিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে শাহরাজাদীর মায়া হল। স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, আব্বা, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি এক ফন্দি এঁটেছি, যদি সেটা ঠিকমত খাটাতে পারি, তা হলে আমি তো বাঁচবই—তার সঙ্গে রক্ষা পাবে দেশের কুমারী মেয়েদের জান আর মান।

মেয়ের কথায় পুরো সান্ত্বনা পেলেন না উজির। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তিনি বাদশার দরবারে চলে গেলেন। এগিয়ে এল শাহরাজাদীর

ছোট বোন তুনিয়াজাদী তার দিদির কাছে। জিজ্ঞাসা করল, আব্বার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল রে দিদি তোর ?

দিদি হেসে বলল, আমি আজ বাদশার বেগম হতে যাচ্ছি রে, বোন।

তুই ?—বলতে গিয়েই তুনিয়ার তু'চোখ জলে ভরে এল।

ছিঃ, কাঁদিসনে, বোকা মেয়ে। শোন্, আমি এক ফন্দি এঁটেছি। বেগম হয়ে শেষ রাত্রে বাদশার কাছে বায়না ধরব, আমি আমার ছোট বোনকে জন্মের শোধ একবার দেখবার জন্যে। জানি অনুমতি মিলবে। তুই গিয়ে জন্মের শোধ একবার আমার কাছে গল্প শুনতে চাস্, ব্যস্।

তুনিয়াজাদী হয়ত বুঝল, হয়ত বুঝল না ; তখনকার মত চুপ করে রইল সে।

সন্ধ্যাকালে শাহরাজাদীকে বিয়ের কনে সাজিয়ে উজির বাদশার সামনে নিয়ে এলেন। বাদশা দেখে চমকে উঠে বললেন, একি করেছ উজির, তুমি—নিজের মেয়েকে···।

কি করব, জাহাঁপনা।—দেশে আর মেয়ে তো চোখে পড়ে না। তাছাড়া আমি না আনলে ও নিজেই আসত, ওর জিদ।

শাহরিয়ার একবার তাকিয়ে দেখলেন শাহরাজাদীর দিকে। যেন একটা সদ্যফোটা বসরাই গোলাপ, চোখে মুখে হীরের ঝলমলানি।

বললেন, তুমি নিজে এসেছ—ইচ্ছে করে—কাল সকালে তোমার কি দশা হবে তা জেনেও ?

জি, জাহাঁপনা—জেনেও। একরাত্রি আপনার বেগম হবার সৌভাগ্য লাভের জন্য শতবার মৃত্যুবরণ করতেও রাজী আমি।

উজিরের মেয়ের কথা শুনে বাদশা একেবারে থ।

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল।

শাহরাজাদীকে খুব ভাল লাগল বাদশার। অনেক আদর পেলো

বাদশার কাছ থেকে সে। সুযোগ বুঝে শাহরিয়ারকে বললে, অনেক পেয়ার পেলাম, জাহাঁপনা, আপনার কাছ থেকে, জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে।—একটা আরজি আছে আপনার কাছে আমার, রাখবেন কি ?

বল বল, আজ রাতে কিছুই অদেয় নেই তোমায় আমার।

শাহরাজাদী বলল, জাহাঁপনা—আমার একটি ছোট বোন রয়েছে তাকে খুব ভালবাসি আমি। কাল সকালে তো দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে আমাকে, তার আগে—যতক্ষণ আছি, মানে আজকের বাকি রাতটুকু আমি তাকে কাছে রাখতে চাই।

বাদশা তখনই লোক পাঠিয়ে শাহরাজাদীর ছোট বোনকে নিয়ে এলেন নিজের শয়নকক্ষে। এনে পাশের একটা পালঙ্কে তার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রি তিন প্রহর কেটে গেছে, আর একটি প্রহর মাত্র বাকি। দুই বোনের কারো চোখেই ঘুম ছিল না, থাকবার কথাও নয়। দুনিয়াজাদী বললে, দিদি ঘুমোসনি ?

কেন রে, দুনিয়া ?

ওদের কথা শুনে শাহরিয়ারেরও ঘুম ভেঙে গেল। চুপ করে রইলেন তিনি দু'বোনের কথাবার্তা শোনবার জন্যে।

দুনিয়া বললে, দিদি—একটা গল্প শোনাবি ? কি সুন্দর গল্প বলতিস তুই, আর তো শুনতে পাব না, জন্মের শোধ তাই—

শাহরাজাদী জবাব দিল, জাহাঁপনা জাগুন আগে, তাঁর অনুমতি পেলে তবে শোনাতে পারি।

শাহরিয়ার জেগেই ছিলেন। বললেন, আমি জেগেছি। বেশ তো, শোনাও না তোমার বোনকে গল্প—আমিও একটু শুনি।

বাদশার অনুমতি পেয়ে মনে মনে খোদাকে তসলিম করে ধীর মধুর কণ্ঠে শাহরাজাদী শুরু করলে তার গল্প : সে যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত। তাছাড়া যাদুকরীর মত কথার ইন্দ্রজাল বুনে চলল সে।

শাহরিয়ার আর ছুনিয়াজাদীর সামনে ভেসে উঠতে লাগল কত মরু প্রান্তর, খর্জুরবীথি, কত সরিৎসাগর পর্বত, কত দৈত্যদানাপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন হীরে জহরৎ কত রকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত বিপদ ঝঞ্ঝা, প্রমোদবিলাস, কত সুন্দরী বিলাসিনী নর্তকী, কত দুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটীল চক্রান্ত, হিংসাদ্বেষ আর প্রণয়ের কাহিনী।

গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, গল্প কিন্তু শেষ হল না। শাহরিয়ার বললেন, বেশ—বাকিটুকু কাল আবার শুনব—

গল্পের শেষটুকু শোনবার জন্যে বেগমের গর্দান নেওয়ার হুকুম দিতে পারলেন না বাদশা।

॥ সূচী ॥

অল বুন্দুকানির কাহিনী

বোন তুনিয়াজাদীর অনুরোধে সুলতানের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদী রাত্রিশেষে এই মজার গল্পটি শুরু করলে—

আরফৎ উৎসবের দিন সেটা। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রসিদ তাঁর সিংহাসনে বসে, পাশেই তাঁর উজির জাফর। খলিফা হঠাৎ জাফরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—উজির, আজ আর দরবার ঘরে আটকে থাকা ভাল লাগছে না, চলো আমরা তু'জনে ছদ্মবেশে বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, ফকির দরবেশ দেখলে তাদের কিছু কিছু খয়রাত করা যাবে, তা ছাড়া দেখবার মত নতুন কিছুও হয়ত চোখে পড়বে আমাদের—কি বলো?

বহুৎ ঠিক—জবাব দিলেন জাফর। তারপর তুইজনেই দরবার ঘর ছেড়ে সুলতানমহলের ভিতরে এক কামরায় গিয়ে ছদ্মবেশ পরে পিছনের এক দরজা দিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে শহরের বাজার এবং বড় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা যেখানেই যে ফকির দরবেশ বা তুঃস্থ কাউকে দেখতে পেলেন তাকেই কিছু দান খয়রাত করতে লাগলেন। সারাদিনটাই এমনি করে কেটে গেল। শেষের দিকে এক বড় রাস্তার মোড়ে এসে খলিফার নজরে পড়ল সেখানে একটি স্ত্রীলোক বোরখার ভেতর থেকে কবজি সমেত তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলছে—মেহেরবান কে আছ, আল্লার নামে কিছু দিয়ে যাও আমায়।

কিন্তু কি সে হাতটা! খলিফা আর তাঁর নজর ফিরাতে পারেন না সে হাত থেকে: কবজি আর হাতের তালু যেন স্ফটিক দিয়ে তৈরি করেছেন খোদা। না, না হল না, চেকনাই তার বুঝি স্ফটিককেও হার মানিয়ে দেয়। মুগ্ধ খলিফা তাঁর জামার জেব থেকে একটা

দিনার বের করে জাফরের হাতে দিয়ে বললেন—যাও ত উজির, এটা ঐ মেয়েটাকে দিয়ে এস।

জাফর গিয়ে সেটা মেয়েটার হাতে দিতেই সে ওটা মুঠো করে চেপে ধরে যখন বুঝলে ওটা দিরহাম বা নুফার (তাম্রমুদ্রা) মত ছোট নয় তখন সে মুঠো খুলে চোখ মেলেই তাকাল: যা ভেবেছি তাই—একটা আনকোরা দিনার!

জাফর দিনারটি ওর হাতে দিয়েই চলতে শুরু করেছিলেন, মেয়েটি তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে বলে উঠল—ও জনাব, মেহেরবানি করে একবার শুনুন ত, শুনে যান।

মেয়েটির ডাকে জাফর তখনই ফিরে এলেন তার কাছে। মেয়েটি বললে—আপনি যে এইমাত্র একটা দিনার খয়রাত করে গেলেন আমায়, সে কি আল্লার নামে—না আর কোন—

জাফর জবাব দিলেন—দানটা আমার নয়, ঐ যে উনি—ঐ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, দিলেন উনি—আমার মারফত।

বেশ ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে এসে বলুন আমার প্রশ্নের উত্তর।

জাফর তখনই খলিফার কাছে গিয়ে মেয়েটি দিনার পাবার পর কি জানতে চাইছে খুলে বললেন। শুনে খলিফা বললেন—ওকে বলো গিয়ে—আল্লার নামেই ওটা দেওয়া হয়েছে।

উজির গিয়ে মেয়েটিকে ঐ কথা বললে মেয়েটি তার জবাবে বললে—খোদাতালাই যেন এর হিসাব রাখেন, ওঁর পাওনা যেন উনি তাঁর কাছ থেকেই পান।

মেয়েটি যা বললে জাফর গিয়ে অল-রসিদকে তা জানালে অল-রসিদ বললেন—তুমি আর একবার যাও ত, উজির, ওর কাছে, গিয়ে জেনে নাও ওর সাদি হয়েছে কি না, যদি শোন সাদি হয় নি তবে ওকে জিজ্ঞাসা করো ও আমার বেগম হতে রাজী কি না।

জাফর গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে যখন জানলে সে কুমারী তখন সে মেয়েটিকে বললে—যে-সাহেব তোমায় দিনার দিলেন তিনি তোমায় সাদি করতে চান, তুমি রাজী আছ এতে?

উত্তরে মেয়েটি বললে—আমার সাদির যৌতুক আর নগদ যা লাগবে তা যদি উনি দিতে পারেন তা হলে ওঁর ঘরে আমি যেতে পারি।

দুটোতে কত কি দিতে হবে খুলেই বলো।

মেয়েটি বললে—ইস্পাহান থেকে বাৎসরিক যত রাজস্ব আদায় হয় ততটা চাই আমার সাজপোশাক বাবদ, আর খোরাসানের রাজস্বের সমান চাই নগদ।

জাফর শুনে মাথা নাড়তে নাড়তে খলিফার কাছে গিয়ে মেয়েটির শর্ত সব খুলে বললেন। খলিফা শর্ত শুনে খুশী হয়ে বললেন—বেশ, তুমি আবার যাও ওর কাছে, গিয়ে বলো—আমি ওর ঐ শর্তই মেনে নিতে রাজী আছি।

জাফর ফিরে গিয়ে মেয়েটিকে ঐ কথা বললে মেয়েটি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে বলে উঠল—উনি এত দিতে পারবেন ? দেবার ক্ষমতা রাখেন !

জাফর তখন আর না বলে পারলেন না—তা রাখেন বই কি ঃ উনি যে স্বয়ং আমাদের ধর্মাধিনায়ক খলিফা হারুন-অল-রসিদ।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি জিভে কামড় খেয়ে নিজের হাত পা ঢেকে বলে উঠল—আলাহমদুৎলিল্লা, জাফরকে বললে—উনি যখন আমাদের ধর্মাধিনায়ক খলিফা তখন আমার আর কি কথা থাকতে পারে।

উজির খলিফার কাছে গিয়ে মেয়েটির সম্মতির কথা জানালে খলিফা উজিরকে নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন, তারপর অনেক বাঁদী সঙ্গে নিয়ে এক বিশ্বস্তা বৃদ্ধা ধাত্রীকে পাঠালেন মেয়েটিকে আনতে। তারা মেয়েটিকে প্রাসাদে এনে প্রাসাদেরই হামামে আচ্ছা করে গোসল করিয়ে জমকালো দামী পোশাক এবং বহুমূল্য রত্নখচিত অলংকার পরিয়ে হারেমে তারই জন্য নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত কক্ষে এনে তাকে নানা বাদশাহী খানা খেতে দিল।

এই সব করবার পর এ খবর তারা খলিফাকে গিয়ে জানালে

খলিফা তখনই চারজন কাজী ডেকে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সাদির চুক্তি-নামা লিখিয়ে নিলেন।

রাত্রি হলে খলিফা এই নতুন বেগমের কক্ষে গিয়ে হাজির হয়ে তার সামনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোন বংশের কোন ঘরের মেয়ে যে সাদির জন্য আমার কাছে এত দাবি করলে?

মেয়েটি স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল—আমাকে বেগম করে জাঁহাপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি, আপনার এ বাঁদী সুলতান কিস্‌রা আনুশির্বানের বেটী, নসিবের ফেরে আমার এই দশায় পড়তে হয়েছিল।

খলিফা বললেন—লোকে বলে তোমাদের পূর্বপুরুষ সুলতান খশরু নাকি তাঁর প্রজাদের উপর দারুণ উৎপীড়ন করেছিলেন। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—তার ফলেই ত তাঁর বংশের মেয়েকে রাস্তায় বসে দশজনের কাছে ভিক্ষে করতে হচ্ছিল।

লোকে আবার এ কথাও বলে যে শেষে তিনি নাকি এমন ন্যায়-নিষ্ঠ হয়েছিলেন যে বনের পশুপক্ষী পর্যন্ত তাঁর কাছে ন্যায়বিচারের জন্য আসত।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—সেই জন্যেই ত আল্লা তাঁর বংশের মেয়েকে শহরের চৌরাস্তা থেকে মহামান্য খলিফার হারেমে এনে বসালেন।

নতুন বেগমের এই রকম কথা শুনে খলিফার মেজাজ এমনি বিগড়ে গেল যে যদিও তাঁর সে রাত তারই কক্ষে কাটাবার কথা তবুও তিনি পুরো এক বছর আর তার মুখ দেখবেন না ঠিক করে তখনই উঠে পড়লেন সেখান থেকে।

একদিন দুদিন করে দিন এবং মাস মাস করে বছর কেটে গিয়ে আবার যে দিন আরাফৎ উৎসবের দিন ফিরে এল সেদিন আবার তিনি উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মসরুরকে নিয়ে ছদ্মবেশে শহরের রাস্তায় ঘুরতে বেরুলেন। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরবার পরই খলিফার নজরে পড়ল রাস্তার ধারের এক দোকানে একটা লোক তোফা 'কুতিফা' (পিস্টক বিশেষ) তৈরি করছে। একেবারে ওস্তাদ ময়রা,

ওর কুতিফার যেমনি গড়ন তেমনি তার খোশবায়। দেখে বড় খুশী হলেন অল-রসিদ। তিনি প্রাসাদে ফিরে এসে তখনই এক খোজা বান্দাকে ডেকে হুকুম দিলেন—তুই যা ত এখনই অমুক রাস্তার ধারে ঐ ময়রার দোকানে, গিয়ে ময়রাকে বলবি—খলিফার হুকুম তুমি এখনই আচ্ছা করে একশোখানা এমন কুতিফা তৈরি করে দাও —যার প্রত্যেকটা একটা লোকের মুঠোয় ধরে।

খোজা বান্দা খলিফার হুকুমে ময়রার দোকানে গিয়ে খলিফার ফরমাস মত কুতিফা তৈরি করিয়ে তার দাম দিয়ে নিয়ে খলিফার সামনে হাজির করল। খলিফা তখন আর এক বান্দাকে দিয়ে পেস্তা বাদাম কিসমিস আর ঐরকম মেওয়া আনিয়ে নিজে হাতে ঐ পিঠের ভিতরে পুরে, শেষে প্রত্যেকটার মধ্যে একটি করে দিনারও ঢুকিয়ে দিলেন। এ সব অবশ্য তিনি এমন সন্তর্পণে করলেন যে উপর থেকে দেখে সহজে কেউ বুঝতে না পারে ওর ভিতরে এই সব আছে।

কুতিফার এই নতুন উৎকর্ষ সাধনের পর খলিফা, যে খোজাটা ওগুলি ময়রার দোকান থেকে এনেছিল তাকেই সুলতান কিসরার বেটীর কাছে পাঠালেন, তাকে বলে দিলেন তুই গিয়ে বেগমকে বলবি—খলিফা শপথ নিয়েছিলেন পুরো এক বছর আপনার ঘরে আসবেন না, সে এক বছর কেটে গেছে, আজ আবার আরাফতের দিন, আজ রাত্রে আসছেন তিনি আপনার ঘরে, তিনি জানতে চেয়েছেন—আপনার দিল কি চায়, তাই তিনি উপহার পাঠাবেন আপনার কাছে।

খোজা নতুন বেগমের ঘরে গিয়ে যখন খলিফার কথাগুলি তাকে বললে তখন সে জবাব দিলে—তুমি তাঁকে গিয়ে বলো—দিল আমার কিছুই চায় না, আমার যা দরকার সে সবই আমার আছে, কোন কিছুর ঘাটতি নেই, কমতি নেই।

খোজা গিয়ে এই কথা খলিফাকে বললে, তিনি তাকে হুকুম দিলেন—তুই আবার গিয়ে বল—আপনার দিল যা চায়, আবার ভেবে বলুন, জাঁহাঁপনা তাই পাঠাবেন আপনাকে।

খোজা এসে আবার এই কথা বললে কিসরার বেটী বললে—বেশ তাঁকে বলো গিয়ে—আমি এক হাজার দিনার এবং তার সঙ্গে একজন বিশ্বস্তা বৃদ্ধা ধাত্রী চাই, যাতে তার সঙ্গে ছদ্মবেশে বাইরে বেরিয়ে ওগুলি দীনত্বঃখীকে খয়রাত করতে পারি।

খোজা ফিরে গিয়ে খলিফাকে এই কথা জানালে তিনি তখনই এক বিশ্বস্তা বৃদ্ধার সঙ্গে এক হাজার দিনার পাঠালেন নতুন বেগম কিসরার বেটীর কাছে। বেগম ছদ্মবেশ পরে হাজার দিনার নিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে বাগদাদের পথে বেরিয়ে যেখানে যে ফকির দরবেশ বা দুঃস্থ কাউকে দেখতে পেল তাকেই দান করে যেতে লাগল। অবশেষে যখন সব দিনার নিঃশেষ হয়ে গেল তখন তারা প্রাসাদের দিকে রওনা হল। কিছুদূর আসবার পরই কিসরার বেটী বৃদ্ধাকে বললে—আম্‌মা, বড় তেষ্টা পেয়ে গেল যে আমার, কিছু পানি পেলে হত!

তেষ্টা পেয়েছে?—তা ঐ ত সক্‌কা শরবাহ রয়েছে (যারা পথে পথিকদের পানীয় জল সরবরাহ করে) ওকে ডাকি, পানি দেবে।

সক্‌কা শরবাহের পানি আমার দিলে রোচে না, ঘেন্না হয়। ও পানি ছোঁবও না আমি। কোন গেরস্থ বাড়ি থেকে যদি পানির যোগাড় করা যায়; এবং তাদের দেওয়ার মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে তা হলে আমি তা খেতে পারি।

বেগমের কথা শুনবার পর বৃদ্ধার নজরে পড়ল সামনেই এক ধনী গেরস্থের বাড়ি, দেউড়িতে তার চন্দনকাঠের দরজা, সামনে তার শ্বেতপাথরের তুটি বেদী, সেখানে বসে রয়েছে ছিমছাম চেহারার এক প্রহরী। বৃদ্ধা তখন বেগমকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রহরীকে বলে দরজায় মৃত্থ করাঘাত করলেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল দামী পোশাকপরা সুদর্শন এক তরুণ। তরুণকে দেখেই বৃদ্ধা বলে উঠল —বাবা, আমার এই বেটীর জব্বর তেষ্টা পেয়েছে, আর পথের সক্‌কা শরবাহের পানি ও কিছুতে ছোঁবে না, তাই বিরক্ত করলাম তোমাদের, মেহেরবানি করে যদি কিছু তেষ্টার পানি—

এ ত আমার পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা—বলেই তরুণ নিজেদের বাড়ির ভিতর চলে গেল এবং প্রায় পরক্ষণেই একটা সুন্দর স্ফটিক পাত্রে কর্পূর দেওয়া ঠাণ্ডা পানি এনে বৃদ্ধার হাতে দিল। বৃদ্ধা বেগমের হাতে দিল। বেগম পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে মুখ থেকে বোরখার অবগুণ্ঠন সরিয়ে তা পরম তৃপ্তির সঙ্গে পান করলে। আশেপাশের কেউই তার দেহের কোন অংশই দেখতে পেল না। এর পর বেগম পাত্রটি বৃদ্ধার হাতে দিলে বৃদ্ধা তা তরুণকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—আল্লা তোমার ভাল করুন, বাবা।

আল্লা আপনাদেরও ভাল করুন, মঙ্গল করুন—বলে পাত্র নিয়ে তরুণ বাড়ির ভিতর চলে গেল। বৃদ্ধাও তখন সুলতান কিসরার বেটীকে নিয়ে খলিফার হারেমের দিকে রওনা হল।

এদিকে খলিফা এর একটু পরেই বাজার থেকে যে কুতিফাগুলি আনিয়ে নিজে হাতে তার মাঝে মেওয়া আর মোহর পুরেছেন সেগুলি সুন্দর একটা চীনে মাটির পাত্রের উপর অতি সুন্দর করে সাজিয়ে একটা খোজা বান্দাকে ডেকে বললেন—ওরে তুই এগুলি নিয়ে যা ত একবার নতুন বেগম কিসবার বেটীর ওখানে, গিয়ে বলবি—খলিফা এই উৎসবের মিঠাই পাঠিয়েছেন আপনাকে, আর তিনি বলে পাঠালেন, আজ তিনি আপনার ঘরেই রাত্রি যাপন করবেন।

খোজা কিসরার বেটীর কামরায় এসে ঐ বৃদ্ধাকে দেখে তারই হাতে মিঠাইয়ের পাত্রটা তুলে দিয়ে খলিফা যা বলে পাঠিয়েছেন তা বলায় বৃদ্ধা খলিফার মেহেরবানির জন্যে খোদার দোওয়া মেঙে খোজাকে বিদায় দিলে। খোজা ফিরে গেল বটে কিন্তু মন মেজাজ বড় খারাপ নিয়ে সে ফিরে গেল। এতগুলি মেঠাইয়ের একটাও এরা তাকে খেতে দিল না। আনবার সময় পথেই তার একবার ইচ্ছা হয়েছিল—একটা সে উঠিয়ে নেয়, কিন্তু নিতে গিয়েও তার সাহসে কুলাল না; ওগুলি এমন ভাবে সাজানো যে একটা সরাতে গেলেও সে ধরা পড়ে যাবে।

এদিকে কুতিফার পাত্র রেখে খোজা চলে গেলেই কিসরার বেটী

বৃদ্ধাকে বললে—বুড়ী মা, আল্লা এ ভালই করলেন। তুমি এক কাজ কর: এই মেঠাইয়ের পাত্রটা, যিনি আজ আমায় তেষ্টার পানি দিলেন তাঁকে উপহার দিয়ে এসো, বলো—আপনি আজ তেষ্টার পানি দিয়ে যার জান বাঁচিয়েছেন তিনিই এটা পাঠালেন।

বেগমের কথায় বৃদ্ধা তখনই মিঠাইয়ের থালাটা নিয়ে সেই তরুণের বাড়ির দিকে রওনা হল। পথে বুড়ীরও লোভ হয়েছিল একটা খেতে, কিন্তু তুলতে গিয়েই দেখে একটা তুললেই সেখানে হাতের চেটোর মত একটা ফাঁক হয়ে যায়। তাই মনে একটা আফসোস নিয়ে বুড়ী তরুণের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হল। তরুণ তখন বাড়ির সামনেই বসে ছিল, সুতরাং ডাকাডাকি আর করতে হল না, বৃদ্ধা তাকে সেলাম করে বললে—বাবা, তুমি আজ যে বিবিকে তেষ্টার পানি দিয়েছ তিনিই তোমাকে এই উৎসবের মিঠাই পাঠিয়েছেন।

বেশ, তুমি ওটা ঐ সামনের বেদীতে রাখ, এ জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিও তোমার বিবিকে, তোমায়ও ধন্যবাদ।

এরপর বৃদ্ধা সেখান থেকে বিদায় নিলেও তরুণ সেখানে তেমনি বসেই রইল। হঠাৎ ওখানকার চৌকিদার এসে তরুণকে বলে উঠল—সেলাম, হুজুর, সেলাম।

চৌকিদার বললে—হুজুর, আজ আরাফৎ পরবের দিন, রাত্রে ঈদের চাঁদ উঠবে, আমীর আলাদীন সাহেবের কাছে এ বান্দা কিছু বকশিশ প্রত্যাশা করে, যা দিয়ে সে তার আওরৎ বালবাচ্চাদের কিছু মিঠাই খিলাতে পারে।

শুনে তরুণ আমীর আলাদীন বলে উঠল—বেশ, তুমি ঐ পরাত সমেত ঐ মিঠাইগুলি নিয়ে যাও, বালবাচ্চাদের খাওয়াবে।

চৌকিদার মহাখুশী হয়ে আমীর আলাদীনের হাতে চুমু দিয়ে মিঠাইয়ের পরাত নিয়ে তখনই বাড়িতে এসে তার স্ত্রীর হাতে দিল। স্ত্রী অমনি বলে—এ আল্লা এ তুমি করেছ কি, সরকারী চৌকিদার হয়ে কার মিঠাইয়ের থালা চুরি করেছ—কি কেড়ে এনেছ?

চৌকিদার বিজয়ীর হাসি হেসে বললেন—না, গো, না—যা ভেবেছ তা নয়, আমীর আলাদীন সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিলাম, আজ পরবের দিন, তিনি আমায় ডেকে এই মিঠাইয়ের থালাটা দিয়ে বললে—তুমি এটা নিয়ে যাও, বাড়ির সবাই মিলে খাবে, আর আমার জন্যে খোদার দোয়া মাঙবে।···ওরে তোরা কে কোথায় ছুটে আয় পরবের মিঠাই খাবি। এরপর চৌকিদার তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে—বড় তোফা কুতিফা, কি বলো গো? আমার ত তর সইছে না, জিভ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে।

শুনে বউ অমনি ধমকে উঠল—থামো, যা-তা বকো না। বুড়ো কালে এত লোভ ভাল নয়। আমি যা বলছি তাই করো: এই কুতিফা ভরতি থালাটা নিয়ে এখনই বাজারে গিয়ে বিক্রি করে এসো, অন্তত ত্রিশ চল্লিশ দিরহাম পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে ছেলেপিলেকে কিছু কিনে দেওয়া যাবে।

চৌকিদার বললে—দোহাই তোমার, আজ পরবের দিন, এস আমরা সবাই মিলে এগুলি খাই, আল্লা খুশী হয়ে আমাদের আরও খাওয়াবেন।

শুনে স্ত্রী অমনি ফোঁস করে উঠল—কেবল খাই আর খাই, বাচ্চাদের মাথার টুপী নেই, পায়ে পয়জার নেই, আমরা কেবল খাবো! আমি আল্লার কসম নিয়ে বলছি—ওদের টুপী পয়জারের ব্যবস্থা না হলে আমি ওর একটা কুতিফা মুখে তুলছি না।

স্ত্রীর এই রকম সব বোলচাল শুনে স্বামী বেচারা আর কি করবে, সে তখনই পরাত সমেত কুতিফা নিয়ে বাজারে গিয়ে হাজির হল। তারপর বিক্রি করতে এক দালালের হাতে দিলে দালাল হাঁকতে লাগল—মেঠাই ভরতি পরাত কে কিনবে এস,—খোশবায়ওয়ালা তোফা টাটকা মেঠাই।

হাঁক শুনে বাজারের এক শেখ এগিয়ে এসে জিনিস দেখে চল্লিশ দিরহাম দিতে চাইলেন। এরপর এক বণিক এসে দিতে চাইলেন আশী। এরপর তৃতীয় একজন এসে ওটা হাতে নিয়ে ভালো করে

উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে দেখেন পরাতটার নীচে লেখা—মহামান্য খলিফার ফরমাসে তৈরী। দেখেই তাঁর মাথা বিগড়ে গেল, তিনি অমনি তেরিয়া হয়ে দালালকে ধমকে উঠলেন—কি পেয়েছ তুমি, এই পরাত দিয়ে শেষে তুমি আমায় ফাঁসি কাঠে ঝুলাতে চাও?

কেন, কি হল জনাব, আপনার এত গোসার কারণ কি, কি করলাম আমি?

চোখ নেই তোমার, দেখছ না—এই যে লেখা রয়েছে—এ আমাদের মহামান্য খলিফার পরাত।

দালাল শুনে একবার তাকিয়ে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে ওটা নিয়েই ছুটল অমনি খলিফার প্রাসাদের দিকে। সেখানে গিয়ে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে খলিফার সামনে গিয়ে ওখানকার মাটিতে চুমু দিয়ে মিঠাই সমেত পরাতটা দেখিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল—এটা—এটা—

খলিফা কিছুক্ষণ মিঠাইভরতি পরাতটার দিকে তাকিয়েই চিনতে পেরে রাগে গরগর করতে করতে বলে উঠলেন—আমি যখন আমার হারেমের কাউকে কোন খাবার পাঠাই তা বাজারে নীলাম হতে যায় কি করে? কোথায় পেলে তুমি এ মিঠাই ভরতি পরাত?

দালাল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—জাহাঁপনা, বিক্রি করতে দিয়েছে এটা আমার হাতে অমুক এলাকার চৌকিদার।

কোথায় সে চৌকিদার, এখনই গিয়ে পাকড়াও করে নিয়ে এস তাকে আমার সামনে। হুকুম দিলেন খলিফা তাঁর লোকজনদের। খলিফার লোকজন গিয়ে তখনই সে চৌকিদারকে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল। চৌকিদার তখন নিজের মনে গজগজ করছে—মেয়েমানুষের কথা শুনে চলতে গেলে সবার এই দশাই হয়, মাগী এমন তোফা পিঠের একটা আমায় খেতে দিল না, এখন ঠেলা সামলাও!

চৌকিদারকে খলিফার সামনে এনে হাজির করলেই তিনি ধমকে উঠলেন—কোথায় পেলি তুই এ পরাত, সাচ বাত বলবি; নইলে এখনই আমি তোর ঘাড় ভেঙে দেব।

চৌকিদার বললে—মালেক, খোদা আপনাকে চিরজীবী করুন, সাচ ছাড়া এক বিন্দু ঝুটা বলব না, এটা পেয়েছি আমি ছোট আমীর আলাদীন সাহেবের কাছ থেকে, তিনি আমায় পরবের দিনে মিঠাই খেতে দিয়েছেন।

শুনে খলিফা রাগে একেবারে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর বড় কেতোয়ালকে হুকুম দিলেন—যাও ত তুমি তোমার লোকজন নিয়ে আমীর আলাদীনের বাড়ি? তাকে ধরে তার পাগড়ী জামাকাপড় ছিঁড়ে মাটিতে মুখ থুবড়িয়ে টানতে টানতে আনবে, শুধু তাই নয় তার বাড়িঘরদোর ভেঙে ওখানকার সব লুঠ করে নিয়ে আসবে।

যো হুকুম, খোদাবন্দ—বলে কোতোয়াল তখনই রওনা হয়ে গেল আমীর আলাদীনের বাড়ির দিকে। সেখানে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে আলাদীন যখন দেখলে লোকজন নিয়ে শহরের কোতোয়াল, তখন সে বিস্মিত হয়ে বলে উঠল—কি, ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কিছু নয়, খলিফার হুকুমে আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।

বেশ ত, নিয়ে চলুন,—আল্লার হুকুম, তারপরই খলিফার হুকুম—এ ত সবার মানতেই হবে।

কোতোয়াল তখন আমতা আমতা করে বললে—কিছু মনে করবেন না, আলাদীন ভাই সাহেব, আমরা যদিও পরস্পরের নিমক খেয়েছি তবু খলিফার হুকুম ত আমাদের না তামিল করে উপায় নেই, —আপনার সম্বন্ধে হুকুম আমাদের আরও আছে মন যদিও আমাদের তা মানতে চায় না তবু খলিফার হুকুম আল্লার হুকুম—না মেনে আমাদের উপায় নেই—এই বলে কোতোয়াল তার লোকজনদের আলাদীনের বাড়ীঘর ভেঙে লুঠ করতে হুকুম দিয়ে নিজে তার পাগড়ি জামা কাপড় ছিঁড়ে, লোক দিয়ে টানাতে টানাতে এনে হাজির করল খলিফার সামনে।

আলাদীন খলিফার দুই হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে আল্লার কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে বললে, খোদাবন্দ,—

এ বান্দা এমন কি কসুর করেছে যে তার জন্যে তার আজ এমন হেনস্থা ?

হারুন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন—ঐ যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখ দেখি তুমি ওকে চেনো কিনা ?

জি, চিনি. ও আমাদের পাড়ার চৌকিদার।

এ পরাত তোমার হাতে এল কি করে ?

আমীর উত্তরে বললে—আমি বাড়ির ভিতরে ছিলাম, এমন সময় সদরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি এক বৃদ্ধা আর এক তরুণী। বৃদ্ধা আমায় দেখে বললে—আমার এই বেটীর ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, পথের সক্কার পানি ও কিছুতে খাবে না, তাই ওর জন্যে একটু খাবার পানি চাইছি আমি। এই শুনে মেয়েটির জন্যে এক পাত্র খাবার পানি এনে দিলাম আমি। মেয়েটির পানি খাওয়া হলেই ওরা দু'জন চলে গেল। ঘণ্টা খানেক পরে আমি আমার বাড়ীর দরজার সামনে বসে আছি এমন সময় দেখি বৃদ্ধা আবার আমার বাড়ির দিকে আসছে, হাতে তার ঐ মিঠাই ভরতি পরাত। বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বললে—বাবা, যে মেয়েটিকে তুমি পানি খাইয়েছ সে-ই এই মিঠাই পাঠিয়েছে তোমাকে, ওর এমন মন যে ও কারো কোন উপকারের জন্যেই ঋণী হয়ে থাকতে চায় না।

আমি বললাম—ওটা তুমি ঐ মাস্তবোহ-বেদীর উপর রাখ। বুড়ী পরাতটা বেদীর উপর রেখে তখনই চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ চৌকিদার এসে আমার কাছে পরবের মিঠাই খেতে চাইলে আমি ঐ পরাত সমেত মিঠাইগুলি তাকে দিয়ে দিলাম, আমি অবশ্য তখনও ঐ মিঠাইয়ের একটিও চেখে দেখি নি। যাই হোক—চৌকিদার তখনই মিঠাইয়ের থালাটা নিয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

খোদাবন্দ, এ ব্যাপারে এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।

শুনে খলিফা বেশ একটু খুশীই হলেন বলে মনে হল, মনটা তাঁর বেশ হালকা ছিল। পরক্ষণেই তিনি আবার আমীরকে প্রশ্ন করলেন

—আচ্ছা, আলাদীন, ঐ বিবি যখন পানি খাচ্ছিল তখন কি তুমি তার মুখ দেখতে পেয়েছিলে ?

আমীরের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—জি, জাহাঁপনা।

শুনে খলিফা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন, নিয়ে এস সেই কিসরার বেটীকে। খলিফার লোকজন কিসরার বেটীকে এনে হাজির করলে তিনি বলে উঠলেন—তোমার এত বড় সাহস, দান খয়রাত করতে বেরিয়ে এই লোকটার হাতে পানি খেতে গিয়ে তুমি তাকে নিজের মুখ দেখাও, রূপ দেখাও। ওরে তোরা কোথায়—এখুনি এ দুটোকে এক সঙ্গে কোতোল কর।

কিসরার বেটী তখন আলাদীনের দিকে ফিরে বললে—আপনি আমার মুখ দেখেছেন ? কখ্খনো না, এ নির্জলা মিছে কথা, আর আপনার এই মিছে কথার জন্যে আমার জান যাচ্ছে।

আলাদীন বললে—নসিবে লেখা থাকলে কে তা খণ্ডাবে বলুন। বলতে চাইছিলাম আমি—না, আমি কিছুই দেখি নি,—কিন্তু হঠাৎ কি করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঐ কথা। নসিব, সবই নসিব।

এরপর জল্লাদ খলিফার হুকুম তামিল করতে লাল কম্বল বিছিয়ে তার উপর ওদের দুইজনকে দাঁড় করিয়ে হাত বেঁধে দিল, তারপর ওদেরই জামাকাপড় কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে ওদের চোখ বেঁধে দিল, তারপর ওদের চারিদিকে একবার চক্কোর দিয়ে বলে উঠল—হুকুম, জাহাঁপনা।

খলিফা বললেন—লাগাও।

এরপর জহ্লাদ দ্বিতীয়বার ওদের চারিদিক ঘুরে খলিফার হুকুম চাইলে সেবারও তিনি খড়্গাঘাত করবার হুকুম দিলেন। এরপর জহ্লাদ তৃতীয়বার ওদের চারিদিকে ঘুরে এসে খলিফার হুকুম চাওয়ার আগে আলাদীনকে বললে—সাহেব, আপনার যদি কোন অভিলাষ থাকে, অবশ্য মুক্তি ছাড়া, মুক্তি দেবার আমার কোন হাত নেই, মুক্তি ছাড়া অন্য অভিলাষ যদি কিছু থাকে তা হলে আমায় বলতে পারেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

শুনে আলাদীন বললে—তুমি একবার আমার চোখের বাঁধন খুলে দাও, যাতে আমি এ তুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেবার আগে একে এবং আমার আপনজনদের একবার প্রাণ ভরে দেখে যেতে পারি, এরপর তোমার যা করবার তা করো, আমার কোন ক্ষোভ থাকবে না।

আলাদীনের কথায় জহ্লাদ তার চোখের বাঁধন খুলে দিলে সে একবার তার ডান দিকে তাকাল কিন্তু তুঃখ সহানুভূতি জানাতে কেউই তার কাছে এগিয়ে এল না, এরপর বাঁ দিকে তাকাতে সেখানেও কোন সাড়া পেল না। খলিফার ভয়ে সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে, মুখ তুলে কেউ চাইল না পর্যন্ত। আলাদীন তখন খলিফার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলে' উঠল—খোদাবন্দ, আমার একটা কথা শুধু বলতে চাই আমি।

কি কথা—বলো ?

মেহেরবানি করে তিনদিন সময় দিন আমায়, এই তিনদিনের মধ্যে আপনি এমন এক তাজ্জব ব্যাপার দেখতে পাবেন যা কেউ কোনোদিন শোনে নি দেখে নি !

বেশ, দিলাম আমি সময়, কিন্তু মনে রেখো এই তিনদিনের ভেতর কোন তাজ্জব যদি আমার চোখে না পড়ে তা হলে তার পরের দিনই নির্ঘাত তোমার গর্দান নেব আমি।

এরপর খলিফা ওদের তু'জনকেই কারাগারে আটকে রাখবার হুকুম দিলেন।

তু'দিন কেটে গেল, তৃতীয় দিনে—তাজ্জব যদি কিছু ঘটে আজই ঘটবে মনে করে—খলিফা হঠাৎ তাঁর সিংহাসন ছেড়ে উঁচু গোড়ালির শক্ত চামড়ার জুতো পরে মাথায় মধু-রঙের পাগড়ি এঁটে, কাঁধে একটা কাউস-অল-বন্দুক ঝুলিয়ে—কেউ তাঁকে আর খলিফা বলে যেন চিনতে না পারে—এমন ছদ্মবেশে সেজে একটা থলিতে মোহর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর প্রাসাদ থেকে, তারপর বাগদাদের পথে পথে অলিতে গলিতে দীনতুঃখী ফকির দরবেশদের ভিক্ষা দিতে

দিতে ঘুরতে লাগলেন, মনে ভাবছেন—দেখা যাক কখন কোথায় সেই তাজ্জব ব্যাপারটা তার চোখে পড়ে।

এমনি চলতে চলতে প্রায় দুপুরের কাছাকাছি তিনি কয়াসরিয়াহ অর্থাৎ শহরের বড়বাজারের কাছে যেই এসে গেছেন অমনি দেখেন একটি লোক বাজার থেকে বেরিয়ে নিজের মনেই বলতে বলতে চলেছে, তাজ্জব ব্যাপার রে আল্লা, এমন তাজ্জব কেউ কোন দিন দেখে নি, শোনে নি।

খলিফা অমনি তাকে প্রশ্ন করে বসলেন—কি তাজ্জব দেখলেন আপনি, জনাব?

বলেন কি, তাজ্জব না? কয়াসরিয়াহে একটি স্ত্রীলোক নির্ভুল কোরানের বয়েৎ আউড়ে যাচ্ছে—ঠিক যেন আমাদের পয়গম্বর বলে যাচ্ছেন, আর আরম্ভ করেছে সে এখন! কখন সেই ফজর থেকে, আর এখনও থামে নি, অথচ এ পর্যন্ত কেউ তাকে একটা দিরহাম ভিক্ষা দিল না, না দিল এক টুকরো খাবার। আপনিই বলুন না, এর চেয়ে তাজ্জব কিছু শুনেছেন আপনি কোন দিন, দেখেছেন?

লোকটার কথা শুনে খলিফা বাজারের ভেতর ঢুকে দেখেন সত্যিই এক বৃদ্ধা এক জায়গায় বসে স্পষ্ট নির্ভুল উচ্চারণে কোরানের বয়েৎ আউড়ে চলেছে, প্রায় শেষ করে আনলে সে। খলিফা মুগ্ধ হয়ে তার কোরান আবৃত্তি শুনতে লাগলেন। একটু পরেই কোরান শেষ করে বৃদ্ধা আল্লার কাছে আশে পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করলে। কিন্তু আশ্চর্য কেউই তাকে কিছু ভিক্ষা দিল না।

খলিফা ভাবলেন—না দেয় না দিক, আমার থলিতে যা আছে সব আমি দিয়ে যাব ওকে—এই ভেবে তিনি তাঁর থলিতে হাত ঢুকিয়েছেন এমন সময় বৃদ্ধা তড়াক করে উঠে পাশেরই এক তরুণ বণিকের ঘরে ঢুকে বললে—বেটা, আমার এক খুবসুরত বেটী আছে, তুমি তাকে ঘরে নেবে?

বেশ, নিতে পারি।

তবে এস আমার সঙ্গে, আমি আল্লার কসম নিয়ে বলতে পারি এমনটি তোমার কোনদিন চোখে পড়ে নি।

শুনে খলিফা মনে মনে বললেন—ইয়া আল্লা! আমি ভেবেছিলাম—এ পীরটীর কিছু হবে, কিন্তু এখন দেখছি এ মহা ধুরন্ধর, যাই হোক এদের দুইজনের কাণ্ডকারখানা না দেখে কিছুই দিচ্ছি না আমি বুড়ীকে।

*

এরপর বুড়ী তরুণ বণিককে নিয়ে তার বাড়ি ঢুকল আর খলিফা তাদের অলক্ষ্যে তাদের পিছু পিছু গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালেন সেখান থেকে বাড়ির ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু চোখে পড়ে।

বুড়ী বাড়িতে ঢুকেই তার মেয়েকে ডাকলেই মেয়ে তার কাছে এগিয়ে এল আর এদিকে তাকে দেখে খলিফার মাথাটা যেন ঘুরে গেল: কই তার হারেমে ত এমন খুবসুরত মেয়ে একটিও নেই। যেমনি মিষ্টি এর মুখখানা তেমনি রঙ, তেমনি দেহের গড়ন, কাজলা দুটি চোখে যেন বেহেস্তের স্বপ্ন ঘনিয়ে আছে, আর কি এ ভুরু রে আল্লা, ঠিক যেন দুটো ধনু—এ থেকে তীর ছুঁড়লে কোন পুরুষের আর রক্ষে নেই। ঠোঁট দুটো যেন এক জোড়া 'কারলোয়নি', দাঁত-গুলি যেন দুই সার মুক্তো, কটি ক্ষীণ। কত আর দেখবেন খলিফা দেহের প্রতিটি অঙ্গ তার পুরুষের মাথা খারাপ করে দেবার মত, তাই তিনি গোপন জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতেই লাগলেন।

মেয়েটির গায়ে তেমন আঁটসাট জামাকাপড় ছিল না তাই মায়ের পাশে একজন তরুণ তাকে হাঁ করে দেখছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—আম্মা তুমি কি গো, একজন অজানা পুরুষের সামনে আমায় তুমি না বলে কয়ে হাজির করলে—আল্লার চোখে এ গুনাহ্ হয়, জানো না।

গুনাহ্ হতে যাবে কেন, পোড়ারমুখী, যে আইন মত তোকে ঘরে নিয়ে ঘর করবে—সে তোকে একবার ভাল করে দেখবে না?

মেয়েটি এই কথা শুনে ঘরে গিয়ে লুকাল, আর খলিফা বুড়ীর

কথায় যখন বুঝলেন বুড়ী ঐ বণিকের সঙ্গে মেয়ের সাদি দেবার জন্যে তাকে ডেকে এনেছে, কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই, তখন তাঁর মনটা বেশ হালকা হয়ে এল।

এবার বুড়ী আর তরুণ বণিকের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল। বুড়ী বললে—কেমন, পছন্দ হয়েছে তোমার আমার বেটীকে ?

হ্যাঁ খুব, খুব পছন্দ !···তা এর জন্যে পণ যৌতুক কত কি দিতে হবে আমার ?

চার হাজার আর চার হাজার—মোট আট হাজার দিনার।

ইয়া আল্লা, আমার সব কিছু বেচলেও যে এত হয় না। চার হাজারের যোগাড় করতে হলেই আমার ধার করতে হবে, তার ভেতর থেকে এক হাজার আমি আপনার মেয়ের পণ দেব, এক হাজার আপনার মেয়েকে পোশাক-আশাক দিতে আর ঘর সাজাতে খরচ করব, বাকী রাখব আমার ব্যাবসা চালাতে। এতেই যদি রাজী থাকেন আপনি ত পারি, নইলে সেলাম—

বুড়ী ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—তবে আমার বেটীর মাথার একটা চুল পাবে না তুমি, বেটী ত দূরের কথা।

বণিক মুখ ভার করে বললে—তা হলে চলি, সেলাম।

বণিক বেরুবার উদ্যোগ করতে খলিফা দরজার সামনে থেকে সরে এক পাশে আত্মগোপন করলেন। তারপর বণিক অদৃশ্য হবারও কিছুটা পর খলিফা বুড়ীর বাড়ির ভিতর ঢুকে তাকে সেলাম জানালে বুড়ীও তাকে সেলাম জানিয়ে বললে—কে তুমি, কি চাই ?

খলিফা বললেন—যে তরুণ বণিক এই একটু আগে আপনার বাড়ি থেকে চলে গেল সে আমাকে বলে গেল আপনাকে খবর দিতে যে আপনার মেয়েকে সাদি করবার ইচ্ছে তার নেই।

সে ত আমি বুঝেই নিয়েছি।

তা—আমি আপনার বেটীকে সাদি করতে চাই, এর জন্য যে সোনাদানা বা আর যা কিছু চাই আপনার তা আমি দিতে রাজী।

বুড়ী শুনে হো হো করে হেসে উঠল—ওহে ডাকুর বেটা ডাকু,

তোমার পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে দুশো দিরহামের মুরদ নেই তোমার : চার হাজার, চার হাজার—আট হাজার দিনারের যোগাড় করবে তুমি কি করে ?—হবে না, সরে পড়ো।

খলিফা বললেন—বিবি সাহেব, আপনার ক্ষেতের আঙুর বিক্রি করতে চান আপনি, না ক্রেতার সঙ্গে ঝগড়া করাই আপনার মতলব ?

বিক্রিই করতে চাই আমি।

তা হলে তা কিনবার সব রেস্ত আমার হাতে আছে।

বেশ, গনে ওজন করে দাও আমার প্রাপ্য, দেব আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের সাদি।

এই কথা শুনে খলিফা বললেন—ঠিক আছে, তারপর ওদের বাড়ির বাইরের ঘরে ভাল একটা আসনে গিয়ে বসে বললেন, আপনি একবার অমুক কাজীর কাছে গিয়ে বলুন ত—অল বুন্দুকানি আপনাকে একবার তলব করেছে।

শুনে বুড়ী বলে উঠল : কাজি তোমার নকর নাকি যে তোমার হুকুমে আসতে যাবেন ?

খলিফা হেসে বললেন—আপনি একবার গিয়ে তাকে বলেই দেখুন না, কিচ্ছু ভয় নেই ভাবনা নেই আপনার, গিয়ে শুধু বলবেন—তিনি যেন কালি কলম আর কাগজ নিয়ে আসেন।

শুনে কি আর করবে বুড়ী, কাজীর বাড়ির দিকেই রওনা হল, ভাবতে ভাবতে গেল—আমার এই হবু জামাই বোধহয় ডাকুর সর্দার টর্দার কিছু হবে, নইলে কাজীর কাছে অমনি করে পাঠায়। কাজীর বাড়ি গিয়ে বুড়ী দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কাজী অনেক লোক নিয়ে ঘরে বসে আছেন, বুড়ীর সেখানে ঢুকতে ভয় করতে লাগল, একবার দরজার কাছে এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। কাজীর হঠাৎ তার দিকে একবার নজর পড়তেই তিনি তাঁর এক বান্দাকে বললেন—ঐ বুড়ী কি বলতে চায়, ওকে একবার ডেকে নিয়ে আয় ত ঘরে। বান্দা গিয়ে বুড়ীকে বললে—এস তুমি কাজী তোমাকে

ডাকছেন। বুড়ী তখন অতি ভয়ে ভয়ে বান্দার সঙ্গে গিয়ে কাজীকে সেলাম করে দাঁড়াল। কাজীও প্রত্যুত্তরে তাকে সেলাম জানিয়ে বললেন—কি চাই তোমার, কেন এসেছ?

বুড়ী বললে—হুজুর, আমার বাড়িতে একজন অল্পবয়সী সাহেব এসেছেন তিনি আপনাকে তার কাছে একবার যেতে বলছেন।

কাজী বেশ একটু রুষ্টস্বরে বললেন, কে বটে এই সাহেব যে আমার নিজের যেতে হবে তার কাছে, নাম কি তার?

উনি ত বলছেন ওঁর নাম অল বুন্দুকানি।

এখন এই অল বুন্দুকানি খলিফা হারুন-অল-রসিদের আর একটা নাম,—গোপন নাম, ওঁর দরবারের বড় বড় কর্মচারী ছাড়া ওঁর এ নাম সাধারণ লোকের কেউ আর জানে না।

যাই হোক অল বুন্দুকানি নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাজীর মুখ চোখের ভাব একেবারে পালটে গেল, সুর পালটে গেল, তিনি অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—চলুন, বিবিসাহেব। চলুন, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—বলে উঠে পড়লেন। বুড়ী মনে মনে ভাবলে—আমার হবু জামাই ডাকুসর্দারের হাতে এই কাজী কোনদিন রাত্রে কোথাও না কোথাও জব্বর ধোলাই খেয়েছে নইলে এত ভয় কেন তাঁর, মুখে বললে, তিনি আপনাকে কালিকলম, কাগজ নিয়ে যেতে বলেছেন।

কাজী তাড়াতাড়ি ও সব নিতে ভুলে গেলেন।

বুড়ীর বাড়ির কাছাকাছি এসে কাজী বললেন—আপনি আগে ঢুকুন। বুড়ীর পিছু পিছু ঢুকে কাজী দেখেন খলিফা হারুন একটা কামরার সামনে একটা আসনে বসে আছেন। কাজী তখনই তাঁর সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে কুর্নিশ করতে যাচ্ছিলেন, খলিফা চোখ ইশারায় নিষেধ করলেন। সুতরাং কাজী তাঁকে সেলাম করেই তাঁর পাশে বসে বললেন—কি হুকুম, হুজুর।

খলিফা বললেন—আমি এই বুড়ীর মেয়েকে সাদি করতে চাই, তুমি চুক্তিনামা-টামা তৈরি করো।

কাজী তখন বুড়ী এবং তার মেয়ের সম্মতি জিজ্ঞাসা করলে তারা

যখন জানালে তারা রাজী তখন তিনি পণ-যৌতুকের প্রশ্ন তুললেন। তখন বুড়ী বললে—পণ চার হাজার দিনার আর অন্যান্য খরচ বাবদ চার হাজার। এবার কাজী খলিফার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি এতে রাজী ?

হ্যাঁ।

কাজী তাড়াতাড়িতে কাগজ আনতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই নিজের দামী আচকানের প্রান্তভাগ ছিড়ে নিয়ে তারই উপর বিয়ের চুক্তিনামা লিখতে শুরু করলেন।

কাজী চুক্তিনামায় খলিফা তাঁর বাপ এবং ঠাকুর্দার নাম পটাপট লিখে ফেললেন, কারণ সে সব তাঁর জানা, এরপর মেয়ে এবং তার বাপ ঠাকুর্দার নাম জিজ্ঞাসা করলে বুড়ী তা বলবার আগে কেঁদেকেটে একেবারে তোলপাড় করে তুললে! ওর বাপ বেঁচে থাকলে এই ডাকুর সাধ্যি কি আমাদের দোরের গোড়ায় হাজির হয়, ওর সঙ্গে মেয়ের সাদি ত দূরের কথা। অকালে তিনি আল্লার কাছে চলে গেলেন তাই ত আমাদের এই দশা!

কাজী বুড়ীর এই বিলাপের মধ্যেই কোন রকমে তার দরকারী খবরগুলি সংগ্রহ করে তাঁর চুক্তিনামা লিখতে লাগলেন। বুড়ীকে যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলবার আগে তার নসিবের কথা বলে নিজের গাল মাথা চাপড়াতে থাকে, কাজী মাথা নেড়ে তাতে সায় দেন বটে কিন্তু বিরক্তিতে তাঁর দমটা যেন আটকে আসে, আর এদিকে বুড়ীর কাণ্ডকারখানা দেখে খলিফা আর কিছুতেই হাসি চাপতে পারেন না।

চুক্তিনামা লেখা শেষ হলে কাজী সেটা খলিফার হাতে তুলে দিলেন। ওটা লিখতে নিজের আচকানটা ছিঁড়ে ফেলেছেন তিনি, ওটা গায়ে নিয়ে বাইরে বেরুতে লজ্জা করছিল বলে ওটা খুলে বুড়ীর হাতে দিয়ে বললেন—চাচী, এটা যে হয় কাউকে—মানে কোন ফকির দরবেশকে দান করে দেবেন। এরপর খলিফা আর বুড়ীকে সেলাম জানিয়ে কাজী সে বাড়ি থেকে চলে গেলেন।

কাজী চলে গেলে বুড়ী খলিফাকে নিয়ে পড়ল। কাজী ডাকবামাত্র তোমার কাছে এলেন, কষ্ট করে চুক্তিনামা লিখলেন, কাগজ আনেন নি বলে এমন দামী আচকানটা তাঁর ছিড়তে হল—এ সবের জন্যে ওঁকে কিছু দিলে না? উনি যে শুধু হাতে চলে গেলেন?

যাক গিয়ে, ওকে আমি কিছু দেব না।

কেন, কারণটা কি? লোকটা তুমি ডাকবামাত্র এমন হন্তদন্ত হয়ে এল কাজকর্ম সব করে দিলে, তার এমন আচকানটা নষ্ট হল, আর তুমি তাকে কিছুই দিলে না, ডাকাতরা এমনই স্বার্থপর বটে!

শুনে খলিফা হেসে উঠে দাঁড়ালেন, যাই একবার বাড়ি যাই, আপনার মেয়ের পণের মোহর, আর বিয়ের সাজ পোশাক আনতে হবে যে।

মুখে ত দিব্যি আউড়ে যাচ্ছ, কিন্তু এত সব যোগাড় করবে তুমি কোথেকে? কার ঘর লুঠ করবার মতলব করেছ?

খলিফা এ সব কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজের প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজের রাজকীয় পোশাক পরে সিংহাসনে বসে শহরের পাথর কাটা মিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী এবং রাজমিস্ত্রী এবং রঙ মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। ওরা এসে তাঁর দু হাতের সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে দাঁড়ালে তিনি তাঁর লোকজনদের হুকুম দিলেন—এদের উপুড় করে ফেলে, প্রত্যেকের মাথায় দুশো করে বেতের ঘা লাগাও ত!

ওরা সঙ্গে সঙ্গে কাতর কণ্ঠে বলে উঠল—জাহাঁপনা কি কসুর করেছি আমরা যে আমাদের এই শাস্তির হুকুম হল?

খলিফা বললেন—কসুর না? 'দবর অল-জাদির' অমুক বাড়িটা তোমরা চেন?

জি।

খলিফা তখন পাথর-কাটা মিস্ত্রী আর রাজমিস্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন—আমার হুকুম,তোমরা এখন গিয়ে ঐ বাড়ির দেয়াল আর মেঝেতে যেখানে যত শ্বেত পাথর লাগে দিয়ে মেরামত করতে

শুরু করে দাও। বিকেলের আগে সারা করা চাই, নইলে তোমাদের সবারই হাত কেটে ফেলব আমি।

ওরা তখন বললে—মালেক, অত পাথর আমরা যোগাড় করব কি করে ?

খলিফা বললেন, সরকারী গুদাম থেকে নাও। আর শোনো—ও বাড়ীর কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কে পাঠিয়েছে তোমাদের—তোমরা বলবে—আপনার জামাই। যদি জিজ্ঞাসা করে কি কাজ করে সে, কি তার পেশা, তোমরা বলবে—আমরা—তা জানি না। যদি জিজ্ঞাসা করে তার নাম কি, তোমরা বলবে—তাঁর নাম অল বুন্দুকানি। বাস্। আর কোন কথা বললে তার উত্তর দেবে না, দিলে—যে দেবে তাকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলাব।

এরপর সর্দার মিস্ত্রী শহরে যত পাথর মিস্ত্রী ছিল সবাইকে নিয়ে সরকারী গুদাম থেকে শ্বেতপাথর বের করে উট আর গাধার পিঠে বোঝাই করে বুড়ীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বুড়ী এই সব নিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—কি চাই তোমাদের ?

এই শ্বেতপাথর দিয়ে আমরা আপনার ঘরের দেয়াল আর মেঝে মেরামত করব।

কে পাঠিয়েছে তোমাদের ?

আপনার জামাই।

কি কাজ করে সে ?

তা আমরা জানি না।

নাম কি তার ?

অল বুন্দুকানি।

শুনে বুড়ী নিজের মনে মনেই বলতে লাগল—আমার এই জামাই নিশ্চয়ই কোন বড় ডাকাত বা চোরের দলের সর্দার।

এরপর মিস্ত্রীরা তাদের কাজ শুরু করে দিলে। মিস্ত্রীর সংখ্যা অনেক সুতরাং প্রত্যেকের ভাগে অতি কম কাজের ভারই পড়ল। সর্দার মিস্ত্রী তদারক করতে লাগল।

এদিকে মহামান্য খলিফা ছুতোর মিস্ত্রীদের সর্দারকে বললে—এবার তুমিও ঐ বাড়ীতে যাও, শহরে যত ছুতোর মিস্ত্রী আছে সবাইকে ডেকে নিয়ে যাও। সরকারী গুদাম থেকে যত যা কাঠ লাগে নিয়ে যাও গিয়ে—ও বাড়ীর দরজা জানালা—বা কাঠের তৈরি অন্যান্য জিনিসের যেখানে যত মেরামত করবার থাকে—করতে শুরু করে দাও। বিকেলের আগে শেষ করা চাই, নইলে তোমার গর্দান যাবে।

এ ছাড়া খলিফা পাথরমিস্ত্রী রাজমিস্ত্রীদের যেমন বলেছিলেন তেমনি তাকেও শিখিয়ে দিলেন ও বাড়ির কেউ তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে—তাঁর নাম অল বুন্দুকানি—এ ছাড়া অন্য কোন কিছুর পরিচয় যেন না দেয়।

এরপর ছুতোর মিস্ত্রীর সর্দার খলিফার নির্দেশ মত লোক যোগাড় করে সরকারী গুদাম থেকে মালপত্র নিয়ে বুড়ীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে বুড়ী তাদের জিজ্ঞাসা করলে, কেন এসেছ তোমরা, কে পাঠিয়েছে?

পাঠিয়েছেন আপনার জামাই।

কি করে সে?

জানি না।

নাম কি তার?

অল বুন্দুকানি।

এরপর মিস্ত্রীরা তাদের কাজ শুরু করল বটে কিন্তু বুড়ী আর নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারছে না, সে তখন মনে মনে বলছে, আমার জামাই আগে যা ভেবেছিলাম, তা নয়, তার চাইতেও বেশি! সে বোধ হয় মানুষই নয়, জিনের সর্দার, নইলে এরা তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কিছু বলতে চায় না কেন?

এদিকে খলিফা এরপর অস্তর, চূণকাম আর ঘরদোর রঙ করার মিস্ত্রীদেরও ঐসব কথা বলে পাঠালেন বুড়ীর বাড়িতে। কড়া হুকুম—বিকেলের নমাজের আগেই সব শেষ করতে হবে, নইলে গর্দান যাবে।

এরা গিয়ে বুড়ীর সওয়ালের জবাব দিয়ে যখন কাজ আরম্ভ করলে তখন বুড়ীর মাথা ঝিমঝিম করতে সুরু করল: জামাই তার কি তা সে বুঝতেই পারছে না। এক বছরের কাজ সে এক প্রহরে শেষ করাতে চায়। এরপর বুড়ী পাগলের মত মিস্ত্রীদের এর ওর কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগল— আচ্ছা, বাপধন, আমার জামাই কি—কি কাজ করে সে—এ কথা তোমরা আমায় কিছুতেই বলতে চাইছ না কেন? উত্তরে ওরা সবাই বললে—কি করব, চাচী, বলবার জো নেই, বললে যে আমাদের জান যাবে।—শুনে বুড়ী শেষে আবার সাব্যস্ত করলে, জামাই তার নিশ্চয়ই কোন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার, নইলে এরা সকলেই তাকে এত ভয় করে চলে কেন?

মিস্ত্রীরা বিকেলের নমাজের কিছুটা আগেই তাদের কাজ শেষ করে খলিফার কাছে গিয়ে বললে—খোদাবন্দ, আমরা আমাদের সব কাজ সেরে এসেছি। শুনে খলিফা তাদের খিলাত বকশিশ দিয়ে খুশী করে বিদায় দিলেন।

এরপর হারুণ-অল-রসিদ তাঁর বান্দাদের ডেকে দামী রেশমী কাপড়ে তৈরি বিছানা, গালিচা, পরদা, বিছানার চাদর, দুই চুপড়ি ভরতি সোনার জরি দেওয়া কনের পোশাক, এক পেটরা ভরতি জড়োয়া গহনা, সোনা রুপো পেতলের বাসন-কোসন ইত্যাদি পাঠাবার আয়োজন করলেন, এর সঙ্গে আর একটা পেট্রায় দিলেন—আট হাজার দিনার।

জিনিসপত্র উট গাধার পিঠে সাজিয়ে খলিফার লোকজন তৈরী হলে তিনি তাদের বললেন—দবর-অল-জাদির অমুক বাড়িতে এ সব পৌঁছে দিবি, আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—এ সব কে পাঠালে—বলবি—পাঠিয়েছেন আপনার জামাই। জামাইয়ের পেশা কি জিজ্ঞাসা করলে বলবি, জানি না, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবি, অল বুন্দুকানি।

খলিফার লোকজন ঐ সব জিনিসপত্র নিয়ে বুড়ীর বাড়িতে এসে কড়া নাড়লে বুড়ী দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বললে—কে তোমরা, কি চাই?

ওরা বললে, আমরা আপনাকে এই সব জিনিসপত্র দিতে এলাম। শুনে বুড়ী চীৎকার করে উঠল—ভুল করেছ তোমরা, মহা ভুল—এত সব দামী দামী জিনিস কোত্থেকে আসবে আমার?—অন্য কারো জিনিস এ, ভুল করে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। এ আমি নিতে যাব কেন, যার জিনিস খুঁজে পেতে তার বাড়িতে পৌঁছে দাও।

ওরা তখন বুড়ীকে বললে—এই বাড়িটা আজই মেরামত হল না?

জি।

তা হলে আপনারই জিনিস এ সব, চাচী, আপনার জামাই পাঠিয়েছেন। এ সব দিয়ে আপনি আপনার ঘর বাড়ি সাজান, পোশাক অলংকার দিয়ে যাকে সাজাবার সাজান। আপনার জামাই বলে পাঠিয়েছেন—তিনি এখন তাঁর কাজে ব্যস্ত আছেন, রাত্রি হলে তাঁর কাজকর্ম সেরে তিনি আসবেন।

শুনে বুড়ী মনে মনে ভাবলে—তা হবেই ত! চোর ডাকাত ত লোকের বাড়ি রাত্রি না হলে আসে না।

জিনিস রেখে খলিফার লোকজন চলে গেলে বুড়ী তার প্রতিবেশিনীদের কয়েকজনকে ডেকে আনল—এই সব জিনিস দিয়ে ঘরদোর সাজাতে, একা সে পেরে উঠবে কেন? তারা এসে জিনিসপত্র দেখে ত একেবারে থ: ইয়া আল্লা, এত সব বাদশাহী জিনিস তোমার এল কোত্থেকে, চাচী? ঘরদোরের দিকে চেয়েও তাদের চক্ষুস্থির: এ আল্লা—এ কি কাণ্ড, কাল ছিল এ যেন একটা ধ্বংসস্তূপ, আর আজ একেবারে নতুন আনকোরা বাদশাহী মহল, কখন বা এ হল, আর হলই বা কি করে?—আমরা ঘুমিয়ে খোয়াব দেখছি না ত!—এই বলে তারা নিজেদের গায়ে নিজেরা চিমটি দিতে লাগল।

বুড়ী তাদের কাণ্ড দেখে হেসে বললে—না, না খোয়াব নয়, এ সত্যি, একেবারে বিলকুল সাচ, এ আজই আমার জামাই

করিয়েছে, আর এই যে সব দামী জমকালো জিনিসপত্তর দেখছ, এ-ও সব আমার জামাই পাঠিয়েছে।

প্রতিবেশিনীরা শুনে তাজ্জব বনে গিয়ে বললে—ওঃ তাই বুঝি! তা চাচী, তোমার জামাই তা হলে কোন বড় বণিক বা আমির-টামির হবে।

না গো, না,—আমার জামাই ও সব কিছু নয়, সে ডাকাতের দলের সর্দার।

প্রতিবেশিনীরা শুনে রীতিমত ভয় পেয়ে বললে—এ আল্লা গেছি. শেষে ডাকাতের সর্দারকে জামাই করলে তুমি, দোহাই তোমার, তোমার জামাইকে বলে দিও, আমরা তোমার প্রতিবেশী আপনজন, আমাদের কোন জিনিসপত্তর যেন লুঠ না করে।

বুড়ী বললে—না, না তোমরা কোন ভয় রেখো না মনে, তোমরা আমার প্রতিবেশী, আপনজন, ডাকাতের সর্দার কেন সে জিনের সুলতান হলেও তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না, বরং তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, একটা আঁচড় লাগতে দেবে না তোমাদের গায়ে।

শুনে চাচীর ডাকু-জামাইয়ের ভয় আর রইল না তাদের মনে, তারা তখন ঐ সব মূল্যবান জিনিস দিয়ে চাচীর ঘরদোর সাজাতে শুরু করে দিল। ঘর সাজানো হয়ে গেলে তবে কনেকে নিয়ে পড়ল: কনের পরণের ছেঁড়া জামাকাপড় ছাড়িয়ে চুবড়ি থেকে জামাইয়ের দেওয়া সোনার, মণিমুক্তোর কাজ করা জমকালো পোশাক আর কত রকমের জড়োয়া তাকে পরিয়ে তারা যখন সাজানো শেষ করল, তখন তার দিক থেকে চোখ আর ফেরানো যায় না। কে বলবে তাকে চাচীর সেই সাবেক বেটী, সে যেন কোন শাহাজাদী, তারও বুঝি বেশী সে, বুঝি বেহেস্তের কোন হুরী।

প্রতিবেশিনীরা কনে সাজানো সব শেষ করেছে, এমন সময় মস্তবড় একদল হামাল (প্রেরিত বাহক) বড় বড় পাত্র ভরতি কোর্মা কাবাব, বিরিয়ানি, হালুয়া, মেওয়া দেওয়া নানা রকমের মিঠাই নিয়ে বুড়ীর বাড়িতে হাজির।

কে পাঠিয়েছে—না, বুড়ির জামাই—কেন না, জামাই বলে দিয়েছেন যে তার শাশুড়ী যেন এই দিয়ে তার প্রতিবেশীদের এবং তার আর যাকে খুশি খাওয়ান।

বুড়ী হামালের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলে—বাপু হে, তুমি বলতে পারো—আমার জামাই কি কাজ করে?

তা ত জানি নে আমরা, বুড়ী মা।

নাম কি তার বল ত?

নাম তাঁর অল বুন্দুকানি।

সর্দার আর কোন কথা না বলে বুড়ীকে সেলাম জানিয়ে তার দলবল নিয়ে চলে গেল। প্রতিবেশিনীদের অনেকেই বলতে লাগল—তা চাচী, তোমার এ জামাই ডাকুর সর্দার না হয়ে যায় না। ওদের মাঝে যারা নিজেদের অভিজ্ঞ বলে মনে করে তারা এই সব কাণ্ড দেখে বলে উঠল—তা ভাই চাচীর এ জামাই ডাকাতের সর্দারই হোক আর যাই হোক, এর সঙ্গে এই বাগদাদের কোন মিঞাই এঁটে উঠতে পারবে না, তা আমরা আগে থাকতেই বলে রাখছি।

এর পর বুড়ী ঐ সব খাবার—যাদের সে ডেকে এনেছিল তাদের পরিতোষ করে খাওয়ালে, আশেপাশের বাড়ির আর সবাইকে ডেকে এনে খাওয়ালো; নিজেরা খেলে, তা ছাড়া বাছাই করে বেশ কিছু বর এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ যদি কেউ আসে তার জন্যে রেখে দিলে।

বুড়ী যে তার মেয়েকে এক ডাকাতের সর্দারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, এবং জামাই এক দিনের ভেতর তার ঘরদোর নতুন করে তাকে দস্তুরমত বড়লোক করে দিয়েছে—এ খবর লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর ক্রমে—যে বণিক ছোকরা আগে বুড়ীর মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—কিন্তু সে পণের পুরো সোনা দিতে পারলে না বলে বুড়ী তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে না—তার কানে গিয়েও পৌঁছল। শুনে তার মন হিংসায় জ্বলে যেতে লাগল। সে তখন ঠিক করল, সে শহরের বড় কোতোয়ালের কাছে গিয়ে তাকে অনেক কিছু দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তার হাতে এই

ডাকুর সর্দারকে ধরিয়ে দিয়ে বুড়ীর মেয়েকে সেই তার বিবি করে নেবে।

আর এক লহমা দেরি করা ঠিক নয় মনে করে সে তখনই বড় কোতোয়ালের কাছে গিয়ে তাকে অনেক দিনারের লোভ দেখিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করল। শুধু তাই নয়, সে আরও বললে—ঐ ডাকুটার কাছ থেকেও আপনি অনেক কিছু আদায় করতে পারবেন, হুজুর,—ও অনেক ধনসম্পদের মালিক। শুনে কোতোয়াল মহাখুশী হয়ে বললে—বহুৎ আচ্ছা, রাত্রে খাবার সময় হোক, ডাকু খেতে আসবে তার বাড়িতে, আমরা তখন গিয়ে ওকে পাকড়াও করব, তুমি তখন অনায়াসে ঐ বিবিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে।

শুনে তরুণ বণিক কোতোয়ালকে ধন্যবাদ জানিয়ে খুশী মন নিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমে রাত্রি হল, লোকের খানাপিনার সময় হল, রাস্তাঘাটে লোকজন চলাচল এক রকম নেই বললেই হয়, এমন সময় বণিক গিয়ে বড় কোতোয়ালের কাছে হাজির হলে বড় কোতোয়াল নাজুক তখনই তার কয়েকজন সহকারী, চারশো অশ্বারোহী, এবং আরও অনেক লোকজন নিয়ে কাগজের ঢাকনার মাঝে চেরাগ জ্বালিয়ে হাজির হল বুড়ীর বাড়িতে।

বুড়ীর বাড়িতে যে সব লোকজন এসেছিল তারা সব খানাপিনা সেরে সেখান থেকে চলে গেছে, বাইরের লোক আর একজনও নেই, তবু বুড়ী বাড়ির ঘরে বাইরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে: বর আসবে। বাড়ির সব দরজাই বন্ধ। কোতোয়াল নাজুক এই দেখে তার লোকজনদের বললেন—তোমরা আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দাও। কোতোয়াল নাজুকের লোকজন ঐ রকম টোকা দিলে বুড়ী তার জানলার খড়খড়ি দিয়ে দেখলে আলো জ্বেলে কোতোয়ালের ঘোড়সোয়ার আর লোকজন তার বাড়ির সামনের রাস্তা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। দেখে বুড়ীর পিলে একেবারে চমকে গেল। ভয়ে দরজা খুলতে আর সাহস পেল না সে।

বড় কোতোয়াল নাজুকের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তার এক সহকারী ছোট কোতোয়াল শামাসাহ। শামাসাহের মাথায় যেমন চুল দেন নি খোদা,—গায়ে একটা লোম দেন নি,—দিলেও তার তেমনি জন-মুনিষ্যির উপর দয়ামায়া দরদ বলে কিছু দেন নি। সে তখন নাজুককে বললে—আমাদের এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি, আপনি হুকুম দিন আমরা দরজা ভেঙে বুড়ীর ঘরে ঢুকে ভাল ভাল জিনিস যা পাই—তা সব লুঠ করে নি।

এই কথা শুনে হাসান নামে নাজুকের আর এক সহকারী তার কাছে এগিয়ে এল। হাসান নামেও হাসান, কাজেও হাসান, যেমনি সুন্দর তার চেহারা তেমনি তার কথাবার্তা, বুদ্ধি বিবেচনা। সে নাজুককে বললে—না, না, এ কাজটা ভাল হবে না, হুজুর, শেষে আপনি ফ্যাসাদে পড়তে পারেন। এ বুড়ীর নামে কোন নালিশ নেই, আর যাকে ধরতে এসেছি সে সত্যি সত্যি চোর কিনা—তাও আমাদের জানা নেই, কারণ কোন প্রমাণ আমরা এখনও পাই নি। কে জানে—বণিক ছোকরার সঙ্গে বুড়ী তার মেয়ের সাদি দিতে চায় নি বলে বিদ্বেষ বশতঃই হয় ত আপনার কাছে গিয়ে মিথ্যে করে লাগিয়েছে সে। আপনার উচিত হবে ব্যাপারটার ভাল করে তদন্ত করা, তারপর আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।

বুড়ী জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কোতোয়ালদের এই সব কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার মেয়েকে গিয়ে বললে। মেয়েও রীতিমত ভয় পেয়ে তার মাকে বললে—আম্মা, তুমি গিয়ে দরজাগুলি আচ্ছা করে এঁটে বন্ধ করে দিয়ে এস, তারপর আল্লা যা করেন। শুনে বুড়ী তখনই গিয়ে দরজাগুলির আগল আরও আচ্ছা করে এঁটে দিয়ে এল। বুড়ী ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার করাঘাত।

আর চুপ করে থাকা চলে না দেখে বুড়ী দরজার ধারে এগিয়ে এসে বললে—কে তোমরা, কি চাই?

ছোট কোতোয়াল শাম্‌সাহ তখন এগিয়ে এসে বললে—চোরের সাগরেদ, বদমাস বুড়ী দরজা খোল শীগগির, আমরা কোতোয়ালি

থেকে এসেছি, বড় কোতোয়াল সাহেব তার সাঙ্গোপাঙ্গ লোকজন নিয়ে এসেছেন।

বুড়ী চটাপট জবাবে বললে—পুরুষ কেউ বাড়িতে নেই, আমরা হারিম, দরজা খুলবো না।

শাম্‌সাহ বললে—না খোলো ত আমরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবো।

বুড়ী এর কোন জবাব না দিয়ে তার মেয়ের কাছে গিয়ে বললে—দেখেছিস কাণ্ড, এই ডাকুটার জন্যে রাত্রের প্রথম দিকেই কি ফ্যাসাদ, কি হেনস্তা আমাদের, এখন আল্লা করুন, জামাই যেন এখন না আসে, এলে ধরা ত পড়বেই, কি জানি জানটাও হয় ত তার যেতে পারে। তোর বাপজান যদি বেঁচে থাকতো তা হলে কি এমনটি হতে পারত।

শুনে মেয়ে বললে—কি করবে আম্‌মা, সবই আমাদের নসিব!—এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

বুড়ীর বাড়িতে যখন এই সব কাণ্ড চলেছে ঠিক সেই সময় খলিফা তাঁর ছদ্মবেশ পরে গুলতি ধনুকটা হাতে এবং কাঁধে একটা তলোয়ার নিয়ে তাঁর কনের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। বুড়ীর বাড়ির কাছে এসে দেখেন কাগজের ঢাকনা দেওয়া চেরাগ আর চেরাগ,—আর লোকের ভিড়। লোকের ভিড়ে বুড়ীর বাড়ির সামনের রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটু এগিয়ে দেখেন শহরের বড় কোতোয়ালের চারিদিকে তার সাঙ্গোপাঙ্গ, লোকজন, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে সেই বণিক ছোকরা। একজন ছাড়া আর সবাই চীৎকার করে বলছে—ভাঙ্গো, দরজা ভেঙে ঢোকো বাড়িতে, বুড়ীকে নির্যাতন করতে থাকলেই ও বলে দেবে—কোথায় ওর সে ডাকু জামাই।

ছোট কোতোয়াল হাসান শুধু এই বলে থামাচ্ছে—না, না, এসব করতে যেও না, আল্লার ডর নেই তোমাদের? বাড়িতে মরদ নেই কেউ, শুধু জেনানা, জেনানাদের উপর এমন জবরদস্তি করতে গেলে

আল্লা গোসা করবেন, ফ্যাসাদে—মহা ফ্যাসাদে পড়তে হবে তোমাদের।

শামসাহ্ অমনি তাকে ধমকে উঠল—তোমার এ ফড়ফরানি থামাও ত, হাসান, আক্কেল বুদ্ধির নামগন্ধ নেই তোমার ধড়ে, বড় কোতায়াল সাহেব তার কর্তব্য করতে যাচ্ছেন, আর তুমি এতে ফ্যাকড়া তুলছ, লজ্জা নেই তোমার, ভয় ডর নেই। তোমায়ই ধরে চালান দেওয়া উচিত, উপরওয়ালার কাছে ফোপর দালালি!

খলিফা শাম্‌সাহের এই কথা শুনে মনে মনে বললেন—আচ্ছা রসো, দেখাচ্ছি মজা, তোমার পেজোমি ঘুচাচ্ছি আমি।

খলিফা তখন বড় রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকলেন। এই গলির একটা বড় বাড়ি তাঁর কনের বাড়ির একেবারে কাছাকাছি—এত কাছাকাছি যে দুই বাড়ির ছাদের মাঝে অতি সামান্যই ব্যবধান। বাড়িটা ওখানকারই এক মস্ত বড় আমীরের, নাম তাঁর, আমীর উনাস, সরকারী হাজার কর্মচারীর উপরওয়ালা তিনি।

উনাস সাহেবের বাড়ীর সামনে গিয়ে খলিফা দেখেন সদর দরজার সামনে এক পরদা ঝুলছে তার উপর এক চেরাগ। আর ঐ দরজার সামনে বসে রয়েছে সাক্ষাৎ যমদূতের মত এক খোজা দরোয়ান।

আমীর উনাস সাহেব ভীষণ রাগী বদমেজাজী লোক, যেদিন তিনি কষে কাউকে চাবুক লাগাতে পারেন না, সেদিন খানাপিনাই হয় না কিছু তাঁর, খিদে হয় না।

যাই হোক ছদ্মবেশী খলিফা ওর বাড়ির সামনে হাজির হলেই খোজা দারোয়ান তাঁর উপর হুমকি দিয়ে উঠল—কে তুমি, কি চাই?

শুনে খলিফা চোখ পাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—দুর্লক্ষুণে কেলো কুত্তা, দূর হ তুই আমার সামনে থেকে, আমি এই বাড়িতে ঢুকব।

খলিফার সে হুঙ্কার ত হুঙ্কার নয়, যেন সিংহের গর্জন। এমনটি আর কারো মুখে কোনদিন শোনে নি দারোয়ান। দারোয়ান সে গর্জন শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে তার মনিবের সামনে গিয়ে হাজির হল। মনিব তাকে এমন কাঁপতে দেখে বলে উঠলেন—মর, বেটা, হতভাগা, কি হল তোর, অমন করছিস কেন ?

দারোয়ান হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—হুজুর, আমি দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছি এমন সময় একটা লোক রাস্তা দিয়ে দরজার সামনে এলেই আমি তাকে মারতে যাব এমন সময় সে আমাকে দুর্লক্ষুণে কেলে কুত্তা দূর হ তুই আমার সামনে থেকে—বলে এমন গরজে উঠেছে যে শুনে মনে হল যে সিংহের গর্জন। তাই ভয় পেয়ে ছুটে এসেছি আমি আপনার কাছে।

শুনে আমীর উনাসের রাগে এমন অবস্থা হল যে এক্ষুনি বুঝি তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যায়। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন—বটে, এত বড় আস্পর্ধা তার, তুই আমার বান্দা, তোকে দুর্লক্ষুণে বললে ত আমাকেই দুর্লক্ষুণে বলা হল, আচ্ছা, দাঁড়া আমি এক্ষুনি তার তড়পানি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।— এই বলে তড়াক্ করে উঠে উনাস একটা পালিশ করা লোহার গদা হাতে তুলে নিলেন, সে গদার গায়ে আবার চৌদ্দটা সূঁচল গোঁজ। এর ঘায়ে পাহাড় চূর্ণ হয়ে যায়, মানুষ ত দূরের কথা। এই গদা হাতে নিয়ে উনাস বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, পথে : আমি দুর্লক্ষুণে, অ্যাঁ, আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা।

তাঁকে সামনে পেয়ে খলিফা বজ্রগম্ভীর স্বরে যেই একবার বলে উঠলেন—উনাস্। আমীর উনাস গলার স্বরে অমনি খলিফাকে চিনতে পেরে হাত থেকে গদা ফেলে দিয়ে তাঁর সামনের মাটিতে চুম্বন করে বলে উঠলেন—জাহাঁপনার বহুৎ মেহেরবানি যে আমার কুটীরে—

খলিফা ধমকে উঠলেন—মেহেরবানির কথা নয়, আমি বলতে এসেছি—কি রকম দায়িত্বজ্ঞান তোমার, তোমার পাশের বাড়িতে একটা বেটা ছেলে নেই, কেবল জেনানা, বদখত কোতোয়াল তার

লোকজন নিয়ে এসে তাদের এমন হেনস্তা করছে আর তুমি আমীর-প্রধান হয়ে ঐ কুত্তার দলকে না তাড়িয়ে চুপ করে বাড়িতে বসে আছ ?

উনাস বললেন—খোদাবন্দ, শুধু আপনার ভয়েই ওদের আমি এখনও কিছু বলি নি, ভেবেছিলাম আপনি হয়ত বলবেন—শহরে বড় কোতোয়াল কি করছে না করছে—তাতে তোমার নাক গলাবার দরকার কি। এখন আপনায় সম্মতি পেলাম, এখনই আমি ওদের সব কটার হাড়গোড় ভেঙে ঠুঁটো করে দিচ্ছি, একটাকেও আস্ত রাখব না আমি।

খলিফা বললেন—ও সব পরে হবে 'খন, তার আগে আমি একবার তোমার বাড়িতে ঢুকতে চাই।

উনাস তখন সসম্মানে খলিফাকে তাঁর বাড়ির ভিতরে নিয়ে বসবার ঘরে তাঁকে বসাবার উদ্যোগ করলে খলিফা বললেন—উঁহু, এখন বসব না আমি ; চলো একবার তোমার বাড়ির ছাদে যাওয়া যাক, ওখান থেকে ও-বাড়ির মেয়েরা কি হালে আছে—তা আমি একবার দেখতে চাই।

উনাস বললেন—মালেক, এখান থেকে কেন, আমি আপনাকে ও বাড়িতে যাওয়ারই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—এই বলে উনাস এক মজবুত চওড়া তক্তা এনে দুই বাড়ির ছাদের কিনারার উপর পেতে দিলেন। খলিফা তখন অনায়াসে বুড়ীর বাড়ির ছাদে গিয়ে উনাসকে বললেন—তুমি আপাততঃ তোমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসো, আমি ডাকলে পরে আসবে। এরপর উনাস গিয়ে নিজের জায়গায় বসে খলিফার হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন, আর খলিফা এদিকে বুড়ীর বাড়ির ছাদ থেকে অতি সন্তর্পণে নেমে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালেন যেখান থেকে বাড়ির নীচের তলার সব কিছু চোখে পড়ে। প্রথমে বাড়ির দিকে নজর পড়তেই তাজ্জব বনে গেলেন খলিফা : মেরামতের পর রঙ মেখে দামী নতুন আসবাবে সজ্জিত হয়ে এ যেন বেহেস্তের গুলবাগিচা হয়ে উঠেছে। ঝাড় আর মোমবাতিতে সারা

বাড়ি রোশনাই, তার মাঝে তাঁরই দেওয়া পোশাক আর অলংকারে সজ্জিত কনে যেন আসমানে নবোদিত সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ। খোদার কেরামতি আছে বটে! দেখে খলিফার আশ আর মেটে না।

ওদের কথাবার্তাও কানে আসছিল খলিফার! বুড়ী তার মেয়েকে বলছিল—এই জালামাহদের (অত্যাচারী) হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় ত খুঁজে পাচ্ছি না আমি, বাছা, আমরা জেনানা, কি আর করতে পারি আমরা বলো, একমাত্র আল্লাই ভরসা।···কোত্থেকে যে ডাকুটা এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হল—তাই ত এ ফ্যাসাদ! তোর বাপজান বেঁচে থাকলে এই ডাকু আমাদের বাড়ির কাছে ঘেঁষতে পারে!

মেয়ে একটু বিরক্তির সুরে বলল—মা, তুমি বার বার লোকটাকে ডাকু ডাকু বলে আমায় এমন লজ্জায় ফেলছ কেন বলত? আল্লা যার সঙ্গে যার মিলিয়ে রাখেন তাই তাঁর দোয়া বলে মাথা পেতে মেনে নিতে হয়।

শুনে বুড়ী একটু চমকে উঠে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল, তার পর বললে—আল্লা করুন তোর বর যেন আজ রাত্রে না আসে এ বাড়িতে, এলে বেচারা মহা ফ্যাসাদে পড়বে, তার জানও যেতে পারে।

খলিফা গোপন জায়গায় দাঁড়িয়ে মা-বেটির সব কথাই শুনলেন, তারপর একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে কনের সামনের বাতির উপরের দিকে ছুড়ে সেটা নিবিয়ে দিলেন।

এ আল্লা—এ বাতিটা কে নেবালো রে, আরগুলো ত সব জ্বলছে—বলে বুড়ী উঠে বাতিটা আবার জ্বেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে অল-রসিদ আর একটা ঢিল ছুড়ে সেটা আবারও নিবিয়ে দিলেন।

এ আল্লা, আবারও নিবিয়ে দিলে যে রে—বলে আবারও আলো জ্বেলে দিলে বুড়ী। খলিফা এবারও যখন ঢিল ছুড়ে আলো নেবালেন, তখন মেয়ের দিকে চেয়ে বুড়ী বলে উঠল—বোধ হয় বাতাসে আলো

নেবাচ্ছে, নইলে কে নেবাবে, কি বলিস? শুনে মেয়ে একটু হাসলে, তারপর নিজেই আলো জ্বালতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা ঢিল এসে তার আঙুলে লাগায় সে চীৎকার করে উঠল। ঠিক সেই সময় উপরের দিকে বুড়ীর নজর পড়ায় সে অমনি বলে উঠল—ওরে ছাখ ছাখ তোর বর এসেছে—ছাদ দিয়ে এসেছে, হবেই ত, চোর ডাকাত কি আর সোজা সদর দরজা দিয়ে আসতে যায়? আলাহমদুলিল্লা, (আল্লার জয় হোক) তবু ভাল যে ও লুকিয়ে ছাদ দিয়ে এসেছে, সামনে দিয়ে আসতে গেলে কোতোয়াল কি ওকে আস্ত রাখত!

এরপর বুড়ী তার জামাইয়ের উদ্দেশ্যে বললে—বাপু, তুমি যে পথে এসেছ, সেই পথে সরে পড়, আমরা জেনানা, তোমাকে বাঁচানোর সাধ্যি নেই আমাদের, ওদের হাতে ধরা পড়লে তোমাকে ওরা একেবারে শেষ করবে।

শুনে খলিফা হো হো করে এক চোট খুব হেসে নিলেন, তারপর বললেন—আপনার সিঁড়ির দরজাটা একবার খুলে দিন ত, আমি নীচে নামি, তারপর ও কুত্তা আর কুত্তার বেটাদের দেখে নিচ্ছি আমি!

বুড়ী বললে—বাপু হে, এ কি তোমার সেই হাবাগোবা কাজী পেয়েছ যে তোমার ভয়ে নিজের আচকানের খানিকটা ছিঁড়েই তোমায় দিয়ে গেল। এর নাম আমীর নাজুক, শহরের বড় কোতোয়াল এ, এও কি সেই কাজীর মত তোমার কথা শুনতে যাবে নাকি।

বুড়ীর সে কথাব জবাব না দিয়ে খলিফা গম্ভীর স্বরে বললেন—দরজা খুলুন, নইলে আমি দরজা ভেঙে নীচে নামছি।

জামাইয়ের এই রকম কথা শুনে বুড়ী তখনই দরজার আগল খুলে দিলে, খলিফা নীচে নেমে তাঁর কনের পাশে বসে বুড়ীকে বললেন—ঘরে কিছু খাবার থাকে ত আনুন, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ও বাবা—বাড়ির দোরে কোতায়ালির লোকের এমন হামলা, এর মাঝে গলা দিয়ে খাবার নামবে তোমার?

ও সব বাজে কথা রেখে খাবার আনুন ত—জামাইয়ের মুখে বিরক্তির সুর।

বুড়ী তখন জামাই এবং নিজেদের জন্যে যে খাবার তুলে রেখেছিল সেই খাবার এনে ভাল রেকাবে সাজিয়ে জামাইকে দিল। অল-রসিদ নিজের খুশিমত খাবার খেয়ে নিলেন, ওরা মা-বেটী পাশের ঘরে বসে নিজেদের খাবার খেয়ে নিল। এরপর বুড়ী এঁটো বাসনগুলি রান্নাঘরে তখনকার মত রাখতে গেল। কোতোয়ালের লোকজন তখন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর হুমকি দিচ্ছে, দরজা খোল, খোল দরজা, নইলে আমরা কিন্তু দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলাম।

বুড়ী রান্নাঘর থেকে ফিরে এলে তখন খলিফা একটা সীল-আংটি তার হাতে দিয়ে বললেন—এটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে আপনি একবার ওদের কাছে যান, গিয়ে এই অঙ্গুরীটা বড় কোতায়াল নাজুক সাহেবের হাতে দেবেন। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কার অঙ্গুরী এ, কোথায় পেলে? বলবেন যার আংটি, যিনি দিলেন, তিনি আমার ঘরে আছেন। যদি এরপর বলেন—কি চান তিনি, তার উত্তরে আপনি বলবেন—চান তিনি চারধাপওয়ালা একটা মই, শেকল, আর এক আঁটি লম্বা লিকলিকে বেত, আর এ ছাড়া তিনি বলে দিয়েছেন—আপনার চার সহকারীকে নিয়ে এই বাড়িতে ঢুকে শুনে যান আপনি আর তিনি কি চান।

শুনে বুড়ী অবাক হয়ে বলে উঠল—তুমি বলো কি, বাবা, শহরের বড় কোতোয়ালও তোমায় ভয় করবে না কি, না তোমার এই সীল-আংটি দেখে ভয় করতে যাবে? আমার ত মনে হচ্ছে আমি বেরুলেই ওরা আমায় এমন পেটানো পেটাবে যে মারের চোটে আমি অক্কা পাব। আমার কেবল মনে হচ্ছে ওরা আমার কোন কথাই শুনবে না, তুমি কিছুতেই আমায় বাঁচাতে পারবে না।

আমি বলছি—কিচ্ছু ভয় নেই আপনার, আমার একটা কথাও অমান্য করবার সাধ্য নেই ওদের; আপনি গিয়ে বলেই দেখুন।

বুড়ী তখন বললে—বাবা, শহরের বড় কোতোয়ালও যদি

তোমায় ভয় করে, তোমার হুকুম মেনে চলে, তবে কিসের জোরে সেটা হয় কৌশলটা আমায় একটু শিখিয়ে দাও না, বাবা, তার জন্যে যদি চুরি ডাকাতি করে আমার মেয়ে-ডাকু হতে হয়—তাতেও আমি রাজী।

শুনে খলিফা একটু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন—আপনি যান, কিচ্ছু ভয় নেই আপনার, আমি বলছি—ভয় নেই।

বুড়ী তখন জামাইয়ের কথায় একটু সাহস পেয়ে সীল আংটিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল, দরজার কাছে পর্যন্ত গেল, কিন্তু খুলতে আর সাহস পায় না, মনে মনে বলে—খুলব? খুলি? না, পুরো আর খুলব না আমি, এক পাল্লার একটুখানি খুলে আংটিটা শুধু ওদের হাতে দিই, তারপর আমার ডাকু-জামাই যা বলেছে হাবভাব যদি ওদের তেমন না দেখি তা হলে তখনই আবার দরজা বন্ধ করে দেব। —এই ভেবে বুড়ী ঘরের ভিতরেই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে যারা ধাক্কা দিচ্ছে তাদের প্রশ্ন করলে, কি চাই তোমাদের?

সামনেই ছিল শামাসাহ, সে অমনি জোর গলায় বলে উঠল—চোরের সাগরেদ, ডাইনী বুড়ী, তোমার ঘরে ডাকাত লুকিয়ে আছে তাকে আমরা চাই, তার হাত পা কেটে মুণ্ডচ্ছেদ করব আমরা; তারপর দেখো না তোমায় কি করি!

বুড়ী শুনে ভয় পেয়ে প্রথমে একটু পিছিয়ে গেল, তারপরই জামাইয়ের কথা মনে পড়ায় একটু সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়ে বললে—তোমাদের মধ্যে কেউ লেখাপড়া জানে এমন লোক আছে?

হ্যাঁ আছে, কেন?—উত্তর দিল ওয়ালি অর্থাৎ বড় কোতায়াল।

বুড়ী বললে—আমি একটা সীল-আংটি দেখাচ্ছি, দেখ ত দেখি এর উপর কি লেখা, কার নাম লেখা?

শামাসাহ অমনি বলে উঠল—মরুক গে, যার নাম লেখা। তারপর সে ওয়ালিকে বললে—হুজুর, এই বুড়ী বেরুলেই আমি ওকে আচ্ছা করে বেতাবো,—তারপর ওকে খুন করব, সীল অঙ্গুরীতে কার নাম লেখা তা দেখব আমরা পরে, যদি দেখি আমাদের

তোয়াক্কা করবার মত ভয় করবার মত কারো নাম, তা হলে বললেই হবে নাম দেখবার আগেই আমরা ওকে শাস্তি দিয়ে ফেলেছি, তা হলে আর আমাদের উপর কোন দোষ বর্তাবে না, কোন শাস্তি-টাস্তি পেতে হবে না আমাদের।

এই কথা বলার পর শামাসাহ দরজার কাছে গিয়ে বুড়ীকে বললে—আনো, দেখাও দেখি তোমার কি সীল-আংটি আছে, দেখালে তুমি হয়ত রেহাই পেয়ে যেতে পার।

শুনে বুড়ী দরজার এক পাল্লা একটুখানি ফাঁক করে সীল-অঙ্গুরীটা শামাসাহের হাতে এগিয়ে দিল। শামাসাহ আবার সেটা বড় কোতোয়াল নাজুকের হাতে তুলে দিল। নাজুক যখন আংটির উপর খোদাই করা নামটা পড়ে দেখলেন—সে নাম হচ্ছে স্বয়ং খলিফা হারুন-অল-রসিদের তখন ভয়ে তাঁর মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল, থর থর করে সারা গা কাঁপতে লাগল তাঁর।

কি হল আপনার, ব্যাপার কি!—শুধাল শামাসাহ।

দেখ, একবার চোখ বুলাও।

শামাসাহ আংটিটা হাতে নিয়ে আলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে যেই দেখে ওতে খলিফা হারুন-অল-রসিদের নাম, অমনি ভয়ে তার হাত-পা যেন পেটের ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে লাগল, মুখে কি যেন বলতে চাইছিল সে, কিন্তু মুখ দিয়ে তার আ—আ-আ ছাড়া কোন শব্দই বেরুল না। ওয়ালির মুখ দিয়ে একবার শুধু বেরুল—আমরা এবার গেছি, আল্লা রক্ষা করুন, শামাসাহকে তিনি বলে উঠলেন—তো-তো-তোমার জন্যেই আমরা মারা পড়লাম।

শামাসাহ এর মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সুর পালটে বুড়ীকে বললে—বিবিসাব, আপনার কি হুকুম, বলুন এবার।

শুনে বুড়ী মনে মনে মহাখুশী হয়ে ভাবলে—যাক এরাও দেখছি আমার জামাইকে ভয় করে; মুখে বললে—হুকুম আমার নয়, যার আংটি তাঁর। তিনি ওয়ালি সাহেবকে তাঁর চার সহকারীকে নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হতে বলেছেন, সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন

—চার ধাপওয়ালা একটা মই, এক আঁটি লম্বা লিক্‌লিকে বেত, শেকল—আর দড়ি।

তা বুড়ী মা, তিনি কোথায় আছেন এখন—এই আংটির মালিক ?

তিনি আমারই বাড়িতে বসবার ঘরে বসে আছেন।

তা তিনি কি হুকুম করে পাঠিয়েছেন—বললেন ?

বুড়ী তার জামাইয়ের হুকুমগুলি আর একবার শুনিয়ে দিলে ওয়ালি ভয়ে একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে তার সহকারী শামাসাহ, হাসান এবং আর তুইজনকে নিয়ে খলিফার সামনে গিয়ে হাজির হলেন। হাসান অতি সৎলোক, খলিফা তা জানেন, তা ছাড়া উনাসের বাড়িতে ঢুকবার আগে শামাসাহের সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হয়েছিল তাতেও তার মনের পরিচয় পেয়েছিলেন, তাই তিনি তাকেই বললেন—হাসান, তুমি একবার জলদি গিয়ে আমীর উনাস সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস ত।

হাসানের মুখে খলিফার তলব শুনে আমীর উনাস তখনই এসে হাজির হলেন, এবং তিনি এলেই খলিফা তাঁকে ওয়ালি এবং শামাসাহকে টিট করে দেবার হুকুম দিলেন, এবং উনাস্ এ তু'জনকে এমন পেটানো পেটালে যে তু'জনেরই হাত পায়ের নখ ছিটকে বেরিয়ে গেল, এরপর ওদের তুইজনকেই হাজতে পোরা হল। আর হাসানকে খলিফা সেইদিনই অনেক বকশিশ দিয়ে শহরের ওয়ালি অর্থাৎ কোতোয়ালের সর্দার করে দিলেন, আর আগেকার ওয়ালি নাজুক যে লোকজন নিয়ে এসেছিলেন তাদের সবাইকে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে বললেন।

কোতোয়ালির লোকজন সব সরে গেলে বুড়ীর বাড়ির সামনের রাস্তা যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন বুড়ী তা দেখে ফিরে এসে মহাখুশী হয়ে তার জামাইকে বললে—ডাকাতের বেটা, ডাকুর সর্দার, এ তুনিয়ায় তোমার জুড়ি মেলে না, শহরের কাজী তোমায় ভয় করে চলে, ওয়ালি তোমার ভয়ে মরে, আমি এখন কিছুদিন তোমার

সাগরেদি করে মেয়ে-ডাকু বনে যাব ঠিক করেছি, লোকে ত বলেই থাকে যেমন মনিব তার তেমন বান্দা, যেমন বাপ তার তেমনি বেটা, তা যেমন জামাই তার তেমনি শাশুড়ী হতেই বা দোষ কি—কি বলো ?

শুনে খলিফা হাসতে লাগলেন।

হাসির কথা নয়, বাবা, আল্লা মেহেরবান, তাই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সময়। তুমি যদি না থাকতে, আর ঐ বদখত ওয়ালির লোকজন যদি দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ত আমার বাড়িতে তা হলে কি দশা হত আমাদের—একবার ভেবে দেখ ত!

অল-রসিদ শুনে হাসতে হাসতে বললেন—আম্মাজান, শহরের ওয়ালি এবং কাজী এমনি করে ডাকুকে মান্য করে দেখেছেন আপনি কোনদিন—শুনেছেন ?

না, বাপধন, আমার বাপের জন্মে কোনদিন দেখিনি, শুনিনি। সবই আল্লার দোয়া, তাঁর মর্জিতে সবই সম্ভব হয়। তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছিলেন তাই ত আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম, আর খলিফা আমাদের যে সর্বনাশ করেছে তার জন্যে তিনি যদি তাঁকেও শায়েস্তা করেন, তা হলেই আমাদের দিলটা পুরো ঠাণ্ডা হয়।

শুনে হারুণ-অল রসিদ মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমি কি করেছি যে সে আমায় এমন অভিশাপ দেয়, মুখে তাকে বললেন—খলিফা আপনার কি করেছেন আম্মাজান যে আপনি তাকে গালমন্দ করছেন ?

করব না, বাবা,—সে কি আমাদের কিছু রেখেছে, আমাদের বাড়ি ঘর দোর ভেঙে চুরে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়েছে, পথের ভিখিরী করে ছেড়েছে আমাদের। এই যে ঘরে তুমি এখন বসে আছ—এর পাথর গুলো পর্যন্ত লোক দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে, পরবার একটা আস্ত কাপড় ছিল না পর্যন্ত আমাদের, খানার-দানা ছিল না। কি হালে ছিলাম আমরা তুমি এসে ত তা চোখেই দেখেছ। ভাগ্যিস আল্লা তোমায় পাঠিয়েছিলেন, নইলে ত আমরা না খেয়ে মারা পড়তাম।

খলিফা আপনাদের এমন করতে গেলেন কেন, শুধু শুধু ত আর হতে পারে না, কারণটা কি ?

শোন বাবা, কি হয়েছিল তাই বলছি : এখন—আমার ছেলে খলিফার দরবারের এক আমীর। সে বাড়িতে বসে ছিল এমন সময় দুইজন আউরত এসে পানি খেতে চাইলে সে পানি এনে দিলে। খেয়ে ওরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে বাড়িতে বসে আছে এমন সময় ঐ দুই আওরতের মধ্যে যার বয়স বেশি, যে বুড়ী সে মস্ত বড় এক পরাতে করে অনেকগুলি মেঠাই এনে আমার ছেলেকে বললে— যে অল্পবয়সী মেয়েটিকে তেষ্টার জল দিয়েছিলেন আপনি তিনিই পাঠিয়েছেন এটা আপনাকে।

বেশ রেখে যাও ঐখানে—বলে জায়গা দেখিয়ে দিলে আমার ছেলে। বুড়ী মিষ্টিশুদ্ধ পরাতটা রেখে চলে গেল। একটু পরেই আমাদের পাড়ার চৌকিদার এসে আমার ছেলের কাছে পরবের বকশিশ চাইলে আমার ছেলে থালাশুদ্ধ ঐ মিঠাইগুলি তাকে দিয়ে দিলে। ঘণ্টাখানেক পরেই খলিফার লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ভেঙে চুরে তচনচ করে যা কিছু ছিল সব লুঠ করে আমার ছেলেকে খলিফার সামনে ধরে নিয়ে গেল। খলিফা তাকে ঐ মিষ্টিসমেত পরাতটি তার হাতে কি করে এল জিজ্ঞাসা করলে সে তাঁকে—আমি যা এখন বললাম তোমাকে, তাই বললে। খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— ঐ তরুণী মেয়েটার পানি খাওয়ার সময় তুমি তার মুখ দেখেছ নাকি —কি দেহের কোন অংশ ?—এখন আমার ছেলে দেখতে পায় নি তার কিছু, বলতেও চেয়েছিল—'না' কিন্তু খলিফার রকম-সকম দেখে কেমন ভড়কে যাওয়ায় তার মুখ দিয়ে কি করে বেরিয়ে গেল—হ্যাঁ। আসলে কিছুই দেখে নি সে মেয়েটির কারণ পানি খাবার সময় মেয়েটি তার মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু খলিফা আমার ছেলের এই ভুল কথা শুনেই মেয়েটিকেও ডেকে আনিয়ে ওদের দু'জনকেই কোতল করবার হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবের দিন হোক, কি অন্য যে কোন কারণেই হোক, সেদিন তাদের

ছুজনের গর্দান না নিয়ে হাজতে রাখা হয়েছে। খলিফা এই অবিচার না করলে ছেলেকে হাজতে না পুরলে—ডাকুর সর্দার তুমি—এত শীগ্‌গির কি তুমি আমার মেয়েকে সাদি করতে পার?

বুড়ীর কথা শুনে খলিফা মনে মনে ভাবলেন, সত্যিই ত আমি এই সব করেছি, এদের এ সব ছুর্দশার কারণ ত আমিই। একটু চুপ করে থেকে খলিফা বুড়ীকে বললেন—আচ্ছা আমি খলিফাকে বলে আপনার ছেলেকে হাজত থেকে মুক্ত করে এনে তাকে খিলাত বকশিশ দিইয়ে যদি তাঁর দরবারে আরও বড় কাজে বসাতে পারি তা হলে কেমন হয়, খুশী হয় আপানার দিল?

শুনে বুড়ী বেশ কিছুটা হেসে বললে—চুপ করো, বাবা, চুপ করো, অনেক হয়েছে, থামো, এ তোমার সে ভীতু কাজীও নয়, ওয়ালিও নয়, ইনি হচ্ছেন খলিফা হারুন-অল-রসিদ, যাঁর ভয়ে ছুনিয়ার পূব পশ্চিম মুলুক কাঁপে, যাঁর মহলের একটা বান্দার সম্মান ওয়ালির সম্মানের চেয়েও বেশি। কাজী আর ওয়ালিকে তুমি যা করেছ, তাতেই তুমি মনে ভেবেছ খলিফাকেও তুমি বাগ মানাতে পারবে, স্বপ্নেও ভেবো না তুমি এ কথা, এ করতে গেলে ছেলেটি ত আমার হাজতে পচছেই, তার নসিবে কি আছে আল্লাই জানেন, এরপর তোমাকেও হারাব আমরা, বাড়িতে পুরুষ বলে আর কেউ থাকবে না, আমাদের ছুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে। তাই বেশি বাহাছুরি আর করতে যেও না।

বুড়ীর কথা শুনে তার প্রতি অনুকম্পায় খলিফার ছুই চোখ ছলছল করে এল, তিনি তখনই উঠে পড়লেন সেখান থেকে। তিনি খলিফার ওখানে যাচ্ছেন মনে করে বুড়ী আর মেয়ে ছুইজনই ভয় পেয়ে তাঁর সামনে ছুই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে—বললে আল্লার কসম, যেওনা তুমি সেখানে, আমরা তোমায় যেতে দেব না, কিছুতেই না। কিন্তু তিনি সে কথা না শুনে, তাদের কোন বাধা না মেনে—যেতেই হবে আমায়, আমি যাবই—বলে তাদের হাত সরিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে

দরবার-ঘরে তাঁর সিংহাসনে বসে তাঁর উজির আমীর ওমরাহদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা তখনই ছুটে এসে তাঁর সামনের মাটি চুম্বন করে আল্লার কাছে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করে বললেন—খোদাবন্দ, এত রাত্রে আমাদের তলব করলেন কেন—আমরা কিছুই বুঝছি না!

খলিফা বললেন—আমার দররারের আমীর আলাদীনের কথা হঠাৎ মনে পড়ল আমার। আমি একটা জবর ভুল করে বেচারাকে হাজতে পুরতে হুকুম দিলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ তার হয়ে কোন কথা বললে না, তাকে একটু সহানুভূতিও দেখালে না, এ-ই বা কি করে হল—তা-ও আমি বুঝছি না!

ওঁরা বললেন—জাহাঁপনা, আমরা তখন আপনার রকম-সকম দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভড়কে গিয়েছিলাম, তাই কিছু বলতে সাহস পাই নি। এখন আমরা সবাই এক সঙ্গে জাহাঁপনার কাছে আরজি জানাচ্ছি, তাঁর কসুর মাফ করে তাঁকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হোক।—এই বলে তাঁরা সবাই তাঁদের মাথার পাগড়ি খুলে, মাটিতে মাথা রেখে তাঁদের বিনীত আবেদন জানালেন।

হারুন-অল-রসিদ তাঁর সভাসদদের বললেন—তোমাদের আরজি মঞ্জুর : তার সকল কসুর মাফ করলাম আমি। তোমরা এখন গিয়ে তাকে হাজত থেকে খালাস করে ভাল জামা কাপড় পরিয়ে আমার সামনে হাজির করো। আমীর ওমরাহরা খলিফার হুকুমে আলাদীনকে মুক্ত করে খলিফার সামনে হাজির করলে সে খলিফার সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে তাঁকে কুর্নিশ করে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে উঠে দাঁড়াল। খলিফা তখন তাকে বহুমূল্য স্বর্ণখচিত 'ডাক-অল-মাত্রাকাহ' খিলাতে ভূষিত করে মাথায় স্বর্ণখচিত রেশমী পাগড়ী পরিয়ে তাকে তাঁর ডান দিকের উজির করে নিলেন। এরপর তার শুভকামনা করে তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে ছুটি করে দিলেন।

আমীর ওমরাহরা তখন রাঙা ঘোড়ার চড়ে মশাল জ্বালিয়ে

শোভাযাত্রা করে আলাদীনকে তার প্রাসাদে নিয়ে চললেন, বাজনদাররা কাড়া-নাকাড়া-বাঁশী বাজাতে বাজাতে তার সঙ্গে চললে।

বাজনা আর সোরগোল ক্রমেই নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বুড়ী যখন ভাবছে—এ আবার কি হল, কি ব্যাপার! ঠিক তখনই এক দল লোক সুখবরটা তাকে আগে পৌঁছে দিতে গিয়ে বুড়ীর বাড়ির দরজায় ঘা দিতে দিতে বললে—বিবিসাব, সুখবর এনেছি আমরা, কি খাওয়াবেন: আপনার বেটা আলাদীন সাহেবকে খলিফা মাফ করে খিলাত বকশিশ দিয়ে তাকে তাঁর ডানদিকের প্রধান উজির করে নিয়েছেন—ঐ যে শোভাযাত্রা করে বাড়ি আসছেন তিনি, বেরিয়ে দেখুন।

শুনে আলাদীনের মা এবং বোনের আনন্দের আর সীমা রইল না, তারা ঘরে যে মিঠাই আর খাবার উদ্‌বৃত্ত ছিল তাই আর কিছু কিছু বকশিশ দিয়ে যারা খবর আনলে তাদের খুশী করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আলাদীন ঘোড়া থেকে নেমে তার বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই তার মা-বোন তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

এরপর মা-বোনের আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পেয়ে বসল আলাদীন তাদের পাশে, বসে নিজের যা যা হয়েছিল, এখন যা ঘটলে তা একে একে খুলে বললে সব তাদের কাছে। বলা শেষ হলে হঠাৎ নজর পড়ল তার নিজেদের বাড়ির দিকে। দেখে চমকে উঠল সে: ও মা, এ সব কি কাণ্ড দেখছি!

কি?

বাড়ি আমাদের এমন নতুন হল কি করে—নতুন চুনকাম, নতুন রঙ, দামী দামী সব আসবাবপত্র! আমি ত সামান্য ক'দিন বাড়ি ছিলাম না, এর মাঝে এ কি করে সম্ভব হল, আর করলেই বা কে? এ কি সত্যি, না খোয়াব দেখছি আমি?

মা বললে—না রে বাবা, খোয়াব না, এ সত্যি, বিলকুল সত্যি।

তোর কথা ত তুই বললি, কিন্তু আমাদের এদিকে কি হল শুনিস নি এখনও, বলছি—শোন। তোকে যেদিন ধরে হাজতে পুরল সেই-দিনই খলিফার লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ঘর দোর ভেঙে, এমন কি মেঝের টালি পর্যন্ত সরিয়ে বাড়িতে যা কিছু ছিল সব লুঠপাট করে নিয়ে গেল, যে কাপড় আমরা পরে ছিলাম তা ছাড়া আর পরবার দ্বিতীয় বস্ত্র রইল না, ঘরে খাবার একটা দানা পর্যন্ত রইল না।

তা এত সব আবার হল কি করে, এত সব দামী দামী জিনিস এল কোত্থেকে?

এ সব আমার জামাই করেছে, জামাই দিয়েছে—সব একদিনের মধ্যে।

তোমার জামাই!—আলাদীন ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, কে সে আমার বোনাই, আমার অনুমতি না নিয়ে তার সঙ্গে আমার বোনের সাদি দিলই বা কে?

চটিস নে, বাবা, চটিস নে, তাকে না পেলে আমরা না খেয়ে মরতাম, তিনদিন আমাদের মা-বেটীর পেটে একটা দানা পড়ে নি।

শুনে আলাদীন একটু শান্ত হয়ে বললে—তা কি কাজ করে আমার এই বোনাই, কি তার পেশা?

মা একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললে, আর বলিস নে, বাবা, সে ডাকাতের সর্দার, ডাকাতি তার পেশা।

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুন চড়ে গেল আলাদীনের, সে অমনি বলে উঠল—একটা ডাকুর সঙ্গে তুমি আমার বোনের বিয়ে দিয়েছে? আসুক সে, আমি আমার বাপঠাকুর্দার কসম নিয়ে বলছি—আমি তাকে সামনে পেলেই খুন করব।

মা তার ছেলের মুখ চেপে ধরল—ছিঃ ছিঃ, বাবা, এমন কথা বলতে নেই, মুখে আনতে নেই, তুই নিজের কথাই শুধু ভাবলি, আর একজনের এতে কি সর্বনাশ হত—ভাবলি নে। আর ডাকু হলেই সে ফেলনা, অচ্ছেদ্দার পাত্র? তার কি দাপট কি ক্ষমতা—তা ত

দেখিস নি তুই, শুনিসও নি, শোন বলছি।—এই বলে আলাদীনের মা তার জামাই কাজীর সঙ্গে কি করেছে, ওয়ালি এবং তার লোকজনকে কেমন শায়েস্তা করেছে সে সব একে একে খুলে বললে। এই দেখ, তাদের রক্তে এখনও আমার ঘরের মেঝে রাঙা হয়ে রয়েছে!

শুধু এই নয়, আমি যখন শেষে বললাম—খলিফা কেমন অন্যায় করে তোকে হাজতে রেখেছেন, তখনই যে বললে—আমি যাচ্ছি খলিফা যাতে আপনার ছেলেকে মুক্তি দিয়ে তাকে খিলাত বকশিশ দিয়ে বিদায় করেন তার ব্যবস্থা করে আসছি। এই বলেই সে চলে গেল, কি তার ক্ষমতা ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই আমরা তোকে ফিরে পেলাম। সে না থাকলে আমরা তোর মুখ আর দেখতে পেতাম—বল?

শুনে আলাদীনের মাথাটা যেন কেমন ঘুলিয়ে গেল! বাগদাদে এমন কোন ডাকাত আছে যার এত ক্ষমতা থাকতে পারে! সে তখন তার মাকে বললে—আচ্ছা, মা, তোমার এই জামাইয়ের নাম কি বল ত?

কি জানি, বাবা, আসল নামটা জানাতে পারি নি আমরা, তবে তার যে ঘরোয়া ডাক নাম আছে তা জেনেছি আমি। মিস্ত্রী, কারিগর ছুতোর মিস্ত্রী এ সবের কাছে জিজ্ঞাসা করে, তারা এলে পরে তাদের আমি শুধোলাম, কে পাঠিয়েছে তোমাদের? ওরা বললে, অল বুন্দুকানি। আর জামাই যখন সাদির আগে আমাকে কাজীর কাছে পাঠাল, তখন আমাকে বলে দিল, গিয়ে বলবেন—অল বুন্দুকানি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অল বুন্দুকানি নাম শোনার সঙ্গে আলাদীন এক লাফে তার আসন থেকে উঠে তার সামনের মেঝেতে একবার দু'বার নয়; সাতবার চুমু দিল। দেখে মা হাসি আর থামাতে পারে না—এ কি রে, বাবা, এত খাতির কেন তোর বোনাইকে, না পথে দেখা হয়ে যেতে সে তোকে রক্ত-রাঙা কড়া সিরাজি খাইয়ে দিয়েছে যে এমন

করাছিস? একটু আগে যে তোর এই বোনাইয়েরই তুই গলা কাটতে চেয়েছিলি?

নামটা শোনার পর আলাদীনের চোখ একেবারে কেমনই হয়ে গিয়েছে, সে বললে—মা তুমি জানো কার সঙ্গে তুমি আমার বোনের বিয়ে দিয়েছ?

কেন, কে সে বটে?

স্বয়ং খলিফা হারুন-অল-রসিদ, নইলে বাগদাদে আর এমন কে আছেন যিনি এই সব অসাধ্য সাধন করতে পারেন?

শুনে আলাদীনের মা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে বলে উঠল—এ আল্লা এখন আমি কি করি?—তুই, বাবা, এখনই আমায় কোন নিরাপদ গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে আয়, নইলে তিনি এসে আমাকে দেখলে আর আস্ত রাখবেন না, আমি তাঁকে কত অকথা কুকথা বলেছি, বারবার ডাকু ডাকু বলে অছেদ্ধা করেছি!

মা-বেটীতে এই সব কথা হতে হতে খলিফা আলাদীনের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। আলাদীন অমনি উঠে তাঁর সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে—তাঁর শুভকামনা করল। খলিফা তাঁর যোগ্য আসনে বসে এদিক ওদিক চেয়ে যখন শাশুড়ীকে দেখতে পেলেন না তখন আলাদীনকে তিনি বললেন—তোমার মাকে কই দেখছি না ত, কোথায় গেলেন তিনি?

আলাদীন বললে—তিনি এখন আসল কথা জানতে পেরে আপনার ভয়ে পালিয়ে আছেন।

বলো গিয়ে কোন ভয় নেই তাঁর। তুমি গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।

আজ্ঞা পেয়ে ছেলের সঙ্গে এসে মা খলিফার সামনের মাটিতে চুমু দিয়ে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করলে। খলিফা মৃদু হেসে বললেন—আজই আপনি কিছু আগে কোমর বেঁধে আমার সাগরেদি করে চুরি ডাকাতি শিখতে চাইছিলেন, তা হলে আবার আমার সামনে থেকে পালাতে গেলেন কেন?

বুড়ী ভীষণ লজ্জা পেয়ে বললে—জাহাঁপনা, না জেনে না চিনে বড় কসুর করে ফেলেছি, আমি মাফ চাইছি।

খলিফা বললেন—যা হবার হয়ে গেছে, আল্লাই আপনাকে মাফ করবেন।

এরপর খলিফা আর কালবিলম্ব না করে তখনই হাজত থেকে সুলতান কিসরার বেটীকে খালাস করে তার সামনে হাজির করতে, তাঁর লোকজনদের হুকুম দিলেন, আর হুকুম দিলেন কাজীকে তলব করতে।

হুকুম পেয়েই কাজী এসে হাজির ; শাহাজাদীকেও আনা হল। এরপর খলিফা কাজীকে বলে কিসরার বেটীকে তালাক দিয়ে তারই সঙ্গে আবার তখনই আলাদীনের সাদি দিলেন।

এমনি করে একই রাত্রি হল দুই নব দম্পতির মিলন রাত্রি।

এরপর এই বিয়ের ভোজ আর উৎসব চলেছিল পুরো তিন দিন ধরে, আর বাগদাদের আমীর ওমরাহ বণিক, হোমরা চোমরা এমন কেউ ছিলেন না—যিনি এই ভোজে নিমন্ত্রিত হন নি।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বললে—দিদি, তোর এ গল্পটা সত্যিই বড় মজাদার। আচ্ছা, এমন কোন গল্প তোর জানা নেই যাতে কোন মেয়ে অল্পবয়সেই প্রেমের জন্য পুরুষের মত দুঃসাহসিক কাজ করেছে ?

আছে, বই কি! দিদির ঝুলিতে অনেক কিছুই আছে, জাহাঁপনা হুকুম করলেই শোনাতে পারি।

শাহরিয়ার বললেন—ঠিক আছে, কাল শুনিও তুমি সেই দুঃসাহসিকার গল্প, কিন্তু এ সাহসটা প্রেমের জন্য হওয়া চাই।

যো হুকুম।

বাল্যপ্রেম এবং তারপর

পরদিন রাত্রিশেষে সুলতানকে তসলিম করে শাহরাজাদী তার সেই গল্প শুরু করলে—

অনেক কাল আগে সিরিয়ায় দুটি লোক বাস করত। তারা দুই ভাই, ভাই হলেও তারা আলাদা গৃহস্থ। তা ছাড়া এক ভাইয়ের অবস্থা খুবই ভাল, রীতিমত ধনী সে, আর একজনের অবস্থা রীতিমত খারাপ, নিতান্ত গরিব সে। এখন এই ধনী লোকটির একটা মেয়ে ছিল, পরমা সুন্দরী সে, যেন বেহেস্তের হুরী ; আর গরিব লোকটির ছিল একটি ছেলে। সেও দেখতে যেন আসমানের চাঁদ। এই ছেলে মেয়ে দুইজনেই সমবয়সী। এদের বয়স যখন দশ বৎসর তখন থেকেই এরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসতে শুরু করল। হলে হবে কি—এই সময়ই আবার ছেলেটার বাপ সেই গরিব লোকটি মারা গেল। ছেলেটি একেবারে অকূল পাথারে পড়ল। মেয়েটি তার অভাব অনটন দুর্দশা দেখে নিজেদের বাড়ি থেকে যখন যা পারত, সে খাবার জিনিসই হোক বা দু'চারটে দিরহামই হোক—দিত, কারণ তার এ চচেরা ভাইটিকে সে খুবই ভালবাসত।

এমনি করে বড় হতে হতে বয়স যখন তাদের চোদ্দ বছর হল তখন ছেলেটি তার কয়েকজন দোস্তকে পাঠাল তার চাচার বাড়ি—কি, না সে তার চচেরা বোনকে সাদি করতে চায়। না, হবে না, বলে চাচা ফিরিয়ে দিলেন তার দোস্তদের। ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসে ছেলেটিকে সকল কথা বললে, ছেলেটি বড়ই দুঃখ পেল মনে।

এমন কাণ্ড যে এর পরের দিনই ঐ মেয়ের বিয়ের আর একটা সম্বন্ধ নিয়ে আর এক দল লোক এল ছেলের চাচার বাড়িতে, তারা বড় লোক, সবাই হোমরা-চোমরা। পণ যৌতুক দেনা পাওনার কথা আলোচনার পর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, দিনক্ষণও।

মেয়েটি শুনলে সব, দেখলেও, কোন কথা বললে না, তারপর রাত্রি যখন দুই প্রহর হল, চারিদিক নিশুত, তখন সে উঠে তার বাপের তহবিল থেকে দু'হাজার দিনার নিয়ে ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে তার ঘরে টোকা দিলে ছেলেটি ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে তার চচেরা বোন, দুটো গাধাও এনেছে সে সঙ্গে।

চল পালাই।

এরপর দুই গাধায় চড়ে দু'জন রওনা হল বিদেশে, দূরে। সারা রাত ধরে চললো তারা, তারপর এক সময় ভোর হলে তারা তাদের গাধা নিয়ে রাস্তার ধারেরই এক বড় জঙ্গলে ঢুকে খানাপিনা এবং বিশ্রাম করল। রাত্রি হলে আবার পথ চলা শুরু। এমনি করে দু'রাত্রি চলে তারা সমুদ্রতীরের এক শহরে এসে হাজির হল। বন্দরে তখনই একটা জাহাজ ছাড়বার আয়োজন করছে, ওরা দু'জন রেইসের (কাপ্তেন) কাছে গিয়ে ঐ জাহাজে বসবার মত একটু জায়গা ভাড়া করল। তারপর মেয়েটিকে জাহাজে নিজেদের বসবার জায়গায় বসিয়ে ছেলেটি শহরের বাজারে গাধা দুটো বিক্রি করতে গেল, গাধা বিক্রি করে ফিরে এসে দেখে তার চচেরা বোনকে নিয়ে বন্দর ছেড়ে চলে গেছে জাহাজ। ছেলেটি কি করবে দিশে না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। একটু পরে উঠে বন্দরের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগল—জাহাজটা কোন দেশের কোন বন্দর যাবে। তারা কোন কিছুই বলতে পারল না।

এদিকে জাহাজটা দশদিন সমুদ্রপথে চলে অন্য এক দেশের এক বন্দরে এসে নোঙর করল। মেয়েটি তখন কাপ্তেনের কাছে গিয়ে বলল—রেইস্, আমি দাম দিচ্ছি, আপনি ডাঙ্গায় নেমে শহরে গিয়ে কিছু গোস্ত, রুটি, মেঠাই আর মেওয়া কিনে নিয়ে আসুন, সবাই মিলে ফুর্তি করে খাওয়া যাবে—এই বলে কয়েকটা দিনার তার হাতে তুলে দিল। কাপ্তেন মহাখুশী হয়ে দিনার নিয়ে শহরের বাজারে চলে গেল। মেয়েটি তখন রেইসের ঘরে গিয়ে পুরুষের পোশাক পরে

রেইসের গলা অনুকরণ করে মাঝিমাল্লাদের হুকুম দিলে—নোঙর তোলো, জাহাজ ছাড়ো।

মাঝিমাল্লারা, এ রেইসেরই হুকুম মনে করে, তখনই নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল। আবহাওয়া এবং বাতাস দুই-ই অনুকূল থাকায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ অনেক দূরে চলে গেল, বন্দর থেকে আর তা দেখা যায় না।

এর একটু পরে রেইস্ গোস্ত-রুটি-মেঠাই-মেওয়া নিয়ে বন্দরে এসে দেখে তার জাহাজ নেই। সে তখন আশেপাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললে—জাহাজ ত অনেকক্ষণ আগে ছেড়ে চলে গেছে।

একটা মেয়েছেলের কথা শুনে লোভে পড়ে এ আমি কি করলাম, এ আমার কি হল রে আল্লা—বলে রেইস তার বুক চাপড়াতে লাগল, দাড়ি ছিঁড়তে লাগল : কতজনের কত কি মাল ছিল, আমার জিনিসপত্র ছিল, এখন আমি কি করি, হায়, আল্লা, কি করি! —এই বলে অনেকক্ষণ বিলাপ করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শহরে ফিরে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এদিকে সে জাহাজ কয়েকদিন চলার পর যে দেশের বন্দরে এসে লাগল সেখানে এক সুলতান আছেন। জাহাজ নোঙর করবার পর মেয়েটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জাঁকজমকওয়ালা মেয়ের পোশাক পরে আবার মেয়ে সেজে মাঝিমাল্লাদের অনেক দিনার বকশিশ দিয়ে বললে—আমি রয়েছি তোমাদের কোন কিছুতে ভয় করো না তোমরা।

বন্দরে নতুন জাহাজ নোঙর করেছে শুনেই সুলতান তাঁর লোকজনদের ডেকে বললেন—যাও ত তোমরা দেখে এস, জাহাজে কি এল, কারা এল। লোকজন খোঁজ-খবর নিতে জাহাজে এসে দেখে, এর রেইস হচ্ছে একটি মেয়ে, অসামান্য সুন্দরী সে, এমনটি তাদের আর কোনদিন চোখে পড়ে নি। লোকজন ফিরে গিয়ে সুলতানকে যখন এই খবর দিলে তিনি আবার কতকগুলি লোক পাঠালেন—

মেয়েটিকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে আসতে, আর মনে মনে ভাবলেন—ওরা যেমন বললে, মেয়েটি যদি তেমন খুবসুরত হয়, তবে ইনসাআল্লা—আমি তাকে সাদি করে আমার বেগম করে নেবো।

এদিকে মেয়েটিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে সুলতান যাদের পাঠিয়েছিলেন, মেয়েটি তাদের বললে—আমি পর্দানসীন কুমারী মেয়ে, সুতরাং আমি একা নামতে পারি না ডাঙায়। তোমাদের সুলতানকে বলো—তিনি যদি আমারই মত চল্লিশটি কুমারী মেয়ে পাঠান আমার জাহাজে, তা হলেই আমি তাদের সঙ্গে ডাঙায় নেমে সুলতানকে গিয়ে সেলাম করতে পারি।

লোকগুলি ফিরে গিয়ে যখন এই কথা জানালে তখন সুলতান তা শুনে বললেন—ঠিকই ত। এরপর তিনি তাঁর দরবারে যে সব আমীর ওমরাহ উজির উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবাইকে বললেন—তোমাদের যার যার বাড়িতে তরুণী কুমারী মেয়ে আছে এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে এস তাদের এখানে। মনে রেখো, এমনি চল্লিশটি মেয়ে আমার চাই। তাঁরা সব তখনই গিয়ে নিজের নিজের বাড়ি থেকে নিজেদের কুমারী মেয়ে এনে হাজির করলেন সুলতানের দরবারে, সুলতানের প্রধান উজিরও তাঁর অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী মেয়ে হাজির করলেন। কুমারী মেয়ের সংখ্যা চল্লিশ পুরে গেলেই সুলতান তাদের জাহাজে পাঠালেন রেইস-মেয়েটিকে আনতে।

ওরা যখন জাহাজে এসে পৌঁছল মেয়েটি তখন রাত্রের খানায় বসবার আয়োজন করছে। ওদের দেখেই সে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম জানিয়ে আপ্যায়ন করে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে এল। সেখানে তাদের বসিয়ে খানা আনবার হুকুম করলে। খানা এল। এক সঙ্গে বসে নানা গল্প গুজব করতে করতে সবাই ফুর্তি করে খেল। এর পরও নানা কথাবার্তা চলতে লাগল। ক্রমে রাত হয়ে গেল প্রায় দুপুর। রেইস মেয়েটি তখন ওদের বলল—অনেক রাত হয়ে গেল, আজ তোমরা আমার জাহাজেই বিশ্রাম করো, ভোর হলেই আমি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে সুলতানকে সেলাম করব।

ওরা সবাই এতে রাজী, সবাই খুশী।

মেয়েটি তখন ওদের শোবার জন্যে বিভিন্ন কামরা দেখিয়ে দিল। চল্লিশটি মেয়ে নিজের নিজের কামরায় গিয়ে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটি যখন দেখলে ওরা সবাই ঘুমে অচেতন তখন সে মাঝিমাল্লাদের হুকুম দিলে—নোঙর তোলো, জাহাজ ছাড়ো।

মাঝিমাল্লারা তখনই নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়লে, ভোরের আলো যখন দেখা গেল তখন জাহাজ ওদেশের সীমানা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

এদিকে ঐ চল্লিশটি মেয়ের ঘুম ভাঙলে তারা দেখে তারা আর তীরে নেই, যে জাহাজে তারা রাত্রে শুয়ে ছিল সে জাহাজ আর তীরে নেই, সে জাহাজ সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ ভেঙে পাল খাটিয়ে চলেছে। তারা ভয় পেয়ে রেইসকে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি, কোথায় নিয়ে চলেছ আমাদের? রেইস বললে—কোন ভয় নেই তোমাদের, তোমাদের যেখানেই নিয়ে যাই না কেন, কোন ক্ষতি হবে না তোমাদের। তোমরা সুখেই থাকবে। এই রকম সব কথা বলে রেইস মেয়েটি তাদের সান্ত্বনা দিলে তাদের ভয় কিছুটা কেটে গেল, চুপ করল তারা।

ভোর হয়েছে অথচ রেইস মেয়েটি আর চল্লিশটি কুমারী মেয়ে এখনও এসে পৌঁছল না প্রাসাদে দেখে সুলতান তাঁর লোকজন পাঠালেন জাহাজে তাকে তাগিদ দিতে, কিন্তু কাকে তাগিদ দেবে, তারা দেখলে কোথায় জাহাজ, জাহাজ তখন নোঙর তুলে হাওয়া। ফিরে এসে তারা সুলতানকে যখন এ খবর জানালে তখন সুলতান বলে উঠলেন—ইয়া আল্লা, এমন ধড়িবাজ মেয়ে ত আমি বাপের জন্মে দেখি নি! মেয়েটি শেষে আমাকে এমন করে ঠকালে! যাই হোক চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে উজিরকে নিয়ে ছদ্মবেশে নিজেই হাজির হলেন বন্দরে, কিন্তু সেখানে হাজার অনুসন্ধান করেও জাহাজের কোন পাত্তা করতে পারলেন না।

জাহাজটা এদিকে কয়েকদিন চলার পর যেখানে এসে নোঙর

করল, সে একটা বিধ্বস্ত শহর, লোকজনের সাড়াশব্দ একেবারে নেই। কিন্তু লোকবসতি না থাকলে কি হবে জাহাজ নোঙর করে পাল নামানোর সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একদল বোম্বেটে—সংখ্যা তাদের ঠিক চল্লিশ— এসে ঐ জাহাজে উঠে বলে উঠল—অনেকদিন পরে খোদা মিলিয়ে দিয়েছেন, এর আরোহীদের সব কোতল করে, মালপত্র সব লুঠ করে নেওয়া যাক

তাদের কাজ শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই সামনে পড়ল রেইস-মেয়েটি। সে তাদের স্বাগত জানিয়ে বললে—অযথা আল্লার জীব জবাই করে লাভ কি, জাহাজে যা কিছু আছে সব পাবে তোমরা, তার সঙ্গে আরও পাবে। তোমরা দেখছি চল্লিশজন, আমার এই জাহাজেও চল্লিশটি খুবসুরত কুমারী মেয়ে আছে, তাদের তোমাদের বিবি করে দেব, আর আমি এই জাহাজের রেইস্, আমি হবো তোমাদের শেখের বিবি, কেমন, এ ভাল কথা—না?

ওরা খুশী হয়ে বললে—হ্যাঁ, খুব ভাল কথা।

বেশ, তা সাদির আগে কিছু খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হয়, কেমন—ঠিক কি না?

হ্যাঁ ঠিক।

তা তোমাদের ভেড়া-টেড়া কিছু আছে?

আছে।

তা হলে কিছু গোস্তের ব্যবস্থা করো, আমরা রসুই করি; খানাপিনা হোক—তারপর –

জলদস্যুরা তখনই তাদের জাহাজ থেকে দশটা ভেড়া এনে জবাই করে ছাল ছাড়িয়ে কুচিয়ে মেয়েটির সামনে এনে দিল। মেয়েটি তখনই আর চল্লিশটি মেয়েকে নিয়ে জাহাজে যে বড় বড় কড়া ছিল তা নামিয়ে সে মাংস নানা মসলাপাতি দিয়ে আচ্ছা করে পাক করলে। এরপর পরিবেশন করলে তা চল্লিশটি বোম্বেটেকে, ওরা পরম তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরে সে খানা খেলে, এরপর মেয়েটি তাদের সিরাজি পরিবেশন করলে,—ঐ সিরাজির সঙ্গে কড়া ভাঙের আরক

মিশিয়ে দিয়েছিল, তাই পান করবার সঙ্গে সঙ্গে জব্বর ঘুমে ঢলে পড়ল তারা, একেবারে মরণের মত ঘুম। এরপর মেয়েটি আর কালবিলম্ব না করে এক খরধার তলোয়ার দিয়ে একে একে ঐ চল্লিশ বোম্বাটের মাথা কেটে তাদের সমুদ্রের জলে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর এল সে ওদের শেখের কাছে, শেখকে আর হত্যা করল না মেয়েটি তার দাড়ি কামিয়ে, এক চোখ উপড়ে, দাঁত ভেঙে তার মাঝি-মাল্লাদের হুকুম দিলে তাকে ডাঙায় নামিয়ে দিতে।

বোম্বেটেদের জাহাজে অনেক লুঠের মালপত্র ধনসম্পদ ছিল, মেয়েটি এরপর সেগুলি লুঠ করে এনে নিজের জাহাজের মাঝিমাল্লাদের বিতরণ করলে। তারপর তাদের হুকুম দিলে ওখান থেকে নোঙর তুলে পাল খাটিয়ে জাহাজ ছাড়তে।

জাহাজ ছাড়াল বটে—কিন্তু এবার আর কয়েকদিনের মধ্যে কোন দ্বীপ বা শহর চোখে পড়ে না। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ ঠেলে জাহাজ চলেছে ত চলেইছে। অবশেষে খোদা একদিন চোখ মেলে চাইলেন, ওরা সমুদ্রের তীরে একটা শহর দেখতে পেয়ে সেখানে জাহাজ ভিড়ালো। শহরটা বড় সুন্দর মনে হল। ভাল করে দেখবার জন্যে মেয়েটি আর চল্লিশটি মেয়ের সঙ্গে পুরুষের পোশাক পরে তরুণ সেজে নেমে পড়ল জাহাজ থেকে। তারপর তারা রাস্তা ধরে চলতে গিয়েই দেখে—ওখানকার সব লোকেরা শোকের পোশাক পরে শোকের শোভাযাত্রা করে পথে বেরিয়েছে।

কি ব্যাপার?

ওখানকার একজন লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—যে এই রাজ্যের সুলতান মারা গিয়েছেন, সিংহাসন এখন শূন্য। ঐ শোভাযাত্রার সঙ্গেই সুলতানের উজির রয়েছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা পাখী। লোকটি বললে, এই পাখীটাকেই কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দেওয়া হবে, ও উড়ে গিয়ে যার মাথায় বসবে তাকেই করা হবে সুলতান।

অদ্ভুত নিয়ম ত !—ভাবলে রেইস মেয়েটি এবং তার সঙ্গিনীর দল।

একটু পরেই উজির উড়িয়ে দিলেন পাখীটিকে, আর পাখীটি উপরে কিছুক্ষণ ফর ফর করে উড়ে খোদার এমনি মর্জি যে বসল গিয়ে ঐ মেয়েটি অর্থাৎ রেইস মেয়েটির মাথার উপর। মেয়েটি তখন এক বাচ্চাবান্দার বেশে। সবাই অমনি বলে উঠল—তাজ্জব, তাজ্জব ব্যাপার ত ! এরপর উজিরের লোকজন পাখীটিকে মেয়েটির মাথার উপর থেকে তুলে নিয়ে গেল।

পরের দিন মেয়েটি পুরুষ বেশেই আবার যখন জাহাজ থেকে নেমে শহরের পথে বেরিয়েছে তখন উজির আবার পাখীটিকে ছেড়ে দিলেন। পাখী একটু উড়েই ঐ রেইসের মাথার উপরেই গিয়ে বসল। দেখেছ, কি অবাক কাণ্ড !—বলে উজিরের লোকজন তাড়া করে উড়িয়ে দিল পাখীটিকে মেয়েটির মাথা থেকে। কিন্তু হলে হবে কি, একটু উড়েই পাখীটি ওরই মাথার উপর গিয়ে বসল। এরপর আরও অনেকবার সরিয়ে দিল ওরা পাখীকে ওর মাথা থেকে, কিন্তু যতবার সরাল, যতবার উড়াল, প্রতিবারের পরেই পাখী ওরই মাথার উপর এসে বসে। দেখে লোকজনের বিস্ময়ের অন্ত রইল না, ওরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে আল্লা চান ইনিই আমাদের সুলতান হোন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা কারোই উচিত নয়, সুতরাং করবও না তা আমরা।—এই বলে তারা ঐ পুরুষবেশী রেইস্-মেয়েটিকে সুলতানের পোশাক পাগড়ী পরিয়ে সুলতানের সীল-অঙ্গুরী হাতে দিয়ে সিংহাসনে বসালো। মেয়েটি তখন তার পুরুষবেশী চল্লিশ সঙ্গিনীকে নিজের ফায়-ফরমাস খাটাবার জন্য নিজের কাছে রেখে দিল।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটবার পর একদিন উজির এসে তাকে বললে—জাহাঁপনা, অভয় দেন ত একটা কথা বলি।

বলুন।

খোদাবন্দ, আমার একটি মেয়ে আছে, পরমাসুন্দরী সে, গুণবতী,

আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গে তার আমি সাদি দিয়ে তাকে আপনার বেগম করে দিই, কারণ বেগম ছাড়া সুলতান—এটা কেমনই যেন লাগে।

সুলতানবেশী মেয়েটি একটু কি যেন ভাবলে, তারপরই বললে, আপনি উজির, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

শুনে উজির মহোল্লাসে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। যথাসময়ে আয়োজন সমাপ্ত হলে কাজী ডেকে সুলতানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেন। উপযুক্ত খানাপিনা উৎসবের ব্যবস্থাও হল। তারপর রাত্রি হলে কনেকে সাজিয়ে গুজিয়ে তার বরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বর মেয়ে-সুলতান কি আর তখন করে, ভাল করে উজু করে সারারাত সে নমাজ করেই কাটিয়ে দিল।

ভোর হলে কনের মা কৌতূহলী হয়ে মেয়ের কাছে শুনতে এলেন, বুঝতে এলেন বরের সঙ্গে কেমন ভাব হয়েছে তার।

মেয়ে বললে—কি বলব তোমায়, মা সারারাত তোমার জামাই শুধু নমাজ করেছেন, একবারও আমার কাছে আসেন নি, ডাকেন নি, এমন কি একটা কথা পর্যন্ত বলেন নি।

মা তাকে বললেন—তুই ঘাবড়াস না, বেটী, বর তোর ছেলে মানুষ ত, লজ্জা কাটে নি, তাই। আর এই প্রথম রাত ত। এরপর দেখিস কত আদর পাবি ওর কাছ থেকে।

পরদিন রাত্রেও নয়া সুলতান হারেমে গিয়ে উজু করে সারারাত আগের দিনের মতই নমাজ করেই কাটিয়ে দিলে। সকাল হলে মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, আজকের খবর কি? মেয়ে মুখ ভার করে বললে—নতুন খবর আর কি, কালও যা, আজও তাই, জামাই তোমার উজু করে সারারাত নমাজেই কাটিয়ে দিলেন, একটা কথা পর্যন্ত বললেন না আমার সঙ্গে—বলে মেয়ে কাঁদতে লাগল। মা তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিলেন। এর পর তৃতীয় রাত্রেও যখন ঐ একই রকম ব্যাপার ঘটল, তখন মা মেয়ের কাছে তাই শুনে বললেন—শোন, আজ রাত্রে তুই এক কাজ করবি,

জামাইকে যখন কাছে পাবি, তখন তুই তার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যা বলবার তাই বলবি, যা তোর মনে আসে।

পরের দিন রাত্রে নয়া সুলতান হারেমে এলে উজিরের মেয়ে মায়ের কথামত তার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—জাহাঁপনার বোধহয় এ বাঁদীকে মোটেই পছন্দ হয়নি, নইলে তিনটে রাত কেটে গেল অথচ একটা কথাও বললেন না আমার সঙ্গে!

নয়া সুলতান তার উত্তরে বললে—ও সোনা, তোমাকে আমার খুব পছন্দ, তুমি আমার নয়নের মণি, কিন্তু আমার একটা গোপন কথা আছে, তা তোমায় বলতে চাই আমি, তুমি গোপন রাখতে পারবে ত?

খুব পারব। গোপন কথা গোপন রাখতে আমার মত আর কেউ পারে না, আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

নয়া সুলতান তখন উজিরের মেয়েকে বললে—ভাই আমিও তোমারই মতন একটি মেয়ে, এখনও কুমারী মেয়ে। আমাকে যে এই পুরুষের বেশে দেখছ—এর কারণ আমার চচেরা ভাইয়ের সঙ্গে আমার সাদি ঠিক হয়ে আছে, দৈব দুর্বিপাকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। আল্লা দিন দিলে যখন তাকে আবার ফিরে পাব, তখন তোমার সঙ্গেই তার আগে সাদি দেওয়াব। তুমিই হবে তার প্রথম রাতের কনে, এর পর তার সঙ্গে আমার সাদি হবে।

উজিরের মেয়ের দরদী মন, বুদ্ধিও খুব। ব্যাপার বুঝে তার মনে আফসোস আর কিছু রইল না, সে বুদ্ধি করে তাদের বিছানা এবং নিজের সাজপোশাকের এমন অবস্থা করে রাখল যে, যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারে রাত্রে তারা একই শয্যায়ই কাটিয়েছে।

পরদিন ভোরে সুলতানের হারেমে মেয়ের সঙ্গে মা দেখা করতে এসে তার বিছানা এবং জামাকাপড়ের হাল দেখেই হেসে বললেন—কি রে ভাব হয়েছে ত?

মেয়ে সলজ্জ মুখে উত্তর দিলে···খু-উ-ব।

নয়া সুলতান এরপর ওখানে ঠিক মতই তার রাজ্য চালাতে

লাগল বটে, কিন্তু মন তার সব সময়েই ভার ভার। তার পেয়ারের চচেরা ভাই এখন কোথায়, কেমন আছে, তার বাপজানই বা কেমন আছেন, তাদের খবর না পাওয়া পর্যন্ত মনে তার একটুও স্বস্তি নেই। কি করে তাঁদের খবর সংগ্রহ করা যায়।

অনেক ভেবে চিন্তে সে এক পন্থা উদ্ভাবন করলে: শহরের সর্দার মিস্ত্রীকে ডেকে সে হুকুম দিলে, আমার প্রাসাদের কাছেই রাস্তার ধারে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে তুমি তোমার লোকজন দিয়ে অতি সুন্দর এক হামাম তৈরি করে দাও, আর পাশেই করে দাও এক সরাইখানা। এর পর শহরের সবচেয়ে বড় ভাস্কর-শিল্পীকে ডেকে এনে হুকুম দিল, তুমি অবিকল আমার মত পাথরের মূর্তি তৈরি করে দাও, আমার মত উঁচু, আমার মত সব কিছু এক কথায় অবিকল আমার মত দেখতে। আর মূর্তিটি গড়ে আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

কিছুদিনের মধ্যেই সর্দার মিস্ত্রী সুলতানের হুকুম তামিল করল: সুলতানের প্রাসাদের কাছে অতি সুন্দর হামাম-বাড়ি তৈরি হয়ে গেল, তার পাশেই সুন্দর এক সরাইখানা। ভাস্কর মূর্তি গড়ে এনে যখন সুলতানকে দেখালে তখন সুলতান দেখলে এ অবিকল তার মূর্তি হয়েছে এক চুল এদিক ওদিক হয় নি। এরপর সুলতান তার লোকজনদের ঐ মূর্তিটিকে হামামের দরজার সামনে মসলা দিয়ে এঁটে বসাতে বললে।

এই সব করা হলে নয়া সুলতান ঢেঁড়া পিটিয়ে শহরের লোকজনদের জানিয়ে দিলে—শ্রান্ত হয়ে বা আরামের জন্যে যে হামামে গোসল করতে চায় সে বিনা খরচে সুলতানের এই হামামে গোসল করে যেতে পারে, তারপর সরাইখানায় খেতে পাবে সে সরবৎ, তার জন্যেও কিছু দিতে হবে না।

ঢেঁড়া শুনে শহরবাসী এবং ওখানে আগন্তুক বিদেশী সবাই মহাখুশী, সবার মুখেই নয়া সুলতানের তারিফ, তার দীর্ঘজীবন কামনা। লোকমুখে খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বিদেশ থেকেও

অনেক লোক আসতে লাগল হামাম গোসল করতে আর সরবৎ খেতে।

এদিকে নয়া সুলতান তার দুই খোজা বান্দাকে ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিল, তোরা গিয়ে হামাম দরজার সামনের মূর্তিটার কাছে বসে থাকবি, হামাম গোসল করতে এসে ওর দিকে কেউ যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, এবং সেই সময় তোরা যদি তার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিস, অমনি তোরা তাকে ধরে আমার সামনে নিয়ে আসবি।

খোজা বান্দা দুটি সুলতানের হুকুমে তখন থেকে ঐ মূর্তির সামনে বসে থাকতে লাগল। কিছুদিন পরেই নয়া সুলতানের বাপ তার মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে ঐ শহরে এসে হাজির হলেন। এরপর ওখানকার লোকমুখে যখন তিনি শুনলেন— এখানকার সুলতানের যে হামাম আছে, সেখানে বিনাব্যয়ে গোসল করা যায়, তারপর পাশের সরাইয়ে কোন কিছু না দিয়ে সরবৎও মেলে, তখন তিনি পথের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করতে ঐ হাম্মামে যাওয়া সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু হামামে ঢুকতে গেলেই যে মূর্তিটি তাঁর সামনে পড়ল তা দেখে তাঁর চক্ষু স্থির ঃ এ আল্লা, এ কি দেখছি আমি, এ যে অবিকল আমার সেই হারানো মেয়ের মূর্তি—এর পুরুষের পোশাক পরা, এই মাত্র ফারাক। মেয়ের কথা মনে করে অবিরলধারে তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। খোজা বান্দা দুটি তাঁকে এই অবস্থায় দেখামাত্র তাদের সুলতানের কাছে নিয়ে গেল। নয়া সুলতান তাঁকে দেখামাত্র নিজের বাপজান বলে চিনতে পেরে তখনই তার বান্দাদের হুকুম দিলে—এঁকে এক ভাল কামরায় রেখে ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা করে দাও।

দুই একদিন পরে ওর সেই চচেরা ভাই ওরই খোঁজে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ঐ শহরে এসে হাজির হল। সে-ও এসে যখন শুনল এখানে সুলতানের হামামে বিনাব্যয়ে গোসল করা যায়, তখন সে-ও ভাবলে—যাই একবার গোসল করে পথের শ্রান্তি দূর করে আসি। ভেবে হামামের সামনে যেই সে এসে দাঁড়িয়েছে

অমনি সেই মূর্তিটি চোখে পড়ায় চোখ যেন সে আর ফিরাতে পারে না, দেখে মনে হয় মূর্তিটি যেন সে চোখ দিয়ে গিলে খেতে চাইছে, তা ছাড়া তার দুচোখ দিয়ে এত পানি ঝরতে লাগল যে তার জামা-কাপড় পর্যন্ত ভিজে গেল। ওকে এই অবস্থায় দেখামাত্র খোজা দুটি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের সুলতানের সামনে হাজির করল। সুলতানবেশী তার চচেরা বোন তাকে দেখেই চিনলে, তখনই তার বান্দাদের হুকুম করলে—একে এখান থেকে নিয়ে একটা ভাল ঘরে রাখো, এবং ভাল খাবার দাবার ব্যবস্থা করে দাও।

এর পর ঐ শহরে এল সেই রেইস্, সে দেশ বিদেশে তার হারানো জাহাজের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে হাজির হয়েছে। আর এখানে এসেই যখন শুনলে বিনাখরচে এখানে হামাম-গোসল করা যায়, তখন হামামে ঢুকতে গিয়ে তার দরজার সামনে ঐ মূর্তিটা দেখা মাত্র তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ওয়াল্লিহি, এ ত তারই মূর্তি! যেমনি বলা অমনি খোজা দুটি তখনই তাকে ধরে সুলতানের সামনে নিয়ে হাজির করল। সুলতানও রেইস্‌কে দেখা মাত্র চিনলে। তখন বান্দাদের সে হুকুম করলে—একে নিয়ে গিয়ে আপাতত অন্য একটা ঘরে আটকে রেখে দাও।

এরপর যে দেশ থেকে নয়া সুলতান ওখানকার সুলতানের চোখে ধূলো দিয়ে চল্লিশটি কুমারী মেয়েকে নিজের জাহাজে তুলে হাওয়া হয়েছিল সেইদেশের সেই সুলতান তার উজিরকে নিয়ে সেই চল্লিশ মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে নানা দেশ ঘুরে অবশেষে এই শহরে এসে হাজির হলেন। তাঁরা এখানে এসে যখন এখানকার হামামের কথা শুনলেন, তখন সুলতান উজিরকে বললেন—উজির, পথে আসতে আমাদের গা ধুলোবালিতে বড় নোংরা হয়ে গেছে, চলো আমরা এই হামামে গিয়ে গোসল করে একটু সাফ হয়ে আসি। উজির বললেন—এ অতি উত্তম প্রস্তাব, জাহাঁপনা। এরপর দুইজনেই গোসলের জন্য হামামের দিকে রওনা হলেন। হামামের কাছাকাছি এসে ওর দরজার সামনে ঐ মূর্তিটা দেখা মাত্র তাঁরা ওর দিকে একেবারে হাঁ করে চেয়ে

রইলেন, দৃষ্টি আর ফিরাতে পারেন না। ওদের অমনি একদৃষ্টে মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে দেখেই খোজা ছুটি ওদের দু'জনকে ধরে নয়া সুলতানের সামনে নিয়ে হাজির করল। যে চল্লিশটি কুমারী মেয়েকে নয়া সুলতান জাহাজে করে নিয়ে এসেছিল তারা বালক-বান্দার বেশে তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। উজির তার মাঝে অবিকল তার মেয়ের মুখের মত একজনের মুখ দেখতে পেয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলেন,···তাঁর দুই চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরে পড়তে লাগল। এ যে বিলকুল আমার বেটীর মুখ—ভাবতে লাগলেন তিনি। এদিকে বালকবেশী উজিরের মেয়ে তার বাপকে দেখে চিনতে পেরেছে, সে ত একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার বাপজানের দিকে। নয়া সুলতান বুঝতে পেরেছে সব, তবু উজিরের দিকে চেয়ে মুখে বললে—কি ব্যাপার ?

উজির তখন নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা আমার নিজের মেয়ের সঙ্গে আরও উনচল্লিশটি মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে···

এইটুকু শোনামাত্র নয়া সুলতান তার বান্দাদের হুকুম দিলে—এদের দু'জনকেও একটা ঘরে নিয়ে রেখে আপাতত খানাপিনার ব্যবস্থা করে দাও।

সর্বশেষে শহরে এল চল্লিশ বোম্বেটের সর্দার সেই শেখ। সে-ও যখন শুনলে ওখানকার খয়রাতি হামাম গোসল আর সরবৎ খাওয়ার কথা, তখন সে-ও ভাবলে যাওয়া যাক একবার এখানে। কিন্তু হামামের সামনে এসেই যখন সে ঐ মূর্তিটি দেখলে তখন সেই ধুরবাজ মেয়েটির সঙ্গে এর মিল দেখে বোকার মত জোর গলায়ই বলে উঠল—ইয়া আল্লা, এ যে দেখছি অবিকল সেই মেয়েটির মুখ, আল্লা করেন পাই যদি হাতের কাছে তা হ'লে তাকে আমি, লোকে যেমনি করে বকরী জবাই করে তেমনি করে, জবাই করব। এরপর নানা অশ্লীল কথা বলে মেয়েটিকে গালাগালি দিতে লাগল।

মূর্তির দিকে চেয়ে লোকটিকে এই সব কথা বলতে শুনে খোজা

দুটি তাকে তাদের সুলতানের সামনে নিয়ে হাজির করল। নয়া সুলতান তাকে দেখেই চিনতে পারে, তখনই হুকুম দিলে—একে হাজতে নিয়ে পোরো।

ক্রমে সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যা উতরে রাত্রি হল, নয়া সুলতান তখন হুকুম করলে—তার বাপ, চচেরা ভাই, রেইস্, সুলতান, উজির আর বোম্বেটের সর্দার শেখকে তার সামনে হাজির করতে। সবাইকে আনা হলে, নয়া সুলতান তাদের বললে—তোমাদের প্রত্যেকে এক একটা করে তাজ্জব গল্প বলো তা হলে রাতটা দিব্যি ফুর্তিতে কেটে যাবে।

ওরা বলল—তাজ্জব গল্প ত কিছু জানা নেই।

তবে আমিই একটা তাজ্জব কাহিনী বলি, তোমরা মন দিয়ে শোনো।

এটা যেন কি রকম লাগে, আপনি বলবেন আমরা শুনব!

কি করা যায়, তোমাদের যখন কিছু জানা নেই, তখন আমিই বলি, শোনো—

এক শহরে এক ধনী বণিক ছিলেন, তাঁর এক ভাই ছিলেন, তিনি খুবই গরিব। এখন এই ধনী ভাইয়ের এক মেয়ে ছিল, আর গরিব ভায়ের ছিল এক ছেলে। এই চচেরা ভাই-বোন খুব ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসত। ছেলেটির গরিব বাপ ছেলেটির দশ বছর বয়সের সময়ই মারা গেছেন। ছেলেটি অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হতে লাগল। যখন তার বিয়ের বয়স হল তখন সে বন্ধুবান্ধবদের পাঠাল তার চাচার কাছে,—কি-না সে তার চচেরা বোনকে বিয়ে করতে চায়। চাচা দূর দূর করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। এরপরই এক বড় লোকের বাড়ি থেকে মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ এল। এরা বড় লোক, সুতরাং এ বিয়েতে আর চাচার আপত্তি নেই ঃ বিয়ের কথাবার্তা, দেনাপাওনা দিনক্ষণ সবই ঠিক হয়ে গেল।

মেয়েটি না কি তার চচেরা ভাইকে খুবই ভালবাসত তাই এ

সম্বন্ধে তার মন রীতিমত খারাপ হয়ে গেল, বিগড়ে গেল, সে মনে মনে ঠিক করলে, তার চচেরা ভাইকে ছাড়া আর কাউকে সে কিছুতেই সাদি করবে না। তাই গভীর রাত্রে সে নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে বাপের তহবিল থেকে কিছু দিনার নিয়ে আস্তাবল থেকে দুটো গাধা নিয়ে ছেলেটির ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিতে ছেলেটি দোর খুলে বেরিয়ে এল, এর পর রাত্রির অন্ধকারে দু'জন গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিদেশে। এই কথা শোনা মাত্র মেয়েটির বাপ এবং চচেরা ভাই তাদের আসন থেকে তড়াক করে উঠে জড়িয়ে ধরলো নয়া সুলতানকে। চিনেছে তারা চিনেছে, পেয়েছে তারা তাদের হারানিধিকে।

এরপর নয়া সুলতানের কাহিনীতে যখন জাহাজের রেইসের প্রসঙ্গ এল তখন তার বর্ণনা শুনে রেইসকে বেশ খুশী দেখা গেল। তারপর যখন সুলতান এবং উজিরের কথা এল তখন তাঁরা তা শুনে বললেন—জাহাঁপনার এ কাহিনীর তারিফ না করে পারা যায় না! কথক হিসাবে খোদার কাছে অনেক পুরস্কার তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু কাহিনীতে যখন জলদস্যুদের কথা এসে গেল তখন শেখ একরকম চীৎকার করেই বলে উঠল—জাহাঁপনা, আল্লার কসম আপনার এ গল্প থামান, এ আর শোনা যায় না, আপনি অন্য কোন গল্প বলুন। অন্যান্য শ্রোতারা তখন প্রতিবাদ করে বলে উঠল—না, না, থামবেন না, খোদাবন্দ, এই গল্পটাই শেষ করুন, বড় সুন্দর এ গল্পটি।

নয়া সুলতান এরপর সেই পাখীর কাহিনীতে এসে গেল যে পাখী তাকে এ রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছে। সর্বশেষে তার হামাম আর সরাইখানা কথা বলে তার গল্প শেষ করল। শুনে শ্রোতারা সব তাজ্জব বনে গিয়ে বলে উঠল—খাসা এ গল্পটি, তোফা! একমাত্র বোম্বেটে সর্দার শেখের মুখ দিয়ে বেরুল—না, এ গল্প মোটেই সুবিধের নয়, এ শুনে আমার দম আটকে আসছে।

গল্প শোনার পর শ্রোতাদের বুঝতে আর কারো কোন কিছু বাকী রইল না। সিংহাসনে বসেই নয়া সুলতান তখন সুলতান আর

উজিরকে বলল—আপনাদের সামনে যে চল্লিশটি বাচ্চাবান্দা দেখছেন, পুরুষবেশে—এরাই হচ্ছে যাদের খোঁজে এসেছেন আপনারা, সেই চল্লিশটি মেয়ে। এই বলে সে তাঁদের অনেক মূল্যবান জিনিস উপহারের সঙ্গে ঐ চল্লিশটি মেয়েকে ফেরত দিলে তাঁরা বিদায় নিলেন। এরপর রেইসের পালা। রেইসকে সে তার জাহাজ ত ফেরত দিলই, তার জাহাজে যে সব মালপত্র ছিল তা-ও দিল।

বোম্বেটে সর্দারের শাস্তিটা অবশ্য রীতিমত কঠোরই হল। নয়া সুলতান তার লোকজনদের হুকুম দিলে তার প্রাসাদের সামনে এক চিতা তৈরি করতে। চিতা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তখন সুলতানের হুকুমে তার লোকজন ঐ শেখকে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ঐ চিতায় ফেলে দিলে। অল্পক্ষণের ভেতরে তার দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

এরপর চচেরা ভাইয়ের পালা। উজিরের মেয়েকে যে কথা দেওয়া ছিল তার সেই কথামত প্রথমেই সে চচেরা ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে, তার পরের দিন বাপকে বলে চচেরা ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বিয়ের সে ব্যবস্থা করলে। শুধু তাই নয়, দুই বিয়ের কাজ মিটে গেলে নিজের সিংহাসনে বসালে নিজের স্বামী ঐ চচেরা ভাইকেই। সাবেক উজির হলেন নতুন সুলতানের দক্ষিণহস্ত, প্রধান উপদেষ্টা।

এরপর মেয়েটির কাজ হল দেশ থেকে নিজের আম্মাজানকে আনা। মা আসার পর ওঁরা সবাই এক সঙ্গে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। খোদার দোয়ায় বাধাবিঘ্ন বিপত্তি আর কিছু ঘটে নি।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বললে—দিদি, তোর এ গল্পটা আমার ভীষণ ভাল লাগল। ভাল লাগল, তার কারণ, মেয়েটা যে শুধু ভালবাসতে জানে, তাই নয়, বুদ্ধিতে সে এতগুলো পুরুষকে হিমসিম খাইয়ে দিল!

শাহরাজাদী মৃদু হেসে বললে—মেয়েরা ধূর্ততায় পুরুষদের হারিয়ে দিলে শুনলে বড় খুশী লাগে—না? জাহাঁপনা অনুমতি করলে—আমি এমন একটা ধূর্ত মেয়ের গল্প শোনাতে পারি,—তা শুনলে লোকের তাক লেগে যাবে।

শাহরিয়ার বললেন—বেশ, কাল শুনিও তুমি সে ধূর্ত মেয়ের গল্প। শুনলে আমরা পুরুষরা তবু একটু সাবধান হতে পারব।

কায়রোর চোরনী

পরদিন রাত্রি শেষে সুলতানকে তসলিম করে শাহরাজাদী সেই ধূর্ত মেয়েটির গল্প শুরু করল—

মিশরের কায়রো শহরে একটা লোক ছিল, বয়স হয়ে গিয়েছিল তার প্রায় চার কুড়ি দশ। কোতোয়ালিতে কাজ করত সে, ছিল থানার মুকুদ্দ ম অর্থাৎ পাহারাওয়ালাদের সর্দার। সর্দার বলে সর্দার, বড় জঁাদরেল সর্দার ঃ কোন ব্যাপারে ভয়ঙ্কর বলে কিছু তার ছিল না।

একদিন রাত্রে ওয়ালির সঙ্গে রেঁাদে বেরিয়ে ভোরের কাছাকাছি 'অল্‌-বাওয়া-বাহে' (পাহারাওয়ালাদের আস্তানায়) ফিরে এসে উজু করে সবে সে ভোরের নমাজের জন্যে দাঁড়িয়েছে এমন সময় কি-ভরতি একটা থলি পড়ল তার সামনে। নমাজটা সেরে নিয়ে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে কে ফেললে এ থলিটা তার খোঁজ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। এরপর থলিটা সে হাতে তুলে নিয়ে তার মুখ খুলে দেখে—দিনার, গুণে দেখে পুরো একশোটা। বেশ তাজ্জবই লাগল তার। পরের দিন ভোরে উজু করে আবার যেই সে নমাজ করতে শুরু করেছে—অমনি আর একটি থলি এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। নমাজের শেষে এদিক ওদিক তাকালে, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। এরপর থলিটা হাতে তুলে নিয়ে খুলে দেখে—এতেও রয়েছে একশো দিনার। অবাক্‌ কাণ্ড! পরের দিন ভোরেও যখন সে উজু করে নমাজ করতে শুরু করেছে অমনি আর একটি থলি এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। এদিন অতি সংক্ষেপে নমাজটা সেরে যেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে অমনি দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স বছর

পনেরোর বেশী নয়। মুকুদ্দুম ধরে ফেললে অমনি মেয়েটিকে ঃ কে তুমি, কি চাও, এমনি করে মোহরের থলি আমার কাছে ছুঁড়বারই তোমার কারণ কি? আজকেরটা নিয়ে ত তিন শো দিনার হল!

মেয়েটি বললে—জনাব, নাম আমার ফতিমা, আমি কি চাই, জিজ্ঞাসা করছেন? চাই আমি আপনার মুখের কথা, আপনার মুখের কথাতেই আমার কাজ উদ্ধার হতে পারে।

হেঁয়ালি রেখে কি করতে হবে আমায়, তাই বলো।

মেয়েটি বললে—জনাব, আমার মতলব কি তা আপনাকে খুলেই বলছি। কাল যখন আপনি রোঁদে বেরুবেন তখন আমি যেন বড্ড বেশী সিরাজি পান করার ফলে বেহুঁস—এই ভান করে কাজী-অল-অস্করের (প্রধান কাজী) বাড়ির সামনে পড়ে থাকব। আমার পরনে থাকবে দামী পোশাক, গায়ে নানা অলংকার। আপনি যখন আমায় বেহুঁস অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবেন তখন আপনার সঙ্গের চেরাগওয়ালাকে আমার সামনে তার চেরাগটা ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখাতে বলে আমার হালটা ভাল করে বুঝে নেবার ভান করবেন, তারপর ওয়ালিসাহেবকে বলবেন—মেয়েটি দেখছি বড্ড বেশী মাত্রায় সিরাজি পান করেছে। শুনে ওয়ালি আপনাকে বলবেন—একে এখন তোমাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে রাখ,···ভোর হোক তখন দেখা যাবে। শুনে আপনি বলবেন—না, হুজুর, এটা ঠিক হবে না, আমি বরং এই এলাকার লোকজনদের ডাকি, তারা কাজী-অল-অস্করকে জাগাক। আপনার কথায় ওয়ালি সাহেব রাজী হবেন। এরপর আপনি হাঁক দিলে যখন ওখানকার লোকজন আপনাদের সামনে এসে হাজির হবে তখন আপনি বলবেন—এই মেয়েটি সিরাজি পান করে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, জ্ঞানগম্যি বলে আর কিছু নেই। চেহারা আর সাজপোশাক দেখে মনে হচ্ছে এ এই পাড়ারই কোন আমীর ওমরাহ বা বণিকের বেটী, ওকে আমাদের আস্তানায় নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, আর যে কোন লোকের হেফাজতে রাখাও ঠিক হবে না, সুতরাং তোমরা একে কাজী

অল-অস্করের বাড়িতে নিয়েই কোথাও শুইয়ে রাখ, ভোর হোক, তার পর যখন এর নেশা কেটে গিয়ে জ্ঞানগম্যি ফিরে আসবে তখন এ নিজেই নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে।

শুনে মুকুদ্দম বললে--এ আর এমন কি কঠিন কাজ।

মেয়েটি বললে—বেশ, এ যদি আপনি করেন, এবং তাতে আমার কার্যসিদ্ধি হয় তা হলে···তিন শো দিনার ত আপনাকে দিয়েইছি, এর উপর আরও পাঁচশো দিনার আপনাকে দেব।

মুকুদ্দম বললে,—বেশ, তাই হবে, এ আমাদের পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয়। এই কথা হয়ে যাবার পর মেয়েটি তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

পরের দিন রাত্রে রোঁদে বেরুবার সময় হলে ওয়ালি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অল-বাওয়া-বাহে গিয়ে মুকুদ্দম আর তার সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে কায়রোর পথে বেরুলেন। একসঙ্গে কিছুটা চলেই মুকুদ্দম ওঁদের একটু পিছু ফেলে কাজী-অল-অস্করের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো। কি মতলবে সে যাচ্ছে ওয়ালির তা কিছু জানা রইল না। ওয়ালি তাঁর দলবল নিয়ে যখন কাজীর বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন, তখন একটু দূর থেকেই দেখেন মুকুদ্দম রাস্তার উপর কি যেন একটা দেখবার চেষ্টা করছে কিন্তু কি যে তা ভাল বুঝে উঠছে না। সে তখন চেরাগওয়ালাকে ডেকে বললে, বাবা, তুই চেরাগটা নিয়ে এখানে একবার আয় ত দেখি, ভাল করে একবার চেরাগটা ধর, দেখি এ বস্তুটা কি। চেরাগওয়ালা এগিয়ে গিয়ে চেরাগ ধরলেই দেখা গেল দামী পোশাক আর অলংকার পরা খুব-সুরত একটা অল্পবয়সী মেয়ে অত্যধিক সিরাজি পান করে বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছে। মুকুদ্দম তখন ওয়ালিকে ডেকে বললে—হুজুর, একটা মেয়ে নেশা করে বেহুঁস হয়ে পড়ে রয়েছে এখানে।

ওকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে ভোর অবধি রাখ, তারপর যা হয় করা যাবে—হুকুম দিলেন ওয়ালি।

মুকুদ্দম বললে—না, হুজুর, এটা ত ঠিক হবে না, বড় কাজী

সাহেবের বাড়ীর কাছে পড়ে রয়েছে এ, কে জানে হয়ত বড় কাজীরই বেটী হতে পারে এ, অথবা কাছাকাছিরই কোন হোমরাচোমরার বেটী, আমাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে রাখব, সেখানে এর যদি কোন কিছু ঘটে তবে ফ্যাসাদে পড়ব আমরা, আমাদের তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

মুকুদ্দমের এই কথা শুনে ওয়ালি হুকুম দিলে তাঁর লোকজন হাঁক ডাক দিয়ে আশেপাশের লোকজনদের জাগালে, তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদিকে কাজী-অল-অস্করকেও জাগানো হল। লোকজন সব অকুস্থলে এসে পৌঁছলে ওয়ালি তাদের বললেন—দেখ ত—কার বেটী এ, একে তোমরা চেন কি না? তারা এগিয়ে এসে চেরাগের আলোয় ভাল করে পরখ করে বলল—না, হুজুর, একে ত আমরা চিনতে পারছি না!

ওয়ালি বললেন—বুঝলাম, কিন্তু একে ত এখন এ অবস্থায় দূরে কোথাও সরিয়ে নেওয়া যায় না, তোমরা কাছাকাছির লোক, তোমরাই কেউ তার বাড়িতে রাত্রির মত একে রেখে দাও ভোরতক, এর জ্ঞান হলে এ নিজেই নিজের বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।

ওরা মাথা নেড়ে বললে—না, হুজুর মাফ করবেন, সে হয় নাঃ কত অলংকার আর দামী কাপড় জামা এর পরনে, দেখেই মনে হচ্ছে —কোন খানদানী ঘরের বেটী এ, আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলে এর যদি কিছু খোয়া যায়, তখন আমাদের মহা ফ্যাসাদে পড়তে হবে। তার চেয়ে এই সামনেই কাজী সাহেবের বাড়ি, ওঁর ওখানে একে রাখাই ভাল, নিরাপদ।

ওয়ালি এতে সম্মতি জানালে ঐ সব লোকেরাই তখন মেয়েটিকে ধরাধরি করে কাজী সাহেবের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর সব চাইতে যে ভাল সাজানো ঘর তার পাশেরই একটা কামরায় তাকে রাখল। এরপর ঘুমুতে যে যার বাড়ি চলে গেল। ওয়ালিও মেয়েটির একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াতে মুকুদ্দম আর তাঁর অন্যান্য লোকজন নিয়ে সেখান থেকে শহরের অন্য দিকে চলে গেল।

এদিকে মেয়েটি কাজীর ঘরে স্থান পাবার পর কিছুক্ষণ আর নড়-চড় করল না, সেই আগেকার মত বেহুঁসের ভান করেই পড়ে রইল। তারপর যখন বুঝলো কাজী আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, শুধু তাই নয়, বেশ গভীর নিদ্রায় নাক ডাকাচ্ছেন তখন সে চুপেচুপে উঠে যে ঘরে কাজীর ধনরত্ন পরিচ্ছদ ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল সেই ঘরের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। তার লোকজনদের আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া ছিল—তারাও সেই সময় এসে গেলে মেয়েটি তাদের সাহায্যে ঘরের তামাম জিনিস নিয়ে সরে পড়ল, রইল কেবল মেঝেতে পাতা মাদুর।

ভোরে উঠে কাজী-অল-অস্কর জামাকাপড় পরার জন্য ঐ ঘরে ঢুকে দেখেন ঘর একেবারে ফাঁকা, একমাত্র মেঝেয় পাতা মাদুর ছাড়া আর কোন কিছু ঘরে নেই। দেখেই কাজী নিজের বুক চাপড়ে জোর গলায় কেঁদে উঠলেন: হায়, আল্লা, এ কি হ'ল আমার, এ কি হল! কাজীর এই জোর কান্না শুনে বাড়ির বান্দারা সব ছুটে এল: কি হল, হুজুর, কি হল? ঘরের ভিতর ঢুকে তারা যখন দেখল ঘর একেবারে খালি, তখন তারা ছুটল যে ঘরে কাল রাত্রের সেই মেয়েটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল—সেই ঘরে: ইয়া আল্লা, এ ঘরও যে ফাঁকা, সে মেয়েটি যে হাওয়া! বুঝতে আর কারো বাকী রইল না যে, সেই মেয়েটিই সব কিছু নিয়ে পালিয়েছে।

সমস্ত ব্যাপারটা যখন কাজীর বোধগম্য হল তখন তিনি একটা ঘোড়ায় চড়ে অমনি সুলতানের ওখানে ছুটলেন, সেখানে গিয়ে সুলতানকে সেলাম করে তাঁকে নিজের বাড়ির ঘটনা সব বর্ণনা করে বললেন—জাহাঁপনা, এ ব্যাপারে আমি ওয়ালি এবং থানার মুকুদ্দ্‌মকে অভিযুক্ত করছি, কারণ ওরাই কাল রাত্রে এসে ঐ মেয়েটিকে আমার বাড়িতে স্থান দিতে বলে, আর ঐ মেয়েটিই আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে আমার ঘর একেবারে শূন্য করে রেখে গেছে।

সুলতান কাজীর নালিশ শুনে তখনই তলব করে পাঠালেন ওয়ালি আর মুকুদ্দমকে এবং ওরা হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন

ওদের কোতল করতে। কাজীর বাড়িতে কি কাণ্ড হয়ে গিয়েছে সে খবর ওদেরও কানে গিয়েছে। সুলতানের হুকুম শুনে ওরা দু'জন তখন হাত জোড় করে বললে—জাহাঁপনা, মাত্র তিনটি দিন সময় ভিক্ষা চাইছি আমরা, এর মধ্যে যদি সে চোরকে ধরে এনে দিতে না পারি তা হলে আপনার বিচারে যে শাস্তি আমাদের প্রাপ্য হয় দেবেন, শুধু তিন দিন সময় দিন আমাদের।

বেশ, তিন দিনই সময় তোমাদের আমি দিলাম, কিন্তু এর মধ্যে তোমরা যদি চোরকে আমার সামনে হাজির করতে না পার তা হলে শুধু তোমাদের দু'জনকে নয়, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের পরিবারের লোকজনদের শুদ্ধ আমি কোতল করব, আর তোমাদের সম্পত্তি করে নেওয়া হবে বাজেয়াপ্ত।

এরপর সুলতানকে কুর্নিশ করে চোরের খোঁজে ওয়ালি বেরুলেন একদিকে এবং মুকুদ্দ ম যাত্রা করল অন্য দিকে। পুরো দু'দিন ধরে কায়রো শহরের রাস্তাঘাট তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন ওরা কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তাই পেলেন না। তৃতীয় দিন দুপুরের নমাজের কাছাকাছি সময় মুকুদ্দ ম শহরের পশ্চিমের দিকের একটা গলিতে ঢুকেছে এমন সময় এক বাড়ির সদর দরজার আড়াল থেকে কে বলে উঠল—ও মুকুদ্দ ম সাহেব।

কে? কে ডাকে আমায়?

যে ডেকেছিল, দরজাটা আর একটু ফাঁক করে সে বলে উঠল—একবার ভিতরে আসুন, এসে দেখুন—কে। মুকুদ্দ ম তার কথামত ভিতরে ঢুকেই দেখে তার সামনে সেই মেয়েটি যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মেয়েটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুকুদ্দ ম তাকে পাকড়াও করলে। মেয়েটি অমনি বলে উঠল—কি, আপনি আমাকে পাকড়াও করছেন কেন, কি মতলব আপনার?

বিশেষ কিছু নয়, তোমাকে সুলতানের সামনে নিয়ে শুধু হাজির করব। তুমি সেদিন কাজীর বাড়িতে যে কাজ করে পালিয়েছ তার জন্য ওয়ালির আর আমার গর্দানের উপর জহ্লাদের খাঁড়া ঝুলছে,

তোমাকে ধরে সুলতানের সামনে হাজির করতে পারলেই আমরা দু'জন রেহাই পাব—এই আর কি !

শুনে মেয়েটি বলল—শুনুন মুকুদ্দ্‌ম সাহেব, আপনি ত বুদ্ধিমান লোক, শুনুন, বুঝুন ঃ আমি যদি আপনার এবং ওয়ালি সাহেবের ক্ষতি করতে চাইতাম, তা হলে কি আমি আপনাকে ডাকতাম, দেখা দিতাম ? হাজার চেষ্টা করলেও আপনারা আমার পাত্তা পেতেন না। আমি যে ইচ্ছে করে আপনাকে ডাকলাম এর কারণ আমি আপনাদের দু'জনকে সুলতানের হাত থেকে মুক্ত করা শুধু নয়, কাজী-অল-অস্করের কাছ থেকে আপনারা দু'জন যত খুশি যা খুশি যাতে আদায় করে নিতে পারেন, তার এক ফন্দি এঁটেছি, কিন্তু এতে আমি যা বলব তাই করতে হবে আপনাদের।

বলো, কি করব আমরা ?

শুনুন, খুলেই বলছি ঃ আমার এক গোরা বাঁদী ছিল, ঠিক আমারই মত দেখতে সে, তাকে আমার সেদিনকার মত জামাকাপড় অলংকার পরিয়ে খুন করে কাজী-অল-অস্করের বাড়ির একেবারে পাশেই যে ধ্বংসস্তূপ আছে, সেখানে কবর দিয়ে রেখে এসেছি। কবরটার উপরে একখানা পাথর দেওয়া আছে, দেখলেই জায়গাটা চিনতে পারবেন। এর পর আপনারা দু'জন সুলতানের কাছে গিয়ে বলবেন—শহরের প্রায় সব জায়গা আমরা তন্ন তন্ন করে দেখলাম কোথাও সে চোর মেয়েটার পাত্তা পেলাম না, বাকী আছে কাজী-অল-অস্করের বাড়ি এবং তার আশপাশ, আপনি অনুমতি দিলে ওখানটাও একটু খুঁজে দেখি—কে জানে সে যদি খুন হয়ে থাকে !

শুনে সুলতান নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন, তখন আপনারা ওঁর বাড়ির কাছের ঐ ধ্বংসস্তূপে পাথর দেখে কবর খুঁড়ে আমার বাঁদীর লাসটা বের করে ওপাড়ার লোকজনদের ডাকবেন, কাজীকেও ডাকবেন, এবং তাঁরই সামনে ঐ লোকজনদের জিজ্ঞাসা করবেন—দেখ ত তোমরা, একে চেন কি না ? সেদিন রাত্রে সিরাজি-পানে বেহুঁস যে মেয়েটিকে পথে পড়ে থাকতে দেখেছিলে, এ সেই কি

না? ওরা বলবে—হ্যাঁ, ঠিক সেই মেয়ে। শুনে ভড়কে যাবেন কাজী, তাঁকে রেহাই দেবার জন্যে তিনি আপনাদের অনেক অনুনয় বিনয় করবেন, আপনারা তখন তাঁর কাছ থেকে যত যা পারেন আদায় করে নেবেন, আর কাজীকে আপনারা শিখিয়ে দেবেন—তিনি সুলতানের কাছে বলবেন—জাহাঁপনা, যে আমার সব জিনিস নিয়েছিল, তার দেখা পেয়েছি আমি, সে আমার সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, আমি তাকে মাফ করেছি, সুতরাং আমি আমার নালিশ তুলে নিচ্ছি।—এই হলে আপনাদের দু'জনেরও মুক্তি, আমারও মুক্তি, আর কাজীও খুনের দায়ে ফ্যাসাদে পড়বে না। যা যা বললাম, এই সব ব্যাপার মিটে গেলে আপনারা দুইজন আমার এখানে আসবেন—কাজীর বাড়ি লুঠ করে আমি যা পেয়েছি তা আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব।

মেয়েটি মুকুদ্দ্‌মকে এই সব কথা বুঝিয়ে বললে, মুকুদ্দ্‌ম রাজী হয়ে তখনই ওয়ালির কাছে ছুটল, তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা বললে তিনিও এ কাজ হাসিল করতে সহজেই রাজী হলেন। এর পর ওয়ালি ঘোড়ায় চড়ে মুকুদ্দ্‌মকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানের সামনে এসে হাজির হলেন এবং যথারীতি তাঁকে কুর্নিশ করে আল্লার কাছে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে বললেন—খোদাবন্দ, কায়রোর তামাম জায়গা খুঁজে দেখলাম আমরা, কোথাও সে চোর মেয়েটির সন্ধান পেলাম না, আমাদের বাকী আছে শুধু কাজী সাহেবের বাড়ি এবং তার আশেপাশে খুঁজতে। আপনি অনুমতি করলে— যদি এখানে আমরা তাকে খুঁজে পাই তা হলে আমাদের জান বাঁচে, খালাস পাই আমরা।

সুলতান ওদের আরজি শুনে তখনই কাজী-অল-অস্করকে ডেকে বললেন—ওয়ালি তোমার বাড়ির ওখানটা একটু খুঁজে দেখতে চায়।

যো হুকুম, খোদাবন্দ।

ওয়ালি এই কথা শুনবার পর মুকুদ্দ্‌ম তার নিজের চল্লিশটি অনুচর নিয়ে কাজীর বাড়ি ও তার আশপাশ খানা তল্লাসি করতে

শুরু করলে। কাজীর বাড়ি তল্লাসি হয়ে যাবার পর তারা এসে পড়ল সেই ধ্বংসস্তূপে, সেখানে একটা নতুন কবরের উপর একটা সদ্য-বসানো আনকোরা পাথর দেখে তারা পাথর সরিয়ে যখন মাটি খুঁড়লে তখন বেরিয়ে পড়ল দামী জামাকাপড় আর অলংকার পরা একটা ফুটফুটে মেয়ের লাস।

মুকুদ্দুম তখন ওপাড়ার লোকজনদের ডেকে এনে লাসটা দেখিয়ে বললে— দেখ ত, এই মেয়েটিকে তোমরা চেন কি না ?

ওরা মেয়েটির মৃতদেহের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, এই ত সেদিন রাত্রের সেই মেয়ে অঢেল সিরাজি টেনে যে রাস্তার উপর বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, আমরা শেষে কাজী সাহেবের বাড়িতে ওকে রেখে এলাম।

মুকুদ্দুম বললে—তা হলে তোমরা তা লিখে দাও।

কাজী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ব্যাপার দেখেশুনে তিনি তখন একেবারে 'থ' হয়ে গেছেন : 'এ কি করে হতে পারল ! লোকজনের সনাক্ত লেখা শেষ হয়ে গেলে ওয়ালি কাজীর কাছে গিয়ে বললেন—এ কি, জনাব, ইসলামের শেখ হয়ে আপনার এই কাজ ? মেয়েটি কোন আমীর ওমরাহ হোমরা চোমরার মেয়ে হবে মনে করে ওকে আমরা আপনার বাড়িতে আপনার হেপাজতে রেখে গেলাম, আর আপনি ওকে রক্ষা করবেন ত ভাল, শেষে গলায় ছুরি বসালেন ?

কি আর জবাব দেবেন কাজী, জবাব দেবার কিছু নেই, কে তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে, প্রমাণ যখন সবই তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি তখন কেবল ভাবছেন, কথাটা সুলতানের কানে না যায়, গেলে কোনক্রমেই তাঁর আর রক্ষা থাকবে না। তিনি উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে তখন ওয়ালিকে বললেন—জনাব, আমি আপনাকে একশো এবং মুকুদ্দমকে বিশ থলি মোহর দিচ্ছি—কথাটা যেন সুলতানের কানে না যায়।

ওয়ালি তাতে রাজী হলে কাজী ওদের তাই দিলেন, এবং ওরাও সুলতানের কাছে গিয়ে কি বলতে হবে কাজীকে তাই

শিখিয়ে দিলে কাজী সুলতানের কাছে গিয়ে বললেন— জাঁহাঁপনা, যে চোরনী আমার যথা সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সে এসে আমার সব কিছু আবার ফেরত দিয়ে গেছে, সুতরাং তার উপর আর কিছু রাগ নেই আমার, আমি আমার নালিশ তুলে নিলাম।

কাজী ওদের কথামত সুলতানের কাছে গিয়ে এই কথা যে বললেন তার কারণ তাঁর মনে ভয় ছিল, না বললে ওরা গিয়ে সুলতানের কাছে এই খুনের কেলেঙ্কারীটা জানিয়ে দেবেন।

এখানকার কাজ মিটে গেলে মুকুদ্দুম যে গলিতে চোরনী মেয়েটার দেখা পেয়েছেন সেই গলিতে ঢুকে যে বাড়ি থেকে সে কথা বলেছিল সেই বাড়ির দরজায় ঘা দিতে বাড়ির ভিতর থেকে কে বলে উঠল— কে ?

আমি ফতিমাকে চাই, ফতিমা বাড়ি আছে ?

বাড়ির ভিতর থেকে উত্তর এল—কে তোমার ফতিমা, চিনি না আমরা, ফতিমা হালিমা-টালিমা কেউ এখানে থাকে না।

মুকুদ্দুম মনে মনে বলে উঠল— আচ্ছা পাজী শয়তানী মেয়ে ত, আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! পরক্ষণেই মাথা ঠাণ্ডা হতে মনে হল—খুব দোষ দেওয়া যায় না, আমাদের মান বাঁচিয়ে বেশ কিছু পাইয়েও দিয়ে গেছে। যা'ক, বেঁচে থাকলে আর একদিন না একদিন দেখা হবে।—তখন বুঝে নেব।

গল্প শুনে সুলতান বললেন—সত্যি, মেয়েদের বুদ্ধির কাছে পুরুষ দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু আল্লা করতেন—এই বুদ্ধির সঙ্গে যদি সততা থাকত!

শাহরাজাদী বললে—কোন কোন মেয়ের তা-ও আছে বই কি, আছে, মানে দস্তুর মত আছে। আপনি অনুমতি করলে আমি সেই ধরনের এমন একটি মহিলার গল্প শোনাতে পারি—যা শুনলে আপনার তাক্ লেগে যাবে।

শাহরিয়ার বললেন—বেশ, কাল শুনব তোমার এ গল্প।

কায়রোর সাধ্বী মহিলা ও তার চার প্রেমপ্রার্থী

পরদিন শাহরাজাদী তার সেই তাক্-লাগানো গল্প শুরু করলে—

কায়রোর এক আমীরের এক সতীসাধ্বী স্ত্রী ছিলেন তিনি অসামান্য সুন্দরী ঃ যেমনি তাঁর অঙ্গের গঠন, তেমনি মুখ চোখ, তেমনি দেহের বর্ণ। দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। এমন যার চেহারা, তাকে যে ঐ চেহারার জন্যেই মাঝে মাঝে ফ্যাসাদে পড়তে হবে—তাতে আর আশ্চর্য কি!

এখন এই বিবির মাসে একবার করে হামাম গোসলে যাওয়ার অভ্যাস ছিল, আর এই গোসলে যাবার সময় পথের ধারেই পড়ত কাজীর কাচারি। এই কাচারি-বাড়ির কাছে এসে মাঝে মাঝে থামতেন মহিলা ঃ অনেক লোকের ভিড়, তা ছাড়া আসামী আর ফরিয়াদীর উত্তর প্রত্যুত্তর—এ সব দেখবার শুনবার একটু আকর্ষণ আছে বই কি! আমীরের বিবি মাঝে মাঝে ওখানে একটু দাঁড়িয়ে যেতেন, বেশ মজা লাগত তাঁর। কাজী তাঁর বিচারের ফাঁকে ফাঁকে অনেক দিন এই মহিলাকে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি।

একদিন মাসের নির্দিষ্ট দিনে মহিলা তাঁর অভ্যাস মত হামামে যাচ্ছেন, কাজীর কাচারি বাড়ির কাছে এলে দেখেন কাচারিতে সেদিন কোন বিচার চলছে না, কাজী একাই বসে আছেন, আর কেউ আশেপাশে না থাকায় কাজী সেদিন মহিলাটির দিকে এমন করে তাকালেন যে তা দেখে মনে হয় যেন সে দৃষ্টির ভেতর দিয়ে হাজার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। এরপরই তিনি মহিলাটিকে বললেন—বিবিসাব, কোন কিছুর অভাব আছে আপনার?

না ত, কোন কিছুর অভাব আমার নেই।

এরপর কাজী আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—বিবিসাব, অনেকদিন থেকেই আপনি আমার মন চুরি করেছেন, আপনার হয়ত জানা নেই। তা যাক, একদিন—মানে যে কোনদিন একটু নিরালায় আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে? মানে—

বিবি অল্প একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

কাজী তখন আনন্দে গলে গিয়ে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—তা কবে, বিবিসাব, কোনখানে?

বিবি বললেন—আজই, লোকে যখন রাত্রির খানা খায় তার একটু পরে। শুনে কাজী মহা খুশী। আমীরের বিবি আর অপেক্ষা না করে তখনই আবার হামামের দিকে রওনা হলেন। সেখানে আচ্ছা করে গোসল করে, সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন এমন সময় পথে শহরের শাহবন্দরের (বণিক সংঘের সিদ্ধিক) সঙ্গে দেখা। মহিলা একেই অপরূপ সুন্দরী, তাতে আবার গোসল সেরে যাচ্ছেন, শাহবন্দর দেখে আর থাকতে না পেরে বললেন—একটা কথা বলতে পারি?

বলুন।

বুঝতেই পারছেন—আপনি আমার মন একেবারে কেড়ে নিয়েছেন, একটু নিরালায় আপনাকে আপন করে পেতে চাই। হতে পারে?

মহিলা তাকে রাত্রির খানার বেশ কিছুটা পরে সাক্ষাতের সময় দিয়ে আবার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। বাড়ির একেবারে কাছা-কাছি এসে গেলে বাজারের সর্দার কসাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেও মহিলার সৌন্দর্য দেখে থাকতে না পেরে ঐ একই অভিলাষ জানাল। মহিলা তাকে সময় দিলেন আরও কিছুটা পর।

এর পর মহিলা নিজের বাড়ি ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বাড়ির সবচেয়ে উপরের কামরার বারান্দায় গিয়ে খোলা হাওয়ায় মাথার কাপড় ফেলে খোঁপা বাঁধবার আগে চিরুনি দিয়ে চুল

আঁচড়াতে লাগলেন। পাশেই এক বণিকের বাড়ি, বণিক তখন কি কাজে একবার ছাদে এসেছিলেন, আমীরের বিবির দিকে নজর পড়তে তার রূপ দেখে তাঁরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। একটু পরেই তিনি এক বুড়ীকে পাঠালেন আমীরের বিবির কাছে নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে। বিবি ঐ বুড়ীর মারফতই বণিকের আসবার সময় বলে দিলেন আরও কিছুক্ষণ পরে।

যথা সময়ে কাজী সেজেগুজে এসে মহিলার বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখেন দরজা খোলাই আছে। তিনি তখন আনন্দে কম্পিত বক্ষে কম্পিত পদে উপরে উঠে মহিলার সামনে গিয়ে একটা স্বর্ণপাত্রে কিছুটা কস্তুরী এনেছিলেন তাই তাঁকে উপহার দিলেন। তারপর তিনি মহিলার সামনের আসনে বসে সবে দু'চারটে কথা বলেছেন এমন সময় বাড়ির সদর দরজায় করাঘাতের শব্দ হল।

কাজী অমনি চমকে বলে উঠলেন—কে? কে এল?

দেখছি, আমার স্বামীই বোধ হয়। যাক গিয়ে, কিচ্ছু ভয় পাবেন না আপনি, আমি ব্যবস্থা করছি—এই বলে মহিলা একটা আলখাল্লা আর একটা তুরতুর (বেদুইনের মাথার টুপি) এনে তাঁকে বললেন, ঐ ঘুপসি ছোট্ট কামরাটায় লুকাতে হবে আপনাকে, সুতরাং আপনার জামাকাপড় ছেড়ে এই পরে ঐ ঘরে ঢুকে পড়ুন। কাজী বিবির কথা মত তাই করলে বিবি দরজা খুলে দেখেন—এলেন এবার বাজারের শাহবন্দর। বিবি তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে উপরে নিয়ে এলে শাহবন্দর বিবির জন্যে যে এক প্রস্থ অতি সুন্দর পোশাক এনেছিলেন তা তাকে উপহার দিলেন। বিবি তখন তাকে সমাদরে পাশে বসিয়ে সবে কথাবার্তা শুরু করেছেন—এমন সময় দরজায় আবার করাঘাত।

আওয়াজ শুনে শাহবন্দর রীতিমত ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার? আর কেউ এল নাকি—কারো আসবার কথা ছিল?

মহিলা দিব্যি শান্ত কণ্ঠে বললেন—আমার স্বামী এলেন বোধ হয়। তা ভয় নেই আপনার, আমি ব্যবস্থা করছি—এই বলে একটা

আলখাল্লা আর তুরতুর এনে বললেন আপনার জামাকাপড় ছেড়ে এই পরে ঐ দ্বিতীয় ছোট্ট কামরাটায় ঢুকে পড়ুন।

শাহবন্দর বিবির কথামত কাজ করলে বিবি নীচে নেমে দেখেন—এসেছে এবার সর্দার কসাই, উপহার এনেছে সে একটা গোটা ভেড়ার মাংস। বিবি তাকে আপ্যায়ন করে উপরে এনে বসিয়ে ভেড়ার মাংস রান্নাঘরে রেখে এসে তার সামনে বসে মিষ্টি গলায় কথাবার্তা শুরু করেছেন, এমন সময় নীচের দরজায় আবার করাঘাত।

শব্দ শুনে কসাইয়ের মুখ ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিবি দেখে হেসে বললেন—ভয় নেই তোমার, আমার স্বামী এলেন বোধ হয়, আমি দেখছি—এই বলে আর একটা আলখাল্লা আর তুরতুর এনে তার হাতে দিয়ে বললেন—তুমি তোমার জামাকাপড় ছেড়ে ঐ তৃতীয় ছোট্ট কামরাটায় ঢুকে পড়।

কসাই মহিলার নির্দেশমত কাজ করলে তিনি নীচে গিয়ে দরজা খুলে দেখেন—এসেছেন এবার পাশের বাড়ির সেই বণিক। আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, বলে বিবি বণিককে সংবর্ধনা জানিয়ে ওপরে নিয়ে এলেন। বণিক দুটো দামী রেশমী জামা উপহার এনেছিলেন, বণিক তা বিবিকে দিলে বিবি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা শুরু করেছেন, এমন সময় দরজায় ঘনঘন করাঘাত।

কে—কে ?—ভয়ে আসন ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বণিক ঃ আমীর সাহেব নয় ত ?

তাই ত মনে হচ্ছে, দেখুন ত কি বিপদ!—উনি এত শীগগির আসবেন, তা ত ভাবতে পারি নি। কাল ত উনি আবার চারটে লোককে খতম করেছেন।

শুনে বণিকের গা দরদর করে ঘামতে লাগল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। দেখে মহিলা বললেন—যাক গে—ভয় নেই কিছু আপনার, আমি আপনার বাঁচবার ব্যবস্থা করছি—এই বলে একটা আলখাল্লা আর তুরতুর এনে তাঁর হাতে

দিয়ে বললেন, নিজের জামাকাপড় ছেড়ে এই পরে জলদি ঐ চতুর্থ ঘুপসি কামরাটায় ঢুকে পড়ুন।

বণিক তখনই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিবির কথামত কাজ করলে। বিবির রূপমুগ্ধ চার রসিক নাগর চার ঘুপসি ঘরে বসে আল্লার নাম স্মরণ করতে লাগলেন। এদিকে বিবি দরজা খুলে তাঁর স্বামীকে উপরে নিয়ে এলেন। স্বামী উপরে এসে বিবির পাশে এক কুর্সিতে আরামে বসে খোশ মেজাজে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। হঠাৎ আমীর বলে বসলেন—হ্যাঁ গো, আজ ত তোমার হামাম গোসলে যাবার দিন ছিল, যাবার পথে দেখবার মত শুনবার মত কি কি দেখলে বলো।

বিবি বললেন—আজ আমার নসিব ভাল ঃ চার চারটে অদ্ভুত মজার জিনিস, মজার ব্যাপার দেখেছি, তার প্রত্যেকটি বলবার মত, শুনবার মত।

বিবির এই কথা ঘুপসি ঘরে ঐ চারজনের প্রত্যেকের নিজের নিজের কানে যেতে ওরা প্রত্যেকেই নিজের মনে ভাবতে লাগল—এই রে, এবার আমি গেছি, ডাইনীটার মনে শেষে এই ছিল?

এদিকে আমীর তখন তাঁর বিবির কথা শুনে বলে উঠলেন—কি কি মজার জিনিস, মজার ব্যাপার, খোলসা করে বল ত শুনি, আমার তর সইছে না।

বিবি বললেন—পথে আমি চারটে লোকের দেখা পেয়েছি, তাদের প্রত্যেকেরই বয়স হয়েছে, কিন্তু ভারী মজাদার লোক তারা, প্রত্যেকেই এক একটা পুরো দস্তুর ভাঁড়, আর প্রত্যেকেরই পরণে এক একটা আলখাল্লা আর মাথায় একটি করে বেদুইনদের টুপি—তুরতুর।

আমীর বিবির কথা শুনেই বুঝে নিয়েছেন ব্যাপারটা, তিনি তখন একটু হেসে বললেন—তা তুমি তাদের এখানে—আমাদের বাড়িতে একবার নিয়ে এলে না কেন, তাদের নিয়ে বেশ একটু মজা করা যেত!

আনলাম না কেন ?—আনলে আপনি তাদের কি করতেন তা ত জানি, আনলেই আপনি তাদের চারজনকেই কোতল করতেন—এই ভয়ে আনি নি।

আমীর হেসে বললে—না, না, আমি তাদের খুন করতে যাব কেন, তারা ত ভাঁড় ছাড়া আর কিছু নয়, আনলে তাদের প্রত্যেককে দিয়ে একটু বাঁদর-নাচ নাচাতাম, একটি করে মজাদার গল্প বলতে বলতাম, এই সব পারলেই আমি তাদের ছেড়ে দিতাম।

আর ধরুন যদি তারা কেউ ঐ নাচ নাচতে না পারত, মজাদার কোন গল্প না বলতে পারত তা হলে কি করতেন আপনি তাদের ?

তুমি যা বলছ—তাই যদি হত তা হলে আমি তাদের কোতল করে তাদের লাস শেয়াল শকুনি দিয়ে খাওয়াতাম।

আমীরের এই কথা কানে যেতে—চার কুঠুরিতে আটক ঐ চারজনের ত তখন হয়ে গেছে। কাজী মনে মনে বলছেন—আল্লা ছাড়া গতি নেই, কাজী হয়ে আলখাল্লা পরে বেদুইনের টুপি মাথায় পরে আমায় যদি বাঁদর-নাচ নাচতে হয় আর মজার গল্প বলতে হয়, তবেই ত হয়েছে, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এর পর কি আমার আর শহরের কাজী থাকা চলবে ? কসাই সর্দার ভাবছে—এই যদি করতে হয় তা হলে আমার বাজারের সর্দারগিরি ফুরোলো। শাহবন্দর ভাবছেন—এই আলখাল্লা পরে আর বদখত টুপি মাথায় দিয়ে যদি আমার বাঁদর নাচ নাচতে হয়, আর মজার গল্প বলতে হয়, তা হলে বাজারের বণিকরা কি আমায় আর শাহবন্দর রাখবে, আর কি সরমের কথা এ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—এর চেয়ে আমায় যদি আমীর এক তরোয়ালের ঘায়ে শেষ করে দেন ত সে ঢের ভাল। আর বণিক ভাবছেন—না, না এ আমি কিছুতেই পারব না, তার চেয়ে আমি নিজের গলা টিপে নিজেকে শেষ করব, সে-ও অনেক সহজ।

এদিকে বিবি তখন স্বামীর কথা শুনে বললেন—যাক আপনার যখন ইচ্ছা তাদের নিয়ে একটু মজা করা, তখন ইনসাল্লাহ্—কাল সন্ধ্যায় তাদের না হয় আপনার সামনে এনে হাজির করব।

আমীর বুদ্ধিমান লোক, সমজদার লোক, এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছেন সব, বললেন—না কাল নয়, কাল সন্ধ্যায় সুলতানের ওখানে আমার জরুরী কাজ আছে, আজ এখনই এখানে যদি তাদের হাজির করতে পার, তা হলে ভাল হয়, দিলটা আমার খুশী হয়।

শুনে বিবি একটু মিষ্টি হেসে বললেন—তা হলে আগে আমায় অভয় দিন, তারপর আপনার অনুমতি পেলেই তাদের আমি এখানে এনে হাজির করতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে : এক বারে এক এক জনকে হাজির করবার অনুমতি দিতে হবে আপনার।

আমীরও হেসে বললেন—বেশ সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছি তোমায় আমি, তা ছাড়া তুমি তাদের তোমার যেমন করে ইচ্ছে হাজির করতে পার।

স্বামীর অভয় এবং অনুমতি পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে বিবি যে কুঠুরিতে কাজী আটক আছেন, তার দরজা খুলে কাজীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে একেবারে স্বামীর সামনে এনে হাজির করলেন। কাজীর পরনে তখন মাত্র সেই আলখাল্লা, আর মাথায় গাধার টুপির মত বেদুইনদের সেই তুরতুর টুপি।

আমীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে পরখ করে যখন দেখলেন, তিনি সত্যিই ঐ এলাকার কাজী, তখন তাঁকে বললেন—হুজুর, বহুৎ খুশী লাগছে আপনাকে দেখে, আলখাল্লা আর তুরতুরে দিব্যি মানিয়েছে আপনাকে!

আলখাল্লা আর তুরতুর পরা অবস্থায় আমীরের ঐ কথা শুনে কাজী আর মাথা তুলতে পারলেন না, জবাব দেবেন কি, আলখাল্লার ভিতরে লজ্জায় তিনি শুধু ঘামতে লাগলেন।

আমীর সাহেব ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে বললেন—তা কাজী সাহেব, হুজুর, আপনি না কি ভাল বাঁদর-নাচ, বেবুন-নাচ নাচতে পারেন, তা একটু নেচে দেখাতে হয় যে আমাদের, তারপর আপনার মুখে একটা মজাদার গল্প শুনতে পারলেই দিলটা আমাদের খুশী হবে।

কি আর করবেন কাজী সাহেব, না নাচলে, গল্প বলতে না পারলে আমীর যা করবেন—তা ত নিজের কানেই শোনা আছে, ভয়ে অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে আছে। সুতরাং লজ্জার মাথা খেয়ে তিনি তখনই দুই হাতে তালি দিয়ে ঐ আলখাল্লা-পরা অবস্থায় এদিকে ওদিকে হেলেদুলে খুব বাঁদর নাচ নাচতে লাগলেন। দেখে আমীর আর বিবি হেসে লুটোপুটি। জান যাবার ভয়ে কাজী এদিকে নেচেই চলেছেন, নাচতে নাচতে যখন বড্ড বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, মাটিতে ঢলে পড়বার অবস্থা তখন তাই দেখে আমীর বললেন—আচ্ছা, থাক, থাক হয়েছে, যথেষ্ট আনন্দ দিলেন আমাদের, এবার মজাদার একটা গল্প বলুন, তা হলেই আপনার ছুটি। আমীরের কথায় ক্লান্ত কাজী একটু দম নিয়েই শুরু করলেন—

দরজী, যুজবাশি এবং তার বিবির গল্প

কোন এক শহরে এক দরজীর দোকানের সামনেই ছিল এক মস্ত বাড়ি। ঐ মস্ত বাড়িতে থাকতেন যুজবাশি (সেনাধ্যাক্ষ) তার বিবিকে নিয়ে। বিবি অসামান্য সুন্দরী। দরজী ও পাড়ায় নতুন দোকান করেছে তাই আগে আর দেখে নি বিবিকে। বিবি একদিন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছেন, অমনি দরজীর নজর পড়ল তাঁর দিকে। যেমনি দেখা অমনি তার মাথা ঘুরে গেল। খুবসুরত বিবির দিকে থেকে নজর সে আর ফিরাতে পারে না। বিবি ওখান থেকে সরে গেলেও আবার দেখবার আশায় কাজকর্ম ফেলে সে ঐ দিকে তাকিয়েই রইল।

এমনি করে সে প্রায়ই তাকিয়ে থাকে, বিবি এসে জানলার ধারে দাঁড়ালে ত কথাই নেই। প্রথম প্রথম কথা বলতে সাহস পেত না, শেষে ভয়টা কেটে গেলে বিবির দেখা পেলেই সে বলতে শুরু করল —বিবি সাহেব, সেলাম, আপনি কি বুঝতে পারছেন না আমার

অবস্থা ঃ আপনাকে দেখে আমার রাতে ঘুম নেই, খানা মুখে রোচে না, কাজকর্ম করতে পারছি না, একটু দয়া করুন; বিবি সাহেব—একটু দয়া, নইলে আমি মরে যাব—

শুনে বিবি বিরক্ত হয়ে ভাবেন—লোকটা বদ্ধ পাগল না কি, জিনে ধরেছে?—না হলে কি আমায় এই সব বলতে পারে!—এই ভেবে বিবি তখনকার মত জানলা থেকে সরে যান। কিন্তু হলে হবে কি, যখনই আবার জানলায় এসে দাঁড়ান, তখনই আবার ঐ কাণ্ড। শেষে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বিবি মনে মনে বললেন—আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা, অমনি বেয়াদপ বেতমিজদের মত তাকানো আর কথা বলা আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি, ওকে এখান থেকে উচ্ছেদ করে তবে আমি ছাড়ব। দরজীকে সায়েস্তা করার পন্থাও একটা তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেললেন।

এরপর একদিন য়ুজবাশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর বিবি তাঁর সবচেয়ে ভাল পোশাক আর অলংকার পরে জামাকাপড় গায়ে দিয়ে আতর খোশবায় মেখে ভাল করে সোজগুজে তাঁর এক বিশ্বস্ত বাঁদীকে ডেকে বললেন—ওরে, তুই একবার যা ত সামনের দরজীর দোকানে, গিয়ে বলবি—আমার মালকিন বিবি সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়ে বলেছেন—এখনই আপনি যদি তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে এক পেয়ালা কফি খান, তা হলে তাঁর দিলটা বড় খুশী হয়।

বাঁদী গিয়ে দরজীকে এই খবর দিলে দরজী আনন্দে দিশেহারা হয়ে সেলাইয়ের কাপড় যেমনি ছিল তেমনি রেখে দোকান বন্ধ করে বাঁদীর সঙ্গে বিবির বাড়ি রওনা হল। এরপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যখন সে বিবির সামনে গিয়ে হাজির হল, তখন বিবির মুখের দিকে চেয়ে তার ভিরমি যাওয়ার যোগাড় ঃ কি মুখ রে আল্লা!—এত কাছাকাছি এসে বিবিকে সে কোনদিন দেখে নি ত! বিবিও সমাদরে তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভাল গদি আঁটা একটা কুর্সিতে বসালেন, নিজে সামনের একটায় বসে বাঁদীকে কফি আনতে হুকুম

দিলেন। বাঁদী কফি আনলো, তার সঙ্গে আনলো শুকনো নানা রকমের ফল। দরজী কফি খেতে শুরু করলে বিবি তার সঙ্গে হেসে হেসে অনেক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। দেখেশুনে দরজী মহা খুশী! বিবির মন গলেছে, তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

এমনি কথাবার্তা চলতে চলতে ক্রমে ছুপুরের খানার সময় হল, বিবি তার বাঁদীকে খানা আনতে বললে সে ভাল ভাল খাবার নিয়ে এল। দরজী দেখে একেবারে আনন্দে দিশেহারা, খেতে গিয়ে খাবার জিনিস সে মুখে না তুলে চোখে তুলতে লাগল। দেখে ত বিবি অমনি হেসে লুটোপুটি। দেখে দরজী হুঁশিয়ার হয়ে দ্বিতীয় গ্রাস অবশ্য মুখেই তুললে, এরপর তৃতীয় গ্রাস যেই তুলতে গেল অমনি দরজায় করাঘাত। বিবি উঠে জানলা দিয়ে এক পলক দেখে নিয়ে এসেই বললেন—সর্বনাশ, আমার স্বামী য়ুজবাশি সাহেব এসে গেছেন।

এই কথা শোনামাত্র দরজীর হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল, সে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বিবিকে বলে উঠল—এখন কি করা যায়, কোথায় লুকাই? বিবি তাকে একটা ছোট্ট ঘুপসী কুঠুরির মাঝে লুকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবির একটা দাঁত টেনে বের করে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে নিলেন। এখন এই তালা আর চাবি ছুই-ই কাঠ দিয়ে তৈরী—লম্বা চাবির গায়ে সাতটা লোহার দাঁত— আর তালার মাঝে তেমনি সাতটা গর্ত, চাবির গায়ের একটা দাঁত যদি পড়ে যায় বা হারিয়ে যায় ত তালা খোলে না। যাই হোক— দরজীকে ছোট্ট কুঠুরিতে বন্ধ করে রেখে বিবি নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলে য়ুজবাশি তার বিবির সঙ্গেই উপরে উঠে এলেন, কিন্তু উপরে উঠে খানার আয়োজন দেখেই বলে উঠলেন, এ কি ব্যাপার— খানা খাচ্ছিল কে?

আমি আর আমার নাগর।

য়ুজবাশি চোখ কপালে তুলে বললেন—তুমি আর তোমার নাগর! এর মাঝে কোথায় গেল সে তোমার নাগর?

ঐ—ঐ ত ঐ কুঠুরির মাঝে।

কুঠুরির মাঝে থেকে—এই কথা শুনবার পর—দরজীর যে অবস্থা হল তা আর মুখে আনা যায় না। এদিকে বিবিকে তখন য়ুজবাশি বলছেন—কুঠুরির মাঝে?—তা ওখানকার চাবি কই?

এই যে আমার কাছেই আছে।

বের কর চাবি, আমার হাতে দাও।

বিবি তখন চাবিটা বের করে—স্বামীর হাতে দিলে য়ুজবাশি তালায় চাবি লাগিয়ে খুলতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যতই চেষ্টা করেন, তালা কিছুতেই খোলে না। বিবি তখন তার স্বামীকে বললেন, আমার এই পেয়ারের লোকটিকে কি করতে চান আপনি?

আমি ওকে বের করেই তলোয়ারের এক কোপে কাটবো।

বিবি বললেন—না, না, সেটা ভাল হবে না, আমার ইচ্ছে আপনি আগে ওর দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে বারান্দার একটা থামে ঝুলিয়ে দিন, তারপর ওর মুণ্ডুটা এক কোপে উড়িয়ে দিন। এই ত এত বড় হয়েছি আমি, আমার জন্মাবধি কোন অপরাধীকে এমনি করে হত্যা করা আমি দেখি নি, আমার বড় সাধ যায়—এমনি করে মানুষ মারা দেখতে।

বেশ তোমার সাধই মেটাব আমি আজ—দাঁড়াও, একটু সবুর কর—এই বলে য়ুজবাশি চাবিটা আরও জোর ঘুরাতে চেষ্টা করতে লাগলেন. কিন্তু চেষ্টা করলে হবে কি—চাবির যে একটা দাঁত নেই, তালা খুলবে কি করে?

ইত্যবসরে বিবি তার স্বামীকে বলতে লাগলেন, আমার আর একরকম সাধ জাগছে।

কি?

আপনি আগে ওর হাত আর পা কেটে ঠুঁটো করে দিন, তারপর গলা কাটুন।

হ্যাঁ, এইটাই আরও ভাল—বলে তিনি চাবি ঘুরাতেই লাগলেন আর বিবি সেই ফাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আরও দশরকম উপায় স্বামীকে

ঝাংলে দিতে লাগলেন। ওদিকে কুঠুরির ভেতর দরজী এই সব শুনছে আর ভয়ে তার যা অবস্থা হচ্ছে তা শুধু আল্লাই জানেন। শেষে য়ুজবাশি কিছুতেই তালা খুলতে পারছেনা না বলে রাগে বিরক্তিতে তাঁর মুখ ক্রমেই বিকৃত হয়ে উঠছে।—দেখে বিবি হঠাৎ হেসে একেবারে মাটিতে চিৎপাৎ হয়ে পড়লেন।

হঠাৎ কি হল আবার তোমার?—এত হাসির কারণই বা কিসে ঘটলো?

বিবি উত্তর দিলেন, হাসছি আপনার কাণ্ড দেখে।

কেন, কি করলাম আমি?

বলছি বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু আপনার মগজে একেবারে নেই না কি?

কেন, এ কথা বলছ কেন?

বলছি, কারণ দেখছি ঠাট্টা তামাসা রসিকতা আপনি মোটেই বোঝেন না। জনাব, আমার যদি কোন নাগর থাকত, আর সে যদি আমার ঘরে আসত, তা হলে তার কথা কি আপনাকে আমি বলতাম? আমি কৌতুক করবার জন্যে বললাম, আর তাই আপনি বিশ্বাস করে তালা খুলতে লেগে গেলেন? এতদিন আমায় নিয়ে ঘর করেও আমার রীতিচরিত আপনার জানা হল না?

য়ুজবাশি এবার হেসে চাবি ঘুরানো বন্ধ করে বললেন—আমিও ত তাই ভাবছিলাম—এই বা কি করে হয় যে আমার বিবির কাছে লোক এসেছে আর বিবি আমার কাছে অকপটে বলছে।

এরপর য়ুজবাশি তাঁর বিবির পাশে এসে বসলেন। খানা তৈরীই ছিল, দুইজন খানা খেতে খেতে নানা মজাদার কথা বলতে লাগলেন। বাইরে কুচকাওয়াজ করে এসেছিলেন য়ুজবাশি তারপর বাড়িতে এসে এই সব ঝামেলা গেল, খাবার পরে বেশ একটু ঘুম পাচ্ছিল তাঁর, তাই তিনি খানা শেষ হলেই নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, একটু পরেই তাঁর নাক ডাকানো শুনতে পাওয়া গেল।

আর একটু অপেক্ষা করে বিবি যখন বুঝলেন স্বামীর আর

শীগগির জাগবার সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি উঠে চাবিতে সেই খোলা দাঁতটা লাগিয়ে ঘুপসি কামরাটার দরজা খুলে দরজীকে বের করে এনে বললেন—বদখত, বেয়াদপ, বেতমিজ, শুনলে ত নিজের কানে কি তোমার হতে পারত ?

জি।

মনে থাকে যেন, আর কোন দিন জানলার পথে আমার দিকে চাইবে না, অমন সব বাজে কথা বলবে না—কেমন ?

জি, এই নাক কান মলছি আমি আর কখনও বলব না।

মনে থাকে যেন, এবারকার মত তোমায় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ফের অমন কিছু করতে দেখলে, বলতে শুনলে আমি আর তোমায় আস্ত রাখব না।

দরজী বললে—বিবি সাহেব, আমি আল্লার কসম নিয়ে বলছি, এমন কাজ আর আমি কোনদিন করব না।

এই কথা শোনার পর বিবি তাঁর বাঁদীকে ডেকে বললে—ওরে, এ বাইরে যাবে, দরজা খুলে দে। বাঁদী দরজা খুলে দিলে দরজী আল্লার নাম করতে করতে নিজের দোকানে চলে গেল।

কাজী তাঁর এই গল্প শেষ করলে আমীর তাঁকে বললেন, এবার আপনি যেতে পারেন। কাজী তখন সেই আলখাল্লা আর বেদুইন-টুপি পরা অবস্থায়ই আমীরের বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আমীর তখন তাঁর বিবির দিকে ফিরে বললেন—এ ত একটা হল, তুই নম্বরেরটা কোথায়, তাকে হাজির কর। আমীরের কথায় তাঁর বিবি উঠে যে কামরাটায় তিনি শাহবন্দরকে আটকে রেখেছিলেন তার দরজা খুলে তাঁকে তিনি হাত ধরে নিয়ে এলেন স্বামীর সামনে। আমীর লোকটির দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে যখন বুঝলেন—হ্যাঁ, এ স্থানীয় বণিক সংঘের শাহবন্দরই বটে তখন তিনি তাঁকে বললেন —বলি, ও খাজা সাহেব, আপনার এ উন্নতি হল কবে থেকে, এমনি ভাঁড় বনে গেলেন কবে ?

শাহবন্দর কোন জবাব না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে শুধু মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

গৃহস্বামী তখন বললেন—যাক, ও সব কথায় কাজ নেই, আপনি আমাদের একটু নাচ দেখান ত, মজাদার নাচ, ভালুক নাচ কি বাঁদর নাচ, যা আপনার খুশি। তারপর একটা মজার গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে।

শাহবন্দর তখন কি আর করবেন, লজ্জার মাথা খেয়ে হাত তালি দিয়ে হেলে দুলে নানা মজাদার অঙ্গভঙ্গী করে নাচতেই লাগলেন, আর তাই দেখে আমীর আর তাঁর বিবির সে কি হাসি! নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে শাহবন্দর যখন একেবারে মাটিতে বসে পড়লেন তখন আমীর বললেন—আচ্ছা হয়েছে, এবার একটা গল্প শুনতে চাই আমরা আপনার মুখে, গল্পটা দস্তুর—দস্তুরমত মজাদার হওয়া চাই কিন্তু—। শুনে শাহবন্দর একটু দম নেবার পর এই গল্পটি শুরু করলেন—

সিরিয়ার একটি লোক এবং কায়রোর তিন স্ত্রীলোক

সিরিয়ার একটি লোক মিশরের বিখ্যাত কায়রো শহরে এসেছে, সঙ্গে তার অনেক বাণিজ্য-দ্রব্য, জমকালো বহু পোশাক, এ ছাড়া দিনারের থলি ত আছেই। শহরের এক সরাইখানায় একটা ঘর ভাড়া করে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে উঠল। সঙ্গে চাকর ছিল না— তাই খানাপিনার জন্যে সে রোজই বাইরে বেরুত, এদিক ওদিক একটু ঘুরেফিরে দেখত, তারপর কোন দোকান থেকে খানা খেয়ে ঘরে ফিরত। রোজকার অভ্যাসমত একদিন সে এমনি ঘুরতে ফিরতে খানা খেতে বেরিয়েছে, বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় তার সামনে পড়ল তিনটি মেয়ে। মেয়ে তিনটির প্রত্যেকেই খুবসুরত, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এ ছাড়া লোকটি দেখল

মেয়ে তিনটি বড় ফুর্তিবাজ, নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে আর হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। দেখে মনটা কেমনই যেন হয়ে গেল সিরিয়ার লোকটির। সে তখন মনে মনে ভাবছে—এদের সঙ্গে একটু ভাব করা যায় না! প্রথমে একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল, কিন্তু তারপর অনেক চেষ্টায় তা কাটিয়ে সাহস সঞ্চয় করে তাদের কাছে গিয়ে বলে বসল—এক সঙ্গে বসে একটু কফি খেলে কেমন হয়—আমার ঘরে?

বেশ ত, বেশ ত—প্রায় এক সঙ্গে তিনজনই বলে উঠল—বেশ ত! —এ ত অতি উত্তম প্রস্তাব।

তা কখন এ সৌভাগ্যটা আমার হবে?

আজই রাত্রে আসছি আমরা আপনার ওখানে, আমাদের রাত্রের খানাপিনার ব্যবস্থাটাও করে রাখবেন, জনাব, তা হলে বেশ ফুর্তিতে কিছুটা সময় কাটবে, গল্পগুজব করা যাবে।

লোকটি তখন বললে—অমুক রাস্তায়, অমুক সরাইখানায় আমার আস্তানা, মনে রেখো।

ঠিক আছে, আপনি খানাপিনার ব্যবস্থা রাখবেন, রাত্রির নমাজের ওকৃত পার হয়ে গেলেই আমরা—আপনার ওখানে গিয়ে হাজির হব। এরপর মেয়ে তিনটি তাকে সেলাম করে তখনকার মত বিদায় নিল, লোকটি বাড়ি ফিরবার পথে অনেক রকমের মাংস, সবজি, টাটকা আর শুকনো ফল, মেঠাই আর সিরাজি কিনে একটা ঝাঁকা মুটের মাথায় দিয়ে নিজের বাসায় এসে হাজির হল। বাড়ি এসে মেয়ে তিনটির জন্যে নিজের হাতে সে রান্না করল, নানা রকমের খানা—এক মাংসই রাঁধল সে পাঁচ রকমের, তাতে চালটাল কিছু না দিয়েই।

ক্রমে রাত্রি হল, সিরিয়ার লোকটি প্রতীক্ষা করতে লাগল, কখন ওরা আসে, আবার এ-ও ভাবতে লাগল যদি ওরা না আসে!

না, এল ওরা ঠিকই, নিজেদের দেওয়া কথামত রাত্রির নমাজের ওকৃতের ঠিক পরেই, এল তিনটি কালো বোরখা দিয়ে তিন জন গা

ঢেকে। লোকটার ঘরে এসে বোরখা তিনটি যখন ওরা খুলে ফেললো তখন লোকটার মনে হল আসমান থেকে যেন তিনটে চাঁদ নেমে এসেছে তার ঘরে। জব্বর খুশী লাগছে লোকটার। সে তখনই নানা রকমের খানা এনে তাদের সামনে হাজির করল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করল। লোকটাও অবশ্য তাদের সঙ্গে বসেই খেলো। খানা হয়ে গেলে পিনার ব্যবস্থা। লোকটি এবার নানা রকমের সিরাজি এনে মেয়ে তিনটিকে পরিবেশন করল, ওরাও পেয়ালা ভরতি করে করে লোকটি মুখের কাছে ধরতে লাগল। কয়েক পেয়ালা পান করবার পরই লোকটির মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে মেয়ে তিনটির যার দিকে তাকায়, মনে হয় যেন বেহেস্তের হুরী।

এদিকে পেয়ালার পর পেয়ালা চলেইছে, চললো একেবারে দুপুর রাত পর্যন্ত, মেয়ে তিনটি নিজেরা যত খাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি খাওয়াচ্ছে সিরিয়ার লোকটিকে। পেয়ালার পর পেয়ালা সিরাজি পান করবার পর লোকটির যখন আর ডান বাঁ জ্ঞান রইল না, মেয়ে পুরুষের ফারাক বুঝবার ক্ষমতা রইল না তখন সে স্খলিত কণ্ঠে একটি একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে—বি-বি বিবিসাব, তো-তোমার নামটি কি বলো ত, সোনা ?

মেয়েটি একটু হেসে বললে—আমার নাম হচ্ছে—"আমার মত কাউকে দেখেছ ?"

লোকটি বললে—ওয়াল্লাহি—না।

এরপর লোকটি তার কনুইয়ে ভর দিয়ে মেঝে থেকে উঠবার চেষ্টা করতে করতে আর একটি মেয়েকে শুধালো—ও চাঁদমুখ, তোমার নাম কি বটে ?

মেয়েটি উত্তর দিলে, আমার নাম—'আমার মত কাউকে কখনও দেখ নি।'

এরপর তৃতীয় মেয়েটির নাম শোনার পালা। লোকটি আদরের ডাক ডেকে বললে—তোমার নাম কি, যাদু ?

সে উত্তর দিলে, আমার নাম—'চেয়ে দেখ দেখলেই চিনবে।'

লোকটি তখন চীৎকার করে বলে উঠল—না, না, আল্লার কসম আমি ত তোমায় চিনছি না, চিনছি না, চিনছি না। আল্লার কসম চিনছি না।

তিনটি মেয়েই ওর এই কথা শুনে বুঝলে লোকটির জ্ঞান গম্যি এখন আর বড় নেই, ওরা তখন তাকে আরও সিরাজি পান করাতে লাগল। ওরা যত দেয় ও তত বলে, ও আমার—'আমার মত কাউকে দেখেছো', তুমি এক পেয়ালা দাও, এরপর সে দিলে ও আর এক-জনকে বলে, ও বিবি 'আমার মত কাউকে কখনও দেখনি', নিজের হাতে তুমি এক পেয়ালা দাও। সে দিলে, আর একজনকে বলে, ও গো 'চেয়ে দেখ, দেখলেই চিনবে,' তুমি এক পেয়ালা দিলে না?

তিনটি মেয়ে যখন লোকটির এই অবস্থা দেখলে তখন তারা ওর মাথার পাগড়ি খুলে নিয়ে সেখানে একটা সুত্তারির (ভাঁড়ের) টুপি পরিয়ে দিলে। ও তা জানতেও পারলে না। জানবে কি, ও তখন একেবারে বেহুঁস। দুই চোখ একেবারে বুজেই আছে।

আর একটু পরে মেয়ে তিনটি যখন দেখলে লোকটি একেবারে মরার মত নিশ্চল, অসাড়, তখন উঠে বোরখা পরে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে চুপেচুপে ওর কামরা থেকে সরে পড়ল।

ভোর হলে লোকটার যখন একটু একটু জ্ঞান ফিরে আসছে ও তখন চোখ বুজেই ডাকতে শুরু করল ও আমার, 'আমার মত কাউকে দেখেছ', ও বিবি 'আমার মত কাউকে কখনও দেখ নি,' ও 'চেয়ে দেখ, দেখলেই চিনবে'—তোমরা আমার হাত ধরে তোলো।

কে কার হাত ধরে? আরও কয়েকবার ডাকবার পরও যখন কেউ কোন সাড়া দিল না, তখন সে জোর করে একবার চারিদিকে তাকাল।—না, কেউ কোথাও নেই ত!—এরপর সে আরও চেষ্টা করে উঠে তার তোরঙ্গের কাছে গিয়ে খুলে দেখে তোরঙ্গ বিলকুল সাফ: দিনার জামাকাপড় কোন কিছুই নেই। দেখেই নেশাটা তার এক রকম কেটেই গেল। সে তখন ঐ ভাঁড়ের টুপি গাধার টুপি-পরা

অবস্থায়ই বাইরে বেরিয়েই যাকে প্রথম দেখলে তাকে জিজ্ঞাসা করলো জানো—কোথায় গেল—'আমার মত কাউকে দেখেছ' ?

লোকটা বললে—না, তোমার মত কাউকে দেখি নি।

এরপর যাকে দেখলে তাকে বললে—দেখেছ কোথায় গেল 'আমার মত কাউকে কখন দেখ নি ?'

লোকটি উত্তর দিলে, না, তোমার মত কাউকে কখনও দেখি নি।

এরপর আবার যাকে দেখলে তাকে বললে—এই পথে গেছে 'চেয়ে দেখ দেখলেই চিনতে পারবে' ?

এ পাগল না কি ভেবে লোকটা কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর দিকে, তার পরে বললে—চেয়ে ত দেখলাম, চিনতে পারলাম না তোমায়।

পথে যাকে দেখে তাকেই সে এমনি জিজ্ঞাসা করে, তাদের কাছে থেকে উত্তরও মেলে ঠিক অমনি। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে শেষে সে এক নাপিতের দোকানের সামনে এসে হাজির হল, সেখানে বেশ কয়েকজন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখেই সে বলে উঠল—আমার মত কাউকে দেখেছ—তারপরেই—আমার মত কাউকে কখনও দেখ নি, আবার তারপর—চেয়ে দেখ, দেখলেই চিনতে পারবে। ওকে এমনি সব আবোল তাবোল বলতে শুনে লোকগুলি ভাবলে—লোকটার মাথাটা একটু বিগড়ে গেছে। তারা তখন ওকে জোর করে ধরে নাপিতের দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটা তখন নিজের মাথায় অমনি ভাঁড়ের টুপি দেখে তখনই সেটা খুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে, তারপর সামনের লোকগুলিকে বললে—তোমরা কেউ আমায় সেই তিনটি মেয়ের পাত্তা বলে দিতে পারো ?

শুনে লোকগুলি তাকে বললে—মিঞা, তুমি যেখানকার লোক সেখানে ফিরে যাও, সিরিয়ায় নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে থাক। এর নাম কায়রো, এখানকার মেয়েরা সুস্থলোককে পাগল

করে দিতে পারে, তাই ভাল কথা বলছি মিঞা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

ওদের এই কথা শুনে ব্যাপার বুঝে লোকটা সরাইখানায় নিজের কামরায় এসে যা সামান্য ভাল জামাকাপড় আর খাবার ছিল তাই নিয়ে নিজের দেশের দিকে রওনা হল।

গল্প শুনে আমীর খুশী হয়ে শাহবন্দরকে বললেন—খাসা গল্পটি শোনালেন আপনি, খুব মজা পেলাম আমরা। এখন আপনি আপনার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হতে পারেন।

ছুটি পেয়ে আর কালবিলম্ব না করে শাহবন্দর ঐ অদ্ভুত পোশাক-পরা অবস্থাতেই আমীরকে সেলাম করে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

এরপর আমীর তাঁর বিবিকে বললেন—তোমার দুটি ভাঁড় ত দেখা হল, এরপর আর কে আছে নিয়ে এস জলদি।

একটু সবুর, এখনই আমি এর পরেরটা নিয়ে আসছি—বলে বিবি তখনই উঠে তৃতীয় কামরা খুলে বাজারের সর্দার কসাইয়ের হাত ধরে এনে স্বামীর সামনে হাজির করলেন। বেচারা লজ্জায় আর মুখ তুলে চাইতে পারছিল না। আমীর অবশ্য তাকে দেখেই চিনে ফেললেন, বাজারের কসাইদের সর্দার এ। আমীর তখন বললেন—বাঃ পোশাকটায় তোমাকে দিব্যি মানিয়েছে দেখছি, তা তুমি আমাদের একটু নাচ দেখাও ত, মিঞা, বানর আর ভালুকের নাচ, তারপর একটা মজার গল্প শোনাতে হবে।

কসাই তখন বাধ্য হয়ে হাতে তালি দিয়ে হেলেদুলে কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে লাগল, নাচতে নাচতে দারুন ক্লান্ত হয়ে শেষে মাটিতে বসে পড়ল।—দেখে আমীর বললেন—বেশ, হয়েছে, খাসা নাচ হয়েছে তোমার এবার একটা মজার গল্প শোনাও ত, মিঞা। কসাই একটু দম নেবার পরই উঠে এই গল্পটি শুরু করল—

সুলতানের ভাঁড় তার বিবি আর বিবির চার বন্ধু

কোন এক দেশের সুলতানের এক ভাঁড় ছিল, বিয়ে সাদি করে নি সে, একাই থাকত আর রোজ সুলতানের দরবারে এসে নানা কৌতুকের কথা বলে সুলতানের মনোরঞ্জন করত। একদিন সুলতানের কি খেয়াল হতে তাকে বলে বসলেন—ওহে, সাদির বয়স ত তোমার অনেক দিনই হয়ে গেছে, এখনও বিয়ে সাদি করলে না তুমি, এ কেমন কথা! বলো ত, আমরা একটা ভাল মেয়ে দেখে তোমার সাদির ব্যবস্থা করি!

ভাঁড় হাত জোড় করে বললে—না, জাহাঁপনা, মাফ করবেন, সাদি করতে আমার দিল চায় না।

কেন গো?

মেয়েরা বড় ধুরবাজ, জাহাঁপনা, স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে ওরা যা তা করে বেড়ায়, কাজ কি আমার ও সব ঝামেলা দিয়ে, একা আছি, এই বেশ আছি।

সুলতান বললেন—ও সব আমি শুনছি না, সাদি তোমাকে করতেই হবে, একটা ভাল মেয়ের সঙ্গে তোমার সাদির ব্যবস্থা করছি আমি।

কি আর করবে বেচারা ভাঁড়, সুলতানের কথার উপর ত আর কথা বলা চলে না, চুপ করে রইল সে। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ মনে করে সুলতান তাঁর উজিরকে ডেকে বললেন—উজির, আমাদের এর একটা সাদির ব্যবস্থা করো ত, এর জন্যে ভাল ঘরের একটা ভাল মেয়ে দেখ, মেয়েটির স্বভাব চরিত্র ভাল হাওয়া চাই।

উজিরের বাড়িতে এক পুরনো বুড়ী ধাত্রী ছিল, উজির তাকে ভাঁড়ের জন্যে একটা ভাল মেয়ে দেখে দিতে বললেন। বুড়ী একটা ভাল মেয়ের খোঁজ এনে দিলে সুলতানের উদ্যোগে সেই মেয়ের সঙ্গে ভাঁড়ের বিয়ে হয়ে গেল। ভাঁড় তার বিবি নিয়ে ঘরে গেল।

বিবিকে নিয়ে ছ'মাস কি সাত মাস ঘর করবার পর একদিন সে সুলতানের জরুরী তলবে—কি এক কাজে অতি ভোরেই সুলতানের দরবারে চলে গেল, ঘরে রইল একা তার বিবি।

এখন সাদি হবার আগে এই বিবির—শুধু একটা নয়, চার চারটি পুরুষ দোস্ত ছিল, ভাঁড় ওকে বিয়ে করে ঘরে আনবার পর তাদের কেউই আর ওর কাছে ঘেঁষবার সুযোগ পাচ্ছিল না, অথচ তাকে তাকে ছিল সবাই। এদিন এ সুযোগটা মিলে যাওয়াতে ঐ চারজনের প্রত্যেকেই ভাবল—আজ একবার ওর কাছে গিয়ে পুরনো দোস্তিটা একটু ঝালাই করে নেওয়া যাক।

এখন এই চার দোস্তের মাঝে একজন হচ্ছে ফতাইরি, মেঠাই আর মাংসের পিঠে ইত্যাদি তৈরি করত সে। আর একজন রেহানি অর্থাৎ খোসবায়ওয়ালা সবজির ব্যাপারী সে, তৃতীয় হচ্ছে বাজারের এক কসাই আর চতুর্থ জন হচ্ছে এক মিহুতার অর্থাৎ বাজনদারের সর্দার।

ভাঁড় বাড়ি থেকে বেরুবার পরেই ফতাইরি এসে তার বাড়ির দরজায় টোকা দিলে, বিবি অমনি দরজা খুলে তাকে দেখেই বলে উঠল—আরে এস, এস, এত দিন পরে মনে পড়ল, কি করে বুঝলে যে আমি একা আছি ?

ফতাইরি জবাবে বললে—বান্দা সব খবরই রাখে, বুঝলে, বিবি-সাব, কতদিন থেকে আমি তাকে তাকে আছি, সুযোগ আর পাই না, আজ আল্লা পাইয়ে দিলেন, তাই এলাম। ভাল মেঠাই আর পিঠে তৈরি করেছিলাম, এনেছি কিছুটা, খেয়ে দেখো।

ভালই করেছ, বসো—বিবি এই বলে বসিয়ে সবে দুই চারটে কথা ওর সঙ্গে বলেছে, অমনি দরজায় আবার কে করাঘাত করলে। ফতাইরি বেশ একটু ভয় পেয়ে বলে উঠল—কে আবার দরজায় ঘা দেয় ?

কে জানে—কে, আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ ঐ ছোট্ট কুঠুরিটার মধ্যে ঢুকে পড়, আমি দরজা খুলে দেখি কে। বিবির

কতামত ফতাইরি তখনই কুঠুরিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল, আর বিবি এদিক দরজা খুলে দেখে তার পুরনো দোস্ত রেহানি।

কি ভাগ্যি যে এতদিন পরে মনে পড়ল! এস, এস।

রেহানি বললে—ক্ষেত থেকে সুবজি তুলছিলাম, এই টাটকা সবজিটার এমন খোসবায় যে এর গন্ধেই তোমার কথা মনে পড়ে গেল, ভাবলাম—একবার যাই না, কিছুটা দিয়ে আসি. তাই খানিকটা নিয়ে এলাম।

বিবি রেহানিকে ঘরে এনে বসিয়ে সবে কিছুটা বাক্যালাপ করেছে এমন সময় দরজায় আবার করাঘাত।

রেহানি অমনি চমকে উঠে বললে—কে এল?

কে জানে—কে, তুমি বরং ঐ কুঠুরিটার ভিতর ঢুকে পড়, আমি দেখি কে এল।

রেহানি বিবির কথামত কুঠুরিটার মধ্যে ঢুকে দেখে সেখানে ফতাইরি বসে আছে। তুমি এখানে কি মনে করে? শুধাল রেহানি। ফতাইরি জবাব দিলে—তুমি যা মনে করে আমিও তাই, উদ্দেশ্যের কিছু ফারাক নেই। শুনে রেহানি মুখ ভার করে বসলে তার পাশে।

এদিকে বিবি দরজা খুলেই দেখে তার পুরনো দোস্ত কসাই।

ঠিক সময়েই এসেছ, এতদিন পরে মনে পড়ল তা হলে?

কসাই বললে—মনে সব সময়েই পড়ে, দেখা করবার সুযোগ ত পাই না, আজ খোদা মিলিয়ে দিলেন, তাই।...সকালে উঠেই একটা ভেড়া জবাই করেছি, তোফা গোস্ত, ভাবলাম—অনেকদিন দেখা হয় না, কিছুটা নিয়ে যাই, তাই খানিকটা নিয়ে এলাম।

এস-এস বলে বিবি তাকে ঘরে এনে বসিয়ে সবে দু'চারটে কথা বলেছে এমন সময়ে দরজায় আবার করাঘাত। কসাই অমনি আঁৎকে উঠে বললে—কে এল?

কে জানে—কে, তুমি বরং গোস্তটা নিয়ে ঐ কুঠুরিটার মধ্যে ঢুকে পড়, আমি দেখছি কে এল।

বিবির কথামত কসাই কুঠুরির মধ্যে ঢুকেই দেখে সেখানে আগে

থেকেই ফতাইরি আর রেহানি বসে আছে। কসাই তাদের দেখেই সেলাম করলে, তারাও সেলাম জানালে। একপর কসাই তাদের বললে, তোমরা এখানে কি মনে করে? তারা উত্তর দিলে—তুমি যা মনে করে আমরাও তাই। এদিকে বিবি দরজা খুলে দেখে—তার পুরনো বন্ধু মিহতার।

আরে এস, এস।···তা এতদিন পরে হঠাৎ আমার এ সৌভাগ্য হল কেন?

আর বল কেন, সুলতান মহলে নহবৎ বাজাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, বেরিয়েই দেখি বড্ড বেশি আগে বেরিয়ে পড়েছি আমি, আর তোমার কর্তাও দেখি আমার আগে আগেই সুলতানের দরবারে চলেছেন, ভাবলাম—এই সুযোগ, অনেক দিন মোলাকাত হয় না, এবার একটু ঘুরে যাই।

এস, বেশ খুশী হলাম, ঘরে এস—এই বলে বিবি মিহতারকে ঘরে এনে বসিয়ে সবে কথাবার্তা শুরু করেছে এমন সময় দরজায় আবার করাঘাত। মিহতার অমনি চমকে উঠে বলে উঠল—এ আবার কে এল?

আল্লাই জানেন—তবে আমার যতদূর মনে হয় আমার স্বামী এলেন। যাই হোক—একটু সাবধান হওয়াই ভাল! তুমি জলদি ঐ কুঠুরির মধ্যে ঢুকে পড়।

বিবির কথামত মিহতার তখনই ছুটে গিয়ে কুঠুরিটার মাঝে ঢুকল, ঢুকতেই ঐ তিন মূর্তি সামনে পড়ল। মিহতার তাদের সেলাম করলে তারাও সেলাম জানালে। এরপর প্রশ্নের পালা। সে তাদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা এখানে কি মনে করে? ওরা উত্তর দিলে—তুমি যা মনে করে আমরাও তাই। ফারাক কিছু নেই। শুনে মিহতার মুখ ভার করে বসে পড়ল তাদের গা ঘেঁষে। ছোট্ট ঘুপসি ঘর ঠাসাঠাসি ত একটু হবেই। বাড়ির মালিক এসে গেছে মনে করে ওদের প্রত্যেকেই তখন মনে মনে ভাবছে—এখন কি আছে নসিবে আল্লাই জানেন!

এদিকে বিবি দরজা খুলেই দেখে সামনেই তার স্বামী। ভাঁড় ভিতরে ঢুকে ঘরে এসে বসলে বিবি তাকে বললে—হঠাৎ ফিরে এলে যে তুমি, রোজ আস ত তুমি রাত্রে সেই খানা খাবার সময়, এর আগে ত সুলতান তোমায় ছাড়েন না! কোন অসুখ বিসুখ করলো না ত? এই বলেই একবার স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে দেখল: না, তেমন ত কিছু মনে হয় না। তা হলে সুলতান বোধহয় এমন কোন জরুরী কাজের ভার দিয়েছেন যাতে তোমার বাড়িতে আসার দরকার হয়েছে, কাজ সেরেই বোধহয় আবার সুলতানের কাছে চলে যাবে, কেমন—তাইত?

না গো বিবিজান, যা ভাবছ তা নয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুলতানের দরবারে গিয়েই দেখি সুলতান অনেকক্ষণ জরুরী কাজে ভীষণ ব্যস্ত, আমাকে দেখেই তিনি বললেন—তুমি আজ বাড়ি ফিরে যাও, জরুরী কাজে ভীষণ ব্যস্ত আমি, তিনদিন আর তোমার আসার দরকার নেই তিনদিন পরে এস, এ তিনদিন তুমি বাড়িতে তোমার বিবির সঙ্গেই কাটাও, তাই ত ফিরে এলাম আমি।

ঘুপসি কুঠুরিতে বসে ঐ চারজন যখন এই কথা শুনলে তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—এখন কি করা যায় বলো ত, তিনদিন ত আমাদের এ ছোট্ট ঘুপসি ঘরে এমনি করে বসে কাটানো সম্ভব নয়।

তবে?

ফতাইরি বললে—এস আমরা এক একজন এক একটা কৌশল করে ভাঁওতা দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

কি সে কৌশল, তুমিই বাৎলে দাও।

বাৎলাবো কি, আমি কি করি তাই তোমরা দেখ, তা হলে নিজেরটা তোমরা নিজেই ভেবে বের করতে পারবে—এই বলে ফতাইরি তখন তার কুচনো মাংস নিজের সারাগায়ে সেঁটে কুষ্ঠরোগীর মত সাজলে। এরপর সে কুঠুরি থেকে বেরিয়ে বাড়ির মালিকের সামনে গিয়ে সেলাম করলে সে-ও সেলাম জানিয়ে বললে, কে তুমি?

আমি ?—আমি হচ্ছি কুঠে পয়গম্বর জব, বাড়ি থেকে বেরুবার পথটা কই, জনাব ?

ভাঁড় তখন তাকে সসম্ভ্রমে বললে—এই, এই যে পথ।

জববেশী ফতাইরি তখন অনায়াসে ভাঁড়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। এরপর রেহানি তার সুগন্ধি সবজির চুপড়ি থেকে সবজি বের করে গায়ে মাথায় যেখানে যত রাখতে পারে লাগাতে পারে লাগিয়ে মুখটা একেবারে সবজির পাতা দিয়ে ঢেকে কুঠুরি থেকে বেরিয়ে ভাঁড়ের সামনে গিয়ে সেলাম জানালে সে-ও প্রত্যুত্তরে সেলাম জানালে। এরপর রেহানি ভাঁড়কে বললে—কুঠে পীর গেছেন এই পথ দিয়ে ?

ভাঁড় বললে, হ্যাঁ গেছেন ত, তা তুমি কে ?

আমি ? আমায় নাম হচ্ছে অল খিজির, সবজি পীর আমি—এই বলে রেহানি ভাঁড়ের নাকের ডগা দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে গেল।

এরপর কসাই ভেড়ার চামড়া দিয়ে গা ঢেকে ওর শিং দুটো নিজের মাথার উপর বসিয়ে চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই ঘুপসি ঘর থেকে, তারপর ভাঁড়ের সামনে এসে বললে—সেলাম আলেকুয়াম। ভাঁড় প্রত্যুত্তরে আলেকুয়াম সেলাম জানিয়ে বললে,—কিন্তু কে তুমি ?

আমি হচ্ছি ইস্কান্দার, শিং-ওয়ালা পীর। কুঠে পীর আব সবজি পীরকে যেতে দেখেছ তুমি ?

তা দেখেছি বই কি, তারা আপনার আগেই এই পথ দিয়ে চলে গেছেন।

শোনামাত্র আর কালবিলম্ব না করে কসাই ঐ বেশেই চটপট তখনি সেখান থেকে সরে পড়ল। এরপর বাজনদারের সর্দার তার সানাইয়ের মুখটা নিজের ঠোঁটের কাছে ধরে ভাঁড়ের সামনে এসে সেলাম জানাবার পর সে-ও যখন সেলাম জানালে তখন সে তাকে বললে—কুঠে পীর জব, সবজির পীর অল খিজির আর শিং-ওয়ালা পীর ইস্কান্দরকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ ?

হ্যাঁ দেখেছি ত, কিন্তু তুমি কে বলো দেখি ?

আমি হচ্ছি ইসরাফিল, আমি এখনই নিদেন কালের বাজনা বাজাবো মতলব করেছি।

শুনে ভাঁড় তড়াক করে উঠে বাজনদারের হাত মোক্ষম করে ধরে বলে উঠল—ও ভাই ইসরাফিল, দোহাই তোমার, নিদেন সুর এখন তুমি বাজিও না, তোমাকে নিয়ে আমি সুলতানের কাছে যাই, তারপর সেখানে তুমি বাজিও—এই বলে ভাঁড় বাজনদারকে হিড়হিড় করে টেনে একেবারে সুলতানের সামনে নিয়ে হাজির করল।

দেখে সুলতান বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন—এ কি কাণ্ড, তুমি একে এমনি করে ধরে এনেছ কেন ?

ভাঁড় বললে—জাহাঁপনা, ইনি হচ্ছেন পীর ইসরাফিল, নিদেন বাজনা বাজাতে যাচ্ছিলেন ইনি, আমি ওঁকে আপনার সামনে হাজির না করা পর্যন্ত ওঁকে বাজাতে নিষেধ করেছি, আপনার অজান্তেই যদি উনি বাজিয়ে বসেন—এই ছিল আমার নিদারুণ ভয়, তাই আমি ওঁকে ধরে রেখেছি। খোদাবন্দ, আমি সর্বদা আপনার মঙ্গল কামনা করে খোদার দোয়া মাঙি কারণ আপনি আমায় এক বিবির সঙ্গে সাদি দিয়েছেন। তার জন্যেও আমার ভয় ছিল, পাছে সে কোন মন্দ লোকের সঙ্গে মেশে, কিন্তু মিছেই আমার সে ভয়, কোন অসৎ লোকের সংশ্রবে সে আসে না, সে নিজেই একটা পীর বললেই হয়। এই দেখুন আজ সকালে আপনার এখান থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি বিবির কাছে কারা এসেছেন—না তিন পীর, আর এই দেবদূত ইসরাফিল, ইনি ত নিদেন বাজনা শুরু করতেই মতলব করেছিলেন।

শুনে সুলতান বলে উঠলেন—তোমার মাথাটা বিলকুল বিগড়ে গেল নাকি, হে, জিনে পেয়েছে তোমায় ? তুমি যে পীর পয়গম্বরের কথা বলছ, এরা সব আসবেন কোথা থেকে—তোমার বিবির কাছে ?

হ্যাঁ, জাহাঁপনা, এসেছিলেন, আল্লার কসম, সাচ বলছি আমি, আপনার কাছে, একটুও লুকোই নি, একটুও কারচুপি নেই।

তোমার বিবির সঙ্গে কোন কোন পীর দেখা করতে এসেছিলেন
—তাদের নাম বলো ত ?

বলছি : প্রথমেই ধরুন, এলেন কুঠে পীর জব, এরপর কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন পীর অল খিজির, তারপর এলেন দুই শিং-এর পীর ইস্কান্দর, সর্বশেষে বেরিয়ে এলেন এই দেবদূত ইসরাফিল।

আলাহম্ দুলিল্লা ; তুমি তাকে দেবদূত ঠাওরেছ ও ত আমার বাজনদারদের শেখ।

তা ত আমি জানি না, খোদাবন্দ, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানেই শুনেছি তাই আপনাকে বলছি আমি।

সুলতান তখন বুঝলেন ভাঁড়ের বিবির ঘরে পুরুষ বন্ধু এসেছিল কয়েকজন, আর ভালমানুষ ভাঁড়কে তারা জব্বর ভাঁওতা দিয়েছে। তিনি তখন রুষ্ট স্বরে তাঁর মিহতারকে বললেন, শোন, শেখ, তুমি যদি আসল ব্যাপারটা আমার কাছে খুলে না বলো, তা হলে আমি তোমার গর্দান নেব।

মিহতার তখন সুলতানের দুই হাতের সামনের মাটি চুম্বন করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—জাহাঁপনা আমার জান নেবেন না—অভয় দেন ত আমি সকল ব্যাপার খুলে বলতে পারি। সুলতান বললেন—না, তোমার সে ভয় নেই, আমি কথা দিচ্ছি তোমায় মৃত্যুদণ্ড দেব না। কিন্তু একটি শর্তে, শর্তটা হচ্ছে—মিছে কথা তুমি একটিও বলতে পারবে না, যাক এখন খুলে বলো তুমি সকল কথা।

শেখ তখন আদ্যোপান্ত—এ ব্যাপারের যা কিছু তার জানা ছিল সব সুলতানের কাছে খুলে বললে—আর শোনবার সঙ্গে সঙ্গে সুলতানের মুখ দিয়ে বেরুল, আল্লা দুনিয়ার তামাম আওরতকে খতম করুন।

এরপর সুলতানের হুকুমে তাঁর কয়েকজন আমীর শেখের কাছ থেকে পাত্তা নিয়ে আর যে তিনজন জব, অল খিজির আর ইস্কান্দর ছদ্ম নামে পীর সেজে ভাঁড়কে ভাঁওতা দিয়ে পালিয়েছিল, তাদের খুঁজে বের করে সুলতানের সামনে হাজির করলেন। সুলতান তখন

একমাত্র শেখকে ছেড়ে দিয়ে নাপিত ডেকে বাকী তিনজনের এমন শাস্তির বিধান করলেন, যা শুনলে পুরুষ মাত্রেরই গা শিউরে উঠে, কারণ এ যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। নাপিতের অস্ত্রোপচারের ফলে তাদের মৃত্যু হতেও অবশ্য বড় বেশি দেরি হয় নি।

আর বিবি ? বিবির কি করা হল ?

না, বিবির আর প্রাণদণ্ড হল না। ভাঁড় নিতান্ত ভাল মানুষ হলেও এবার আর তার আসল ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না, সে তখনই কাজী ডেকে তার বিবিকে তালাক দিয়ে দিলে।

কসাইয়ের এই গল্প শুনে আমীর প্রথমে খুব খানিকটা হাসলেন তারপর একটু সামলে নিয়ে তাকে বললেন—তোমার এ গল্পটা বেশ মজারই বটে, যাক এবার তোমার ছুটি, এখন তুমি বাড়ি যেতে পার। কসাই ছুটি পেয়ে এই পোশাকে সে পথ চলবে কি করে ভাবতে ভাবতে আমীরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এদিকে আমীরের বিবি চতুর্থ কামরা খুলে প্রতিবেশী বণিকের হাত ধরে স্বামী সামনে হাজির করলেন। আমীর কঠোর দৃঢ় নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে যখন বুঝলেন যে ইনি তাঁদের প্রতিবেশী বণিক তখন তাঁকে বেশ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জনাব, আপনি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হয়েও আমার হারেমের দিকে নজর দেবেন—এ আমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি। আপনি আমাদের সাধ্যমত রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, আপদ বিপদে সাহায্য করবেন এইটাই প্রত্যাশা করি আপনার কাছ থেকে। আপনি করলেন এর উল্টো। প্রতিবেশীর পবিত্র কর্তব্য ভঙ্গ করেছেন আপনি। এর আগে আমি যে তিন জনকে ছেড়ে দিলাম তাদের আমাদের প্রতি কোন কর্তব্য ছিল না, কিন্তু আপনি প্রতিবেশী হওয়ায় আপনার কর্তব্য ছিল, সেই কর্তব্যের বিপরীত কার্য করে গুরুতর অপরাধ করেছেন আপনি, এ ব্যাপারে উচিত হয় যে আমি নিজে হাতে আপনাকে বধ করি, কিন্তু তা আর আমি করব না, আপনার আগের তিনজনকে যেমন ছেড়ে দিয়েছি,

আপনাকেও তেমনি ছেড়ে দেব, কিন্তু একটি শর্তে, সে শর্ত হচ্ছে আপনাকে মজাদার একটা গল্প শুনিয়ে যেতে হবে আমাদের।

এই কথা শুনে বণিক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর গল্প শুরু করলেন—

প্রগল্‌ভার সাজা

এক ভদ্রলোক, তিনি ছিলেন সাহেব-অল-হায়ৎ (জ্যোতির্বিদ) আর এঁর যে বিবি ছিল সে ছিল পরমা সুন্দরী ; যেমনি দেহের গঠন, তেমনি বর্ণ, তেমনি আর সব কিছু। এই বিবি সুযোগ পেলেই তার স্বামীকে গুমোর করে বলত—বুঝলে, সাহেবজান, আমার মত আর কোথাও পাবে না, শুধু বড় ঘরের বেটীই আমি নই, আমার মত সৎস্বভাব ইমানদার আওরতও তুমি কোথাও পাবে না! হরদম হাজারোবার এই কথা স্ত্রীর মুখে শুনে শুনে স্বামীরও দৃঢ় বিশ্বাস, বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে তার স্ত্রীর মত সাধ্বী আর দুনিয়ায় নেই। শুধু বিশ্বাস আর ধারণা নয় অনেক লোকের কাছে, বন্ধুদের অনেক মজলিসেই তিনি নিজের বিবির সৎস্বভাবের কথায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

একদিন অনেক এলেমদার লোকের বৈঠকে তিনি হাজির ছিলেন, কারণ তিনিও ত কম লোক নন ; তিনি একজন মস্ত বড় জ্যোতির্বিদ। বৈঠকে সেদিন স্ত্রীজাতির কথাই হচ্ছিল, ওদের ছলা কলা থেকে শুরু করে ওদের ছল চাতুরি প্রতারণা, বেইমানি, বহুবল্লভবৃত্তি ইত্যাদি। এরপর তাঁদের এক একজন স্ত্রীলোকের কুকীর্তির এক একটা গল্প শোনাতে লাগলেন। এই সব শোনার পর সাহেব-অল-হায়ৎ বলে উঠলেন—আল্লার অশেষ দোয়া, আমার বিবির এ সব দোষের কোনটাই নেই, যেমনি ঘরের বেটী তিনি, তেমনি সৎ স্বভাব তাঁর, আমা বই তিনি আর জানেন না।

শুনে একজন প্রশ্ন করে বসলেন—কি করে জানলেন আপনি ?

আমার বিবিই বলেছেন।

আপনি একটা উজবুক, জনাব।

কেন, আমি উজবুক হতে গেলাম কিসে ?

কিসে ? আপনার বিবি বললেন, আর তাই আপনি বিশ্বাস করলেন ? ওদের কোন কথায় বিশ্বাস করবেন না, জনাব, আমি যা বলছি, তাই করুন, তা হলে হাতে হাতে ধরতে পারবেন, আপনার বিবি নিষ্ঠাবতী, কি না।

কি বলুন।

আপনি বাড়ি যান, গিয়ে আপনার বিবিকে বলুন, দিন চারেকের জন্যে বিদেশে যেতে হচ্ছে আমার, না গিয়ে উপায় নেই, তুমি পথে খাবার কিছু রুটি, পনির, আর কিছু শুকনো ফল একটা পোঁটলায় বেঁধে দাও। বিবি এই সব যোগাড় করে দিলে তাই নিয়ে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ুন, তারপর অল্প কিছুক্ষণ পরেই চুপিচুপি ফিরে এসে কোন আওয়াজ না করে একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে থেকে দেখুন আপনার বিবি কি করেন।

ঠিক, এ যুক্তি ত মন্দ নয়—এই ভেবে সাহেব-অল-হায়ৎ বাড়িতে গিয়ে বললে—বিবিজান, কিছু রুটি, পনির আর শুকনো ফলের একটা পোঁটলা বেঁধে আমাকে দাও, কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যেতে হচ্ছে আমায়। বেশি দেরি হবে না, চারদিন কি বড় জোর ছয় দিন।

শুনে বিবির চোখ ছলছল করে এল, কাতর কণ্ঠে সে বললে—তোমায় ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে, আমি যে তোমায় ছেড়ে একদিনও থাকতে পারি নে। আর নিতান্তই যদি যেতে হয় তবে আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

বিবির রকম সকম দেখে আর কথা শুনে স্বামী ভাবলেন—আমার স্ত্রীটি একটি রত্ন, এমন সাধ্বী, স্বামীগতপ্রাণা আর ছুনিয়ায় নেই, স্ত্রীর কথার উত্তরে মুখে বললেন—একটু ধৈর্য ধরে থাক, চার দিন কি বড় জোর ছয় দিন—এর বেশি দেরি হবে না আমার।

অভিমানের সুরে—পুরুষের কি কঠিন প্রাণ!—বলে গিয়ে বিবি স্বামীর পথের খাবার এক পুঁটলি বেঁধে এনে তাঁর হাতে দিল। সাহেব-অল-হায়ৎ সেই পুঁটলি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, তারপর এদিক ওদিক ঘুরে ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এসে বাড়ির এক নিরালা গোপন কোণে লুকিয়ে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলেন এক খুজরি (ইক্ষু বিক্রেতা) তাঁর বাড়িতে ঢুকলো, ঢুকেই তাঁর বিবিকে সেলাম করল—বিবিও তাকে সেলাম জানিয়ে বললে—কি এনেছ তুমি ?

কি আর আনতে পারি বলো—আখের ব্যাপারী এনেছি দু'খানা আখ।

বেশ, ঐ ঘরের এক কোণে রাখ।

খুজরি আখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ির কর্তা কোথায় ?

ভয় নেই, চার পাঁচদিন নিশ্চিন্তি ; বিদেশে গেছে। আল্লা করুন যেন আর না ফেরে। এই বলে খুজরিকে নিয়ে ঘরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবার পর খুজরি চলে গেল, বিবি বারান্দায় এসে বসল। এর একটু পরেই বাজারের হাঁস-মুরগী-পায়রার ব্যাপারী এল।

কি এনেছ ?—জিজ্ঞাসা করল বিবি।

তোমার জন্যে দুটো পায়রা জবাই করে ছাড়িয়ে এনেছি।

বেশ, রাখ এই পাত্রে।

এরপর বিবি তাকে নিয়ে ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবার পর ব্যাপারী সেলাম করে চলে গেল।

এরপর এল এক বড়লোকের বাগানের মালী।

কি এনেছ ?—শুধালে বিবি।

এনেছি বাগানের সব চেয়ে বড় আর পাকা দুটো বেদানা।

বেশ, রাখো ঐ খানে, একটু বসো, বলে বিবি ঘরের মাঝে গিয়ে পোশাক পালটে, খোসবায় মেখে চোখে কাজল দিয়ে এসে মালীর সঙ্গে অনেকক্ষণ হাসি মসকরা করবার পর মালী চলে গেল। তারপর

বিবি তার সৌখীন জমকালো পোশাক ছেড়ে আটপৌরে পোশাকটা পরে নিল। সাহেব-অল-হায়ৎ স্বামী লুকিয়ে থেকে স্ত্রীর কার্যকলাপ সবই দেখলেন, সবই বুঝলেন। গোপন জায়গায় আর একটু অপেক্ষা করে থাকবার পরই তিনি বাড়ি ঢুকলে বিবি তাঁকে দেখে বলে উঠল —এ কি, তুমি না বিদেশে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরুলে? যাওয়া হল না ত হলে?

স্বামী বললেন—কি করে আর হবে বলো, পথে বেরুতেই যে কাণ্ড দেখলাম তা মুখে আনতে আমার গা ঘিনঘিন করে, কাগজ কলমে লেখা চলে না।

করুক গা ঘিনঘিন, একটু কষ্ট করে বলোই না দেখি, শুনি। বলতেই হবে তোমায়, না শুনে আমি ছাড়ছি না।

এতই যদি জিদ তোমার ত শোনো: বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে সবে বড় রাস্তা ধরেছি এমন সময় এক ব্যাসিলিস্ক (সাপের মত জানোয়ার বিশেষ) তার খোড়ল থেকে বেরিয়ে আমার সামনে রাস্তার উপর আড়াআড়ি তার শরীর বিছিয়ে দিল, আমি আর এক পাও এগুতে পারলাম না। কি বদখত আর বিটকেলে তার চেহারা, —রে বাপ: খুজরি ঐ যে আখ এনে দিয়েছে তোমায়, ওরই মত সে লম্বা, আর ঐ যে বাসনের উপর পালক ছাড়ানো দুটো পায়রা রয়েছে, ওদেরই পালকের মত তার মাথার চুল, আর মাথাটা হচ্ছে তার তোমার ঐ মালীর আনা বেদানার মত।

স্বামীর মুখে এই কথা শুনে বিবির আর বুঝতে বাকী রইল না যে স্বামী কোথাও লুকিয়ে তার অপকর্ম সব নিজের চোখে দেখে ফেলেছেন, সুতরাং কি আর উত্তর দেবে সে, সে শুধু মুখ হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই বিস্ফোরণ। স্বামী প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন—সয়তানী, রাক্ষুসী, ডাইনি, এই তোমার সৎস্বভাব? একটু চোখের আড়াল হলেই তোমার এই কাণ্ড? তোমার যা জিনিসপত্তর আছে নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—

কিন্তু শুধু মুখে বললেই ত দূর করা যায় না, বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া যায় না, সুতরাং এরপর সাহেব-অল-হায়ৎ কাজী ডেকে বিবিকে তিনবার তালাক দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন।

প্রতিবেশী বণিকের এ গল্পটিও আমীরের বেশ ভাল লাগল, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে তিনি কিছু ওয়াকিবহাল হলেন। এরপর তিনি আগের তিনজনকে যেমন ছুটি করে দিয়েছেন, তাকেও তেমনি ছুটি করে দিলেন।

যাই হোক এই কাণ্ডের পর আমীরের বিবিকে আর কেউ কোনদিন বিরক্ত করতে সাহস পায় নি।

গল্প শুনে সুলতান ও দুনিয়াজাদী দুইজনেই খুশী, জবর খুশী। শাহরিয়ার বললেন—সত্যি বড় আনন্দ পেলাম তোমার এ গল্পটা শুনে, ধূর্ততার সঙ্গে সততার অপূর্ব সংমিশ্রণ। কিন্তু একটা সত্যিকার প্রেমের গল্প অনেকদিন শোনা হচ্ছে না আমাদের!

আপনি হুকুম করলেই শোনাতে পারি।

বেশ, কাল শুনব এ গল্প।

বাগদাদের এক দেউলে ও তার বাঁদী

পরের দিন শেষ রাত্রে শাহরাজাদী সুলতানের অনুমতি নিয়ে তার সেই গল্পটি শুরু করলে—

বাগদাদে একটা লোক ছিল, নাম ছিল তার করিম। করিমের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কারণ তার বাপজান তার জন্যে অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু হলে হবে কি—বেহিসেবির মতো কাজ করে একদিন সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। হিসাবটার কোথায় ভুল করল সে—সে কথাটাও বলে রাখা দরকার। বাজারে বাঁদী বিক্রি হচ্ছিল—তার মধ্যে একটি বাঁদীকে দেখে এবং দালালের মুখে তার গুণের কথা শুনে বড্ড ভাল লেগে গেল তার, সে তাকে তখনই ভালবেসে ফেললে। ফলে অনেক দিনার খরচ করে বাঁদীটাকে কিনে ঘরে আনল করিম, তারপর তাকে নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মত ঘর করতে লাগল। করিম বাঁদীকে যেমন ভালবাসে, বাঁদী করিমকে বাসে বুঝি তার চেয়েও অনেক বেশি। সুতরাং দিন তাদের বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল বলা যায়। কিন্তু একটা বড় ভুল করে যাচ্ছিল করিম: কোন হিসেব না রেখেই বাঁদীকে সাজাতেগোজাতে, ভাল খানা খাওয়াতে—এক কথায় বাঁদীকে সুখে রাখতে সে দু'হাতে খরচ করে যাচ্ছিল। অল্প বয়স দু'জনের, সুতরাং দু'জনের কারোই খেয়াল ছিল না এদিকে। ফলে একদিন দেখা গেল, করিমের হাতে রেস্ত বলে আর কিছুই নেই। মহা ভাবনায় পড়ে গেল করিম: এখন সে নিজে কি খাবে, বাঁদীকে কি খাওয়াবে!

বন্ধুবান্ধব কার না থাকে, করিমেরও ছিল। আর কিছু দিতে না পারুক তারা সৎপরামর্শ ত দিতে পারে। তাদের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে তারা বললে—তোমার ত দিব্যি গানের গলা ছিল হে,

বাঁদী ঘরে আনবার আগে ওস্তাদ গুণীদের সঙ্গে মিশে শিখেছিলেও বেশ, তোমার বাঁদীরও গলা শুনেছি আমরা, খাসা গায়। দুই জনে মিলে গান গেয়ে বেড়াও, তাতেই বেশ রোজগার হবে, স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। কথাটা পছন্দ হল না করিমের, তার বাঁদীরও না।

বাঁদী করিমকে খুবই ভালবাসে, সে বললে—ভেবেচিন্তে আমি একটা উপায় ঠাওরেছি, এটা করলে তোমার সঙ্কট মোচন হবে।

কি ?

তুমি আমায় বিক্রি করে দাও, তাতে আমাদের দু'জনেরই দুর্দশার মোচন হবে। নিতান্ত বড়লোক ছাড়া কেউ আমাকে কিনতে পারবে না, সুতরাং অনেক দিনার পাবে তুমি, তোমার আর্থিক দুর্গতি ঘুচবে, আর ধনীর বাড়ি গিয়ে আমারও কষ্টে থাকবার কথা নয়। এরপর যা হয় একটা কিছু ফন্দি করে আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। এ ছাড়া ত আমি আর পথ দেখতে পাচ্ছি না।

কয়েক দিন পরপর বাঁদী করিমকে এই রকম বুঝানোর পর করিম শেষে রাজী হয়ে তাকে বাজারে নিয়ে গেল। বাঁদীকে প্রথমেই যিনি দেখলেন তিনি হচ্ছেন বসোরার এক হাশিমী (হজরত মহম্মদের প্রপিতামহের নাম হাশিম, তাঁরই বংশধর যাঁরা তাঁরা হাশিমী), এই হাশিমী শুধু সদ্‌বংশজাতই নয়, রুচি এবং দরাজ দিলের দিক দিয়েও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ইনি বাঁদীকে পছন্দ করে দু' হাজার দিনার দিয়ে করিমের কাছ থেকে কিনে নিলেন। করিম দিনার হাতে নিয়ে কাঁদতে লাগল, বাঁদীও কাঁদতে লাগল। করিম তখন যুক্তিনামা নাকচ করে দিয়ে দিনার ফেরত দিতে চাইল হাশিমীকে; হাশিমী তাতে রাজী হলেন না। করিম তখন নিদারুণ দুঃখে অস্থির হয়ে কাঁদতে ত লাগলই, তা ছাড়া পাগলের মত নিজের বুক মুখ চাপড়াতে লাগল, তার এত পেয়ারের বাঁদী নেই ঘরে, খালি ঘরে সে কি করে যাবে !—একটু পরে মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে সে বাড়ি না গিয়ে মসজিদে গিয়ে হাজির হল; আল্লার জায়গা, ওখানে গেলে দিলটা যদি একটু জুড়োয়।

মসজিদে গিয়েও কিছুক্ষণ বসে বসে শুধু কাঁদল সে, তারপর ক্লান্ত হয়ে দিনারের থলিটাকে বালিশ করে মাথার নীচে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল, তারপর কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে জানতেও পারে নি। কিছুক্ষণ পর মাথায় একটু টান পড়তেই জেগে গিয়ে দেখে একটা লোক তার দিনারের থলিটা নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। করিম তাকে ধরতে যাবে বলে উঠতে গিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ; চোর চুরির আগেই তার দুই পা আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে। করিম তখন আবার নতুন করে বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করল—হায়, আল্লা, আমায় কি করলে, আমার পেয়ারের জনও গেল, আমার দিনারও গেল ! এ নিদারুন শোক সহ্য করতে না পেরে করিম শেষে তাইগ্রীসের তীরে গিয়ে গায়ের আলখাল্লা দিয়ে মুখ ঢেকে নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল। তীরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বুঝলে—লোকটার নিদারুণ কিছু একটা ঘটেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে করিমকে ডাঙায় তুলে আনলে, তারপর তারা জিজ্ঞাসা করলে—কেন সে এ কাজ করতে গিয়েছিল। করিম তার সব দুঃখের কথা খুলে বললে তারা তাকে নানা সান্ত্বনা দিলে। ওদের মাঝে একজন বৃদ্ধলোক ছিলেন, তিনি করিমকে বললেন—বাবা, তোমার ধন গেছে, তাই বলে জানটা দিয়ে দোজকের আগুনে পুড়তে যাচ্ছিলে কেন ? চল কোথায় তোমার বাড়ি দেখি, আমি তোমার সঙ্গে যাব তোমার বাড়িতে। এই বলে বৃদ্ধ করিমের হাত ধরে তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বৃদ্ধ করিমের সঙ্গে এ-কথা ও-কথা বলতে করিমের মনটা একটু শান্ত হল।

বৃদ্ধ শেখ করিমের বাড়ি থেকে চলে যেতেই করিমের মনে তার বাঁদীর শোক, দিনারের শোক আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আবার আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগল তার মনে, কিন্তু দোজকের আগুনের কথা স্মরণ করে সে কোন রকমে সে ইচ্ছা দমন করল। এ দিকে বাড়ির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, খাঁ খাঁ করছে বাড়ি; যেন গিলে খেতে আসছে ! ওখানে টিকতে না পেরে বেরিয়ে পড়ল সে, কিন্তু

এ দুঃখ ভুলতে কোথায় যাবে সে ! আপন মনে ভাবতে ভাবতে দেখে কখন সে তার এক দোস্তের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। দোস্ত তার অবস্থা দেখে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করল তখন সে তার সকল কথা তাকে খুলে বললো। দোস্ত তাকে পঞ্চাশটা দিনার দিয়ে বললে—ভাই, তুমি আর বাগদাদে থেকো না, এই নিয়ে বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়, কিছুদিন ত চলবে। এদিক ওদিক ঘুরলেই দুঃখের জ্বালার কিছু উপশম হবে। তারপর, সদ্‌বংশের ছেলে তুমি, তোমার বাপঠাকুরদা মুনশী ছিলেন, তোমার হাতের লেখা অতি সুন্দর, কোনদেশের নাজিমের (রাজ্যপাল বা রাজপ্রতিনিধি) শরণাপন্ন হও, কাজও কিছু একটা মিলবে, এবং তাঁর সাহায্যে তোমার পেয়ারের বাঁদীকে হয়ত তুমি ফিরে পাবে। দোস্তের কাছ থেকে দিনারগুলি পেয়ে এবং তার মুখে আশ্বাসের এই কথাগুলি শুনে যেন মনে একটু বল পেল করিম। সে তখন ইরাকের ওয়াজিদ্ শহরে তার আত্মীয়স্বজন ছিল বলে সেখানে যাওয়াই মনস্থ করল। ভাগ্য-চক্রে নদীর ধারে এসে দেখে একখানা জাহাজ তখন ওয়াজিদে যাওয়ারই উদ্যোগ করছে। খালাসীরা মালপত্র উঠাচ্ছে জাহাজে। সে তখন তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—ভাইসব, তোমাদের জাহাজে একটু জায়গা হবে আমার, আমি ওয়াজিদে যাব।

না, সাহেব, সে কি করে হবে, এ ত বাণিজ্য জাহাজ বা ভাড়ার জাহাজ নয়, এক হাশিমী সাহেবের জাহাজ এ। করিম তাদের খানা-পিনার জন্যে কিছু দিনার দিতে চাইলে তাদের মন নরম হল, তারা বললে,—হ্যাঁ নিতে পারি আমরা, তবে আপনি এ পোশাক পরে থাকলে চলবে না, আপনার ঐ ভাল জামাকাপড় ছেড়ে আমাদের এই খালাসীর পোশাক পরতে হবে, তা হলে আপনাকে আমরা আমাদের একজন বলে চালিয়ে দিতে পারব।

খালাসীদের কথা শুনে করিম তখনই বাজারে গিয়ে খালাসীদের পোশাক কিনে পরে পথের খানার জন্যে কিছু খাবার কিনে জাহাজে উঠল। একটু পরেই দেখে তার সেই বাঁদী উঠছে জাহাজে সঙ্গে তার

দুই পরিচারিকা। দেখেই মনটা একটু খুশী হয়ে উঠল করিমের।— ওকে দেখতে পাবে সে, গানও শুনতে পাবে, অন্তত বসোরা যাওয়া পর্যন্ত ত এ সুযোগ পাবেই সে। একটু পরই হাশিমীও জাহাজে উঠলেন, সঙ্গে তার অনেক লোকজন। জাহাজ ছেড়ে দিল। অল্প কিছুক্ষণ পরই হাশিমী বাঁদীকে নিয়ে খেতে বসলেন, হাশিমীর সঙ্গীরাও বসলেন, তবে অন্যত্র।

খানা হয়ে গেলে হাশিমী বাঁদীকে বললেন—আর কত দিন এমনি ধারা চলবে, এ কান্নাকাটি কি তোমার থামবে না কোনদিন? পেয়ারের লোককে ছেড়ে অনেককেই আসতে হয়, কিন্তু, কই তারা ত এমন করে না। তারপর শুনেছি তুমি না কি খাসা গান গাও, কিন্তু হাজার বললেও একদিন তুমি আমাদের গান শোনালে না একটাও। মেয়েটি এর কোন জবাব দিল না দেখে হাশিমী তার সামনে একটা পর্দা টাঙিয়ে দিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে উঠে গিয়ে তাদের সিরাজি পরিবেশন করতে লাগলেন।

এইসব দেখেশুনে করিমের মনটা বেশ একটু খুশী হল।—মেয়েটি তা হলে এখনও তার কথা ভুলতে পারে নি। ওদিকে হাশিমীর সঙ্গীরা সিরাজি পান করতে করতে ওখানে বসেই মেয়েটিকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। বারবার অনুরোধ করায় মেয়েটি শেষে একটা বীণ চেয়ে পাঠাল। বীণ এলে মেয়েটি সেটা হাতে নিয়ে টুংটাং করে বেঁধে নিয়ে শুরু করল—

ওরা আমার দয়িতকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল
সঙ্গে নিয়ে গেল আমার জীবনের সকল আনন্দ।
ওদের পথ চলা শুরু হতেই
হৃদয়ে আমার যে দাবানল জ্বলে উঠল
তা আজিও জ্বলছেই, জ্বলবেই
কোনদিন বুঝি নিববে না।

গান গাইতে শুরু করলেই মেয়েটির দুই চোখ জলে ভরে এল, সে জল শেষে এমন অঝোরে ঝরতে শুরু করলো—যে মেয়েটির আর

গান গাওয়া সম্ভব হল না, বীণটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে মাথা হেঁট করে শুধু কাঁদতেই লাগল। তার এই অবস্থা দেখে হাশিমী এবং তাঁর সঙ্গীরা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন, আর করিম এদিকে মূর্ছিত হয়েই পড়ল। মূর্ছিত করিমকে দেখে হাশিমীর সঙ্গীরা মনে করলেন লোকটাকে জিনে পেয়েছে, তাই তারা করিমের কানে নিজেদের জানা জিন ছাড়ানো মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলেন। তাদের কেউ কেউ মেয়েটিকে নানা সান্ত্বনার কথা বলে তাকে আবার গান গাইতে অনুরোধ করতে লাগলেন। ওদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে চোখের জল মুছে মেয়েটি বীণটা আবার তুলে নিল হাতে, গাইল—

ওরা আমার ঘর ভেঙে
ধনরত্ন সব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল
অসহায় আমি পথে দাঁড়িয়ে
শুধু হাহাকার করে কাঁদতে লাগলাম।
ওরা আমার আনন্দ নিয়ে চলে গেল,
হায় আল্লা, তার স্মৃতিটুকু রেখে গেল কেন!
এখন এই স্মৃতিতে ভরা ভাঙা ঘরে
আমি একলা কি করে দিন কাটাই?

গাইতে গাইতে মেয়েটি শেষে মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তার অবস্থা দেখে সবারই চোখে জল এসে গেল, আর এদিকে করিমও কাঁদতে কাঁদতে শেষে অচেতনই হয়ে পড়ল। খালাসীরা করিমের অবস্থা দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, হাশিমীর একটা চাকর তখন খালাসীদের ধমকে উঠল—তোমরা এই পাগলটাকে জাহাজে তুলেছ কেন? ওরা বললে—আগে বুঝতে পারি নি, এবার জাহাজ কোথাও নোঙর করলেই আমরা ওকে ডাঙায় নামিয়ে দেব।

এরপর জাহাজ সুন্দর একটা জিয়ার (ছোট্ট গ্রাম) পাশ দিয়ে যেতে হাশিমী তার সঙ্গীদের বললেন—এস, এখানে একটু নামা যাক। তখন সন্ধ্যার কাছাকাছি। হাশিমী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নেমে গেলে করিম সুযোগ পেয়ে মেয়েটির পরদার পাশ থেকে বীণটা টেনে নিয়ে

নিজস্ব ভঙ্গীতে টুং টাং করে তা বাঁধতে লাগল, ওর সুরবাঁধার রকম শুনেই মেয়েটি বুঝলে এ করিম ছাড়া আর কেউ নয়! করিম কিন্তু কোন গান না করে বীণটা আবার যথাস্থানে রেখে নিজের জায়গায় এসে বসল।

হাশিমী তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে এলেন জাহাজে, তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে, চারদিক জোছনায় একেবারে ছেয়ে গেছে। হাশিমী মেয়েটির কাছে এসে বললেন—আল্লার দোহাই, আমাদের ফুর্তিটা একেবারে মাটি করে দিও না, এবার ভাল দেখে একটা গান ধরো। শুনে মেয়েটি বীণ হাতে তুলে নিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে ফুঁপিয়ে উঠল যে দেখে সবার মনে হল, যেন জানটা তার বুঝি বেরিয়েই গেল। এরপর মেয়েটি হাশিমীকে বললে— আল্লার কসম, বলছি আমার সাবেক মনিব এবং গানের ওস্তাদ এই জাহাজেই আছেন।

থাকেন সে ত ভালই, আমাদের এখানে এসে বসতে তার কোন মানা নেই, তাকে কাছে পেলে বরং ভালই, তোমার বুকের বোঝা কমবে, আমরা একটু ভাল করে তোমার গান শুনতে পাব। কিন্তু তুমি কোথাও বোধ হয় ভুল শুনেছ, ভুল বুঝেছ, তার এ জাহাজে থাকবার কোন সম্ভাবনা নেই।

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, তিনি আছেন, আর তিনি কাছে থাকতে বীণের তার বাঁধতেও আমি পারব না, আর যে গান আমার গাওয়া অভ্যাস ছিল তা গাইতেও আমি পারব না।

হাশিমী বললেন—বেশ, আমি খালাসীদের জিজ্ঞাসা করে দেখছি, এ জাহাজে বাইরের কেউ আছে কি না।

বেশ, দেখুন।

হাশিমী তখন খালাসীদের ডেকে বললেন—তোমরা বাইরের কোন লোক তুলেছ জাহাজে?

ওরা ভয় পেয়ে বললে—না ত।

পাছে তাকে খোঁজা এইখানেই শেষ হয়ে যায় এই ভয়ে করিম

হেসে উঠে বললে—হ্যাঁ, আমি এই যে এখানে আছি। আমি যখন ওর মালেক ছিলাম, তখন ওর গানের ওস্তাদও ছিলাম।

মেয়েটি অমনি হাশিমীকে বলে উঠল—আল্লার কসম, এ আমার সেই সাবেক মনিবেরই কণ্ঠস্বর।

হাশিমীর হুকুমে তাঁর বান্দারা তখন করিমকে ধরে নিয়ে এল তাঁর সামনে। হাশিমী তাকে দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠলেন—এ কি হয়েছে তোমার, এমন দশা তোমার কে করলে?

করিম তখন তার সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত হাশিমীকে খুলে বলতে লাগল, বলবার সময় কান্নায় কতবার যে বাক্‌রোধ হয়ে যাচ্ছিল তার লেখাযোখা নেই। আর করিমের কাহিনী আর কান্না শুনে পর্দার আড়ালে থেকে বাঁদীও একেবারে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। দেখেশুনে হাশিমীর সঙ্গীদের চোখেও জল এসে গেল, হাশিমী নিজে ত সম্ভব মত কাঁদলেনই, তারপর তিনি করিমকে বললেন—দেখ ভাই, আল্লার কসম বলছি, আমি আজ পর্যন্ত তোমার বাঁদীর কাছে পর্যন্ত যাই নি, শুধু তাই নয়, এই আজ ছাড়া আমি তার গানও শুনি নি। আল্লা আমাকে অনেক দিয়েছেন, কিছুরই অভাব নেই আমার। আমি বাগদাদ এসেছিলাম দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে, —বাগদাদের গান শুনব আর খলিফার কাছে আমার একটু কাজ ছিল তাই সারব। খলিফার সঙ্গে দেখা করবার পর বাগদাদের গান শুনব বলেই আমি এই মেয়েটিকে কিনে নিই, তখন ত আমার জানা ছিল না তোমাদের দুইজনের মনের কথা। যাক যা হয়ে গেছে, গেছে,—এখন আল্লাকে সাক্ষী রেখে আমি কথা দিচ্ছি— বসোরায় পৌঁছেই আমি এই বাঁদীকে খালাস করে দিয়ে তোমার সঙ্গে এর সাদি দেব, আর তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন যাতে স্বচ্ছন্দে চলে যায় এমন কিছু ধনসম্পদও তোমায় দেব; হ্যাঁ, তবে একটা সর্ত আছে, সর্তটা হল—যখনই আমার গান শুনতে ইচ্ছে করবে, আমি একটা পরদা টাঙিয়ে দেব আর সেই পরদার আড়ালে থেকে এই মেয়েটি আমায় গান শোনাবে, তুমি থাকবে আমার ভাই বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

শুনে করিমের আর আনন্দের সীমা রইল না, হাশিমী তখন পরদার ওদিকে মুখ বাড়িয়ে মেয়েটিকে বললেন—কি গো, শুনেছ ত, এতে তোমার দিল খুশী হবে ত? শুনে বাঁদী আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় হাশিমীর জন্যে শুধু খোদার দোয়া মাঙতে লাগল।

হাশিমী তখন তার একটা চাকরকে ডেকে করিমকে দেখিয়ে বললেন—একে ভাল করে গোসল করিয়ে, ভাল জামাকাপড় পরিয়ে খোশবায় মাখিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আয়। চাকরটা তার মনিবের হুকুম তামিল করলে হাশিমী করিমকে ভাল খানা খাওয়ালেন, সিরাজি পান করালেন। তারপর শুরু হল গান। এবার আর মেয়েটির চোখের জল ফেলা নেই, সে পরমানন্দে কণ্ঠে মধু ঢেলে দিয়ে গাইল—

আমার দয়িত আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে
অশ্রুর বন্যা নেমেছিল আমার চোখে,
দেখে ওরা ছি ছি করতে লাগল।
ওরা বিরহের জ্বালা ত বোঝে নি কোনদিন
তাই এ কথা বলে।
বিরহে যে পাঁজরার নীচেটা জ্বালিয়ে খাক করে দেয়
এ কথা আমি ওদের কি করে বোঝাব?

মেয়েটির গান শুনে শ্রোতারা সবাই খুশী, মহাখুশী। করিম নিজের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে মেয়েটির হাত থেকে বীণ নিয়ে নিজের মনোমত করে বেঁধে তার ওস্তাদী দরদী গলায় ধরল—

যদি চাইতে হয় ত দুনিয়ার মালিক
মেহেরবান খোদার কাছে চেও,
তারপরেই চাইবে দরাজদিল দরদী লোকের কাছে
জমিনে তারা খোদার প্রতিনিধি।
নির্দয় ধনীর কাছে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হবার
কোন মানে হয় না,
হাত পাতবে এমন লোকের কাছে
গরিব দুঃখীর জন্য যার প্রাণ কাঁদে।

করিমের দরদী গলার গান শুনে হাশিমী এবং সঙ্গীরা একেবারে মুগ্ধ, বিগলিত। এরপরই মেয়েটিকে আবার গাইতে বললেন তাঁরা। মেয়েটি গাইল, তারপর আবার করিম গাইল, তারপর আবার মেয়েটি। এমনি করে গান শুনতে শুনতে তাঁরা একটা জাহাজঘাটায় এসে হাজির হলেন। হাশিমীর নির্দেশে জাহাজ নোঙর করা হল সেখানে। জায়গা অতি সুন্দর ছিল বলে ওরা সবাই নেমে পড়লেন জাহাজ থেকে, একটু ঘুরেফিরে দেখবেন। ওদের সঙ্গে করিমও নামল। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর একটা গাছের নীচে চাদর বিছিয়ে খানাপিনা হল, পিনাটা একটু বেশি মাত্রায় হল, সুতরাং নেশাও হল সবার দস্তুর মত, এমন কি ডান বাঁয়ের জ্ঞান রইল না বললে চলে।

এবার জাহাজে ফিরবার পালা। নেশা সবারই এমন জমেছে যে কে এল, না এল, সে খোঁজ রাখা আর সম্ভব নয়। করিম সবার পিছনে পড়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া ভীষণ ঝিমুনি পাচ্ছিল তার। ঝিমুনির চোটে এক জায়গায় একটু বসে পড়ল সে। যেমনি বসা, অমনি কাৎ অমনি ঘুম। আর ঘুম বলে ঘুম—জব্বর ঘুম। এদিকে হাশিমী তার সঙ্গীদের নিয়ে টলতে টলতে কোন রকমে জাহাজে এসে উঠলেন, কেউ পড়ে রইল কিনা তার হিসাব রাখা আর সম্ভব হল না। জাহাজ ছেড়ে দিল। করিম তখন একটা গাছের নীচে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

পরদিন ভোরে সূর্য উঠবার পর রোদের তাপ লাগায় তবে করিমের ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙবার পর চোখ মেলে দেখে আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। বুকের মাঝে অমনি একটা হাতুড়ির ঘা পড়ল তার। তখনই উঠে জাহাজ ঘাটে ছুটল। এসে দেখে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। ইয়া আল্লা, ওরা একবার আমি উঠলাম কি না তার খোঁজও করলেন না! পরক্ষণেই মনে হল, তাঁদের দোষ দেখা যায় না তাঁদেরও ত আমারই মত দশা! হায় আল্লা, এ কি দশা হল আমার! আমার পেয়ারের জনকে এতদিন পরে কাছে পেয়েও আবার হারালাম! তাকে হাশিমী বসোরায় নিয়ে গেছেন, কিন্তু

হাশিমীর নাম, তার পদবী তার বাড়ির ঠিকানা কোন কিছুই ত জানি নে আমি, জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এমনি সব চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে জাহাজঘাটায়ই করিম পাগলের মত পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

আল্লার অশেষ দোয়াঃ একটু পরেই বসোরাগামী একখানা জাহাজ বন্দরে এসে লাগল, করিম সেই জাহাজে চড়ে বসোরায় এসে হাজির হল। হাজির ত হল, কিন্তু এখন কি করবে সে, কোথায় যাবে, হাশিমীর ঠিকানা সে জানে না, তবে? অচেনা অজানা জায়গা! হঠাৎ একটা ফন্দি এসে গেল তার মাথায়—সামনেই একটা মুদির দোকান দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দোকানের মালিককে বললে—একটু কাগজ আর কালি কলম পেতে পারি?

মুদী তাকে ঐ সব এনে দিলে সে লিখতে শুরু করল—মুদী তার হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হল, কিন্তু করিমের জামাকাপড়ে নানা দাগ-দাগাড়ি দেখে বললে—কে তুমি, বসোরায় আসা হয়েছে কেন?

করিম বললে আমি গরিব বিদেশী, এখানে কাজের খোঁজে এসেছি।

করবে তুমি কাজ, আমার এখানে?

কি কাজ?

আমার খাতাপত্র লিখবে, জমা খরচের খাতা। খাওয়াপরা পাবে, আর রোজ আধ্ দিরহাম।

বেশ, রাজী আছি আমি,—বললে করিম।

এরপর করিম মুদীর দোকানে হিসাব রাখার কাজে লেগে গেল। তার সুষ্ঠু কাজের ফলে এক মাস পরে দেখা গেল মুদীর দোকানের আয়ের অঙ্ক বেড়ে গেছে, ব্যয়ের অঙ্ক কমে গেছে। মুদী খুশী হয়ে তার দৈনিক বেতন আধ দিরহাম থেকে এক দিরহাম করে দিল।

দিন যেতে লাগল, করিম হাশিমীর খোঁজ আর পায় না। একমাস দু'মাস করে বছর ঘুরে এল, করিমের হিসাব রাখা আর দেখাশোনায় মুদীর দোকানের অনেক উন্নতি হল। মুদী তখন করিমকে একটা

প্রস্তাব দিল—বেটা করিম, আমি বলি কি, আমার একটা মেয়ে আছে, তাকে সাদি করে আমার ব্যাবসায় অংশীদার হয়ে যাও।

রাজী হল করিম, সাদিও করল মুদীর মেয়েকে, করে মুদীর দোকানের অংশীদার হল। কিন্তু মনে তার এক ফোঁটা শান্তি নেই, দিনরাত হু হু করে মন—যে জন্যে এখানে আসা, তার কিছুই এখনও হল না।

আর এক বছর কেটে যাবার পর করিম একদিন দোকানে বসে তার কাজ করছে এমন সময় দেখে দলেদলে লোক ভাল জামাকাপড় পরে খানাপিনার চুপড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। করিম কিছু বুঝতে না পেরে মুদীকে জিজ্ঞাসা করলে—কি ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছে এরা দলেদলে এমন সেজেগুজে খানার চুপড়ি নিয়ে?

ওঃ তুমি জানো না বুঝি? আজ যে শহরের ফুর্তিবাজদের ফুর্তি করবার দিন। এখানকার যত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে তারা এখানকার খানদানি ঘরের ছেলেদের নিয়ে উবুল্লাহ্ নদীর তীরে আজ ফুর্তি করতে যায়।

শুনে করিমের মনে হল, গেলে মন্দ হয় না; একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুটা সময় অন্তত রক্ষা পাওয়া যাবে, তা ছাড়া দিল যারে দেখতে চায়—এখানে গেলে—কি জানি তার সঙ্গেও হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে। এই ভেবে সে মুদীকে বললে—যাব আমি একটু দেখতে? কোনদিন দেখিনি।

বেশ ত যাও না তুমি এই সব দলের সঙ্গে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—এই বলে মুদী বাড়ি থেকে ভাল খানাপিনা আনিয়ে করিমকে দিয়ে বললে—ওখানে গিয়ে খাবে।

করিম খাবারের চুপড়ি নিয়ে পথে দলে দলে লোক যাচ্ছিল, তাদের একটায় ভিড়ে পড়ল, এবং তাদের সঙ্গেই উবুল্লাহ্ নদীর তীরে সেই ফুর্তির জায়গায় এসে হাজির হল। আল্লার কাজ আল্লা করেন ওখানে গিয়ে দেখে হাশিমীর জাহাজের যে রেইস্ ছিল সেও রয়েছে ওখানে, নদীর ধারে তার দলবল নিয়ে, পাশেই তাদের একটা বজরা।

করিম দূর থেকেই তাদের ডাকলে তারা করিমকে চিনতে পেরে তার কাছে এগিয়ে এসে বললে—আরে, তুমি বেঁচে আছ ? এস, এস আমাদের বজরায়—এই বলে করিমকে তারা বজরায় নিয়ে গিয়ে বসালে করিম তাদের কাছে নিজের কাহিনী সব খুলে বললে। ওরা বললে—আমরা ভেবেছিলাম তুমি মাতাল হয়ে জলে পড়ে ডুবে মারা গেছ।

আর দু' একটা কথা হওয়ার পর করিম বললে—আচ্ছা তোমরা কেউ সেই মেয়েটির খবর কিছু বলতে পার ?

তা পারি বই কি। জাহাজে তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না যখন সে শুনল তখন সে নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে বীণ আছড়ে ভেঙে নিজের বুক মুখ চাপড়াতে লাগল, তার সঙ্গে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না। কিছুতেই থামে না। শেষে হাশিমীর সঙ্গে যখন আমরা বসোরায় এসে হাজির তখনও সে কাঁদছেই। আমরা বললাম—আর সহ্য হয় না, বাপু, তোমার এ কান্না থামাও।

ও বললে—তোমরা হাশিমীর বাড়ির পাশে একটা সমাধি-কুটির করে দাও, আমি কালো পোশাক পরে ওখানে থেকে জীবন কাটাব। তার কথামত ঘর করে দিয়েছি আমরা, ও এখনও ওখানেই থাকে।

এরপর করিমকে তারা হাশিমীর বাড়িতে নিয়ে গেলে মেয়েটি যখন করিমকে দেখল তখন সে কি রকম এক বুকফাটা চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, করিম ছুটে গিয়ে অমনি তাকে জড়িয়ে ধরল। হাশিমী এসে ওদের দুইজনকে ঐ অবস্থায় দেখে করিমকে বললেন—তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও এবার।

করিম বললে—সে কি, জনাব, কি কথা ছিল আপনার ; আমি বলেছিলেন বসোরায় এসে ওর মুক্তিপত্র দেবার পর ওর সঙ্গে আমার সাদি দেবেন।

হাশিমী যে কথা বলেছিলেন সে কথা রাখলেন। মেয়েটিকে মুক্তি দেবার পর কাজী ডেকে করিমের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন, তারপর দুইজনকে অনেক ভালো জামাকাপড়, আসবাব পত্র ত দিলেনই,

ওসবের সঙ্গে দিলেন পাঁচ হাজার দিনারের একটি থলি। শুধু তাই নয় করিমকে তিনি বললেন—এই পাঁচ হাজার করে দিনার আমি তোমাদের মাসে মাসে দেব, কিন্তু সেই সর্তে, মনে আছে ত? তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকবে, আর যখনই আমি মেয়েটির গান শুনতে চাইব, তখন ও আমায় গান গেয়ে শুনাবে—অবশ্য পর্দার আড়ালে থেকেই।

হাশিমীর বদান্যতা এইখানেই শেষ হল না, তিনি করিমকে সস্ত্রীক বাস করবার জন্য সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ি, আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় সকল রকম জিনিস সাজিয়ে দান করলেন। করিম বাড়িটা দেখে গিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে সেই বাড়িতে উঠে তাদের নতুন জীবনযাত্রা শুরু করল।

হ্যাঁ, আর একটা কাজ করল করিম; এরপর মুদীর কাছে গিয়ে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললে—চাচা, আপনার মেয়ের কোন দোষ নেই, তবু তাকে আমি তালাক দিতে চাই, নইলে আমি আমার মনে শান্তি পাচ্ছি না। এ তালাকের জন্য যে খেসারত দিতে হয় আমি দিতে প্রস্তুত। মুদী সকল ঘটনা জানবার পর এতে সহজেই রাজী হল। কাজী ডেকে করিমের সঙ্গে মেয়ের তালাক হয়ে গেল।

এবার নিশ্চিন্ত। করিম তার স্ত্রীকে নিয়ে হাশিমীর দেওয়া বাড়িতে হাশিমীর বদান্যতায় বেশ সুখেই বাস করতে লাগল। হাশিমীর ওখানে দু' বছর বাস করবার পর করিম আগে বাগদাদে যে সমৃদ্ধিতে ছিল, সেই সমৃদ্ধিই ফিরে পেয়েছিল, জীবনের বাকী দিনগুলিতে তাদের দুইজনের আর কোন দুঃখের আঁচড় গায়ে লাগে নি।

গল্প শুনে দুনিয়াজাদী বলে উঠল—তোর এ গল্পটি কি করুণ আর মিষ্টি রে দিদি! বড় ভাল লাগল আমার।

শাহরিয়ার বললেন—তুমি ছেলে মানুষ কি না, তাই হাশিমীর আত্মত্যাগের দিকটা আর তোমার চোখে পড়ল না। হাশিমীর

উদারতার তুলনা হয় না। প্রেমের চাইতে মহত্ত্ব, উদারতা আর সততার কাহিনী শুনলে আমার দিলটা যেন বেশি খুশী হয়। এরপর সুলতান শাহরাজাদীর দিকে চেয়ে বললেন—কাল তুমি আমায় ঐ ধরনের একটি গল্প শোনাতে পারবে?

আপনি হুকুম করলেই পারব।

ধর্মপ্রাণ ইউশুপ

পরের দিন শেষ রাত্রে শাহরাজাদী এই গল্পটি শুরু করলে—

ইসরাইলের এক ধনী ব্যক্তির এক সত্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ গুণবান ছেলে ছিল, নাম ছিল তার ইউশুপ। বাপের যখন অন্তিম কাল উপস্থিত হল তখন ইউশুপ তাঁর শিয়রে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে—বাপজান, খোদার কাছে যাবার আগে আমি কি ভাবে চলব সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে যান।

বাপ বললেন—বেটা, একটা কথা শুধু তোমায় আমি বলে যেতে চাই। খোদার কসম নিয়ে কখনও কিছু বলবে না, মিছে হলে ত না-ই, সত্যি হলেও বলবে না।—এই বলেই বাপ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পিতৃভক্ত ধর্মপ্রাণ ইউশুপের বাবা মরবার আগে কি বলে গিয়েছেন সে কথা লোকের কানে যেতেই ব্যাপারটা আরম্ভ হল। একের পর এক লোক এসে বলতে লাগল—তোমার বাপজান আমার কাছে এত ধারতেন, তোমার ত জানাই আছে সে কথা, যদি বলো—আমি জানি না, তবে আল্লার কসম নিয়ে বলতে হবে তোমায়—আমি জানি না।

কি আর করবে বেচারা ইউশুপ, বাপ বলে গিয়েছেন, আল্লার কসম ত সে নিতে পারে না, সুতরাং যে যত দিনার [illegible] কথা

বলে তাই সে তাকে দিয়ে দেয়। এমনি করে দিতে দিতে সে এক রকম সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। বাড়িতে নিজের বিবি ছাড়া ছোট ছোট ছুটি ছেলে ছিল ইউশুপের। এ রকম চলতে থাকলে আর কিছুদিন পরে নিজেদের খানাপিনাই বন্ধ হয়ে যাবে, তাই সে নিজের বিবিকে বললে—দেখছ ত কাণ্ড। আর কিছু দিন এখানে থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে, তোমাদের নিয়ে আরও কোথাও পালিয়ে যেতে চাই আমি, সেখানে গিয়ে মজুর-গিরি করে খাই, সে-ও ভাল।

বিবি বললে—সেই ভাল, আল্লা যেমন রাখেন তেমনি থাকব।

ইউশুপ তখন তার বিবি আর ছুটি ছেলেকে নিয়ে বন্দরে যে জাহাজ পেল তাতেই চড়ে বসল, জাহাজ কোন দেশে যাচ্ছে তার খোঁজ নেবারও দরকার বোধ করল না, যেখানেই হোক—বাড়ি থেকে পালাতে পারলেই সে বাঁচে।

কিন্তু কোথায় পালাবে, নসিব যখন মন্দ হয় তখন তার হাত থেকে কেউ পালিয়ে নিস্তার পায় না। কয়েক দিন পরই যে জাহাজে তারা যাচ্ছিল একটা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগে তা ভেঙে ডুবে গেল। ইউশুপ কোনরকমে ভাঙা জাহাজের একটা তক্তা যোগাড় করে তাই ধরে নিজের জান বাঁচাল, বিবি আর ছেলে ছুটো আর একটা তক্তা পেয়ে তার উপর চড়ে আত্মরক্ষা করলে। এদের সবারই জান বাঁচলেও এক সঙ্গে বা কাছাকাছি তারা আর থাকতে পারল না। ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে চলল তারা বিভিন্ন দিকে। তারপর ঐ ঢেউ আর হাওয়ার মর্জিতেই বিবি ছিটকে পড়ল এক দেশে, একটা ছেলে অন্য দেশে, অন্য ছেলেকে অবশ্য এক জাহাজের নাবিকেরা দেখতে পেয়ে তাদের জাহাজে তুলে নিয়েছিল। আর ইউশুপ ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়ল এক দ্বীপে—একেবারে নির্জন দ্বীপ।

সবই আল্লার মর্জি।

ধর্মপ্রাণ ইউশুপ দ্বীপে পড়ে একটু জিরিয়ে নিয়েই উজু গোসল করে দেহটাকে একটু শুদ্ধ করে সমুদ্রের তীরেই পরম ভক্তি ভরে নমাজ করে নিল, তারপর সামনেই একটা ফলের গাছ পেয়ে তার ফল

খেয়ে ক্ষুধা এবং কাছেরই একটা ঝরনার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করল। এমনি করে তিন দিন কেটে গেল। ইউশুপ যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাক পাঁচ তক্ত নমাজ করতে ও কখনও ভোলে না। তিন দিন পর ও শুনতে পেল উপর থেকে সুউচ্চকণ্ঠে কে যেন ওকে বলছেন—ইউশুপ, তুমি তোমার বাপজানের কথামত কাজ করেছ এবং আল্লার ফরমান মেনে চলো, তাই যা তোমার খোয়া গিয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি তুমি পাবে। এই দ্বীপের অমুক জায়গায় অনেক বহুমূল্য ধনরত্ন, দিনার-দিরহাম, হীরে-জহরত পোঁতা আছে, আল্লা তোমাকে সে সব দান করলেন। জাহাজে করে লোক আসবে এ দ্বীপে তুমি তাদের সংবর্ধনা করে এ সবের কিছু কিছু দান করো, তাতে তোমার ভাল হবে। এখন তুমি গিয়ে ঐ সব ধনরত্ন উদ্ধার করো।

ইউশুপ দৈববাণী শোনার পর আল্লার নাম করে গিয়ে সেই ধনরত্ন উদ্ধার করলো। দু' একদিন পরেই এক দল লোক জাহাজে করে ঐ দ্বীপে এসে হাজির হল, ইউশুপ তাদের অনেক ধনরত্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে বললে—ভাই সব তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে আমার এখানে লোক নিয়ে এস, আমি তোমাদের এবং তাদের অনেক জায়গা জমি ধনরত্ন—অনেক কিছু দেব, তা ছাড়া যারা আগে আসবে তারা পাবে বড় বড় পদ।

ওরা দেশে ফিরে গিয়ে ঐ কথা প্রচার করলে বহু লোক আসতে শুরু করল ঐ দ্বীপে। শুধু ওদের দেশ থেকে নয়, লোক মুখে শুনে নানা দেশ থেকে। এমনি করে বছর দশেকের মধ্যেই দ্বীপ একেবারে জমজমাট হয়ে উঠল। আর ইউশুপ হল ওখানকার সুলতান।

এ দ্বীপে যে আসে সেই সুলতানের দান আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর একেবারে কেনা গোলাম হয়ে যায়। তার এই খ্যাতি দুনিয়ার চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং ইউশুপের দ্বীপে এখন বহু-লোকের বসবাস হলেও লোক আসার বিরাম নেই।

এখন ভাগ্যক্রমে ইউশুপের বড় ছেলেটি যে লোকের হাতে পড়েছিল, তাকে সে লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে আদবকায়দায় দুরস্ত

করে তুলেছিল। সে যেখানেই যায় তার কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। এই ছেলেটি যখন এই দ্বীপের সুলতানের কথা শুনলে তখন সে নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ঐ দ্বীপে এসে হাজির হল। সুলতান তার আদব কায়দা দেখে কথাবার্তা শুনে তাকে তাঁর এক উজির করে নিলেন, জানলেন না যে ও তাঁর বড় ছেলে।

ছোট ছেলেটি পড়েছিল এক বণিকের হাতে। বণিক তাকে লেখাপড়া শেখানোর পর ব্যাবসা বাণিজ্য শিখিয়েছিলেন। এ দ্বীপের সুলতানের সুখ্যাতি শুনে এই দ্বীপে বাণিজ্য করতে এলে সুলতান তাকে তাঁর এক আমীর করে নিলেন।

আর এদিকে ইউশুপের বিবিও আশ্রয় পেয়েছিলেন এক বণিকের বাড়িতে। বণিক ধর্মপ্রাণ, সজ্জন। আল্লার চোখে যা অপরাধ, পাপ সেদিকে তিনি ভুলেও পা বাড়ান না। ইউশুপের বিবি তার বাড়িতে এলে তিনি তাকে নিজের সহোদরার মত মর্যাদা দিলেন। শুধু তাই নয়, তার নানা গুণের পরিচয় পেয়ে তিনি তার বাণিজ্যিক, বৈষয়িক এবং গৃহস্থালীর কাজেও তার পরামর্শ নিতে লাগলেন। ক্রমে বাণিজ্যযাত্রা করবার সময়ও তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলেন।

এই বণিকও যখন দ্বীপের সুলতানের খ্যাতি শুনলেন তখন তিনি নানা বাণিজ্য দ্রব্য ও সুলতানের জন্য নানা মূল্যবান উপহারে জাহাজ ভরতি করে যাত্রা করলেন ঐ দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে রইলেন ইউশুপের বিবি। তিনি যেখানে যান সেখানেই ঐ মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

বণিক যথা সময়ে দ্বীপে উপস্থিত হয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করে নানা মূল্যবান জিনিস নজরানা দিলেন, সুলতান সে সব জিনিস পেয়ে মহাখুশী। সুলতানও প্রতিদানে মূল্যবান জিনিস উপহার দিলেন বণিককে।

দুইজনে দস্তুর মত দোস্তি হয়ে গেল। সুলতান বণিককে আপ্যায়ন করে বললেন—আজ আর আপনাকে জাহাজে ফিরতে দিচ্ছি না, আমার এখানে থেকেই আমার সঙ্গে রাত্রের খানাপিনা করবেন।

বণিক দুই হাত জোড় করে বললেন—আমি মাফ চাইছি, জাহাঁপনা।

কেন,—বাধা কি ?

বাধা—মানে—আমার জাহাজে মালপত্র পাহারা দেবার জন্যে এক অতি পূতচরিত্রা সতী সাধ্বী মহিলা আছেন, তাঁকে আমি নিজের সহোদরার মতো দেখি, গুরুর মতো পীরের মতো শ্রদ্ধা করি, সব কিছুতে তাঁর পরামর্শ নিই আমি। তাঁকে নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণের সর্ব দায়িত্বও আমার। তাই জাহাজে ফিরে না গিয়ে আমার উপায় নেই, তাই মাফ চাইছি আমি, জাহাঁপনা।

ইউশুপ বললেন—ও জন্যে ভাবতে হবে না, আমি এখান থেকে আমার অতি বিশ্বস্ত দুইজন লোক পাঠাচ্ছি আপনার জাহাজে, তারাই আপনার জাহাজের মালপত্তর সমেত এই বিবি সাহেবাকে পাহারা দেবে।

বণিক এতে রাজী হলে সুলতান না জেনে নিজেরই যে দুই ছেলেকে নতুন উজির আর আমীর করেছিলেন তাদেরই ডেকে বললেন—তোমরা দু'জন গিয়ে এই বণিকের জাহাজে এক বিবির হেপাজতে অনেক মালপত্র আছে সে সব পাহারা দাও। হুঁসিয়ার, বিবির যেন কোন আপদ বিপদ না ঘটে, মালপত্র যেন কিছু খোয়া না যায়।

সুলতানের হুকুমে নতুন উজির এবং আমীর দুইজন জাহাজে গিয়ে বিবির কাছে সুলতান যে তাদের তাঁকে পাহারা দিতে পাঠিয়েছেন সে কথা বলায় তিনি আর কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না। উজির আর আমীর রাত্রির কিছুটা সময় নমাজ করে কাটাল। তারপর উজির আমীরকে বললে—ভাই সাহেব, সুলতান আমাদের এখানে পাহারা দিতে পাঠালেন, কিন্তু এমনি শুধু শুধু বসে থাকলে ত আমরা ঘুমিয়ে পড়তে পারি, তার চেয়ে বরং আসুন আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে ভালমন্দ যা সব দেখেছি, যা সব ঘটেছে তাই বলা কওয়া করি।

আমীর বললে—এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আমার কথা শুনতে চান বলি, নসিব আমার বড়ই মন্দ। একই দিনে মা, বাপ, ভাই—সব হারিয়েছি আমি। আপনার যে নাম, আমার ভাইয়েরও ছিল ঐ নাম।

কেন, কি হয়েছিল তাদের।

বলছি, সব কথা খুলেই বলছি: আমার বাপজান অমুক জায়গা থেকে জাহাজে করে আমাদের নিয়ে বিদেশে যাচ্ছিলেন। ডুবো-পাহাড়ে ঘা খেয়ে আমাদের সে জাহাজ গেল ডুবে, খোদার দোয়ায় আমি এক কাঠ ধরে ভেসে এক ডাঙ্গায় উঠলাম বটে, কিন্তু আমার বাপ মা ভাইয়ের যে কি দশা হল কিছুই জানতে পারলাম না আমি।

উজির শুনেই অমনি বলে উঠল—ভাই সাহেব, আপনার মায়ের নাম ছিল কি বলুন ত!

নাম বললে আমীর।

আর বাপজানের?

আমীর নিজের বাপের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে উজির এক লাফে উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, তুমিই আমার ভাই। আমি তোমার দাদা।

মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে দুই ভাই নিজের নিজের জীবনে যা কিছু ঘটেছে নিজেদের মধ্যে তাই বলা কওয়া করতে লাগল। ওদের মা ওদের কথাবার্তা সব কিছুই কান পেতে শুনলেন কিন্তু তখনই সংযম হারিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন না। রাত্রি ভোর হলে এক ভাই বললে—ভাই, ফজর ত হয়ে গেল, এবার চলো আমরা নিজেদের আস্তানায় গিয়ে কথাবার্তা বলি।

সেই ভাল।

এই বলে দুই ভাই জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। আর এদিকে বণিক এসে দেখে তার ধর্মবোনের মুখ ভার।

কি হল, বোন, মুখ এত ভার কেন?

মহিলা উত্তরে বললেন, আপনি ত আপনার অচেনা দুই লোক পাঠালেন আমায় পাহারা দিতে, কিন্তু তারা যে আমায় কি জ্বালিয়েছে তা কি বলব।

কেন—কি করলো তারা ?

তারা কুপ্রস্তাব দিয়ে আমায় প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছে, বিরক্ত করেছে।

শুনে বণিক মহাক্রুদ্ধ হয়ে ছুটলেন তখনই সুলতানের কাছে, গিয়ে বললেন সব কথা তাঁকে খুলে।

সুলতান তখনই ডেকে পাঠালেন নতুন উজির আর আমীরকে, এদের স্বভাবের জন্য এদের বড়ই ভালবাসতেন সুলতান, এরাই শেষে এই করলো, পুরো বিশ্বাস হয় না যেন তাঁর ! যাই হোক—শোনাই যাক। তা ছাড়া যে মহিলার সঙ্গে এরা দুর্ব্যবহার করেছে তাঁকেও জাহাজ থেকে আনালেন তিনি দরবারে। তাঁর নিজের মুখেই নিজের ফরিয়াদ শোনা যাক।

মহিলা তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি তাঁকে বললেন—বিবিসাব, আমি আমার দুই বিশ্বস্ত কর্মচারীকে কাল রাত্রে আপনাকে পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়েছিলাম, ওরা কি অসদাচরণ করেছে আপনি নিজের মুখে বলুন।

মহিলা উত্তর দিলেন—জাহাঁপনা, খোদার দোহাই দিয়ে বলছি আমাকে কিছু বলতে হুকুম করবেন না, ওরা কাল জাহাজে বসে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করেছে—তাই এখানে ওদের বলতে বলুন।

সুলতান তখন তাঁর উজির আর আমীরকে হুকুম দিলেন—ওহে, কাল তোমরা জাহাজে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করেছ, তাই এখানে খুলে বলো, কোন কিছু লুকোলে ফ্যাসাদে পড়বে।

ওরা তখন কোন কিছু বাদ না দিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে গত রাত্রের কথাবার্তা সব সুলতানকে শুনিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সুলতান তাঁর সিংহাসন থেকে ছুটে এসে ওদের দুজনকে একই সঙ্গে বুকে

জড়িয়ে ধরে একরকম চীৎকার করেই বলে উঠলেন—ইয়া আল্লা, তোরাই আমার দুই বেটা।

ঠিক তখনই মহিলা তার মুখ থেকে বোরখা সরিয়ে বলে উঠলেন—আর আমিই ওদের মা।

এরপর এ চারজনের মধ্যে যে কি আনন্দের সাড়া পড়ে গেল তা, জাহাঁপনা সহজেই কল্পনা করতে পারছেন, মুখে আর আমি তার কি বর্ণনা দেব। এরপর খোদার ডাকে তাঁর কাছে যাওয়ার আগে তাদের জীবনে আর কোন দুঃখের কারণ ঘটে নি।

গল্প শুনে শাহরিয়ার বললেন—বড় আনন্দ পেলাম তোমার এ গল্পটা শুনে।

দুনিয়াজাদী বললে—দিদি, এখনও রাত আছে, আর একটা ছোট গল্প শোনা-না, ভাই।

অনুমতির জন্যে শাহরাজাদী সুলতানের দিকে চাইতেই তিনি বললেন—হ্যাঁ, শুরু করো।

ইস্কান্দর অল্ কার্নায়

সুলতানের অনুমতি পেয়ে শাহরাজাদী বলতে শুরু করলে—

শোনা যায়—ইস্কান্দর অল্ কার্নায় দেশভ্রমণে বেরিয়ে এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলেন যেখানে সবাই একেবারে নিঃস্ব। নিঃস্ব বলে নিঃস্ব, পার্থিব ভোগের কোন কিছুর ব্যবস্থাই নেই তাদের। নিজেদের কেউ মারা গেলে নিজেদের ঘরের সামনেই তারা কবর দেয়, সে কবরে ধুলোবালি পড়লে তারা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে, আর প্রতিদিন মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে আল্লার দোয়া মাঙে। মাটিতে যে গাছপালা জন্মে তার পাতা আর ঘাস ছাড়া তাদের অন্য খাদ্যের

ব্যবস্থা নেই।—দেখে বড় কষ্ট হল দিগ্‌বিজয়ী ইস্কান্দরের মনে, তিনি ডেকে পাঠালেন ওদের সর্দারকে। সর্দার এল না, বললে—কি দরকার আমার ওঁর কাছে যাওয়ার, আমার ত কিছু চাওয়ার নেই তাঁর কাছে।

দূত ফিরে এসে যখন এই কথা জানালে ইস্কান্দরকে তখন তিনি নিজেই গিয়ে হাজির হলেন সর্দারের কাছে, গিয়ে বললেন—তোমরা কেমন লোক, হে, এমন হাল কেন তোমাদের, সোনা রুপো, দুনিয়ার ধনদৌলত কিছুই ত তোমাদের—দেখছি—নেই!

সর্দার হেসে বললে—ও সবের কোন কিছু পেলেই কি লোকের আকাঙ্ক্ষা মেটে?

তোমাদের ঘরের দরজার সামনে অমন কবর খোঁড়া কেন?

উত্তরে সর্দার বললে—এ আমাদের চোখের সামনে থাকলে আমরা আমাদের নিজেদেরও মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন থাকি, তা ছাড়া পরলোকের কথা ভেবে আল্লা খোদাতালায় মন দিতে পারি, ঐহিক বাসনা কামনার খপ্পরে পড়ি না।

বেশ তা যেন হল, কিন্তু তোমরা ঘাস খাও কেন?

সর্দার এর জবাবে বললে—এর কারণ হচ্ছে দুটো। তার একটা হচ্ছে—আমাদের উদরকে আমরা জীবজন্তুর কবরখানা করে তুলতে চাই না, তা ছাড়া আমারা জানি গলার নীচে নামলেই ত আহারের আনন্দ ফুরিয়ে গেল।

এরপর সর্দার একটা মানুষের মাথার খুলি বের করে ইস্কান্দরের সামনে ধরে বললে—আপনি জানেন এটা কার মাথার খুলি?

না।

সর্দার বললে—যাঁর খুলি এটা, তিনি এই দুনিয়ার এক মহা-প্রতাপশালী সুলতান ছিলেন, প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করতেন, গরিবদের করতেন শোষণ, এমনি করে দুনিয়ার জঞ্জাল অনেক ধনরত্নের তিনি স্তূপ করেছিলেন। শেষে আল্লার রোষেই পুড়ে মরতে হল তাঁকে, এ হচ্ছে সেই সুলতানের মাথার খুলি। এরপর

সর্দার আর একটা খুলি বের করে ইস্কান্দরের সামনে রেখে বললে, আর এটা কার মাথার খুলি জানেন?

না ত।

সর্দার বললে—এটা হচ্ছে আর এক সুলতানের মাথা। এ সুলতান ন্যায়নিষ্ঠ, প্রজাপালক ছিলেন, তাঁর রাজ্যের লোকজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন, তাই মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা আল্লার কাছে গিয়ে বেহেস্তের গুলবাগিচায় ঠাঁই পেয়েছে।

এরপর সর্দার ইস্কান্দরের মাথার উপর একটা হাত রেখে বললে—আপনার এটা—এ দুটির কোনটির মত যদি জানতাম।

শুনে ইস্কান্দর চোখের জলে ভেসে সর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমায় আমার উজির করে নেব, দুজনে এক সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করব।

সর্দার অমনি বলে উঠল—যান যান, ওসব কিছু আমি চাই না, কোন দরকার নেই আমার।

কেন, এ কথা বলছ কেন?

বলছি তার কারণ—আপনার অনেক ধনরত্ন আছে, আর আপনি দিগ্‌বিজয় করেছেন বলে দুনিয়ার তামাম লোক আপনার শত্রু, দুশমন, আর আমার সন্তোষ আর দারিদ্র্যের জন্যে দুনিয়ার তামাম লোক আমার দোস্ত। আমার কিছুই নেই, পার্থিব কোন কিছু চাইও না আমি কিছু, চাই কেবল আমি মনের সন্তোষ।

সর্দারের এই কথা শুনে ইস্কান্দর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, চোখে চুমু দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।